ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত

কবিজীবনী

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত

কবিজীবনী

শ্রীভবতোষ দত্ত
সম্পাদিত

ক্যালকাটা বুক হাউস
১।১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২

প্রকাশক শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল
ক্যালকাটা বুক হাউস
১।১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২

প্রচ্ছদশিল্পী
শ্রীঅনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

মুদ্রাকর শ্রীমন্মথনাথ পান
কে. এম. প্রেস
১।১ দীনবন্ধু লেন, কলিকাতা ৬

জনক-জননী

শ্রীচরণেষু

ইহার পূর্ব্বে কোন মহাশয় এতদ্দেশীয় কোন কবির জীবন-চরিত প্রকাশ করেন নাই,—এবং এতৎ প্রকাশের কি ফল তাহাও কেহ জ্ঞাত হয়েন নাই—আমরা প্রথমেই ইহার পথ-প্রদর্শক হইলাম।

—ঈশ্বর গুপ্ত ১২৬২

ভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যে কবিখ্যাতি ছিল তাহা সুপরিচিত; কিন্তু সংবাদ-প্রভাকরে বিক্ষিপ্ত তাঁহার গদ্যরচনার পরিচয় সাধারণ পাঠকের প্রায় অজ্ঞাত। সে-যুগে তাঁহার সম্পাদিত এই পত্রিকা যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, এবং তাঁহার অধিকাংশ গদ্যরচনা ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে ১৮৫৩ হইতে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সংকলিত প্রাচীন কবি ও কবিওয়ালাদের লুপ্তপ্রায় জীবনবৃত্তান্ত ও অপ্রকাশিত রচনা সংগ্রহ। তাঁহার অব্যবহিত পূর্ব্বের যুগের ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ হইতে আরম্ভ করিয়া, টপ্পা-রচয়িতা রামনিধি গুপ্ত ও হরু ঠাকুর রাম বসু প্রভৃতি কবিওয়ালাদের সম্বন্ধে যে সমস্ত সাময়িক উপাদান বিক্ষিপ্ত ও দুরধিগম্য অবস্থায় পড়িয়া ছিল, তাহার উদ্ধার করাই ছিল ঈশ্বর গুপ্তের মুখ্য উদ্দেশ্য; এবং ইহার জন্য তিনি অশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের সাধারণ গদ্যরচনার যাহাই মূল্য হউক না কেন, বাংলা সাহিত্যে এই ধরণের প্রথম উদ্যোগ হিসাবে এই নিবন্ধগুলির পৃথক্ মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

সংবাদ-প্রভাকরের পুরাতন ফাইল এখন দুষ্প্রাপ্য। যাহা আছে তাহাও হয়ত কিছু কাল পরে লুপ্ত হইয়া যাইবে। পুনর্মুদ্রণের অভাবে গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত এই রচনাগুলি সাধারণ পাঠকের গোচরে আসে নাই। সেই জন্য হয়ত ঈশ্বর গুপ্তের এই কৃতিত্বের যথাযোগ্য সমাদর হয় নাই। কিন্তু যাঁহারা পরবর্ত্তী কালে এই যুগের সাহিত্য-ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, ঈশ্বর গুপ্তের সংগৃহীত তথ্যই তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল, যদিও এক রামগতি ন্যায়রত্নের উল্লেখ ছাড়া অন্য কোথাও ইহার স্বীকৃতি দেখি নাই। একমাত্র ভারতচন্দ্র

সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্ত যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা ছাড়া অন্য রচনাগুলি পৃথক্ গ্রন্থরূপে মুদ্রিত হয় নাই। এই সব কারণে মনে হয়, ঈশ্বর গুপ্তের অধুনা বিস্মৃতপ্রায় এই লেখাগুলির পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন আছে।

ঈশ্বর গুপ্তের এই অনুসন্ধান ও সংগ্রহের মূলে ছিল—এক দিকে প্রাচীন কবিদের প্রতি তাঁহার আন্তরিক মমত্ববোধ, অন্য দিকে তৎকালে প্রচলিত ও জনপ্রিয় কবিগান আখড়াই গান প্রভৃতির সহিত মাঝে মাঝে বাঁধনদার বা গীতিরচয়িতা হিসাবে তাঁহার সাক্ষাৎ সংযোগ। নিরক্ষর না হইলেও ঈশ্বরগুপ্ত যে সুশিক্ষিত ছিলেন, এ কথা বলা যায় না। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন : "বলিতে গেলে শিক্ষা যাহাকে বলে ঈশ্বরচন্দ্র তাহার কিছুই পান নাই। ইংরাজি শিক্ষা ত হইলই না, বাঙ্গালাও নিজে পড়িয়া যাহা শিখিলেন তাহাই একমাত্র সম্বল হইল।" কিন্তু তাঁহার প্রখর বুদ্ধি, চতুরতা ও সহজ জ্ঞান যথেষ্ট ছিল ; শিক্ষিত সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিবার সুযোগও তিনি পাইয়াছিলেন। ইহার সঙ্গে ছিল তাঁহার পদ্য লিখিবার সহজাত শক্তি। অব্যবহিতপূর্ব্ব যুগের কবিদের কাব্যে অনুরাগ এবং সমকালবর্ত্তী কবিওয়ালা প্রভৃতির সহজ সঙ্গীতামোদের প্রতি পক্ষপাত তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ পদ্যরচনার শক্তিকে উদ্রিক্ত ও বর্দ্ধিত করিয়া তাঁহাকে অপূর্ব্ব অশিক্ষিত-পটুত্বের অধিকারী করিয়াছিল।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের তিনি প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। ভারতচন্দ্রের যে সুমার্জ্জিত ও গাঢ়বদ্ধ ভাষা, শিক্ষিত রসবোধ, বিদ্বৎসুলভ বৈদগ্ধ্য ও স্বল্পাক্ষর প্রকাশভঙ্গী, তাহার অন্তর্লোকে প্রবেশ করিবার মত শিক্ষা, ভাব ও কল্পনা ঈশ্বর গুপ্তের বা তাঁহার সমকালীন গীতরচয়িতাদের ছিল না। সেইজন্য ভারতচন্দ্রের নিখুঁত ক্লাসিকাল বাণীভঙ্গি পরবর্ত্তী যুগে স্থায়িত্বলাভ করিল না। কেবল দেখিতে পাই, উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী বিদ্যাসুন্দরের অক্ষম ও কদর্য্য অনুকরণ।

ঈশ্বর গুপ্তের নিজের কবিতাও খুব উঁচু দরের হইয়া উঠিল না। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার প্রশংসা করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে বলিয়াছেন, এরূপ কবি জন্মিয়া আর কাজ নাই! অর্থাৎ, যুগ-পরিবর্ত্তন এবং নূতন শিক্ষা ও আদর্শের প্রসারে এরূপ কবিতার রস ও রুচি জীর্ণপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। নবযুগের নবজাগ্রত রস-পিপাসা ও নূতন সৃষ্টির আগ্রহ ইহার দ্বারা তৃপ্ত হইবার নয়। তথাপি, ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব-শক্তি থাক্‌ না থাক্‌, তিনি পূর্ব্বকবিদের মর্য্যাদা বুঝিয়াছিলেন। তাঁহাদের লুপ্তপ্রায় রচনা-সংরক্ষণের জন্য তাঁহার শ্রদ্ধান্বিত চেষ্টা সত্যই প্রশংসার যোগ্য।

ভারতচন্দ্র বা রামপ্রসাদ প্রবর্ত্তিত সাহিত্যের জের ঈশ্বর গুপ্ত ঠিক টানিতে পারেন নাই বলিয়াই, বোধ হয়, ঈষৎ পূর্ব্বকালের ও সমকালের চটুল গীতি, ছড়া ও পদ্যরচনার দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহাকে প্রেরিত করিয়াছিল কবি-টপ্পা-আখড়াই-রচয়িতাদের গীত ও জীবনী সংগ্রহে। প্রাচীনতর কবিদের মত ইঁহাদের জীবন-বৃত্তান্ত সুজ্ঞাত ছিল না; এবং গানের আসরে মুখে-মুখে রচিত পদগুলি কালে অবজ্ঞাত ও লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। কিংবদন্তী ও লোকের স্মৃতির উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় ছিল না। ক্ষণস্থায়ী আমোদের চটকদার উপায় হিসাবে ইহার অধিকাংশ, উঁচু দরের কেন, কোন দরের সাহিত্য হইয়া উঠে নাই। শিল্পরূপ ছিল অতি সামান্য; আধ্যাত্মিকতা বা বৈষ্ণবগীতির সূক্ষ্মতা ছিল না বলিলেও চলে। কিন্তু খুব স্থূল হইলেও এই রচয়িতাদের মন ছিল সাধারণ মানুষের মন। ইহাদের গানে ও ছড়ায় ছিল দৈনন্দিন বাঙালী জীবনের সরস অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছায়া; ইহাদের প্রেম ছিল সাধারণ মানুষের প্রেম; ইহাদের আগমনী গানে ছিল বাঙালীর সহজ বাৎসল্যের স্বাভাবিক আকুলতা। গুরু গম্ভীর কৃত্রিম রচনাগুলি ছাড়িয়া দিলে, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতারও মুখ্য প্রতিপাদ্য ছিল সেই যুগের সাধারণ মানুষ—রঙ্গভরা বঙ্গদেশের সাধারণ বাঙালী। তদনুযায়ী কবির মনও ছিল সাধারণ বাঙালীর

মন। সেই জন্য কবিওয়ালা প্রভৃতির লৌকিক গানগুলি তাঁহার মনের অনুকূল ছিল, এবং ইহাদের সংগ্রহে ও সংরক্ষণে তাঁহার উৎসাহের অন্ত ছিল না। কবি গান, টপ্পা ও আখড়াই সঙ্গীত কালে বৈঠকী গান হিসাবে, নব্যবঙ্গের না হউক, সে-কালের তথা-কথিত 'বাবু' সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন করিত,—একথা আমরা জানি উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রচিত 'নববাবুবিলাস' পুস্তকে নবধা 'বাবু'লক্ষণের মধ্যে আখড়াই গানের উল্লেখ হইতে। অনেক পরবর্ত্তী কালে হুতোম প্যাঁচার নক্সাতে যে আখড়াই গানের উল্লেখ আছে তাহাও স্মরণীয়। এই ধরণের গানের সঙ্গে রামপ্রসাদের সময় হইতে শাক্ত গানও যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। দেখিতে পাই, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার বোধেন্দুবিকাশে শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীতের অবতারণা করিয়াছেন।

সুতরাং মনে হয়, পূর্ব্বকালের কবিদের প্রতি ঈশ্বর গুপ্তের যে পক্ষপাত ছিল, তাহা আন্তরিক হইলেও তাঁহাদের রচনার প্রকৃত মূল্যবোধ সম্বন্ধে তাঁহার কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তাঁহার প্রচেষ্টার পিছনে কোনও সাহিত্যিক আদর্শ বা সাহিত্য-ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া বোধ হয় না। সাহিত্য-সমালোচনার চেষ্টাও তিনিও করেন নাই। কিন্তু উদ্দেশ্য যাহাই হউক, ভারতচন্দ্রের সময় হইতে তাঁহার নিজের সময় পর্যন্ত প্রচলিত বাংলা রচনার যে উপাদান তিনি সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অন্য উপকরণের অভাবে এখনও আমাদের প্রধান উপজীব্য। বিশেষজ্ঞের জানা থাকিলেও সাধারণ পাঠকের প্রায় অজ্ঞাত। আধুনিক কালের অনুসন্ধান ইহার খুব বেশি তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে বলিয়া হয় না।

স্নেহাস্পদ শ্রীভবতোষ দত্ত প্রাচীন কবি সম্পর্কে বর্ত্তমান কালে মূল্যবান্ ঈশ্বর গুপ্তের এই রচনাগুলি প্রকাশ করিবার ভার স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়াছেন। এই ভার-বহনের শিক্ষা, যোগ্যতা ও অধ্যবসায় তাঁহার আছে। এক জায়গায় বা কোন নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থাগারে সংবাদ প্রভাকরের সব ফাইল পাওয়া যায় না। সেগুলির অনুসন্ধান পরিশ্রম

সাপেক্ষ, এবং ধারাবাহিক ভাবে সযত্নে সাজাইয়া টীকাটিপ্পনীর সহিত প্রকাশ করা যথেষ্ট জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করে। শ্রীযুক্ত দত্ত তাহাতে সফল হইয়াছেন।

কিন্তু তাঁহার বর্ত্তমান গ্রন্থ কেবলমাত্র সংকলন নয়। কবিদের সম্বন্ধে পরবর্ত্তী কালে প্রাপ্ত তথ্যের তিনি যথাযোগ্য সমাবেশ করিয়াছেন, এবং এই সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটি ভুলভ্রান্তিরও সংশোধন করিয়াছেন। নাতিদীর্ঘ ভূমিকায় তিনি ঈশ্বর গুপ্তের আলোচ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত প্রচলিত বাংলা কাব্যের ও কাব্যজাতীয় রচনার যে ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনি ভারতচন্দ্রকে লইয়াছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের, রামনিধি গুপ্তকে ইহার দ্বিতীয়ার্দ্ধের, এবং ঈশ্বর গুপ্তকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের প্রতিনিধি হিসাবে। সঙ্গতি রক্ষার খাতিরে এরূপ নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা মোটামুটি ঠিক হইতে পারে, কিন্তু টপ্পারচয়িতা রামনিধি গুপ্ত বা তাঁহার সমসাময়িক কবিওয়ালারা কেবল অরাজক বাংলা সাহিত্যের আসর জমাইয়া রাখিয়াছিলেন; প্রতিনিধি হিসাবে বসিবার প্রতিভা বা যোগ্যতা তাঁহাদের ছিল বলিয়া মনে হয় না।

যাহা হউক, তৎকালীন রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও সাহিত্যিক পরিবেশের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সে-যুগের বাংলা কাব্য ও গীত রচনা ও রচয়িতাদের সম্বন্ধে গ্রন্থের সম্পাদক একটি বিশ্লেষণমূলক সুলিখিত বিবরণ দিয়াছেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইতেছে কবিগানের লৌকিক উদ্ভব ও আখড়াই গান সম্বন্ধে তাঁহার যুক্তিযুক্ত আলোচনা। ঈশ্বর গুপ্তের জীবনী সম্বন্ধে কতকগুলি অপ্রকাশিত ঘটনাও তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে কৌতূহলজনক হইতেছে, হিন্দু কলেজের নূতন শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য উক্ত কলেজের কর্ত্তৃপক্ষসভা স্থির করিয়াছিল "prosecuting him if necessary"!

অথচ ইহা বিস্ময়কর যে, ঈশ্বর গুপ্ত নাকি Tom Paine রচিত *Age of Reason* গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন !

আধুনিক রস ও রুচির অনুকূল না হইলেও, প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি আন্তরিক অনুরাগ আমাদের তরুণ সম্পাদককে প্রেরিত এবং ইহার মর্য্যাদাবোধ তাঁহাকে অবহিত করিয়াছে। তাঁহার জিজ্ঞাসু মন যে অনুসন্ধিৎসা, অধ্যয়ন ও তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছে, তাহা বর্ত্তমানে বাংলার সাহিত্যবিষয়ক আলোচনায় বিরল হইয়া আসিতেছে। সেইজন্য তাঁহার গ্রন্থ প্রকৃত সাহিত্যোৎসাহী পাঠকের সহায়ক হইবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

কলিকাতা

শ্রীসুশীলকুমার দে

নিবেদন

কবি ঈশ্বর গুপ্ত সংবাদপ্রভাকরে কবি ও কবিওয়ালাদের যে জীবনী প্রকাশ করেছিলেন, একমাত্র ভারতচন্দ্র ছাড়া তাদের কোনোটাই স্বতন্ত্রভাবে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় নি। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের একটা যুগের আলোচনা করতে গিয়ে সকলেই ঈশ্বর গুপ্তের এই রচনার উপরেই নির্ভর করেছেন। সেইজন্য কবি এবং কবিওয়ালাদের জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি হয় তো আধুনিক পাঠকের একেবারে অজ্ঞাত নয়। তা হলেও মূল রচনাগুলি দেখবার সুযোগ সাধারণ পাঠকের অনেকেরই হয় না; সেই দিক বিবেচনা করলে এই জীবনীগুলির পুণর্মুদ্রণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু এ ছাড়াও 'কবিজীবনী' প্রকাশের অন্য রকম গুরুত্বও আছে। জীবনী রচনা করতে গিয়ে ঈশ্বর গুপ্ত কবিদের যুগের নানা ঘটনার উল্লেখ করেছেন, ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ চিত্র রচনার পক্ষে তাদের মূল্য আছে। লেখক নিজে হয়তো এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন না, কিন্তু বাঙালীর নবজাগ্রত ইতিহাস-চর্চার পরিমণ্ডলে বাস করে তিনি এর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেন নি। তিনি নিজেই বলেছেন 'ইহার পূর্বে কোন মহাশয় এতদ্দেশীয় কোন কবির জীবন-চরিত প্রকাশ করেন নাই।' লোক-শ্রুতি থেকে সংগ্রহ করে মূলতঃ জীবনীগুলি রচিত; এগুলিকে ইতিহাসের রূপ তিনি দিতে পারেন নি সত্য; কিন্তু উপাদান তিনি রেখে গিয়েছেন এবং সেটুকু যদি তিনি না করতেন, তবে আজও এর ইতিহাস গঠন করা যেত না। বর্তমান গ্রন্থটি সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই প্রস্তুত করা হয়েছে। ভারতচন্দ্র-রচিত মঙ্গল কাব্য, রামনিধি-রচিত টপ্পা বা কবিওয়ালাদের রচিত কবিগানের স্বতন্ত্র রস-বিচার বর্তমান সম্পাদকের লক্ষ্য নয়; অষ্টাদশ শতাব্দীতে সৃষ্ট সাহিত্যের ব্যাপক বর্ণনাও আমার উদ্দেশ্য নয়। জীবনীকে মাত্র অবলম্বন করে সাহিত্য ধারার সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছি। সেইজন্য এই সব বিষয়ে স্বতন্ত্র এবং বিস্তৃত আলোচনায় ব্যাপৃত হই নি। ঈশ্বর গুপ্ত যাঁদের জীবনী রচনা করেছিলেন, তাঁরা সকলেরই জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীতে। সেই

হিসাবে এই শতাব্দীর সাহিত্যের ইতিহাসকেই যথাসম্ভব স্পষ্ট করবার চেষ্টা করেছি।

আমাদের দীর্ঘ মধ্যযুগের মঙ্গল কাব্যের শেষ সার্থক কবি ভারতচন্দ্র এই যুগের প্রথম কবি। ভারতচন্দ্রের জীবনীতে এবং কাব্যে মধ্যযুগীয় দীর্ঘ ঐতিহ্যের শেষ উজ্জ্বল দীপ্তি যেমন আছে, তেমনি আসন্ন পরিবর্তনের আভাসও তাতে দুর্লক্ষ্য নয়। কোম্পানীর রাজত্ব পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করেছেন ভারতচন্দ্র। ওই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ একটা বিশৃঙ্খলারই যুগ। এই সময়ে কোনো বড়ো কবি সত্যই কেউ নেই, যিনি যুগের বাণীকে কাব্যে রূপ দিতে পারেন। এই যুগের কোনো স্পষ্ট রূপ নেই, তাই তার বাণীও নেই। এই বিশৃঙ্খল অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের একমাত্র শক্তিমান্ কবি রামনিধি গুপ্ত। রামনিধির জীবন-কাহিনীতে যেমন এই যুগের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ছায়া আছে, তাঁর গানেও তেমনি স্পষ্টতঃই বাংলা কাব্যের দিক্ পরিবর্তন আভাসিত হয়েছে। এই আভাস স্পষ্ট হতে লাগল উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মানবিক মূল্যবোধ যখন নতুন শিক্ষাপ্রণালীর দ্বারা দেশে ছড়িয়ে পড়তে থাকল। স্বভাবতঃই সেই সময়টা ছিল প্রাচীন এবং নবীনের দ্বিধার যুগ। ঈশ্বর গুপ্তের রচনা এবং জীবন-কাহিনীতে এই দ্বিধার পরিচয় আছে। কবিতায় ঈশ্বর গুপ্তের যে পরিচয় পাই, সংবাদপ্রভাকরের সম্পাদকীয় মন্তব্যের সঙ্গে সর্বাংশে তা মেলে না। 'অবতারণা'র পঞ্চম অধ্যায়ে আমি এই ইতিহাসের আভাস দিয়েছি। একদা ধর্মসভার অনুগামী রক্ষণশীল ঈশ্বর গুপ্ত ধর্ম সংরক্ষণের অতি উৎসাহে একদিকে খ্রীষ্ট ধর্মান্দোলনের বিরুদ্ধে টম পেইনের *Age of Reason*-এর অনুবাদ করেছিলেন, তেমনি হিন্দু কলেজের প্রতিকূল মন্তব্যের ফলে তাঁর মামলায় জড়িয়ে পড়বার উপক্রমও হয়েছিলেন। এই ঈশ্বর গুপ্তই প্রায় কুড়ি বছর পরে ধর্মসভার বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করেছিলেন এবং স্ত্রী-শিক্ষা ইত্যাদি সমাজ সংস্কার কিছু কিছু সমর্থন করেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের এই পরিবর্তনকে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী মানসের অনতিক্রম্য পরিবর্তনের প্রতীক বলেই মনে করি। যদিও ঈশ্বর গুপ্তের কর্ম ও কীর্তির আলোচনা 'কবিজীবনী'র ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় প্রত্যক্ষ-ভাবে আসে না, কিন্তু বর্তমান সময়ের পাঠকের কাছে এর ধারাবাহিকতা সম্পূর্ণ করে দেখাবার জন্যই এর প্রয়োজন আছে। বিশেষতঃ ঈশ্বর গুপ্ত

কবিগানের ঐতিহ্যকে টেনে চলেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমাজের দ্বিধার ভাব কেটে গেল। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যে নতুন মূল্যবোধ সুপ্রতিষ্ঠিত হল।

ঈশ্বর গুপ্ত কবিওয়ালাদের যে জীবনী লিখেছেন, তাতে গানের সংকলনই বেশি। কবিগানের এবং কবিওয়ালাদের ব্যক্তিগত সৃষ্টির আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হত না মনে হলেও আমি বিশেষ করে সাহিত্য-ইতিহাসের প্রধান গতিকেই অনুসরণ করে এসেছি। আখড়াই ও কবিগানের সাধারণ আলোচনাই আমি করেছি। এদের রীতি-পদ্ধতির বিশ্লেষণে প্রবেশ করা আমার পক্ষে অনাবশ্যক ছিল। বিশেষতঃ অধ্যাপক সুশীলকুমার দের *History of Bengali Literature in the Nineteenth Century* গ্রন্থে 'কবিওয়ালা' অধ্যায়টিতে এর সর্বাঙ্গীণ আলোচনা আছে। অবশ্য তার পরেও 'কবিওয়ালা' সম্পর্কে সম্প্রতি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ব্রজসুন্দর সান্যাল লিখিত ধারাবাহিক 'কবিওয়ালা' প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। 'নব্যভারত' এবং 'সাহিত্য সংহিতা'য় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ দুটির মধ্যে ভাবগত এবং ভাষাগত পার্থক্য নেই বললেই হয়। কবিগান সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার অবকাশ আমার ছিল না কিন্তু ইতিহাসের দিক্ দিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে কবিগানের উদ্ভব বৈষ্ণব ঐতিহ্যে নয়, এর উদ্ভব নেহাতই লৌকিক। বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব এর উপর পড়লেও গানের পদ্ধতি, আবেগ, মনোভাব এমন কি বিষয়বস্তুও লোকজীবনের নিম্ন সমাজ থেকেই এসেছে। 'অবতারণা'র চতুর্থ অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কবিগানের প্রাচীনতম সংগ্রহকার ঈশ্বর গুপ্তের সংগ্রহে কোথাও গৌরচন্দ্রিকা, প্রেমবৈচিত্ত বা অনুরূপ খাঁটি বৈষ্ণবীয় ভাবের গান নেই। তা ছাড়া ঈশ্বর গুপ্ত বলেছেন, "কেহই এ সকল কবিতা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই, কেবল মুখে অভ্যাস করিয়া রাখিয়াছেন সুতরাং সে অভ্যাস বৃথা হইতেছে। অক্ষরবদ্ধ থাকিলে অন্বেষণ দ্বারা প্রাপণ পক্ষে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে"। সুতরাং এই সাহিত্য সৃষ্টির রীতি পদ্ধতি সবই মধ্যযুগের অন্যান্য সাহিত্যধারার থেকে আলাদা। পরবর্তী কালে বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে এর মধ্যে কিছু কিছু বৈষ্ণব বিষয়ের প্রবর্তন হয় তো হয়েছিল, কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন। পাঁচালী বা যাত্রার বিষয় কবিগানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী।

কবিগানের 'ক্রিটিকাল' আলোচনা সম্ভব কিনা জানি না, কিন্তু অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিচিত্র সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। রচয়িতা-সমস্যা, পাঠ-সমস্যা, কবিগানের আদি রূপ সম্পর্কে সুস্পষ্ট দৃষ্টান্তের অভাব বারবারই অনুভব করেছি। মন্নূলাল মিশ্রের 'প্রাচীন ওস্তাদী কবির গান' কিংবা গঙ্গাচরণ ভট্টাচার্যের 'হাফ আখড়াই সঙ্গীত-সংগ্রামের ইতিহাস' প্রভৃতির মতো বইয়ের উপর আমাদের নির্ভর করতে হলেও এসব বইয়ে সঙ্গতির অভাব স্বভাবতঃই পাঠককে সন্দিগ্ধ করে তোলে। গান মাত্রই যেমন কবিগান না হতে পারে তেমনি বিশেষ কবিওয়ালার নাম থাকলেই সেটা তাঁর রচনা নাও হতে পারে, এইজন্য কবিগানের নিজস্ব রীতি এবং ইতিহাসের পরিষ্কার স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠা দরকার। সাহিত্য হিসাবে উৎকৃষ্ট হোক বা নাই হোক, কবিগানের আলোচনা যে সুরু হয়েছে, এটা আশার লক্ষণ। 'অবতারণা'র চতুর্থ অধ্যায়ে আমি আখড়াই সঙ্গীতের ইতিহাস ঈশ্বর গুপ্তের রচনা থেকেই সংকলন করেছি। এই আলোচনা পূর্ণাঙ্গ অবশ্যই নয়; পূর্ণাঙ্গ করতে গেলে সঙ্গীত-শাস্ত্রের যে জ্ঞান থাকা দরকার, বর্তমান সম্পাদকের তা নেই। বিশেষজ্ঞেরা সেই আলোচনা যোগ্যতার সঙ্গে করতে পারবেন বলে মনে করি। আখড়াই গান চর্চার ইতিহাস অনুসরণ করতে গিয়ে হাফ আখড়াই গানের উদ্ভবের সময়টি (১৮৩২, জানুয়ারী) এবং মনোমোহন বসু বর্ণিত উপলক্ষ্য (দ্রষ্টব্য পৃ ৪০৭-৯) নির্দেশ করা সম্ভব হয়েছে—ভবিষ্যতে যাঁরা আলোচনা করবেন, তাঁদের এটা কাজে লাগতেও পারে।

ঈশ্বর গুপ্ত ইচ্ছা করেছিলেন, প্রত্যেক কবির জীবনী স্বতন্ত্র গ্রন্থের আকারে প্রকাশ করবেন। বর্তমান সংকলনে 'কবি' এবং 'কবিওয়ালা' এই দুটি প্রধান ভাগ করে কবিদের আবির্ভাবকাল অনুসারেই জীবনীগুলি সাজিয়েছি। 'পরিশিষ্টে' কবিজীবনী সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন বা অন্য বিবরণ সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। গোঁজলা গুঁই বা লালু নন্দলালের জীবনী ঈশ্বর গুপ্ত সম্পূর্ণ সংগ্রহ করতে পারেন নি। 'প্রাচীন কবি'র সাধারণ আলোচনাতে তিনি তাঁদের উল্লেখ এবং গানের সংগ্রহ করেছেন। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ব্রিটিশ মিউজিয়ম থেকে নন্দলালের গান উদ্ধৃত করেছেন (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩২৯)। সেটি মূল্যবান্ সন্দেহ নেই, কিন্তু কবিওয়ালা লালু নন্দলালের সঙ্গে অভিন্ন কিনা বলা যায় না। আবিষ্কৃত গানও ঠিক কবিগানের প্রণালীতে লেখা নয়। অবশিষ্ট অংশে সংবাদ-

প্রভাকর থেকে যোড়াসাঁকো এবং বাগবাজারের সঙ্গীত-সংগ্রামের বর্ণনা দেওয়া হল। দুই কারণে সেটি উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ বাগবাজারের বাঁধনদার ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত; সেদিক থেকে ঈশ্বর গুপ্তের ভূমিকার প্রত্যক্ষ বিবরণ পাঠকদের কাছে কৌতূহলোদ্দীপক হবে; দ্বিতীয়তঃ হাফ আখড়াই গানের সমগ্র ছবিটিও তাঁরা এই বিবরণ থেকে কল্পনা করতে পারবেন।

এই গ্রন্থের সর্বশেষ ভাগ 'আনুষঙ্গিক তথ্য'। এই ভাগে পরবর্তী কালে প্রাপ্ত তথ্য সন্নিবিষ্ট করে ঈশ্বর গুপ্তের সংগ্রহ সম্পূর্ণ করবার চেষ্টা করেছি। প্রায় দেড় শ' বৎসরের ইতিহাসের রূপকে স্পষ্ট করতে গিয়ে ঈশ্বর গুপ্তের জীবনের ঘটনা ছাড়াও আরো কিছু কিছু নতুন সংবাদও চোখে পড়েছে। ভারতচন্দ্রের জীবন-কাহিনীতে উল্লিখিত বিষ্ণুকুমারীর পেঁড়ো অধিকারের ভিত্তিহীনতা তার মধ্যে একটি। ইনি ব্রজকিশোরী হলেও হতে পারেন, কিন্তু বিষ্ণুকুমারী অবশ্যই নন। ছাপরায় রামনিধির কার্যকলাপের সন্ধান করতে গিয়ে সিয়র-উল-মুতাখরীনে এক বাঙালী রামনিধির উল্লেখ পাওয়া গেল। ইনি আমাদের রামনিধি কিনা জানি না। এ বিষয়ে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় (৬৩ খণ্ড, ৪ সংখ্যা) প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলাম। তথ্য সংগ্রহ সম্পূর্ণ এবং ভ্রান্তিবর্জিত, এমন কথা বলার স্পর্ধা আমার নেই। সুধী পাঠক এর ভ্রান্তি ইত্যাদি নির্দেশ করলে সম্পাদক কৃতজ্ঞ হবেন।

এই গ্রন্থ সম্পাদনে অনেকেই আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে অনুসন্ধানের গুরুত্ব সম্পর্কে আমাকে সর্বপ্রথম অনুপ্রেরিত করেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ পূজনীয় শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়। উপদেশ নির্দেশ আলাপ আলোচনার দ্বারা তিনি আমার ঔৎসুক্য জাগিয়ে দিয়েছেন এবং সন্দেহ নিরসন করেছেন। আমার অধ্যাপকস্থানীয় শ্রদ্ধাস্পদ ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় সর্বদাই আমার কাজের সংবাদ নিয়েছেন। 'অবতারণা' অংশটি পড়ে এবং আলোচনা করে তিনি অশেষ উপকৃত করেছেন। আমার অধ্যাপক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় শুধু আলোচনা করেই নয়, গ্রন্থ প্রকাশেও পরামর্শ ইত্যাদি দিয়ে অপরিমেয় সাহায্য করেছেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের সস্নেহ উপদেশ এবং পরামর্শেও আমি উপকৃত। শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়ের নিকট যখনই যে সংবাদ জানতে চেয়েছি, অযাচিত সৌজন্যবশতঃ তখনই

চন্দননগর থেকে তিনি সেই সংবাদ জানিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন। বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন মহাশয়ও আমাকে বই দিয়ে ও অন্যভাবে সাহায্য করেছেন। রূপচাঁদ পক্ষীর শেষ জীবনের সংবাদ আমাকে জানিয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অগ্রজ-প্রতিম শ্রীযুক্ত দেবীপদ ভট্টাচার্য। এ ছাড়া যাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে আমি উপকৃত, কুচবিহার কলেজের অধ্যক্ষ আমার প্রাক্তন সহকর্মী শ্রীযুক্ত চণ্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কবি শ্রীযুক্ত অজিত দত্ত, সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ্ শ্রীযুক্ত রাজ্যেশ্বর মিত্র তাঁদের অন্যতম।

আচার্য সুশীলকুমার দের নিকট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় সর্বপ্রথম গ্রন্থ-সম্পাদনার পাঠ নিয়েছিলাম। অন্য মূল্যবত্তা ছাড়াও আমার কাছে তাঁর লিখিত ভূমিকাটির সেদিক থেকে একটি ব্যক্তিগত মূল্য আছে। তাঁর কর্মব্যস্ততার ফাঁকে ক্লেশ স্বীকার করে এই সমালোচনামূলক ভূমিকাটি তিনি যে লিখে দিয়েছেন, সেজন্য আমি কৃতার্থ।

পুরণো সংবাদপ্রভাকর দেখতে দেওয়ার জন্য কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার এবং সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষের নিকট আমি বিশেষভাবেই ঋণী। সংবাদপ্রভাকর থেকে কবিদের জীবনী অপরিসীম ধৈর্য সতর্কতা এবং নৈপুণ্য সহকারে আগাগোড়া নকল করে দিয়েছেন আমার পত্নী শ্রীমতী গার্গী দত্ত। তিনি দুমাসের মধ্যে এই বিস্তৃত পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। নানা কারণে গ্রন্থ প্রকাশে বিলম্ব হল বটে, কিন্তু তাঁর সাগ্রহ সহায়তা না পেলে প্রকাশ যে অনিশ্চিত হত, তাতে সন্দেহ নেই।

প্রেসিডেন্সী কলেজ
বাংলা সাহিত্য বিভাগ
কলিকাতা
২৯ ভাদ্র, ১৩৬৫

শ্রীভবতোষ দত্ত

আনুষঙ্গিক তথ্য

ভারতচন্দ্র

(১৭০৬—১৭৬০ খ্রী)

ভারতচন্দ্র অতি বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। ভারতচন্দ্রের পূর্বপুরুষের বিবরণ স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় 'ভারতচন্দ্র ও ভুরস্টরাজবংশ' প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে দিয়েছেন।[১]

ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য অতি প্রাচীন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের আদি বাসস্থান ছিল এই রাজ্য। বহু পণ্ডিতের বাস ছিল বলেও এর খ্যাতি ছিল। দার্শনিক শ্রীধরাচার্য দশম শতাব্দীতে 'ন্যায়কন্দলী' গ্রন্থের শেষে আত্মপরিচয় দিয়েছেন,

> আসীদ্দক্ষিণরাঢ়ায়াং দ্বিজানাং ভূরিকর্মণাং।
> ভূরিসৃষ্টিরিতি গ্রামো ভূরিশ্রেষ্ঠিজনাশ্রয়ঃ॥

জনশ্রুতিমূলক বিবরণ থেকে জানা যায় স্থানীয় সামন্তরাজা শনিভাঙড়কে পরাজিত করে চতুরানন নিয়োগী ভুরশুট রাজ্য দখল করেন। চতুরাননের দৌহিত্র কৃষ্ণ রায়কেই ভুরশুট রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ধরা হয়। কৃষ্ণ রায় ছিলেন মহাকবি কৃত্তিবাসের বংশজাত। চতুর্দশ কিংবা পঞ্চদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণ রায় রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করলেন। কৃষ্ণ রায়ের তিন পুত্র,—বসন্ত রায়, মহেন্দ্র রায় এবং মুকুট রায় ভুরশুট রাজ্যের তিনটি গড়ে তিনটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন যথাক্রমে গড় ভবানীপুরে, গড় পাঁড়ুয়ায় (বা পেঁড়োয়) এবং গড় দোগাছিয়ায়। গড় ভবানীপুরের বংশেই বিখ্যাত প্রতাপনারায়ণের জন্ম। ভারতচন্দ্র রসমঞ্জরীতে এঁর উল্লেখ করেছেন। প্রতাপনারায়ণ কৃষ্ণ রায়ের প্রপৌত্র। তাঁর সভাসদ ছিলেন ভরত মল্লিক, যিনি 'চন্দ্রপ্রভা' নামে বিখ্যাত কুলশাস্ত্র রচনা করেছিলেন। দীনেশ ভট্টাচার্য বলেন "১৬৫০—৮৫ খ্রীঃ মধ্যে ভরত মল্লিক ও রাজা প্রতাপনারায়ণকে নিঃসন্দেহে স্থাপন করা যায়।"

দ্বিতীয় রাজ্য পেঁড়ো সমগ্র ভুরশুট রাজ্যের ছ' আনা অংশ মাত্র ছিল। এই বংশেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ভারতচন্দ্র। ভুরশুট রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা কৃষ্ণ রায়ের দ্বিতীয় শাখায় ভূপতি রায়ের প্রপৌত্র সদাশিব রায়ের পৌত্র ও নরেন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন ভারতচন্দ্র। লক্ষ্মী-

---

১ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৫৮ ভাগ পৃ ১৮৯—২০০

নারায়ণ (বা লছিরনারায়ণ) তখন ভুরশুটের বৃহত্তম ও প্রধান গড় ভবানীপুরের রাজা। বর্ধমানের রাজা তখন ছিলেন কীর্তিচন্দ্র এবং কীর্তিচন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন নরেন্দ্রনারায়ণের পিতৃব্য রাজবল্লভ।[১] ভারতচন্দ্র রসমঞ্জরীতে লিখেছেন, "রাজবল্লভের কার্য্য কীর্ত্তিচন্দ্র নিল রাজ্য।" এই রাজবল্লভের চক্রান্তেই ভুরশুট রাজ্য বর্ধমানরাজের করতলগত হয়েছিল। কীর্তিচন্দ্র ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হয়েই বিভিন্ন রাজ্য জয়ে মন দিলেন।[২] দীনেশ ভট্টাচার্য বলেন, "আমাদের অনুমান, নরেন্দ্ররায়ের পিতৃব্য রাজবল্লভ এই চক্রান্তের নায়ক ছিলেন। জ্ঞাতিশত্রুর বিশ্বাসঘাতকতা এ স্থলেও রাজ্যনাশের কারণ হইয়া থাকিবে। ভারতচন্দ্র ও তাঁহার জীবনীলেখকেরা সমগ্র ভুরস্থট রাজ্যই নরেন্দ্র রায়ের অধিকারে ছিল, এইরূপ ধারণার সৃষ্টি করিয়াছেন। বস্তুতঃ পাণ্ডুয়ার গড় অধিকার এই সংঘষের একটা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ঘটনা মাত্র। কীর্ত্তিচন্দ্রের প্রধান লক্ষ্য ছিল বীর রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের পরাজয় এবং জনশ্রুতি অনুসারে লক্ষ্মীনারায়ণ পূর্ব্বতন কতিপয় সংঘর্ষে অপূর্ব্ব বীরত্ব দেখাইয়া জয়ী হইয়াছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণের পরাজয়ের পর পেঁড়োর অংশ অধিকার সহজসাধ্য ছিল, সন্দেহ নাই।" রাজবল্লভ-কীর্তিচন্দ্র সম্বন্ধে একটি ঐতিহাসিক ছড়া পাওয়া গিয়েছে বলে অধ্যাপক সুকুমার সেন উল্লেখ করেছেন।[৩] এই ঘটনা ঘটেছিল ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে।[৪]

লক্ষ্য করবার বিষয়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই বিবাদের যে বর্ণনা দিয়েছেন, উল্লিখিত বিবরণ তার থেকে আলাদা। ঈশ্বর গুপ্তের বিবরণে, কীর্তিচন্দ্র তখন শিশু। তাঁর জননী বিষ্ণুকুমারী আলমচন্দ্র ও ক্ষেমচন্দ্রকে পাঠিয়ে ভবানীপুর এবং পেঁড়োর গড় অধিকার করে নেন। ঈশ্বরগুপ্তের বিবরণ জনশ্রুতিমূলক, সম্ভবত সর্বাংশে তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। লোকনাথ ঘোষের ইতিহাসে বলা হয়েছে বিষ্ণুকুমারী ছিলেন তেজচন্দ্রের জননী। ১৭৭৬ থেকে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিষ্ণুকুমারী পুত্রের পক্ষে রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন। ১৭৪০

১ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ পৃ ৮৩৩

২ Lokenath Ghose, The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas Zeminders etc Part II (1881), p 6.

৩ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৮৩৩

৪ বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১৯৫৭) পৃ ৫৭৯। একটি সনদে তারিখ পাওয়া গিয়েছে ১১১৯ সাল।

খ্রীষ্টাব্দে কীর্তিচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র চিত্রসেন রায় রাজা হলেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং রাজ্য চলে যায় কীর্তিচন্দ্রের অনুজ মিত্রারাম রায়ের পুত্র তিলকচন্দ্রের হাতে। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে তিলকচন্দ্রের পুত্র তেজচন্দ্র রাজা হন। সুতরাং মহারাণী বিষ্ণুকুমারী ছিলেন কীর্তিচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ। ঈশ্বর গুপ্ত বলেছেন, বর্গির হাঙ্গামার সময় তিলকচন্দ্রের জননী তিলকচন্দ্রকে নিয়ে মুলাযোড়ের দক্ষিণে কাউগাছীতে চলে আসেন। সেখানেই তিলকচন্দ্রের বিবাহ হয়, সম্ভবতঃ বিষ্ণুকুমারীর সঙ্গে। তার পূর্বে কীর্তিচন্দ্রের পেঁড়ো অধিকারে বিষ্ণুকুমারীর ভূমিকার বিবরণ অনৈতিহাসিক।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ভারতচন্দ্রের জীবৎকাল ও পঠদ্দশার যে সালের উল্লেখ করেছেন, তাতেও সংশয় দেখা দিয়েছে। চৌপদী সত্যনারায়ণের পাঁচালীতে ভারতচন্দ্র লিখেছেন, 'ব্রতকথা সাঙ্গ পায় সনে রুদ্র চৌগুণা'। এই ইঙ্গিতটির অর্থ ঈশ্বর গুপ্ত প্রথমে করেছিলেন ১১৩১ সাল; পরে আবার গণনা করে স্থির করেছেন ১১৪৪ সাল। ভারতচন্দ্র যে ১১১৯ সালে (১৭১২ খ্রী) জন্ম গ্রহণ করেন তাতে ঈশ্বর গুপ্ত কখনও সংশয় প্রকাশ করেন নি। চল্লিশ বৎসর বয়সে ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের কাছে এসেছিলেন। মোটামুটি এই সুস্পষ্ট সালগুলি এবং কিছু কিংবদন্তীর আশ্রয় নিয়ে ঈশ্বর গুপ্তের হিসাব খ্রীষ্টাব্দ অনুযায়ী দাঁড়ায়—

জন্ম	১৭১২		
সত্যনারায়ণ পাঁচালী	১৭৩৬		বয়স ২৪
অধ্যয়ন কাল	১৭৪২	পর্যন্ত	বয়স ৩০
বিষয়কর্ম ও কারাভোগ	১৭৫০	পর্যন্ত	বয়স ৩৮
শ্রীক্ষেত্র ও ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরির নিকট	১৭৫২		বয়স ৪০
অন্নদামঙ্গল রচনা	১৭৫২		
মৃত্যু	১৭৬০		বয়স ৪৮

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় 'ভারতচন্দ্রের পঠদ্দশা' প্রবন্ধে[১] ভারতচন্দ্রের অধ্যয়নকাল ও অন্যান্য ঘটনার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি রায়গুণাকরের জীবনীর দিগ্‌দর্শন করেছেন এইভাবে—

১ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৫৯ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা। মদনমোহন গোস্বামী 'রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র' (১৯৫৫) গ্রন্থে দীনেশ ভট্টাচার্যের মতই মোটামুটি গ্রহণ করেছেন। দ্রষ্টব্য পৃ ১৭-১৯।

জন্ম	১১১৩	১৭০৬ খ্রী

[গুপ্তকবির ১৬৩৪ শক ঠিক নয় কারণ প্রাচীন হস্তলিপিতে ২ ও ৮-এর রূপ ৩ ও ৪-এর মতো হওয়াতে লিপিকর প্রমাদবশতঃ ১৬২৮ শক ১৬৩৪ হয়েছে।]

কীর্ত্তিচন্দ্রের ভুরসুট অধিকার	১১১৯	১৭১২ খ্রী
মাতুলগৃহে পলায়ন	১১২৩-২৪	১৭১৬-১৭
পঠদ্দশা	১১২৪-৪৪	১৭১৭-৩৭
সত্যনারায়ণের ব্রতকথা (চৌপদী)	১১৪৩	১৭৩৬
সত্যনারায়ণের ব্রতকথা (ত্রিপদী)	১১৪৪-৫	১৭৩৭-৩৮
বর্দ্ধমানে মোক্তারী	১১৪৫-৪৮	১৭৩৮-৪১
বর্গীর সূত্রপাত	১১৪৮	১৭৪১-৪২
উড়িষ্যাদি পরিভ্রমণ (৫ বৎসর)	১১৪৮-৫২	১৭৪১-৪৫
চন্দননগরে	১১৫২-৫৩	১৭৪৫-৪৬
কৃষ্ণনগরে	১১৫৩	১৭৪৬
মূলাযোড়ে বাটী নির্ম্মাণ	১১৫৬	১৭৪৯
নাগাষ্টক রচনা	১১৫৭	১৭৫০
অন্নদামঙ্গল রচনা	১১৫৯	১৭৫৩
মৃত্যু	১১৬৭	১৭৬০

সুতরাং দীনেশবাবুর মতে ভারতচন্দ্রের জীবৎকাল ৫৪ বৎসর।

পৃ ৫। **রামচন্দ্র মুনসী**। "দেবানন্দপুর বকুলতলার মুনসীদিগের আদিবাস ছিল বর্দ্ধমান- নন্দীপুর। কামদেব দত্তরায় এই বংশের আদিপুরুষ। ইনি ১০০১ হিজরী—১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে দেবানন্দপুরে বসতি করেন এবং দিল্লী হইতে 'মুনসী' উপাধি প্রাপ্ত হন। এই উপাধি ছিল ব্যক্তিগত। রামচন্দ্র দত্তরায় মুনসীর দুই পুত্র—কেশবরাম ও হীরারাম রায়। রামচন্দ্রের সময় হইতে এই 'মুনসী' উপাধি বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। এই বংশের অন্যতম বংশধর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ দত্ত মুনসী (বর্ত্তমানে ছোট আদালতের উকিল) মহাশয়ের নিকট রক্ষিত বংশকুলজীতে আছে—"রামচন্দ্র মুনসী মহম্মদ সা বাদসাহের আমলে ১১৩৩ হিজরী (—১৭২৬ খ্রী)-তে মুনসী আখ্যা প্রাপ্ত হন ও পরে কবি ভারতচন্দ্র রায়কে পারস্ত ও আরবী ভাষা শিক্ষা দেন।" ১

১ মদনমোহন গোস্বামী, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, পৃ ২৩, পাদটীকা ৩।

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য রামচন্দ্র দত্তের পূর্বপুরুষের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। এই বংশে জয়কৃষ্ণ দত্তের পুত্র রামভদ্র দত্ত মুনসী ছিলেন। জয়কৃষ্ণের ভ্রাতা রাধাকৃষ্ণের পুত্র ছিলেন রামচন্দ্র।[১] দীনেশবাবু এই প্রবন্ধে তাঁর পূর্বেকার অনুমান (দ্রষ্টব্য, ভারতচন্দ্র ও ভুরসুট রাজবংশ) প্রত্যাহার করে বলেছেন, হীরারাম রায় ভারতচন্দ্রের রাজ্যভ্রষ্ট জ্ঞাতি নন, দেবানন্দপুরে তাঁর আশ্রয়দাতার পুত্র।

পৃ ১২। **সত্যনারায়ণের ব্রতকথা রচনা**। ঈশ্বর গুপ্ত মনে করেছেন ত্রিপদী ব্রতকথাই প্রথমে রচিত হয়েছিল। দীনেশবাবুর মতে চৌপদী ব্রতকথাই প্রথমে রচিত হয়।" প্রথমে রচিত বলেই কবি এতে বিস্তারিত আত্মপরিচয় দিয়েছেন, ত্রিপদীতে তার প্রয়োজন হয়নি।

প্রথম রচনায় তিনি নায়ক রামচন্দ্রের নামোল্লেখ করবেন, এটাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয় রচনায় তিনি নায়কের পুত্র হীরারামের নাম দিয়েছেন। দীনেশবাবুর হিসাবে, ঈশ্বরগুপ্ত সত্যনারায়ণের ব্রতকথা রচনাকালে ভারতচন্দ্রের বয়স যত কম মনে করেছেন, আসলে তত কম নয়। তখন ভারতচন্দ্রের বয়স ত্রিশ বৎসর।

এখানে উল্লেখযোগ্য, দীনেশবাবুর অনুমান দেবানন্দপুরেই ভারতচন্দ্র গঙ্গাষ্টক রচনা করেন। এতে এমন সব ভুল আছে, যেগুলি নতুন শিক্ষার্থীর কাছে অপ্রত্যাশিত নয়। তুলনায় নাগাষ্টক ভ্রান্তিবর্জিত এবং উৎকৃষ্ট। এই 'গঙ্গাষ্টক' ঈশ্বর গুপ্ত সংগ্রহ করতে পারেন নি। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতচন্দ্রের এক পৌত্রের কাছ থেকে সংগ্রহ করে রহস্যসন্দর্ভ প্রথম পর্ব, নবম খণ্ড পৃ ১৩৯-এ গঙ্গাষ্টক প্রকাশ করেন। সুকুমার সেন অনুমান করেন, এই পৌত্র বোধহয় রামধন রায়।[২]

পৃ ১৬। **ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী**। ফরাসী গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর যোগ ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দেরও আগে। ১৭১৬-র আগে থেকে ১৭৩০-এর মধ্যভাগ পর্যন্ত কুড়ি টাকা বেতনে তিনি ফরাসী সরকারে কেরানীগিরি করেছিলেন। ইন্দ্রনারায়ণের তৃতীয় পুত্র কৃষ্ণরাম ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের কাছে সাহায্যের আবেদন করেন। আবেদন-পত্রে ইন্দ্রনারায়ণকে দেওয়ান বলে

---

১ 'ভারতচন্দ্রের পঠদশা', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৫৩ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা পৃ ৪৯।

২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ খণ্ড, ২ সং, পৃ ৮৩৩।

উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সত্য সত্যই তিনি দেওয়ান ছিলেন কিনা সন্দেহ। ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কুর্তিয়ে (দালাল) নিযুক্ত হলেন। এতে তিনি যে দস্তুরী পেতেন, তাতে তিনি বিপুল সম্পত্তি উপার্জন করেন। ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দ্রনারায়ণ ফরাসী কোম্পানীর জমিদারীর Fermier অর্থাৎ ইজারাদার নিযুক্ত হন। হয় তো একেই দেওয়ানী বলা হয়েছে। ইন্দ্রনারায়ণের স্থাপিত নন্দদুলাল মন্দিরটি স্থাপত্যকলার জন্য খ্যাত ছিল। এই মন্দিরটি স্থাপিত হয় ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে। এই মন্দিরের সংলগ্ন অতিথিশালায় একজন চর্মকার জাতীয় স্ত্রীলোক জলচল জাতি বলে পরিচয় দিয়ে সেখানে কাজ করত। পরে তার আসল পরিচয় প্রকাশ হয়ে যাওয়াতে তাকে বিতাড়িত করা হল বটে কিন্তু ইন্দ্রনারায়ণ ব্রাহ্মণ-সমাজে পতিত হলেন। এই অপবাদের জন্য অনেকদিন তাঁর সঙ্গে ব্রাহ্মণদের আহারাদি চলত না।[১]

খুব সম্ভব এইজন্যই ভারতচন্দ্র তাঁর আশ্রয়ে থাকলেও তাঁর বাড়ীতে আহার করতেন না। ইন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হয় ১৭৫৬ খ্রী।

পৃ ১৬। **রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়**। "রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী গোন্দলপাড়া চন্দননগর। তাঁহারা দুই সহোদর ছিলেন। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লবণ বিভাগের দেওয়ান ছিলেন। কেহ কেহ বলেন দিনেমার কোংর দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার বংশের কেহ আছেন বলিয়া জানি না, অন্ততঃ এখানে নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর মৃত্যু হয়। তিনি সমসাময়িক ছিলেন।"[২]

পৃ ১৭। **কৃষ্ণচন্দ্র রায়**। ভারতচন্দ্র যখন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে আসেন, তখন কৃষ্ণচন্দ্রের বয়স চত্রিশ বৎসর এবং ভারতচন্দ্রের বয়স চল্লিশ। কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে।[৩]

পৃ ১৭। **রায়গুণাকর উপাধি**। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে মূলাজোড়ে যে জমি দেন, তার দানপত্রে গুণাকর উপাধির উল্লেখ আছে। দানপত্রের তারিখ ১লা অগ্রহায়ণ ১১৫৬ সাল। নদীয়া কালেকটরী থেকে সংগৃহীত এই দানপত্রের প্রতিলিপি 'বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা'য় (৫২ ভাগ, পৃ ৬) প্রকাশিত হয়েছে।

১ চারুচন্দ্র রায়, 'ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী', প্রবর্তক, আষাঢ় ১৩২৯।

২ শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ চন্দননগর থেকে বর্তমান লেখককে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

৩ Pertsch (Ed) ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতম্ পৃ ৪৩।

সুতরাং ভারতচন্দ্র ১৭৪৯-র পূর্বেই রায়গুণাকর উপাধি লাভ করেছিলেন।

পৃ ১৭। **মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী**। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মুকুন্দরামের আবির্ভাবকাল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য তিনি রচনা করেছিলেন বৃদ্ধ বয়সে।[১]

পৃ ১৮। **অন্নদামঙ্গল**। অধ্যাপক সুকুমার সেন মনে করেন অন্নপূর্ণাপূজা-প্রবর্তনের পূর্ব-ইতিহাস হিসাবে মহারাজা কবিকে কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত করিয়েছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রই অন্নপূর্ণা পূজার প্রবর্তন করেন।[২]

পৃঃ ১৮। **নীলমণি সমাদার**। ভারতচন্দ্র মানসিংহ কাব্যে গায়েনের উল্লেখ করেছেন—

> ঔীউসাঁই নীলমণি কণ্ঠ আভরণ।
> এই মঙ্গলের হবে প্রথম গায়ন॥

পৃ ১৮। **রসমঞ্জরী**। মৈথিল কবি ভানুদত্তের (১৩শ শতাব্দীর শেষ ও ১৪শ শতাব্দীর প্রথম) রসমঞ্জরী নামক নায়ক-নায়িকা লক্ষণ গ্রন্থের অনুবাদ। ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলের পর রসমঞ্জরী অনুবাদ করেছিলেন—ঈশ্বর গুপ্তের এই অনুমান ঠিক নয়। রসমঞ্জরীতে রায়গুণাকর উপাধির উল্লেখ নেই। সুতরাং ১৭৪৯-এর আগে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। অন্নদামঙ্গলে কবি এই উপাধি ব্যবহার করেছেন; গ্রন্থ-রচনার নির্দিষ্ট বৎসরেরও (১৭৫২-৫৩) ইঙ্গিত আছে।

পৃ ১৮। **মুলাযোড়ে জমি প্রাপ্তি**। কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে মূলাযোড় ইজারা দেন ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে। উপরে দ্রষ্টব্য।

পৃ ২৪। **ভারতচন্দ্রের পাদপূরণ**। সেকালের রসগ্রাহিতার একটি লক্ষণ। নবকৃষ্ণ দেব হরু ঠাকুরকে এ রকম সমস্যা দিতেন, হরু ঠাকুর সমস্যাপূরণ করতেন—হরু ঠাকুরের জীবনীতে ঈশ্বর গুপ্ত এর উল্লেখ করেছেন। কৃষ্ণনগর রাজদরবারে এ রকম সমস্যা পূরণ করে 'রসসাগর' আখ্যা পেয়েছিলেন কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী।[৩] পাদপূরণের কৌতুক উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকেও চলিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায় নামে এক পল্লীকবিকে এই রকম পাদপূরণ করতে দিতেন।[৪]

---

১ মুকুন্দরামের কাল সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্ম দ্রষ্টব্য আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (৩ সং)।

২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ খণ্ড, ২ সং, পৃ ৮৩৭।

৩ দ্রষ্টব্য পূর্ণচন্দ্র দে, রসসাগর কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর বাঙ্গালা সমস্যা-পূরণ।

৪ দ্রষ্টব্য বঙ্কিম প্রসঙ্গ, পৃ ৮৩-৮৪।

পৃ ২৬। **বর্গীর হাঙ্গামা।** From Cutwah they penetrated through the Burdomaan country; detaching their parties into every district; still amassing great booty and striking universal terror round them; sometimes alarming even the European settlements. The rains at length setting in, about the middle of June gave a flattering hope that the land would soon be delivered from these devouring locusts. But alas! this pleasing prospect had but a short duration; they retired it is true; and bent their rout towards the Bierboheen hills; ···Boschar Pundit issued orders to march into Bengal···they returned about the latter end of July; and pitched their tents on the highest parts of the Burdomaan country; and settled themselves there for the remainder of the rainy season.[১]

তিলকচন্দ্রের জননী তিলকচন্দ্রকে নিয়ে কৃষ্ণনগরে চলে আসেন ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে। তখন বর্ধমানের রাজা তিলকচন্দ্রের পিতৃব্যপুত্র চিত্রসেন রায়। চিত্রসেন রায়ের মৃত্যু হয় ১৭৪৪-এ। বর্গীর হাঙ্গামার সময় চিত্রসেন রায়ের সভায় ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। চিত্রসেনকে নায়ক করে তিনি 'চিত্রচম্পূ' কাব্য রচনা করেন ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে। এই গ্রন্থে বর্গীর হাঙ্গামার একটি জলন্ত বর্ণনা আছে—

এবমাদিবিশ্রুতস্বরূপচারিত্র্যঃ সংমিলিত এষ মহান্ নিসর্গদুর্গমো বর্গিবর্গ [।] নাং সৈন্যসাগর ইতি নিসর্গভীরুভাবভঙ্গুরাণাং গৌড়জনপদপ্রকৃতীনাং কিং কর্ত্তব্যং ক গন্তব্যং ক স্থাতব্যং ক উপায়ঃ কঃ সহায় ইতি হা দেব কিমিদমনুষ্ঠিত মতিনিষ্ঠুরমিতি চ দিশি দিশি অকাণ্ড প্রকাণ্ডপ্রচণ্ডবজ্রাভিঘাতখণ্ড্যমানগণ্ড শৈলমণ্ডলচণ্ডরণিতজনিত ইব মন্দরমহীধরোদ্দামমন্থনামর্দ্দান্দোলিতাম্ভোরাশিমহাম্ভোধিনিবহবহুল কল্লোলনিকরসঞ্জনিত ইব সম্পূরয়ন্নাশাবিবরমপি রোদসীকন্দরোদরং দূরিতশব্দান্তরগ্রহণাবসরো বভূব সুমহান্ কোলাহলঃ ॥১৩॥

---

১ J. Z. Holwell, Interesting Historical Events Relative to the Province of Bengal, Part I (London 1766) Pp 122-123.

ততশ্চ শকটশিবিকাশ্বেরমতুরঙ্গমতরণিভিশ্চঙ্ক্রম্যমানৈ শ্চক্রমেকচক্রেরসংক্রমমাক্রামন্তিরাচামন্তিরিবাশাচক্রবালং ধনজনভারমন্থরসঞ্চারৈরতিবিস্তারৈর্ধাবতাং মহাধন [া] নাং গৃহীতগৃহসারাম্বরভূষণভাজনানামকারণবিস্তজবালকলোলবালকানাং গ্রীবাবন্ধিতশালগ্রামশিলানাং দুর্ব্বহমহাভারবিবিধশাস্ত্রপুস্তকসঞ্চয়াপচয়চিন্তাসন্তাপজ্বরজর্জ্জরাণাং ভূমিনির্জ্জরাণাং দুর্ব্বহগর্ভভারমন্থরাণাং নিতম্ববিম্বকুচকুম্ভস্তম্ভভারালসানাঞ্চ পঙ্কসঙ্কটকুশকাশকণ্টকাঙ্কুরশঙ্কয়া পদে পদে স্ফুরিতাতঙ্কানাং নিদাঘসময়ে সমেধমানমধ্যন্দিননিদাঘদীধিতিদীধিতিব্রাততীব্রতাপপ্রতাপমসহমানানাং যথাসময়মিলিতপানাহারতয়া ক্ষুত্তৃড্ব্যাকুলিতার্ত্তকরোদেনার্ত্তব্যাহারকাতরহৃদয়ানাং প্রমদানাং করুণকরুণার্ত্তপরিদেবিতক্রন্দিতৈর্ব্যাকুলানাং বর্গিবর্গময়মিব নিখিলস্বর্গমনুভবন্তীনাঞ্চ বিবিধার্ত্তনাদেন মিথোঽনুবাদেন চ ক্ষুভিতমিব ক্ষমামণ্ডলমভবৎ ॥১৪॥[১]

পৃ ২৭। **নাগাষ্টক রচনা**। মূলাজোড়ের পত্তনিদার রামচন্দ্র নাগের দৌরাত্ম্যে উৎপীড়িত হয়ে ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে সংস্কৃতে নাগাষ্টক রচনা করে পাঠান। এই কবিতার দু'টি পংক্তি ঐতিহাসিকদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়—'বয়শ্চত্বারিংশত্তব সদসি নীতং নৃপ ময়া' এবং 'পিতা বৃদ্ধঃ পুত্রঃ শিশুরহহ নারীবিরহিণী'। চল্লিশ বৎসর বয়সে ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে আসেন।[২] নাগাষ্টক রচনা কালে কবির একটি পুত্রের জন্ম হয়েছে; পুত্র তখন শিশু।

ভারতচন্দ্র যখন বর্ধমান থেকে পালিয়ে পুরী গেলেন, তখনই উড়িষ্যা মারাঠাদের অধিকারে (১৭৪২ খ্রী)। নাগাষ্টক রচনার আগেই বর্গীর হাঙ্গামার ভয়ে বর্ধমানের রাজা কাউগাছিতে পালিয়ে এসেছেন। বর্গীর হাঙ্গামা তখন সম্পূর্ণ। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠা বাংলা দেশ আক্রমণ করেছে। সুতরাং ১৭৪৫-এর পর নাগাষ্টক রচিত হয়। ১৭৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অন্নদামঙ্গল

---

১ বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৩৫ ভাগ পৃ ৫৭-৬১। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী লিখিত 'বাঙ্গালায় বর্গীর হাঙ্গামার প্রাচীনতম বিবরণ' প্রবন্ধে উদ্ধৃত। গঙ্গারামের মহারাষ্ট্র পুরাণও (রচনাকাল ১৭৫১ খ্রীঃ) বর্গির হাঙ্গামা নিয়ে রচিত। দ্রষ্টব্য—আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (৩ সং)।

২ এই বাক্যটির আর একটি অর্থ, চল্লিশ বৎসর আপনার নিকট কেটে গিয়েছে। অবশ্য এই অর্থ হলে ভারতচন্দ্রের জীবৎকাল অত্যন্ত দীর্ঘ হয়। জীবনীর অন্যান্য ঘটনা এই অর্থের প্রতিকূল।

রচনাকালে ভারতচন্দ্রের তিন পুত্রের জন্ম হয়েছে। নাগাষ্টকে উল্লিখিত 'পুত্রঃ শিশুঃ' অর্থাৎ একটিমাত্র শিশুপুত্র।[৩] সুতরাং রচনাকাল অন্ততঃ ১৭৫০-এর পরে নয়। তা' ছাড়া ১৭৫০-এ বর্গীর হাঙ্গামার অবসান। অতএব নাগাষ্টক অবশ্যই ১৭৪৫ এবং ১৭৫০-এর মধ্যে রচিত।

৩ দীনেশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের এই যুক্তি সবল নয়। কারণ 'পুত্রঃ শিশুঃ অর্থে একটিমাত্রই পুত্র—এ অর্থ নাও হতে পারে।

রামপ্রসাদ সেন

(১৭২০—১৭৮১ খ্রী)

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন একজন বিখ্যাত সাধক ছিলেন বলে তাঁর জীবনী এবং সাধনপ্রণালী দীর্ঘকাল আলোচিত হয়ে এসেছে। আলোচনাতে কিন্তু অলৌকিকতার স্থানই বেশি। রামপ্রসাদের জীবনী সংক্রান্ত তথ্য আসলে ঈশ্বর গুপ্ত যা দিয়ে গিয়েছেন তার চেয়ে বেশি বিশেষ কিছু পাওয়া যায় নি। পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় 'সাহিত্য সাধক চরিত মালা'য় কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের জীবনের প্রামাণিক নির্ভরযোগ্য তথ্যগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন।

রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দর কাব্যে এইভাবে আত্মপরিচয় দিয়েছেন—

ধনহেতু মহাকুল পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত
প্রসন্না কালিকা কৃপামই॥
সেই বংশ সমুদ্ভব, পুরুষার্থ কত কব,
ছিলা কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর জন্মিলেন রামেশ্বর
দেবীপুত্র সরল হৃদয়॥
তদঙ্গজ রামরাম মহাকবি গুণধাম
সদা যারে সদয়া অভয়া।
তদঙ্গজ রামপ্রসাদে কহে কালিকার পদে,
কৃপাময়ি ময়ি কুরু দয়া॥

রামপ্রসাদের এই আত্মপরিচয় থেকে, ভরত মল্লিক প্রণীত চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থ এবং বৈদ্যকুলপঞ্জী অম্বষ্ঠসম্বাদিকা (১২৫৬) থেকে রামপ্রসাদের গৌরবময় বংশের বিবরণ সহজেই উদ্ধার করা গিয়েছে। রামপ্রসাদের পিতামহ রামেশ্বরের বিবাহের উল্লেখে চন্দ্রপ্রভা সমাপ্ত। অম্বষ্ঠসম্বাদিকায় অবশ্য রামপ্রসাদের উল্লেখ আছে—

ধলহণ্ডীয়-বংশীয়ো হালীশহরবাসকৃৎ।
রামপ্রসাদসেনোঽভূত্তজ্জঃ সাধকঃ সুধীঃ।[১]

---

১ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, 'কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ' গ্রন্থে উদ্ধৃত।

"রাঢ়বঙ্গের সর্বত্র ধন্বন্তরিগোত্র বীজী পুরুষ বিনায়ক সেনের বংশ সর্বশ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া পরিগণিত হইত। বিনায়কের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ কৃত্তিবাস (বিনায়ক—রোষ—নারায়ণ—সাণ্ডু—মরণি—কৃত্তিবাসাঃ)। কৃত্তিবাসের পুত্রেরা আদি স্থান রাঢ়ান্তর্গত মালঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া 'ধলহণ্ড গোষ্ঠীং সমাশ্রিতাঃ'। তদবধি মালঞ্চের পরেই ধলহণ্ডে সেন বংশের একটি প্রসিদ্ধ সমাজ গড়িয়া উঠে। রামপ্রসাদ সুতরাং কৃত্তিবাসকেই আদি পুরুষ ধরিয়াছেন। রামপ্রসাদের পিতামহ রামেশ্বরের নাম ভরত মল্লিক উল্লেখ করিয়াছেন (চন্দ্রপ্রভা পৃ ৫৫, রত্নপ্রভা পৃ ২১)—তিনি ছিলেন কৃত্তিবাসের অধস্তন নবম পুরুষ (কৃত্তিবাস—রত্নাকর—নিত্যানন্দ—জগন্নাথ—যদুনন্দন—রঞ্জন—রাজীবলোচন—জয়কৃষ্ণ—রামেশ্বর)।

ভরত মল্লিকের লেখা হইতে জানা যায়, রামেশ্বরের পিতার আমল হইতে বংশে দৈন্যদশা উপস্থিত হইয়াছিল। 'দুর্দৈবদৈন্যতঃ' রামেশ্বরের সহোদরা ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল 'কুমারহট্টনিবাসী' জগদীশ দাসের সহিত এবং অনুমান হয়, তৎসূত্রে রামেশ্বরই প্রথম কুমারহট্টে বাস স্থাপন করেন। কুমারহট্ট সপ্তগ্রাম সমাজের অন্তর্গত। মূল রাঢ়ীয় সমাজের কুলীনেরা অনেকে 'ধলহণ্ডীয় সেনবংশকে নিষ্কুল বলিয়া লিখিয়াছেন (চন্দ্রপ্রভা পৃ ১৩; রত্নপ্রভা পৃ ৩), কিন্তু ভরত মল্লিক স্বয়ং তাহা স্বীকার করেন নাই।"[১]

রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দরে ভ্রাতা এবং পুত্র কন্যাদের মঙ্গল কামনা করে লিখেছেন—

জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভবানী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী।
যাঁর পাদপদ্ম আমি রাত্রি দিবা সেবি॥
ভগ্নীপতি ধীর লক্ষ্মীনারায়ণ দাস।
পরম বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস।
ভাগিনেয় যুগ্ম জগন্নাথ কৃপারাম।
আমাতে একান্ত ভক্তি সর্বগুণধাম॥
সর্বাগ্রজা ভগ্নী বটে শ্রীমতী অম্বিকা।
তাঁর দুঃখ দূর কর জননী কালিকা॥

---

১ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন (সাহিত্যসাধক চরিত মালা, ১৩৫৯) পৃ ৬—৭।

গুণনিধি নিধিরাম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।
তাঁরে কৃপা দৃষ্টি কর মাতা জগন্মাতা॥
জগদীশ্বরীকে দয়া কর মহামায়া।
মমাত্মজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া॥
শ্রীকবিরঞ্জনে মাতা কহে কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাগো দেহি পদধূলি॥
শ্রীমতী পরমেশ্বরী সর্ব্বজ্যেষ্ঠা সুতা।
শ্রীকবিরঞ্জনে ভণে কবিতা অদ্ভুতা॥
ধরাতলে ধন্য সে কুমারহট্ট গ্রাম।
তত্রমধ্যে সিদ্ধ পীঠ রামকৃষ্ণ ধাম॥
শ্রীমণ্ডপে জাগ্রত শৈলেশ পুত্রী যথা।
নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন তথা॥

এই বর্ণনায় রামপ্রসাদ পত্নীর উল্লেখ করেন নি। বিদ্যাসুন্দর রচনার পর তাঁর আর একটি পুত্র লাভ হয়। তাঁর নাম রামমোহন। বৃদ্ধ বয়সে রামপ্রসাদের এই পুত্র হলে নাকি আজু গোঁসাই বলেছিলেন 'তুমি ইচ্ছা সুখে ফেলে পাশা কাঁচায়েছ পাকা ঘুঁটি।' রামমোহনের বংশধরের নিকট থেকেই অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রামপ্রসাদ সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন।

ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন "৬০ বৎসর বয়সের কিঞ্চিৎ পরেই রামপ্রসাদ সেন মায়িক সংসার পরিহারপূর্ব্বক নিত্যধামে যাত্রা করেন। তাঁহার মৃত্যুর দিন গণনা করিলে ৭২ বৎসরের অধিক হইবে না।" রামপ্রসাদের জন্মাব্দের ঠিক প্রমাণ পাওয়া না গেলেও এতদিন ১৬৪০-১৬৪৫ শকের মধ্যে তাঁর জন্ম হয়েছিল বলে ধরা হয়েছে। "কবিরঞ্জনের জন্মকাল সঠিক নির্ণয় করা সহজ নহে। অনেকে অনুমান করেন ১৬৪০-১৬৪৫ শকের মধ্যে কবিরঞ্জনের জন্ম হয়। 'সাধক সঙ্গীত'-সংগ্রহকার শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ বলিয়াছেন "বহু যত্নে ইহা জানিতে পারা গিয়াছে যে কবিরঞ্জন ১৬৪২ শকে জন্মগ্রহণ করেন।" তাহা হইলে ১১১২ সাল (ইং ১৭১৮ খৃঃ অব্দ) কবিরঞ্জনের জন্মকাল ধরিতে হইবে।"[১] ঈশ্বর গুপ্ত উল্লেখ করেছেন, শ্যামা প্রতিমা বিসর্জনের দিন রামপ্রসাদের মৃত্যু হয়। অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লক্ষ্য করেছেন রামপ্রসাদের

১ রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর (বঙ্গবাসী, ২য় সং., ১৩১৩ সাল) পৃ ২

বাৎসরিক শ্রাদ্ধ পুরুষানুক্রমে শ্যামাপূজার পরের দিন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।[১] দীনেশ ভট্টাচার্য মহাশয় হিসাব করে দেখেছেন "১১৮৮ বঙ্গাব্দে ৩ কার্ত্তিক মঙ্গলবার (১৬ অক্টোবর ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে) প্রায় ২৫ দণ্ড পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশী ছিল, তৎপর অমাবস্যায় শ্যামাপূজার উৎকৃষ্ট কাল। তৎপরদিন বুধবার রামপ্রসাদের মৃত্যু ধরিয়া গুপ্তকবির প্রবন্ধ রচনাকালে ঠিক ৭২ বৎসর পূর্ণ হয়। এই তারিখই যে গুপ্তকবির গবেষণালব্ধ অভ্রান্ত নির্ণয় তাহাতে সন্দেহ নাই, যদিও তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ তিনি লিখিয়া যান নাই। মৃত্যুকালে রামপ্রসাদের বয়স ৬০ বৎসরের 'কিঞ্চিৎ' বেশী' হইয়াছিল—১১২৭ সনে জন্ম ধরিলে বয়স হয় ৬১-২ বৎসর। খুব সম্ভবতঃ ঐ সনেই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল (১৬৪২ শকাব্দ, ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দ), নিশ্চিতই তাহার পূর্ব্বে নহে এবং ১১২৮ সনের পরেও নহে।"[২]

যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, বাইশ বৎসর বয়সে রামপ্রসাদের বিবাহ হয়। বিবাহের পর কুলগুরু মাধবাচার্যের নিকট তিনি পত্নীসহ দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষা শক্তিমতে হয়েছিল। দীক্ষার এক বৎসর পর মাধবাচার্যের মৃত্যু হয়। এই সময় কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ কুমারহট্টে আসেন। আগমবাগীশের কাছে রামপ্রসাদ উপাসনা-পদ্ধতি শিক্ষা করেন।[৩] অবশ্য এই সব ঘটনার কোনো প্রমাণ উল্লিখিত হয় নি। রামপ্রসাদের 'মনরে ওরে শ্রীনাথ দত্ত কর তত্ত্ব'—এই পংক্তি থেকে কেউ কেউ মনে করেন রামপ্রসাদের গুরুর নাম শ্রীনাথ।[৪] আবার কারো মতে গুরুর নাম কৃপানাথ,—

কৃপানাথ উপদেশ প্রসাদ ভক্তের শেষ
প্রাণদান দিয়া লৈতে চায় [৫]

রামপ্রসাদ যে কলিকাতায় মুহুরিগিরি করতেন সে-সম্পর্কেও বিভিন্ন জনশ্রুতি আছে। অতুলচন্দ্র তাঁর বইতে তার তালিকা দিয়েছেন।[৬]

হরিমোহন সেন বিবিধার্থসংগ্রহ ১৭৭৩ শক ফাল্গুন সংখ্যায় লিখেছেন, রামপ্রসাদ কৃষ্ণচন্দ্রের মুহুরি ছিলেন। রাজা তাঁকে "মহাশয় উপাধি প্রদান

১ অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামপ্রসাদ (১৩৩০) পৃ ১০৫, পাদটীকা।
২ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের গ্রন্থ, পৃ ১০।
৩ যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রামপ্রসাদ (১৩২৪) পৃ ১৩-১৫।
৪ অতুল মুখোপাধ্যায়, পৃ ২১, পাদটীকা
৫ বিদ্যাসুন্দর (বঙ্গবাসী, ১৩১৩) পৃ ১০
৬ অতুল মুখোপাধ্যায়, পৃ ৩৫৯-৩৬০

পূর্ব্বক স্বালয়ে প্রেরণ করিলেন ; এবং তাঁহার মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন।" (পৃ ৬৭)

রামপ্রসাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নিধিরাম সেনের বংশধর রামনাথ সেন বলেন "নিধিরামের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কনট্রাকটর কৃষ্ণ মল্লিকের সবিশেষ পরিচয় ছিল। মল্লিক মহাশয়কে বলিয়া নিধিরাম কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রসাদকে তাঁহার অধীনে মাসিক ১২৲ টাকা মাহিনায় চাকুরী করাইয়া দেন। প্রসাদ মল্লিকগৃহে ১ মাস ১৮ দিন মাত্র চাকরী করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি নিধিরামের গৃহেই থাকিতেন।"

কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ সুজনতোষিনী (১৩০২, কার্তিক) পত্রিকায় 'কবি রামপ্রসাদ' প্রবন্ধে লিখেছেন 'প্রসাদ চুঁচুড়া গ্রামে শীল বাবুদের বাড়ীতে চাকরী করিতেন।'

পৃ ৫০। **গোকুলচন্দ্র ঘোষাল**। খিদিরপুরের ঘোষাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা কন্দর্প ঘোষালের পৌত্র। কন্দর্প গোবিন্দপুরে বাস করতেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দুর্গ নির্মাণের জন্য গোবিন্দপুর নিয়ে নিলে তিনি খিদিরপুরে উঠে যান। তাঁর দুই পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল ও গোকুলচন্দ্র ঘোষাল। গোকুল গভর্নর ভেরেলেস্টের দেওয়ান হয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে গোকুলচন্দ্রের মৃত্যু হয়।[১] বিজয়রাম সেন গোকুল ঘোষাল সম্পর্কে 'তীর্থমঙ্গল' কাব্যে লিখছেন—

দেওয়ানজির গুণকথা কি কহিব বাণী।
গরিব সদয় বড় সর্ব্বত্র বাখানী ॥৬৭
ভগবতীর কৃপা তারে সর্ব্বলোকে বলে।
বাঙ্গালার কর্ত্তা করি রাখিলা ভূতলে ॥৬৮
গোকুলচন্দ্রে কালীমাতা তুমি বর দিবা।
বাঙ্গালার কর্ত্তা করি সদাই রাখিবা ॥
দেওয়ানজীর সমো দাতা নাহি এই দেশে।
তাঁহার গুণের কথা দেশে দেশে ঘোষে ॥
আঠারো শত দীনে করেন নিত্য চালু দান।
এ জন্মেতে দেওয়ানজীর সদাই খোস নাম ॥

---

১ হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা সেকালের ও একালের (১৯১৫) পৃ ৯০৭

চাকরা লোকের দুঃখ নাহি তার কাছে।
এই হেতু সর্বজন ঘুরে পাছে পাছে॥ (১১১৩-১১১৬)[১]

রামচন্দ্রের পুত্র জয়নারায়ণ ঘোষাল 'কাশীপরিক্রমা' কাব্য রচনা করেন, দ্বিতীয় কাব্য শ্রীকরুণানিধানবিলাস।

পৃ ৫০। **মহারাজকুলপতি দুর্গাচরণ মিত্র।** ১৭৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ান কোম্পানীর দেওয়ান ছিলেন। এই পরিবারের পূর্বপুরুষের বাসভূমি ছিল নদীয়া জেলার গোরপাড়া গ্রামে। নিধিরাম মিত্র কলিকাতায় কুমারটুলির বসু পরিবারে বিবাহ করেন। নিধিরামের প্রপৌত্র বেণীমাধব এবং তাঁর পুত্র দুর্গাচরণ। দুর্গাচরণ বাবুরাম নামে পরিচিত ছিলেন। লোকনাথ ঘোষ লিখেছেন—

All the best pandits of Kamalpur—a village adjacent to his ancestral residence, the Tarkalankars and the Nyayaratnas chiefly of the family of Balaram when they came to Calcutta to realize their annuities in Puja times and their invariable due on other festive occasions (marriage, shrads etc.) found comfortable lodgings in his house.[২]

পৃ ৫৩। **বলরাম তর্কভূষণ।** এককালে বলরাম তর্কভূষণের পাণ্ডিত্যের বিশেষ খ্যাতি ছিল—

শ্রীকান্তঃ কমলাকান্তো বলরামশ্চ শঙ্করঃ।
চত্বারো যত্র বিদ্যন্তে বৃহস্পতি পরাঙ্মুখঃ॥

কালীকৃষ্ণ দেবের সভাপণ্ডিত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার 'মাধবমালতী' গ্রন্থে নবকৃষ্ণ দেবের সভায় যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতেও বলরামের উল্লেখ আছে—

তাঁর ছিল নবরত্ন ইহার সেরূপ।
সভাস্থের কিবা কব নিজে বিদ্যাকূপ॥
সাক্ষাৎ বরদাপুত্র নামে জগন্নাথ।
তর্কপঞ্চানন রূপে ভুবন বিখ্যাত॥

---

১ বিজয়রাম সেনের তীর্থমঙ্গল (নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত) পৃ ১৭, ২২৬।

২ Lokenath Ghose, The Modern History of the Indian Chiefs etc. Pp. 224-226.

মহাকবি বাণেশ্বর নন্দের শঙ্কর।
বলরাম কামদেব আর গদাধর॥
শিবরাম গঙ্গপুরে স্মার্ত্ত কৃপারাম।
শান্তিপুরে বাস গোঁসাই ভট্টাচার্য নাম॥
এই নবরত্ন লয়ে সর্ব্বদা আমোদ।
আপনি আছেন লক্ষ্মী কি কব সম্পদ॥[১]

"বলরামের নাম অদ্যাপি পণ্ডিতসমাজে সম্যক্ প্রচারিত আছে। রাজবল্লভের বৃহৎ সভায় বলরাম নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন (অম্বষ্ঠাচারচন্দ্রিকা, পৃঃ ৮৭)। রাখালদাস ন্যায়রত্নের মতানুসারে ভট্টপল্লীর নৈয়ায়িকগণ বলরামের ছাত্র সম্প্রদায় (বিজয়া, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২, পৃঃ ৬৩৯)। বলরাম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কামদেবের ছাত্র ছিলেন এবং সমগ্র বাঙ্গালাদেশে একজন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক হইয়াছিলেন।" নবকৃষ্ণ যে সকল মহাপণ্ডিতের সপ্তাহব্যাপী বিচারে সন্তুষ্ট হইয়া একদিনই লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বলরাম অগ্রণী। 'বিজয়া' পত্রিকায় ৩য় বর্ষ ৯ সংখ্যায় হরিহর শাস্ত্রী মহাশয় 'ন্যায়শাস্ত্র ও ন্যায়রত্ন' শীর্ষক প্রবন্ধে বলরাম সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। বলরাম তর্কভূষণ প্রথম বয়সে লেখাপড়া কিছুই শেখেন নাই, বড় গোয়ারগোবিন্দ ছিলেন। ১৯।২০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বলরাম কেবল মাছ ধরিয়া ও সাঁতার কাটিয়া বেড়াইতেন। গুপ্তিপাড়ায় তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। বলরাম একবার শ্বশুরবাড়ীতে গিয়াছেন, তাঁহার শালাজ আসিয়া কাণ মলিয়া দিতেই বলরামও তাঁহার কাণে হাত দিবার জন্য উদ্যত হইলেন। তখন সেই শালাজ আরক্ত নয়নে পার্শ্ববর্ত্তী রমণীগণকে বলিলেন, 'শুনিয়াছিলাম যে 'বলা' লাঙ্গলা, সত্যই তাই; আমার ননদটি একটি আস্ত জানোয়ারের হাতে পড়িয়াছে।

'এই অপমানের পর বলরাম সেই মুহূর্ত্তেই শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করিলেন। প্রাণপণ পরিশ্রমে লেখাপড়া আরম্ভ করিলেন। এবং শীঘ্রই একজন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িকরূপে বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বত্র খ্যাতিলাভ করিলেন।[২]

পৃ ৫৮। **কালীকীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন, বিদ্যাসুন্দর**। রামপ্রসাদের প্রথম এবং তৃতীয় গ্রন্থ দুটি এবং তাঁর সাধনসঙ্গীতগুলিই সকলের জ্ঞাত। প্রসাদপ্রসঙ্গে

---

১ সাহিত্যসাধক চরিত মালার রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের জীবনীতে উদ্ধৃত পৃ ১৭।

২ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সাধককবি রামপ্রসাদ (১৩৫৩) পৃ ১৮১।

বলা হয়েছে "উক্ত কাব্যদ্বয় [কালীকীর্তন ও বিদ্যাসুন্দর] ব্যতীত কৃষ্ণকীর্তন ও শিবসঙ্কীর্তন নামক আরো দুইখানা কাব্য রচনা করেন। কৃষ্ণকীর্তনের পৃষ্ঠা দুই ভিন্ন অবশিষ্ট এবং শিবসঙ্কীর্তন সম্পূর্ণ অপ্রাপ্য।"[১]

কালীকীর্তনে কয়েকটি ভণিতায় রামপ্রসাদ 'কবিরঞ্জন' উপাধি ব্যবহার করেছেন। দীনেশ ভট্টাচার্য অনুমান করেন, কালীকীর্তন ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের পর রচিত হয়েছিল; কারণ ঐ খ্রীষ্টাব্দের সনদে নদীয়ারাজ রামপ্রসাদের নামের সঙ্গে কবিরঞ্জন উপাধি যোগ করেন নি। রামপ্রসাদের জীবিতকালেই কালীকীর্তনের যথেষ্ট প্রচার হয়েছিল, ঈশ্বর গুপ্তের লেখা থেকেই তা' বোঝা যায়, সুতরাং ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের বেশী পরেও কালীকীর্তন রচিত হয় নি।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বর গুপ্ত কালীকীর্তনের এক সংস্করণ প্রকাশ করেন।[২] বর্তমান জীবনীতে তিনি বলেছেন "পঞ্চবিংশতি বৎসর অতীত হইল আমরা রামপ্রসাদি পদ্য সংগ্রহ করণে প্রবৃত্ত হইয়াছি"। তাঁর এই উদ্যমের একটি ফল ছিল কালীকীর্তন প্রকাশ।

পৃ ৫৮। **কৃষ্ণকীর্তন**। কৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল অনুমান করা যায় নি। দীনেশ ভট্টাচার্যের অনুমান "ঈশ্বর গুপ্ত ইহা সম্পূর্ণ পাইয়াছিলেন, কিন্তু একটি মাত্র পদ মুদ্রিত করেন"।

পৃ ৫৮। **বিদ্যাসুন্দর**। অধ্যাপক সুকুমার সেনের মতে 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য বোধহয় রামপ্রসাদের প্রথম রচনা।'[৩] তিনি অবশ্য অনুমানের পক্ষে কোনো কারণ উল্লেখ করেন নি। তবে বিদ্যাসুন্দর কাব্যও ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের পর রচিত। কারণ এই কাব্যে কবি কবিরঞ্জন উপাধি ব্যবহার করেছেন। ঈশ্বরগুপ্ত পরে লিখেছেন, "মহারাজ রামপ্রসাদি বিদ্যাসুন্দর দৃষ্টি করিয়া ভারতচন্দ্রের প্রতি বিদ্যাসুন্দর রচনার আদেশ করিয়াছিলেন'। রামপ্রসাদের রচনা যে ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী এ-কথা ঈশ্বর গুপ্তের পরে অনেকেই মনে করেছেন। দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, "ভারতচন্দ্রের রচনা যে গর্হিত রুচিদোষদুষ্ট, রামপ্রসাদ তাহার পথপ্রদর্শক'। এই বিশ্বাসের আর একটি কারণ ছিল। শোভাবাজার রাজ-

---

১ প্রসাদপ্রসঙ্গ (১ম সং, ১৮৬৫) পৃ ৪০

২ শ্রীসনৎ গুপ্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৫০ ভাগ পৃ ৫৫-৬০-তে পুনর্বার মুদ্রিত করেছেন।

৩ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ ৮৫০

বাড়ীর পণ্ডিত-কবি রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কবিকেশরী ১২৪৩ সালে প্রাণরাম চক্রবর্তীর কালিকামঙ্গল সম্পাদনা করেন। তাতে সম্পাদক নিজে কয়েক পংক্তি যোগ করে দেন—

বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম প্রকাশ।
তদন্তর কৃষ্ণরাম নিমতা যার বাস॥
তাঁহার রচিত গ্রন্থ আছে ঠাঁই ঠাঁই।
রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা পাই॥
পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে।
রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে॥[১]

আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, রামপ্রসাদের রচনা ভারতচন্দ্রের পরবর্তী। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল সমাপ্তির তারিখ ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দ অপরন্তু ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের সনদে দেখা যায় রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন উপাধি পান নি। সুতরাং স্পষ্টতঃই রামপ্রসাদের কাব্য ভারতচন্দ্রের কাব্য রচনার পর।[২] অন্য প্রমাণও দেওয়া হয়েছে, "বিদ্যাসুন্দর রচনাকালে রামপ্রসাদের তিন সন্তানের জন্ম হইয়াছে, তৎকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৪০। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর এবং সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহনের জন্মের পূর্ব্বে ১৭৬০-৭০ খ্রীঃ মধ্যে রামপ্রসাদ গ্রন্থরচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়।"[৩]

পৃ ৫৮। **কবিরঞ্জন উপাধি**। রামপ্রসাদ যে কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট থেকে কবিরঞ্জন উপাধি পেয়েছিলেন, ঈশ্বর গুপ্তের উক্তি ছাড়া তার আর কোনো প্রমাণ নেই। কৃষ্ণচন্দ্র যাঁদের ভূমি দান করতেন, দানপত্রে তাঁদের নামের সঙ্গে উপাধিও প্রযুক্ত হত। ভারতচন্দ্রের প্রাপ্ত সনদে রায়গুণাকর উপাধি যুক্ত আছে। কিন্তু রামপ্রসাদকে নদীয়ারাজ যে ভূমি দান করেছিলেন, তার সনদে কবিরঞ্জন উপাধি নেই।[৪] ঐ দানপত্র ১১৬৫ সনের; 'অর্থাৎ ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে ঐ উপাধি প্রদত্ত হয় নাই'।

১ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৫০ ভাগ, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, 'প্রাণরাম চক্রবর্তীর কালিকামঙ্গল'।

২ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ (১৩৬৩), পৃ ৫১।

৩ রামপ্রসাদ সেন (সাহিত্যসাধক চরিত মালা) পৃ ৩২।

৪ রামপ্রসাদ সেন (সাহিত্যসাধক চরিত) পৃ ২১।

পৃ ৫৯। **পূর্ব্ব অঞ্চলে রামপ্রসাদি কবিতা**। রামপ্রসাদ নামে অন্তত: তিনজন বিভিন্ন কবির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। হালিসহরের রামপ্রসাদ সেন, কবিওয়ালা রামপ্রসাদ চক্রবর্তী [১] এবং পূর্ববঙ্গের চিনিশপুরের দ্বিজ রামপ্রসাদ। প্রসাদপ্রসঙ্গকার তাঁর বইয়ের প্রথম সংস্করণে দ্বিজ ও সেন রামপ্রসাদের মীমাংসা করতে না পেরে এমন অনুমানও করেছিলেন দ্বিজের লঘুতাব্যঞ্জক সঙ্গীতগুলি রামপ্রসাদের প্রাথমিক রচনাও হতে পারে।[২] দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি বললেন, "যদিচ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ ভিন্ন দ্বিজ রামপ্রসাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্থির মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিলাম না, তথাপি পশ্চিম বাঙ্গালার সেন রামপ্রসাদ ভিন্ন পূর্ব্ব বাঙ্গালায় একজন দ্বিজ রামপ্রসাদ ছিলেন—আমার এই সংস্কার দূর হইল না।"[৩] প্রসঙ্গত: বলা যেতে পারে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ কায়স্থ ছিলেন এবং তাঁর নাম ছিল রামপ্রসাদ দাস—এই মত প্রতিষ্ঠারও চেষ্টা হয়েছে।[৪]

দীনেশ ভট্টাচার্য মহাশয় দ্বিজ রামপ্রসাদের পরিচয় নিঃসংশয়িতরূপে উদ্ধার করেছেন। পূর্ববঙ্গে ভৈরব টাঙ্গী শাখার জিনারদি ষ্টেশনের নিকট চিনিশপুরের কালীবাড়ি দ্বিজ রামপ্রসাদের সাধনাস্থল। এঁর ডাক নাম ছিল 'পেচু ঠাকুর'। প্রবাদ অনুসারে কামাখ্যায় তিনি সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। সিদ্ধিলাভের পর বেশী বয়সে তিনি পুনরায় বিবাহ করেন। দ্বিজ রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন অপেক্ষা বয়সে বড়ো ছিলেন।

পৃ ৫৭। **রামপ্রসাদকে নিষ্কর ভূমি দান**। "রামপ্রসাদের পুত্র রামদুলাল সেন "শন ১২০২ সাল ১৯ অগ্রহায়ণ" তাঁহার পিতার নামীয় মহাত্রাণ সম্পত্তির বিবরণ চারিটি পৃথক তায়দাদে দাখিল করেন—তন্মধ্যে ১৮৩৪৮ নং তায়দাদে আছে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে মোট ৫১/০ বিঘা নিষ্কর জমী দান করিয়াছিলেন।"

---

১ 'রামবসু'-সম্পর্কিত 'আনুষঙ্গিক তথ্য' দ্রষ্টব্য।

২ প্রসাদ প্রসঙ্গ (১ম সং ১৮৬৫) পৃ ১৩-১৪।

৩ প্রসাদ প্রসঙ্গ (২য় সং ১২৮৩) পৃ ৫৪-৫৫।

৪ নব্যভারত, ১৩০২ পৃ ১৬৬-১৭৪ এবং পৃ ৩২১-৩৩২, রসিকচন্দ্র বসুর প্রবন্ধ। এই মতের প্রতিবাদ দ্রষ্টব্য নব্যভারত, ১৩০২, পৃ ৪৬৯-৪৭৫।

এছাড়াও রামপ্রসাদ স্বগ্রামের ধনী ব্যক্তিদের নিকট থেকে দান পেয়েছিলেন। হালিসহরের সুভদ্রা দেবী ১১৬৫ সনে একটি বাড়ি, দর্পনারায়ণ রায় তাল্গড়েজা গ্রামে ২ বিঘা জমি এবং দর্পনারায়ণ, শ্রীরাম রায় ও কালীচরণ রায় একসঙ্গে ৮ বিঘা জমি রামপ্রসাদকে দান করেছিলেন।[১]

এখানে উল্লেখযোগ্য, রামপ্রসাদ তাঁর গানে কোথাও কৃষ্ণচন্দ্রের উল্লেখ করেন নি। কালীকীর্তনে রাজকিশোর রায়ের নাম করেছেন। দীনেশ সেনের অনুমান "ইনি কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজার পিসা শ্যামাসুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের জামাতা ছিলেন। কবি এই রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়ের আদেশে 'কালীকীর্তন' রচনা আরম্ভ করেন। সে কথা তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন। রচে গান মোহান্ধের ঔষধ অঞ্জন॥" ভারতচন্দ্রও এই রাজকিশোর মহাশয়ের গুণজ্ঞাপক এক পংক্তি কবিতা লিখিয়াছেন—"মুখ রাজকিশোর কবিত্ব কলাধার। (অন্নদামঙ্গল)॥"[২]

বিজয়রাম সেনের তীর্থমঙ্গলে এক রাজকিশোরের নাম আছে—

হুগলীর দেওয়ান রাজকিশোর রায়।
বজরাতে আসিয়া তাঁহে প্রণমিল পায়॥৯৭[৩]

পৃ ৫৯। **অজু গোঁসাই**। এঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। প্রকৃত নাম অযোধ্যরাম গোস্বামী বা রাজু গোস্বামী। ইনি ছিলেন বৈষ্ণব, রামপ্রসাদের সমসাময়িক এবং স্বগ্রামবাসী। আজু অত্যন্ত পরিহাসরসিক ছিলেন এবং উপস্থিত মত সঙ্গীত রচনা করতে পারতেন। শোনা যায়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র উভয়কে একত্র করে উত্তর প্রত্যুত্তর উপভোগ করতেন। তবে আজুর পরিহাস মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে চাইলেই তিনি থামিয়ে দিতেন। উত্তরমূলক গান ছাড়া আজুর অন্য ধরণের গান পাওয়া যায় না। রামপ্রসাদ আজুকে কখনও আক্রমণ করেছেন বলে শোনা যায় নি। আজু গোঁসাইকে লোকে পাগল বলত। কিন্তু সত্যই তিনি পাগল ছিলেন না। তবে ইনি পণ্ডিত এবং সাধক ছিলেন। কেউ কেউ বলেন এঁর নাম

---

১ রামপ্রসাদ সেন (সাহিত্য সাধক চরিত) পৃ ২১-২২।
২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (ষষ্ঠ সং) পৃ ৫০৯।
৩ তীর্থমঙ্গল (নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত) পৃ ২৩।

অজয় গোস্বামী, অচ্যুতানন্দ গোস্বামী অথবা রাজচন্দ্র গোস্বামী। এঁর কোনো বংশ নেই।[১]

পৃ ৬২। **রামপ্রসাদের ধর্মমত**। রামপ্রসাদ কালীর উপাসক শাক্তসাধক ছিলেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের পর রামপ্রসাদ কালিকামঙ্গলে তন্ত্রোক্ত কতকগুলি রহস্যময় ক্রিয়া বর্ণনা করেছেন। 'রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দর একাধারে কাব্য ও কৌলতন্ত্রের নিবন্ধ এবং জনসাধারণের নিকট এজাতীয় রহস্যময় তন্ত্রগ্রন্থ চিরকালই গুপ্ত থাকে।" (দীনেশ ভট্টাচার্য) রামপ্রসাদ কালীসাধনা করতে করতে অদ্বৈতানুভূতিতে পৌছেছিলেন, ঈশ্বরগুপ্ত নিজেই তা বলেছেন। "শ্রীরামপ্রসাদের জীবনে অদ্বৈতব্রহ্মের উপলব্ধি এবং দ্বৈতভাবে ঈশ্বরোপাসনা (অর্থাৎ তাঁহার দুইরূপ—একটী সবিশেষ বা সগুণ এবং অপরটী নির্বিশেষ বা নির্গুণ। প্রথমোক্তরূপে তিনি ঈশ্বর জীব ও জগৎ এবং দ্বিতীয়রূপে তিনি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়) উভয়ই কিয়ৎপরিমাণে সামঞ্জস্য লাভ করিয়া বিরাজ করিতেছিল। এক জীবনে উভয় ভাবের সামঞ্জস্য কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি করিতে না পারিলে প্রসাদের সঙ্গীতগুলির মধ্যে অনেকস্থলে পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ আছে বলিয়া ভ্রম হইবে।"[২]

পৃ ৬৪। **রামপ্রসাদের মৃত্যু**। রামপ্রসাদের মৃত্যু সম্পর্কে বিভিন্ন কিম্বদন্তীর প্রচলন আছে। কেউ কেউ বলেন, কালী মূর্তির বিসর্জনের সময়ে তিনি জলে ঝাঁপ দেন। "He died in 1762, it is said by jumping into the river Ganges with the image of Kali, which was thrown in after the ceremony of the Puja was over.[৩]

কেউ কেউ বলেন, ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ হয়ে রামপ্রসাদের মৃত্যু হয়।

---

১ যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত, সাধক কবি রামপ্রসাদ (১৯৫৪), অষ্টম অধ্যায়ে অজু গোঁসাইয়ের অনেকগুলি গান উদ্ধৃত।

২ অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামপ্রসাদ পৃ ৯২। নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত রামপ্রসাদের ধর্মমতের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। দ্রষ্টব্য বীরভূমি (নবপর্য্যায়) দ্বিতীয় খণ্ড (১৩১১) 'প্রসাদী সঙ্গীত' পৃ ৭-২২, ৮৯-১০১, ১৫০-১৬১।

৩ The Good Old Days of Ho'ble John Company (1882) Vol. I. p. 289 যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'সাধককবি রামপ্রসাদ' ১৪ অধ্যায়ে রামপ্রসাদের মৃত্যু সম্পর্কে বিভিন্ন কিম্বদন্তীর উল্লেখ করেছেন।

পৃ৬৬। **চূড়ামণি দত্ত**। "চূড়ামণি দত্তের বাড়ী ছিল বর্ত্তমান শোভাবাজারের রাজবাটীর দক্ষিণভাগে। অদ্যাপি রাজবাড়ীর দক্ষিণভাগে চূড়ামণি দত্তের গলি বিদ্যমান রহিয়াছে। শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণ পলাশী যুদ্ধের পর প্রচুর ধনশালী এবং প্রতিষ্ঠাবান্ হওয়ায় সেকালের কলিকাতায় অনেক বুনিয়াদি ধনবান্দের ঈর্ষাভাজন হইয়াছিলেন।

এই চূড়ামণি দত্তের সহিত সামাজিক ও বৈষয়িক ব্যাপার লইয়া রাজা নবকৃষ্ণের সঙ্গে প্রায়ই বিবাদ-বিসম্বাদ চলিত। উভয় উভয়কে ঠকাইতে চেষ্টা করিতেন। চূড়ামণি দত্ত সে সময়ে একজন ধনী মজলিসী এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। কথিত আছে যে চূড়ামণি দত্তের চরমকাল উপস্থিত হইলে তাঁহার পুত্রেরা তৎসমীপে গিয়া পারলৌকিক ক্রিয়াদি সম্পাদন সম্বন্ধে অভিমত প্রার্থনা করিলেন। তদুত্তরে তিনি কহিলেন, "বাপু, তদ্বিষয়ে তোমরা যাহা ইচ্ছা করিতে পার। সম্প্রতি আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আমার প্রণীত একটি গীত যাহা বাক্স মধ্যে আছে, একশত ঢাকের বাদ্য সহ সেই গানটি গাহিতে গাহিতে আমাকে 'তীরস্থ' কর।' এই বলিয়া বাক্সের চাবি তাঁহাদিগকে ফেলিয়া দিলেন। পুত্রেরা তাঁহার আদেশ অনুসারে একশত ঢাকের বাদ্যসহ তাঁহাকে গঙ্গাতটে লইয়া যাইলেন। গঙ্গাযাত্রা করিবার কালে নবকৃষ্ণের বাটীর সম্মুখ দিয়া তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হয় ও তাঁহার রচিত গীতটি ঢক্কানিনাদের সহ উচ্চৈঃস্বরে গীত হয়।

কথিত আছে যে চূড়ামণিকে যখন গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া হয়, তৎকালে তিনি শয্যায় বসিয়াছিলেন, শয়ন করেন নাই। তাঁহার পীড়া সাংঘাতিক আকার ধারণ করিবা মাত্রই তিনি বহুসংখ্যক ঢুলি আনাইয়া নিজে একখানি রৌপ্য নির্ম্মিত চতুর্দ্দোলায় বসিয়া গঙ্গাযাত্রায় চলিলেন। অগ্র পশ্চাৎ অসংখ্য লোহিত বর্ণের পতাকা, দলে দলে নগরকীর্ত্তন। চতুর্দ্দোলাটি নানারূপে সাজানো। নামাবলীর চন্দ্রাতপ তুলসী মালার ঝালর, চারিদিকে তুলসী গাছ, আর তার মধ্যে চূড়ামণি দত্ত আসন করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ, পরিধানে রক্তবর্ণের চেলী, পৃষ্ঠে নামাবলী ও গলায় এবং হাতে জপমালা। অগ্রে ঢুলিরা 'চূড়া যায় যম জিনতে' এই বোল বাজাইতে লাগিল। কীর্ত্তনিয়ারা গাহিতে লাগিল গীতটি এই—

আয়রে আয় নগরবাসী, দেখবি যদি আয়।
সবারে (জগৎ) জিনিয়ে চূড় যম জিনিতে যায়।

যম জিনিতে যায়রে চূড়া যম জিনিতে যায়।
নবা দেখবিত আয় নবা দেখবিত আয়!
জপ তপ কর কিন্তু মরতে জানলে হয়। ইত্যাদি

শোভাবাজার রাজবাটীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া, এই গান গাহিবার পর চূড়ামণি সদলবলে গঙ্গার দিকে অগ্রসর হইলেন। রাজবাটীর লোকেরা এই কঠোর বিদ্রূপে বড়ই মর্মাহত হইলেন। কয়েকদিন গঙ্গাবাস করিয়া চূড়ামণি দত্ত পরিশেষে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন।"[১]

"চূড়ামণি দত্তের শ্রাদ্ধের সময়ে একটা গোলযোগ ঘটায় নবকৃষ্ণ তাঁহার দলস্থ কায়স্থগণকে সভাক্ষেত্রে যোগদান করিতে নিষেধ করায় কালীপ্রসাদ [চূড়ামণির পুত্র] বড়িশা-বেহালার সাবর্ণ চৌধুরী জমীদার সন্তোষ রায়ের শরণাপন্ন হন। ইনি স্বদলস্থ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণকে লইয়া কালীপ্রসাদের বাটীতে উপস্থিত হওয়ায় তিনি পিতৃদায় হইতে উদ্ধার পান।"[২]

---

১ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সাধক কবি রামপ্রসাদ পৃ ১৭৪-১৭৫।

২ হরিহর শেঠ, প্রাচীন কলিকাতা পরিচয় (১৯৫২) ৪২২-৫২৩।

রামনিধি গুপ্ত*

(১৭৪১—১৮৩৯ খ্রী)

কবি রামনিধি গুপ্ত অতি দীর্ঘজীবী ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর বর্গীর হাঙ্গামার সময় তাঁর জন্ম এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের সময় তাঁর মৃত্যু। এই দীর্ঘ প্রায় সাতানব্বই বৎসরের সব ঘটনা এবং তাদের সাল তারিখ যথাযথ মনে রাখা স্বভাবতঃই কঠিন। বিশেষতঃ রামনিধি জীবনের শেষের দিকে অতীত অবিকৃতরূপে মনে রাখতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। তাঁর জীবদ্দশাতে সংকলিত 'গীতরত্ন' (১২৪৪) গ্রন্থে নিধুবাবুরই অনেক গান বিকৃত এবং পরিবর্তিত আকারে পাওয়া যায়। গীতরত্ন গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের (১২৭৫) ভূমিকায় জয়গোপাল গুপ্ত লিখেছেন—"আর যখন সে সকল গীত রচনা হইয়াছিল, তখনকার লোকপরম্পরায় মুখে মুখে শিখিয়া রাখিয়াছিল, সে সকল গীত এই ক্ষণে সংগ্রহ কিম্বা সংশোধন করিবার উপায় নাই তাহার ভিতর বিস্তর অশুদ্ধ পদ এবং কথা শুনিতে পাওয়া যায় এ নিমিত্তে নিরস্ত রহিতে হইল।"[১] সুতরাং নিধুবাবু নিজের রচিত অনেক গানকেই যখন শুদ্ধরূপে সংকলনে উদ্ধৃত করতে পারেন নি তখন তাঁর অতি দীর্ঘ জীবনের ঘটনা এবং সাল তারিখ অভ্রান্তরূপে বলে যেতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। ঈশ্বর গুপ্ত নিধুবাবুর জীবনকাহিনী রামনিধি অথবা জয়গোপাল কার কাছে শুনেছিলেন বলা শক্ত। মনে হয় জয়গোপালের কাছেই শুনেছিলেন। গীতরত্নের ২য় ও ৩য় সংস্করণের ভূমিকায় জয়গোপাল পিতার যে জীবনী দিয়েছেন, মাঝখানে কিছু বাদ থাকলেও, সেই জীবনী ঈশ্বর গুপ্তের সংগ্রহের অবিকল উদ্ধৃতি বলা যায়। জয়গোপালের দেওয়া তথ্য ঈশ্বর গুপ্ত ব্যবহার করেছিলেন, পরে সেই রচনাকে গীতরত্নের ভূমিকায় ব্যবহার করা হয়েছিল, মনে হয়।

ঈশ্বর গুপ্ত নিধুবাবুর জীবনের কতকগুলি সুস্পষ্ট বৎসর উল্লেখ করেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, জয়গোপাল গুপ্তের সংস্করণেও নিধুবাবুর জীবনের ঘটনা

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৬৩ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যায় রামনিধি গুপ্তের জীবনকাহিনী আলোচনা করে প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলাম। সেই প্রবন্ধটি এখানে মুদ্রিত হল।

১ গীতরত্ন (৩ সং) পৃ ৸৶০।

সবই রেখে দেওয়া হয়েছে, সাল-তারিখেরও কোনো পরিবর্তন নেই। এটাও মনে রাখা দরকার, জয়গোপাল নিধুবাবুর তৃতীয় বিবাহের সন্তান। তৃতীয় বিবাহ হয় নিধুবাবুর ছাপরা থেকে ফেরার পর; তখন তাঁর বয়স তিপ্পান্ন বৎসর। বরদাপ্রসাদ দে রামনিধি গুপ্তের আর একটি জীবনী লিখেছিলেন; তাতে ঈশ্বরগুপ্তকে প্রধানতঃ অনুসরণ করা হলেও দু-একটি নতুন সংবাদ দেওয়া আছে।[১] রামনিধি যখন ছাপরা যান তখন তাঁর বয়স ৩৫ বৎসর এবং ছাপরায় নিধুবাবুর অবস্থিতিকাল ১৮ বৎসর—এই দুটি নূতন সংবাদ মিলিয়ে ঈশ্বর গুপ্ত-নির্দিষ্ট রামনিধির জীবনী এই রকম—

জন্ম	১১৪৮	১৭৪১ খ্রী
চাঁপ্তা থেকে প্রত্যাবর্তন	১১৫৪	১৭৪৭
সুখচরে বিবাহ	১১৬৮	১৭৬১
প্রথম সন্তান	১১৭৫	১৭৬৮
ছাপরা যাত্রা	১১৮৩	১৭৭৬
কলকাতায় প্রত্যাবর্তন	১২০১	১৭৯৪
দ্বিতীয় বিবাহ	১১৯৭	১৭৯০ ?
তৃতীয় বিবাহ	১২০১	১৭৯৪
সংশোধিত আখড়া স্থাপন	১২১১	১৮০৪
মৃত্যু	১২৪৫	১৮৩৯

এই বিবরণের একটি বড়ো অসঙ্গতি দ্বিতীয় বিবাহের বৎসর।[২] কলকাতায় ফেরার পূর্বেই এই তারিখ পড়ে। সুতরাং হয় দ্বিতীয় বিবাহ আরো পরে হয়েছে, না হয় আগেই নিধুবাবু ফিরেছিলেন এবং বরদাপ্রসাদ-কথিত ছাপরায় স্থিতিকাল আঠারো বৎসর নয়। এর কোনোটাই সত্য না হতে পারে; আগাগোড়া হিসাবেই ভুল থাকা বিচিত্র নয়।

এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের মতে 'নিধুবাবুর দ্বিতীয় বিবাহ—কলিকাতার জোড়াসাঁকোয় ১১৭৮ সালে—৩০ বৎসর বয়সে।'[৩]

---

১ Journal of the Bengal Academy of Literature, vol I. No 6 January 6, 1894.

২ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে সর্বপ্রথম এই অসঙ্গতি লক্ষ্য করেন। দ্রষ্টব্য সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩৩৪ 'রামনিধি গুপ্ত' প্রবন্ধ। 'নানানিবন্ধ' (১৩৬০) পুনর্মুদ্রিত (পৃ ১১৩, পাদটীকা)।

৩ বঙ্গভাষার লেখক পৃ ৩২০।

'বাঙ্গালীর গান' গ্রন্থে নিধুবাবুর দ্বিতীয় বিবাহের তারিখ ১১৭৮ সাল অর্থাৎ ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দ।[১] বৈষ্ণবচরণ বসাকের মতেও রামনিধির দ্বিতীয় বিবাহ হয় ১১৭৮ সালে। দেখা যাচ্ছে, এই তারিখটির সম্পর্কে কিঞ্চিৎ সন্দেহের অবকাশ আছে। অনেকেই ঈশ্বর গুপ্ত অথবা জয়গোপালের তারিখ গ্রহণ করেননি।

বরদাপ্রসাদ লিখেছেন, ছাপরা যাত্রার সময় নিধুবাবুর বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসর অর্থাৎ ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দ। ঈশ্বর গুপ্তের জীবনীতে নিধুবাবুর ছাপরা যাত্রার সময়ের ইঙ্গিত দেওয়া আছে—'অনন্তর যে সময়ে এই বঙ্গদেশে ইংরাজদিগের স্থির প্রভুত্ব হয় এবং যখন সাহেবেরা এই রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশের রাজা ও ভূম্যধিকারিদিগের সহিত বন্দোবস্ত করেন, সেই সময়ে নিধুবাবু নিজ পল্লীস্থ ৺দেওয়ান রামতনু পালিত মহাশয়ের সহিত চিরণ ছাপরায় কর্ম্ম করিতে গমন করিলেন…"।[২] পলাশীর যুদ্ধের পর অনেক দিন পর্যন্ত ইংরেজেরা এ-দেশের রাজস্ব-ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে নি। এমন কি ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ানী লাভ করবার পরেও জমিদারদের সঙ্গে বন্দোবস্তে বিশেষ কিছু পরিবর্তন আসে নি—

"Since the subversion of the Mogul empire, the lands of every district of course became the property of each respective usurper, so long as by their own power they can maintain possession; and so long each usurper deemed himself, and in fact was a real sovereign. Thus upon the English East India company's assuming the Dewannee, we find that they also in their turn, declare themselves to have become the sovereigns of a rich and patent kingdom; of the revenues of which they likewise declare themselves not only the Collectors but Proprietors."[৩]

---

১ বাঙ্গালীর গান, পৃ ৬৬।

২ বর্ত্তমান গ্রন্থ, পৃ ১০১।

৩ Bolts, Consideration on Indian Affairs Particularly respecting the Present State of Bengal (1772) p. 150.

—এই সময়ে অর্থাৎ ১৭৬৫ থেকে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা দেশে মহম্মদ রেজা খান এবং বিহারে সীতাব রায় ইংরেজদের অধীনে নায়েব্ দেওয়ান রূপে শাসনকার্য এবং রাজস্ব-আদায় করতেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা সন্তোষজনক ছিল না। এদের উৎপীড়নের দুঃসহ স্মৃতি অনেকদিন পর্যন্ত দেশে জাগরূক ছিল। অতঃপর ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ব্যবস্থার পরিবর্তন হল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর এর প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবেই দেখা ছিল। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ দেওয়ান দেশীয় রাজস্ব কর্মচারীদের কাজের তদারক করবার জন্য বিভিন্ন স্থানে পরিদর্শক নিযুক্ত করলেন। তাদের কাজ হল ভূমির উৎপাদন, প্রদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ইত্যাদি সংগ্রহ করা।[১] এই বিবরণীতে দেশের দারুণ অব্যবস্থা প্রকট হোল।

সুতরাং ১৭৬৫-র পর দ্বিতীয় ব্যবস্থা হল ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে। এই ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কড়াকড়ি করা হল। পরিদর্শকদের নাম হল কলেকটর। তাঁরা দেশীয় কর্মচারীদের সহায়তায় রাজস্ব সংগ্রহ করতেন।

"Every British Collector had still a native officer, chosen by the Committee of Revenue and styled Diwan joined with him in the superintendence of the land tax. The actual collection was managed by the farming system, according to which tenders were invited for each Pargana, or fiscal division of a District. A settlement for five years (1772-1777) was concluded with the highest bidders, whether they were the previous Zemindars or not.[২]

কিন্তু এ রকম নীলামের ব্যবস্থা করেও তেমন সুফল পাওয়া গেল না। নীলামের অনুরূপ রাজস্ব অনেক ক্ষেত্রেই প্রজারা দিতে পারল না। ১৭৭৭-এর পর বাৎসরিক বন্দোবস্ত করা হল। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে বোর্ড অফ রেভিনিউ স্থাপিত হলে জেলায় জেলায় রাজস্ব আদায় প্রত্যক্ষতঃ ইংরেজ কালেক্টারের হাতে এসে যায়। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত হল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

---

১ **Fifth Report from the Select Committee on the Affairs of East India Company Vol I (1812) Ed. Firminger (Cal 1917) p. 4.**

২ **Hunter, Bengal Ms Records Vol I (London, 1894) p. 18.**

ঈশ্বর গুপ্ত ইংরেজের সঙ্গে দেশীয় জমিদারের যে-বন্দোবস্তের উল্লেখ করেছেন, সেটা স্পষ্টতঃই ১৭৭২-১৭৭৭-এর। চিরণ ছাপরায় মণ্টগোমারী তখন কালেক্টর এবং রামতনু পালিত ছিলেন দেওয়ান। কালেক্টর এবং দেওয়ানের নিয়োগ এই ব্যবস্থাতেই হয়েছিল, উপরে উদ্ধৃত হাণ্টারের বর্ণনাই তার প্রমাণ। তা' ছাড়া রামনিধির জীবনের ঘটনাপঞ্জীর তারিখও এই সময়েই পড়ে।

রামনিধির জীবনের ঘটনাগুলি মোটামুটি সবই মিলে গেলেও দ্বিতীয় বিবাহের সময়টির সম্বন্ধে কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা গেল না। আমাদের অনুমান, ১৭৬১-তে নিধুবাবুর প্রথম বিবাহ এবং ১৭৬৮-তে প্রথম সন্তানের জন্ম পর্যন্ত নিধুবাবুর জীবনের এই সাত বৎসরে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটেছিল, যা তিনি পরবর্তীদের কাছে কখনোই প্রকাশ করেন নি। অনুমান করি, নিধুবাবু এই সময়ে ছাপরায় ছিলেন এবং ১৭৬৮-র পূর্বেই কলিকাতায় ফিরে এসেছিলেন। প্রথমবার ছাপরা থেকে ফেরার পর স্ত্রীবিয়োগ ঘটে এবং বঙ্গভাষার লেখক এবং বাঙ্গালীর গানের সংবাদ সত্য হলে ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিবাহ করেন। কিন্তু সে-স্ত্রীও বিগত হলে ঈশ্বর গুপ্ত-উল্লিখিত জমিদারী বন্দোবস্তের সময় (১৭৭২ থেকে ১৭৭৭-এর মধ্যে) তিনি আবার ছাপরায় যান। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ফিরে এসে তিনি তৃতীয়বার বিবাহ করেন।

ঈশ্বর গুপ্ত নিধুবাবুর জীবনের একটি অর্থপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ছাপরার নায়েব জগন্মোহন মুখোপাধ্যায়ের অসৎ উপায়ে অর্থোপার্জনের নির্দেশে বিরক্ত হয়ে রামনিধি সেখানকার কাজ ছেড়ে দেন। কিন্তু তাঁর প্রাপ্য দশ হাজার টাকা জগন্মোহন মুখোপাধ্যায়েরই কথায় তাঁর কাছ থেকে নিয়ে নেন। নিধুবাবু যদি অসৎ উপার্জনকে ঘৃণা করেন তবে এ টাকা কিসের? সেকালের দিনে একজন সামান্য কেরাণীর পক্ষে জীবিকানির্বাহের পরেও এই সঞ্চয় কি ক'রে সম্ভব? বরদাপ্রসাদ দে লিখেছেন, Ramnidhi went to Chapra at the age of thirty five on the assurance that he would be appointed to the post of second clerk in the collectorate which was then vacant.[১] অনুমান হয়, এটা নিধুবাবুর পূর্বার্জিত অর্থ। প্রথমবার তিনি যখন ছাপরায় এসে ছিলেন তখনই সম্ভবতঃ এই অর্থ লাভ করে থাকবেন। এটা

---

১ Journal of the Bengal Academy of Literature. Vol 1. No 6. p. 4.

শুধুই অনুমান হলেও এই সময়ের একটি অদ্ভুত ঘটনার সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল কি? ঘটনাটি এই—

এ যুগের অর্থাৎ ১৭৬০ থেকে ১৭৬৪র মধ্যে বাংলাদেশের ইতিহাস মীর কাশিমের সঙ্গে ইংরেজের সংঘর্ষের বিবরণে পূর্ণ। মীর কাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ অনিবার্য এবং আসন্ন ভেবে এলিস পাটনা শহর অধিকার করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। এই ঘটনা ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের। এলিসের এই হঠকারিতা ইংরেজরাও সমর্থন করে নি। ভ্যানসিটার্ট লিখেছেন,

The particulars of this disaster with the other operations of the war are sufficiently known : let it here suffiice to observe that the city was surprised and taken without resistance by our troops, in the night of the 24th June ; and by their disorderly behaviour afterwards, whilst they were dispersed, and intent only on plunder, was retaken by a handful of the Nabob's people, the next day at noon ; after which loss the gentleman of the factory with the scattered remains of the army retired across the river and were all destroyed or taken prisoner.[১]

অতঃপর এলিস তাঁর অনুচরদের নিয়ে গঙ্গা অতিক্রম করলেন ২৯-এ জুন। গোলাম হোসেন তবাতবাই এই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে—

But Mr. Ellis, who had now lost all courage not choosing to stand his ground even there, resolved to fly further, as far as Chapra by water and from thence to cross the Serdjo which is the boundary of the two Soobahs, or provinces, intending to take shelter in Shudjah-ed-doula's dominions ; but even that could not be effected. One Ram-nedy, Fodjdar of the district of Sarun, an ungrateful Bengaly, who owed much to the English had the confidence to attack the fugitives, whilst

১ **Vansittart, A Narrative of the Transactions in Bengal, Vol III (1766) Pp 829-380.**

Sumro, with some regiments of Talingas crossed over from Bacsar to support him,[১]

এই ঘটনা ঘটেছিল ছাপরার অন্তর্গত মানঝি নামক স্থানে। বর্ণনায় রামনিধিকে অকৃতজ্ঞ বাঙালী বলা হয়েছে। কারণ ইংরাজের কাছেই তিনি কাজ করতেন তথাপি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। ফৌজদার একটি বড়ো পদ, সেই পদে সত্য সত্যই তিনি যদি অধিষ্ঠিত থাকতেন তবে তাঁর নাম অন্যান্য স্থানেও উল্লিখিত থাকত। কিন্তু সমরুর নাম থাকলেও রামনিধির নাম নেই।[২] সুতরাং রামনিধি আসলে সত্য সত্যই ফৌজদার ছিলেন না। এই রামনিধি যদি নিধুবাবু হন, তবে তাঁর বয়স বাইশ বৎসর। এই বয়সে সাধারণ সৈনিক হওয়াই সম্ভব। এইজন্যই তাঁর নাম আর কারো মনে থাকে নি। এর পরেই নবাবের সঙ্গে ইংরেজের বিরোধ চরমে ওঠে এবং বাংলার নবাবী রাজত্ব সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায়। এমন হওয়া বিচিত্র নয়, এই সব ঘটনায় তিনি প্রচুর অর্থ লাভ করেছিলেন কিন্তু সে সব ফেলে কিংবা গচ্ছিত রেখে বাংলা দেশে ফিরে আসেন সম্ভবত: ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে।[৩] ১৭৬৮-তে তাঁর একটি পুত্র লাভ হয়। কিন্তু বেশিদিন সে জীবিত থাকে নি কিছুদিন পর পত্নীরও মৃত্যু হয়। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। হরিমোহন এই বৎসরটি সম্পর্কে বোধহয় নিশ্চিত ছিলেন সেইজন্য বৎসরের সঙ্গে বয়সেরও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় পত্নীও বেশিদিন জীবিত ছিল না। এরপর নিধুবাবু ছাপরা চলে যান। সাত আট বৎসর

---

১ Seir-ul Mutaqharin Vol II (1902) p 474.

২ Bengal District Gazetteer, Saran, Ch. II p 23 মুতাখরীনকে অনুসরণ করেছে। কিন্তু Broome, History of the Rise and Progress of the Bengal Army (1850) p 364; John William, Bengal Native Infantry (1817) Vol 1 p 125; Caraccioli, Life of Lord Clive Vol. 1. p 87; Vansittart. A Narrative of Transaction, Vol III (1766) কোনো বইতেই রামনিধির নাম নেই. যদিও সমরুর নাম পাওয়া যায়।

৩ উর্ধ্বতন কর্মচারীর নিকট এই অর্থ গচ্ছিত রাখা বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে মনে হতে পারে। জগমোহনের সন্দেহজনক চরিত্রই এর সত্যাসত্যতার প্রমাণ। শাসন বিভাগে অসাধুতার দৃষ্টান্ত কিশোরীচাঁদ মিত্রের উক্তিতেই সুস্পষ্ট। দ্রষ্টব্য অবতারণা. 'অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ ও রামনিধি'।

পর তিনি মন্বন্তরের পরে ফিরে গেলেন, তখন তাঁর পূর্ব ইতিহাস বিস্মৃত। বারবার মৃত্যুশোকে নিধুবাবুর মনে বৈরাগ্য ভাবের উদয় হয়। তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৭৯৪-তে কাজ ছেড়ে কলকাতায় ফিরে এসে তিনি তৃতীয় বার বিবাহ করেন। এমন হওয়া খুবই সম্ভব, ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন বলেই ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সে-সব কথা তিনি আর প্রচার করতে চান নি। এইজন্যই রামনিধি গুপ্তের প্রথম জীবনের ইতিহাস আজ আমাদের কাছে অজ্ঞাত।

মুতাখরীনে উল্লিখিত রামনিধি আমাদের রামনিধি কিনা সে সম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্ত অবশ্য এখন করা যায় না। সেকালের দিনে কোন বাঙালীর বাংলা দেশের বাইরে গিয়ে দুঃসাহসিকতাপূর্ণ উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়া অসাধারণ—এ বিষয়ে একাধিক রামনিধির কল্পনা একটু কষ্টকর। তাঁর যে দৃঢ় স্বল্পবাক্ ব্যক্তিত্বের উল্লেখ ঈশ্বর গুপ্ত করেছেন সেটাও স্মরণীয়। নিজের কথা নিধুবাবু বিশেষ বলতেন না বলেই মনে হয়। যিনি গান রচনা করেছিলেন 'নানান দেশের নানান ভাষা' তাঁর চরিত্রে বিদেশীর প্রতি বিরাগের বীজ এক বিস্মৃত-প্রায় অতীতে নিহিত ছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে।

ছাপরা থেকে শেষ বারের মতো ফেরার পর তিনি শুধু সঙ্গীতচর্চা করেই দিন কাটিয়েছেন। লঙ্ লিখেছেন, Nidhu a century ago, composed poems sung to this day; he was said to have written the best when he was drunk.[১] তিনি আর কোনো জীবিকা গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা নেই। বরদাপ্রসাদ দে লিখেছেন,

At Calcutta he passed his days pleasantly for many long years. He wrote and sang and sang and wrote. His fame as a singer spread far and wide. Ramnidhi established a society composed mostly of young men for the cultivation of music chiefly vocal music.

রামনিধি শেষ জীবনে রামমোহনের ব্রহ্মসমাজের সংস্পর্শেও এসেছিলেন। জয়গোপাল গুপ্ত পিতার জীবনীতে এই অংশটি যোগ করেছেন—

"ব্রহ্মসমাজের পূর্ব্ব উপাচার্য্য ৺ উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ মহোদয় এক দিবস রামনিধি বাবুকে আদেশ করিলেন মহাশয় একটী ব্রহ্মসংগীত রচনা করিয়া

১ Long, Descriptive Catalogue (1855) Popular Songs.

শ্রবণ করাইতে হইবে সেই অনুরোধে বাবু তৎক্ষণাৎ কিঞ্চিৎ মৌন থাকিয়া এই গীত রচনা করিয়া শুনাইলেন, যথা

রাগ বেহাগ তাল আড়া।

পরম ব্রহ্ম তৎপরাৎপর পরমেশ্বর
নিরঞ্জন নিরাময় নির্ব্বিশেষ সদাশ্রয়,
আপনা আপনি হেতু বিভু বিশ্বধর ॥
সমুদয় পঞ্চকোষ জ্ঞানা জ্ঞান যথা বাস
প্রপঞ্চ ভূতাধিকার।
অন্নময় প্রাণময়, মানস বিজ্ঞানময়,
শেষেতে আনন্দময় প্রাপ্ত সিদ্ধ নর ॥ ১॥

বিদ্যাবাগীশ মহোদয় এই গীত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং কহিলেন বাবু তুমি সাধু তোমার অসাধারণ ক্ষমতা দৃষ্টে আমরা চমৎকৃত হইয়াছি, কারণ এ প্রকার গীত পূর্ব্বে কখন রচনা করেন নাই, তাহাতে হঠাৎ এমন রচনা শুনা যায় নাই, যাহা হউক, এই গীত দেওয়ানজীকে অর্থাৎ রামমোহন রায় মহাশয়কে দেখাইয়া ব্রহ্মসমাজে গান করাইব, এই কথাবার্ত্তার পর কোন বিশেষ রোগাক্রান্ত হইয়া এতন্মায়াময় সংসার পরিহার করত ব্রহ্মলোকে যাত্রা করিলেন এ কারণ অনুমান হইতেছে এ গীত সমাজের গীতে ভুক্ত হয় নাই অপ্রকাশ রহিয়াছে।"[১]

গীতরত্নে রাজা বরদাকণ্ঠ রায়ের রচিত অপূর্ণ টপ্পা নিধুবাবুর সম্পূর্ণ করার কথা উল্লিখিত আছে।

ঈশ্বর গুপ্ত উল্লেখ করেছেন শেষ জীবনে নিধুবাবু ইংরেজি বই পড়েও সময় কাটাতেন। নিধুবাবু বাল্যকালে এক পাদ্রীর কাছে ইংরেজি শিখেছিলেন। বরদাপ্রসাদ লিখেছেন English also he studied, for a knowledge of that language was then as now a recognised passport to prefer ment in the Government service. সম্ভবতঃ এই উক্তির অনুসরণই করা হয়েছে 'বাঙ্গালীর গান' এবং অমরেন্দ্রপ্রসাদ রায়ের প্রবন্ধে।[২]

রামনিধির মৃত্যু হয়েছিল শনিবার, ৬ই এপ্রিল ১৮৩৯।

---

১ গীতরত্ন (২য় সং ১২৬৩) পৃ ১২ ১৩।

২ নারায়ণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩, পৃ ৭৩৯ অমরেন্দ্রপ্রসাদ রায়, 'নিধু গুপ্ত'।

A native lyric poet, of the name of Nidhiram Gupta, usually called Nidhu Baboo, who was at the same time one of the oldest inhabitants in Bengal is just dead at the age of eighty. His songs were very celebrated among his own countrymen and were collected and printed two years ago.[১]

নিধুবাবুর সঙ্গীত রচনার উপলক্ষের নানা রকম কাহিনী প্রচলিত আছে। প্রেমসঙ্গীত (গরাণহাটা হইতে সরকার এণ্ড কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত ১২৯৪) গ্রন্থে তার নিদর্শন পাওয়া যাবে।

পৃ ১০৩। **সরি মিয়া।** "প্রকৃত নাম গোলাম নবী। একাদশ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার স্ত্রীর নাম শোরি। গোলাম নবী যে সঙ্গীত রচনা করিতেন, সে সঙ্গীতে নিজের নাম গোপন রাখিয়া স্ত্রীর নাম প্রচার করিতেন। সেই কারণে তাঁহার রচিত টপ্পা সকল শোরী মিঞার টপ্পা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। হিন্দী টপ্পা রচনায় ইঁহাকে অদ্বিতীয় বলা যাইতে পারে। ইনি যেমন সঙ্গীত রচনায় সুনিপুণ ছিলেন, সেইরূপ সুগায়ক বলিয়াও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।"[২] গোলাম নবী পাঞ্জাবের অধিবাসী ছিলেন। নিধুবাবুই হিন্দুস্থানী টপ্পাকে বাংলায় রূপান্তরিত করে প্রচলন করেন। বাংলা টপ্পার ইতিহাস সম্পর্কে শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র প্রণীত বাংলার গীতকার (১৩৬৩) গ্রন্থে 'বাংলার টপ্পা' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

পৃ ১০৩। **"জয় জয় বাগ্‌বাণী" ইত্যাদি।** সম্পূর্ণ গানটি জয়গোপাল গুপ্ত রামনিধি গুপ্তের জীবনীতে[৩] উদ্ধৃত করেছেন। গানটি এই—

আড়ানা বাহার।

তাল হরি

জয় জয় বাক্‌বাণী নিখিল বিভব প্রদায়িনী।
পদমধ্যে মুখাম্বোজ বক্ষে কর সরসিজ পঞ্চাসতো বর্ণময় মানি॥

---

১ The Friend of India, April 11, 1839, p 229, Weekly Epitome of News. এখানে বয়স ঠিক বলা হয় নি। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ায় এই সংবাদ প্রকাশের কথা জানতে পারি ব্রজেন্দ্রপ্রসাদের প্রবন্ধ থেকে।

২ বাঙ্গালীর গান পৃ ৯৯৫।

৩ গীতরত্ন (২সং ১২৬৩) পৃ ৫।

সদাসরসিজোদ্ভব সরোজাক্ষ সদাশিব প্রভৃতি অমরবন্দিনী।
অক্ষগুণ আর বিদ্যা অমৃত কলসমুদ্রা দেহি পদচতুষ্টয় পাণি ॥১
সদাপীনোন্নত শুনি ঈষদাভা ত্রিনয়নী সর্ব্ব ইন্দু শিরে ধারিণি।
জগন্মোহন দীনে আশ্রয় স্বকীয় গুণে,
দেহিপদ অম্বুজে ভবানি ॥২॥

পৃ ১০৪। **দ্বিতীয় বিবাহ**। উপরে দ্রষ্টব্য। জয়গোপাল গুপ্ত তারিখ দিয়েছেন ১১৯৮।

পৃ ১০৪। **জয়চন্দ্র গুপ্ত**। ঈশ্বর গুপ্ত ভ্রমক্রমে জয়গোপালকে লিখেছেন জয়চন্দ্র। জয়গোপাল পিতার জীবনীতে এই ভ্রম সংশোধন করেছেন। তাঁদের কনিষ্ঠ ভগিনীও তখন জীবিত।

পৃ ১০৫। **রামচন্দ্র মিত্র**। "জয়নারায়ণ মিত্র—সাধারণতঃ ইঁহাকে লোকে জয় মিত্র বলিত। ইঁহার পিতা রামচন্দ্র মিত্র জাহাজের কাপ্তেনদিগের মুচ্ছুদ্দির কাজ করিয়া বহু অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। জয়নারায়ণ ক্রিয়াকলাপ ও পূজাপার্ব্বণে অনেক অর্থব্যয় করিতেন এবং সেজন্য তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন। বরাহনগরে গঙ্গাতীরে যে কালীমন্দির ও দ্বাদশ শিব মন্দির দেখিতে পাওয়া যায় উহা তাঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত"।[১]

রামচন্দ্র মিত্র-জয়চন্দ্র মিত্র সম্পর্কিত অংশটি জয়গোপালের জীবনীতে নেই।

পৃ ১০৫। **নারায়ণ মিশ্র**। গঙ্গাতীরে আনন্দময়ীর মন্দিরে কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয় জনৈক মোহান্ত দ্বারা। মোহান্তের মৃত্যুর পর জগন্নাথ নামক এক ভক্তের উপর এই দেবীর সেবার ভার অর্পিত হয়। তাঁর অবস্থা ভালো ছিল না বলে তিনি নারায়ণ মিশ্র নামে এক অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণকে এই দেবীস্থান বিক্রয় করেন। তিনি দেবীর নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুর পর নারায়ণ মিশ্রের দৌহিত্র জমিদার মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পর্ণ কুটীরের পরিবর্তে বর্তমান মন্দির তৈরী করে দেন।[২]

পৃ ১০৫। **গঞ্জীর দল**। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন "এই সময়ে ও ইহার কিঞ্চিৎ পরে সহরে গাঁজা খাওয়াটা এত প্রবল হইয়াছিল যে সহরের স্থানে স্থানে এক একটা বড় গাঁজার আড্ডা হইয়াছিল। বাগবাজার, বটতলা ও বৌবাজার

---

১ হরিহর শেঠ, প্রাচীন কলিকাতা পরিচয় (১৯৫২) পৃ ৪৪৭।

২ হরিহর শেঠ, পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ২০৮-৯।

প্রভৃতি স্থানে এরূপ একটা আড্ডা ছিল। বৌবাজারের দলকে পক্ষীর দল বলিত। সহরের ভদ্র গৃহের নিকর্ম্মা সন্তানগণের অনেকে পক্ষীর দলের সভ্য হইয়াছিল। দলে ভর্ত্তি হইবার সময়ে এক একজন এক একটী পক্ষীর নাম পাইত এবং গাঁজাতে উন্নতি লাভ সহকারে উচ্চতর পক্ষীর শ্রেণীতে উন্নীত হইত।"[১] পক্ষীর দলের প্রতিষ্ঠাতা কে বলা কঠিন। অনাথকৃষ্ণ দেব লিখেছেন, বাগবাজার নিবাসী শিবচন্দ্র ঠাকুরকে পক্ষীর দলের স্থষ্টিকর্ত্তা বলে অনেকে মনে করেন। ইনি মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।[২] কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন, শিবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রূপচাঁদ পক্ষীর দলের নেতৃত্ব করেছিলেন এবং তাদের সাংসারিক ব্যয়ভার বহন করেছিলেন। ইনি বাগবাজারের অধিবাসী ছিলেন।[৩]

পক্ষীর দলে বিখ্যাত ছিলেন রূপচাঁদ পক্ষী। এঁর প্রকৃত নাম রূপচাঁদ দাস। রূপচাঁদের আদি দেশ উড়িষ্যায় চিলকার নিকটে। রূপচাঁদের পিতার নাম গৌরহরি দাস। গৌরহরি রাজা হরিহর ভক্তের আম মোক্তার ছিলেন। এঁকে কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতা গড়গোবিন্দপুরে এসে থাকতে হত। রূপচাঁদের জন্ম ১২২১ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে। কলিকাতাতেই ইনি থাকতেন। আবাল্য সঙ্গীতে এঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। দুরকম গানই রূপচাঁদ রচনা করতে পারতেন, শান্ত রসাত্মক এবং ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক। এঁর সব সঙ্গীতেই 'পক্ষী' বা 'খগরাজ' ভণিতা থাকত। বাউল সঙ্গীতও ইনি রচনা করেছেন। অনেক গানে বাংলা ও ইংরেজি শব্দের মিশ্রণ আছে, যেমন 'আমারে ফ্রড করে কালিয়া ড্যাম! তুই কোথায় গেলি।'[৪] রূপচাঁদ পক্ষী উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকেও জীবিত ছিলেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০-এ জুলাই রুকমাবাঈ-এর বিখ্যাত বিবাহ বিচ্ছেদ মামলার ফয়সালা হয়। রূপচাঁদের একটি গানে এর উল্লেখ আছে—

তোমরা নিউজ পেপারে পড় নাই
পতিরে ত্যাগ কল্লে রুকমাবাঈ
নূতন আইন হবে তাই॥ (বাঙ্গালীর গান)

---

১ শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (৩সং) পৃ ৫৬।

২ অনাথকৃষ্ণ দেব, বঙ্গের কবিতা. পৃ ৩২৫।

৩ পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড, পৃ ১৫২।

৪ বঙ্গভাষার লেখক পৃ ৩৫৪।

পঙ্কীর বল সম্পর্কিত এই অংশটি জয়গোপাল গুপ্ত পিতার জীবনী থেকে বাদ দিয়েছেন।

পৃ ১০৬। **বর্দ্ধমানাধিপতি তেজশ্চন্দ্র**। তেজশ্চন্দ্র তিলকচন্দ্রের পুত্র। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে তিলকচন্দ্রের মৃত্যুর পর তেজশ্চন্দ্র রাজা হন। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী বিষ্ণুকুমারী পুত্রের পক্ষে রাজ্যপরিচালনা করবার জন্যে শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে তেজশ্চন্দ্র আবার রাজ্যভার নিয়ে নেন। কিন্তু তাঁর সময়ে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়; যথাসময়ে রাজকরও তিনি দিতে পারতেন না। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পরই জাল প্রতাপচাঁদের আবির্ভাব হয়। মহাতাবচাঁদ এঁর দত্তক পুত্র।

পৃ ১০৬। **মহানন্দ রায়**। মহারাজ নন্দকুমারের পুত্র গুরুদাস রায় সুতানুটি চড়কডাঙ্গায় বাস করতেন। মহারাজ গুরুদাসের কোনো উত্তরাধিকারী না থাকায় ভাগিনেয় মহারাজ মহানন্দ রায় বিষয় সম্পত্তি পান। তিনি মুর্শিদাবাদের নিজামতের দেওয়ান ছিলেন। মহানন্দের তিন পুত্র। কনিষ্ঠ জয়কৃষ্ণ মুর্শিদাবাদে থাকতেন।

পৃ ১০৬। **শ্রীমতী**। রামনিধির সঙ্গে শ্রীমতীর সম্পর্কে যে ঘনিষ্ঠ ছিল, এ-কথা কেউ অস্বীকার করেন নি। জয়গোপালও এই অংশটি যথাযথ রেখে দিয়েছেন শুধু "প্রায় প্রতি রজনীতেই তাহার গৃহে গমন করিতেন"—এই অংশটি বাদ দিয়েছেন। তারপর "যখন যে রূপ ভাবের উদয় হইত তৎক্ষণাৎ" এই অংশের পর জয়গোপাল যোগ করেছেন "তাহারি এক এক গীত রচনা করিতেন এবং সেই গীত সকল সকল রাগে এবং সকল তালে গান করিতেন, এতাদৃশ যে যখন যে গীত যে রাগে গান করিতেন বোধ হইত যে এ গীত সেই রাগে উদ্ভব হইয়াছে"। রামনিধির সঙ্গে শ্রীমতীর সম্পর্ক যে আপত্তিজনক ছিল না, সে কথা বরদাপ্রসাদ দে জোরের সঙ্গে উল্লেখ করে লিখেছেন—

I say this on the authority of one who was on familiar terms with Ram Nidhi.[১]

পৃ ১০৭। **রাজকৃষ্ণ বাহাদুর**। রাজকৃষ্ণ দেব মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পুত্র। রাজকৃষ্ণ দেবের জন্ম ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে। ইনি কুলপ্রদীপ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ১৮১৫

১ বরদাপ্রসাদের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ পৃ ৩।

খ্রীষ্টাব্দে রচিত এই গ্রন্থ তাঁর পুত্র কালীকৃষ্ণ দেব ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। কায়স্থ কুলীনের বিবরণই এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য।

পৃ ১০৭। **শ্রীদাম দাস**। শ্রীদাম দাস ও তার ভাই সুবল নূতন যাত্রার অভিনয় করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখেছেন, "শিশুরাম অধিকারী নামা এক ব্যক্তি কেঁদেলী-গ্রাম-নিবাসী ব্রাহ্মণ তাহার [যাত্রার] গৌরব সম্পাদন করে। তৎপূর্ব্ব হইতে বহুকালাবধি নাটকের জঘন্য অপভ্রংশস্বরূপ একপ্রকার যাত্রা এতদ্দেশে বিদিত আছে। সঙ্কীর্ত্তন ও পরে কবির প্রচারের মধ্যে তাহার প্রায়ঃ লোপ হইয়াছিল। শিশুরাম হইতে তাহার পুনর্বিকাশ হয়। শিশুরামের পর শ্রীদাম সুবল ও তৎপরে পরমানন্দ প্রভৃতি অনেকে যাত্রার পরিবর্দ্ধনে নিযুক্ত হইয়া অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছে।"[১] ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে শ্রীরামপুরে শ্রীদাম দাসের ওলাউঠা রোগে মৃত্যু হয়।[২] কালিয় দমন যাত্রা করে এদের বিশেষ নাম হয়। শ্রীদাম দাস এবং কুলুইচন্দ্র সেনের পুত্র গোকুলচন্দ্র সেন নীলমণি মল্লিকের পক্ষে আখড়াই সঙ্গীতে বাগবাজারের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।[৩]

পৃ ১০৮। **নীলমণি মল্লিক**। ইনি পাথুরিয়াঘাটার মল্লিক, পিতার নাম গঙ্গাবিষ্ণু মল্লিক। বড়বাজারের মল্লিকদের সঙ্গে গঙ্গাবিষ্ণুর ভগিনীর বিবাহ ব্যতীত এদের কোনো সম্পর্ক নেই। বৈষ্ণবদাস মল্লিক এবং সনাতন মল্লিকও এই পরিবারের। নীলমণির দত্তক পুত্র ছিলেন রাজেন্দ্র মল্লিক। নীলমণি সঙ্গীতামোদী ছিলেন—

Babu Nilmoni Mullick had a particular taste for music and liberally encouraged professors of that delightful art. On the occasion of Sripanchami every year he held a Maiphel in which musicians exhibited their talents and received liberal rewards. He introduced the reformed system of Full-Ackrai singing accompanied with the musical concerts. The intonations were of a very high and perfect order and of scientific precision. This sort of singing has for want of competent masters became

১ বিবিধার্থ সংগ্রহ. ১৭৮০ শক মাঘ পৃ ২৩৫।

২ সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১ম খণ্ড পৃ ১৪০।

৩ গীতরত্ন (২ মুদ্রণ, ১২৬৩) পৃ ১০।

extinct for nearly half a century and has given place to the less clever form of Half-Ackrai singing[১]

পৃ ১০৮। **পাথুরেঘাটার ঠাকুরবাবুরা**। পাথুরেঘাটার ঠাকুর বংশের প্রতিষ্ঠাতা দর্পনারায়ণ ঠাকুর। দর্পনারায়ণের ভ্রাতা নীলমণি ঠাকুর জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। দর্পনারায়ণের প্রপৌত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। এঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় ঈশ্বর গুপ্ত প্রথম সংবাদপ্রভাকর প্রকাশ করেন। স্যর যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর দর্পনারায়ণের আর এক প্রপৌত্র।

পৃ ১০৮। **যোড়াসাঁকোর সিংহবাবুরা**। দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের বংশ। শান্তিরামের পুত্র জয়কৃষ্ণ, তাঁর পুত্র নন্দলাল। নন্দলালের পুত্র ছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ।

পৃ ১০৯। **মোহনচাঁদ বসু**। রামনিধি wrote and sang and sang and wrote. His fame as a singer spread for and wide. Young men, having a *penchant* for music clustered around him. Unlike professional songsters, he unresrervedly gave them lessons in vocal music. Some of the young men afterwards became good singers—notably Mohan Chand Bose of Bagbazar.. ···Ram Nidhi established a society composed mostly of young men, for the cultivation of music, chiefly vocal music[২]

মোহনচাঁদের পিতামহ রামচরণ বসু দেওয়ান ছিলেন। মোহনচাঁদের পিতার নাম জয়নারায়ণ বসু। পৈতৃক বিষয় দিয়েই মোহনচাঁদ জীবিকা নির্বাহ করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কবিগানের গৌরবময় যুগ অতিক্রান্ত হলে মোহনচাঁদ প্রথমতঃ সখের দাঁড়া কবি ও পরে হাফ আখড়াই গানের সৃষ্টি করেন। মোহনচাঁদ বাগবাজারের অধিবাসী ছিলেন। যোড়াসাঁকোর রামলোচন বসাক মোহনচাঁদের প্রতিপক্ষে দল করেছিলেন। হাফ আখড়াই ও সখের দাঁড়া কবি মোহনচাঁদের সুরে গাওয়া হত। নিধুবাবু সঙ্গীত-সংগ্রামে মোহনচাঁদের উপর বিশেষ নির্ভর করতেন। "সভাবাজারের রাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুর পূর্ব্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার অভিপ্রায়ে

১ Lokenath Ghose পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৫৮।

২ বরদাপ্রসাদ দে পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধ।

নিধুবাবুকে দিয়া একটি নূতন ধরণের দল প্রস্তুত করাইলেন। একটি সভাবাজারে অন্যটি বাগবাজারে। দলের মধ্যে বিশেষ প্রতিভা কাহারও ভাগ্যে ফুটিয়া উঠিল না। কেবল মোহনচাঁদ বসু নামে একটি বালক দিন দিন প্রতিভার পরিচয় দিতে লাগিল। রামনিধি গুপ্ত কেবল তাহারই উপর আশা স্থাপন করিয়া রাজাবাহাদুরের তাপিত হৃদয়ে শান্তিবারির অভিষেক করিতে লাগিলেন।" ঈশ্বর গুপ্ত শোভাবাজারের দলে গান রচনা করতেন।[১]

পৃ ১১০। **রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়**। ইনি সেকালের একজন বিখ্যাত বাঁধনদার। প্রীতিগীতিতে এঁকে আখড়াই সঙ্গীতের 'প্রধান বাঁধনদার' বলা হয়েছে। অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত গীতরত্নমালায় (১ম খণ্ড) রামচাঁদের কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক তিনটি গান উদ্ধৃত আছে।[২] ১৮৪৯ এর মার্চ মাসে কলিকাতায় 'নন্দবিদায়' নামে নূতন যাত্রার যে অভিনয় হয়, রামচাঁদ তাতে গান এবং সুর দিয়েছিলেন। ঐ বৎসরের ৩০ এ মার্চের সম্বাদ ভাস্করে এই বিবরণ প্রকাশিত হয়। যোড়াসাঁকোর হাফ আখড়াইয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন রামচাঁদ—এ কথাও বলা আছে। রামচাঁদ কবি, ধনাঢ্য এবং সঙ্গীতনিপুণ বলে পরিচিত ছিলেন। সম্বাদ ভাস্কর পত্রেই (১৮৪৯, ১৭ই এপ্রিল) শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাড়ীতে 'নন্দ বিদায়' যাত্রার তৃতীয় অভিনয়ের বিবরণে বলা হয়েছে "এতদ্দেশে যে সকল যাত্রা হইয়া থাকে, এ যাত্রা সেরূপ যাত্রা নহে, ইহা নূতন প্রকার।"[৩] এই যাত্রাতে গান ও সুর যোজনা করে রামচাঁদ বহুকাল স্মরণীয় হয়ে ছিলেন। "যে সকল প্রাচীনরা তাঁহার রচিত "নন্দবিদায়" গীতাভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা একবাক্যে বলেন যে সেরূপ যাত্রা এই মহানগরীতে আর কখন হয় নাই।"[৪]

পৃ ১১০। **রামসেবক মল্লিক**। এঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯এ অক্টোবরে সার হেনরী রাসেলের বাংলা দেশের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হওয়া উপলক্ষে তাঁকে নাগরিক সম্বর্ধনা করা হয়। অভিনন্দন পত্রে রামলোচন মল্লিক, নীলমণি মল্লিক এবং রামসেবক মল্লিকের স্বাক্ষর

১ গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য. হাফ আখড়াই সঙ্গীত সংগ্রামের ইতিহাস, পৃ ১৬।

২ পৃ ৪৯৭, ৫১৪, ৫২৬।

৩ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (৩য় সং) পৃ ১৯-২০।

৪ প্রীতিগীতি পৃ ৯

আছে।[১] পাথুরিয়াঘাটার মল্লিক পরিবারে রামলোচনের নাম পাওয়া যায় না। বড়বাজারের নিমাইচরণ মল্লিকের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন রামলোচন। রামসেবক মল্লিক পাথুরিয়াঘাটা অথবা বড়বাজার—কোন মল্লিক পরিবারের বলা যায় না। ঈশ্বর গুপ্ত বড়বাজারের উল্লেখ করেছেন। মনে হয় বড়বাজারের নিমুমল্লিকের চতুর্থ পুত্র রামমোহনের সঙ্গে তিনি ভুল করেছেন। পরে দ্রষ্টব্য।

পৃ ১১০। **হাফ আখড়াই**। দাঁড়া কবি ও হাফ আখড়াইয়ের মধ্যে পার্থক্য গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট করে নির্দেশ করেছেন। দাঁড়া কবির ক্রম এই রকম—

চিতান — পরচিতান—ফুকা—মেলতা—মহড়া—শওয়ারি—খাদ—ফুকা—মেলতা—অন্তরা।

অন্তরা সমাপ্ত হলে দ্বিতীয় চিতান। আগের কবিগানের অন্তরা রচনার রীতি পরে থাকে নি। দ্বিতীয় ফুকার পরেই গীত সমাপ্য। হাফ আখড়াই অবিকল এই রকম, কেবল ফুকার পর ডবল ফুকা। অন্তরা থাকে না।[২]

হাফ আখড়াই সঙ্গীতের সৃষ্টি কি ভাবে হল, মনোমোহন বসু তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন—

"নিধুবাবু প্রাচীন হইয়া পড়িলেন এবং অন্যান্য প্রধান উদ্যোগী অনুরাগীগণকে মৃত্যু অপসারিত করিল; ইহাতেই বোধ হয় বহু কৃচ্ছ্র সাধ্য আখড়াই আমোদ বন্ধ হইয়া গেল। পূর্ব্ব হইতেই দাঁড়া-কবির প্রাদুর্ভাব ছিল, এখন আরো হইল—মোহনচাঁদবাবুর যোগ ও স্বর পাইয়া আরো উন্নত হইল। এইরূপে চলে, একদা কোনো ধনশালী মল্লিকবাবুদের ভবনে (নাম ভুলিয়াছি) বাগবাজারের সহিত যোড়াসাঁকোর কবিযুদ্ধ হয়। মোহনচাঁদবাবু নিজে যান নাই, কিন্তু নিজের (বাগবাজারের) দলকে অতি পরিপাটিরূপে প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়াছেন। বাগবাজারের সর্ব্বাঙ্গীন সম্পূর্ণ জয় হইল—মোহনচাঁদবাবুর মধুম্রক্ষিত স্বরের প্রশংসায় আসরে ধন্য ধন্য রব উঠিল।"

বাগবাজারের দলের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে সেই দলের জনৈক কর্তা ব্যক্তি অকস্মাৎ শ্রোতাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেললেন, এর চেয়েও অনেকাংশে

---

১ Bengal : Past & Present Vol 41, pt 1-2, p 94, Editor's Notebok. 'Ram Sebuck Mullick another member of the family'; আন্দুলের মল্লিক পরিবারে একজন রামসেবক মল্লিক ছিলেন।

২ গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাচীন কবি সংগ্রহ পৃ ।৶০—।০

উৎকৃষ্ট সঙ্গীত শোনাবেন। আসলে তিনি নিজেও প্রতিশ্রুত সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। মোহনচাঁদ বসুকে বাড়ীতে গিয়ে সব কথা বলে তাঁর মুখ রক্ষা করতে বললেন।

মোহনচাঁদ নিজেও এ সম্বন্ধে কিছুতেই জানতেন না। সর্বজন সমক্ষে এই আকস্মিক প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য তিনি বিব্রত হয়ে পড়লেন। দু' তিন দিন নির্জনে ভেবে ভেবে মোহনচাঁদ একটি নূতন সঙ্গীত-রীতির উদ্‌ভাবন করলেন —"আখড়াই এখন হওয়া ভার, বিশেষ তাহা তো পুরাতন—একট নূতন কিছু চাই—তবে কেন আখড়ায়ের অনুকরণে হাফআখড়াই করি না? রাগ-রাগিণীর অত নৈপুণ্যময় খেলা ও অত ভাঁজ ছাড়িয়া দিই, অথচ তাহাদের সরল সুপ্রকাশও রাখা যাউক—অথচ দাঁড়া-কবি হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ হউক—অথচ তাহার ন্যায় ইহাতে উত্তর-প্রত্যুত্তর চলুক।"

অতি গোপনে এই নূতন সঙ্গীত-রীতির অভ্যাস চলতে লাগল। "বাগ-বাজারের আখড়া আপনাদের বহুবিস্তৃত পাড়ার মধ্যে এমন গুপ্ত স্থানে বসিল যে চতুর্দ্দিগে যতদূর পর্য্যন্ত গানের আওয়াজ যাওয়া সম্ভব, ততদূর এবং তদধিক সীমাস্থান পর্য্যন্তও আপনাদের বিশ্বাসী লোক ব্যতীত, ঘরের কথা প্রকাশ করে, এমন এক ব্যক্তিরও বাস ছিল না অথবা পাড়ার কর্তারা তেমন কাহাকেও থাকিতে দিলেন না।" যোড়াসাঁকোর দল সংবাদ জানবার যথেষ্ট চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। এমন কি যোড়াসাঁকোর পাড়ার এক যুবকের বাগবাজারনিবাসী মাতুলের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার কৌতুককর ঘটনাও মনোমোহন বসু উল্লেখ করেছেন। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী অবশ্য যোড়াসাঁকোর দল একদিন বাগবাজারের গান শুনে গেল। কিন্তু তাদের আসল সঙ্গীত কিছুই শোনানো হল না।

অতঃপর "গাহনার দিন আসিল—সঙ্গীতসংগ্রাম আরম্ভ হইল। বাগ-বাজারের আসর—প্রথমে তাঁহাদিগকেই গাইতে হইল। সারদা বিষয় উভয় পক্ষে এক রকম তো হইয়া গেল। সখীসম্বাদের সময় সাজ বাজনার পর স্বয়ং মোহনচাঁদ প্রমুখ বাগবাজারের দল যেই মাত্র চিতানের প্রথম চরণ গাইয়া ছাড়িয়া দিল, অমনি বাহবার চোটে বোধ হইল বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়ে! ক্রমে পর-চিতেন, ফুকা, ডবল্ ফুকা (এই ডবল ফুকা কবি গানের মধ্যে পূর্ব্বে মোটে ছিল না) মেলতা মহড়া ইত্যাদি পর পর যত গাওয়া হইতে লাগিল, ততই অভূতপূর্ব্ব গগনস্পর্শী প্রশংসার ধ্বনি পুনঃপুনঃ উত্থিত হইল।...... তবু

মোহনচাঁদবাবু প্রথম প্রথম হাফ আখড়ায়ের যে সুর করিয়াছিলেন তাহা তত ভাল হয় নাই—ক্রমে তাহার এত উৎকর্ষ করিয়া তুলিয়াছিলেন যে তাহার তুল্য নাই, মূল্য নাই।"

নিধুবাবু আখড়াই সঙ্গীতের অবমাননায় মোহনচাঁদের উপর প্রথমে খুবই রুষ্ট হয়েছিলেন। মোহনচাঁদের গান শুনতেই তিনি অস্বীকৃত হয়েছিলেন। পরে অনেক অনুরোধে হাফ আখড়াই গান শুনে খুসীই হন এবং মোহনচাঁদকে এই গান প্রচার করতে অনুমতি দেন।[১]

২৮ জানুয়ারি ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের 'সমাচার দর্পণে' 'সমাচার চন্দ্রিকা' থেকে উদ্ধৃত একটি বিবরণে নূতন ধরণের আখড়াই সঙ্গীতের উল্লেখ পাওয়া যায়। ৯ই মাঘ ১২৩৮ শনিবার রাত্রিতে রামমোহন মল্লিকের মেছুয়াবাজারের বাড়ীতে মোহনচাঁদ বসু এবং যোড়াসাঁকোর কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়ের দলের মধ্যে এই সঙ্গীত সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। বর্ণনায় বলা হয়েছে, "ইহা প্রকৃত আখড়াগান নহে এবং কবিওয়ালার মতও বলা যায় না এজন্য অনেকেই কহেন নিম আখড়া অথবা কেহ কহেন হাপ আখড়ার লড়াই হইয়াছিল।"[২]

ঈশ্বর গুপ্ত যে হাফ আখড়াই সঙ্গীতানুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়েছেন, খুব সম্ভব সমাচার চন্দ্রিকার বর্ণনা সেই অনুষ্ঠানেরই। রামসেবক মল্লিকের পরিবর্তে এখানে পাওয়া যাচ্ছে রামমোহন মল্লিকের নাম। মনোমোহন বসু 'মল্লিক ভবন' বলেছেন, বিশেষ নাম ভুলে গিয়েছেন। ঈশ্বর গুপ্ত 'শীতকালে শনিবার রাত্রি' বলে সময়টির একটি আভাস দিয়েছেন; চন্দ্রিকার বিবরণ অনুযায়ী সেটা ৯ই মাঘ ১২৩৮ শনিবার রাত্রি।

সুতরাং হাফ-আখড়াই সঙ্গীতের প্রবর্তন হল ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি, ১২৩৮ সালের মাঘ মাস থেকে।

পৃ ১২৭। **আখড়াই গাহনার সৃষ্টি**। বর্তমান গ্রন্থের 'অবতারণা'র আখড়াই সঙ্গীতের ইতিহাস দেওয়া হল। গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য প্রণীত 'হাফ আখড়াই সঙ্গীত সংগ্রামের ইতিহাস গ্রন্থে পূর্ব ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস কতদূর নির্ভরযোগ্য জানি না।

---

১ মনোমোহন গীতাবলী (১৮৮৭) ভূমিকা, পৃ ।/০—।৶০

২ সংবাদপত্রে সেকালের কথা ২য় খণ্ড (৩ সং) পৃ ২৮০।

পৃ ১২৭। **কাশীনাথবাবুর ফুলবাগান**। কাশীনাথের পিতামহ ঘসিরাম সম্রাট শাজাহানের দেওয়ান ছিলেন। এঁরা ছিলেন ক্ষেত্রি। কাশীনাথের পিতা মুলুকচাঁদ কলিকাতায় বসতি করেন। কাশীনাথের সময় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সঙ্গে কাশীনাথবাবুকে নিয়ে সুপ্রীম কোর্টের বিবাদ হয় ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে।

রাসু নৃসিংহ

(রাসু ১৭৩৫—১৮০৭ খ্রী ; নৃসিংহ ১৭৩৮—১৮০৭ খ্রী-র পর)

"বাঙ্গালা ১১৪১ সালে, ইংরেজি ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রাসু এবং বাঙ্গালা ১১৪৪ সালে ইংরেজি ১৭৩৮ খ্রীঃ অব্দে নৃসিংহ ফরাসডাঙ্গার অধীন গোন্দলপাড়া গ্রামে ভদ্র কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাহাদের পিতার নাম আনন্দীনাথ রায় ছিল। আনন্দীনাথ ফরাসি গবর্ণমেণ্টের অধীন সামরিক বিভাগে সামান্য মুহুরীগিরি কার্য্য করিতেন। এই পদের বেতন সামান্য নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও তাঁহার রোজগার কিন্তু সামান্য হইত না, অন্য উপায়ে তিনি বেশ উপায় করিতেন। রায় মহাশয় বলিতেন, অর্থ উপার্জ্জনের সময় ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা করিবে না, কিন্তু একবার হস্তগত হইলে তাহা যাহাতে উপযুক্ত কার্য্যে ধর্ম্মার্থে ব্যয়িত হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি নাকি অধর্ম্মোপায়ে অর্জ্জিত অর্থের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তদ্দ্বারা বৎসরান্তে মহামায়া গণেশ জননী দুর্গার রাতুল চরণ জাঁক জমকের সহিত অর্চ্চনা করিতেন। তিনি দীন দুঃখীর অভাব মোচন ও অতিথি অভ্যাগতের পরিচর্য্যা করিতে কাতর হইতেন না। এই সকল কার্য্যে তাঁহার অর্জ্জিত অর্থের অধিকাংশই ব্যয়িত হইত।

রাসু ও নৃসিংহ পাঠার্থে একত্র গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় প্রেরিত হন। আনন্দীনাথের শ্বশুড়বাড়ী চুঁচুড়া ; তৎকালে তথায় মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত একটী বাঙ্গালা বিদ্যালয় ছিল। এই বিদ্যালয় ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে পাদরী মে কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছিল। পাঠশালার কার্য্যপ্রণালী ও অবস্থা তাদৃশ সন্তোষজনক না হইলেও, আনন্দী সেইখানেই পুত্রদ্বয়ের অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেন এবং শুভদিন দেখিয়া তাহাদিগকে নিজ শ্যালকের তত্ত্বাবধানে চুঁচুড়ায় প্রেরণ করেন।"

রাসু নৃসিংহের পড়াশুনায় মন ছিল না। পাঠশালায় যাবার নাম করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসতেন বটে, কিন্তু পাঠশালায় যেতেন না। তাঁদের মামা সংশোধন করবার চেষ্টা করলেন কিন্তু ফল কিছুই হল না। "অগত্যা মাতুল মহাশয়কে বাধ্য হইয়া এক বৎসর পর ভাগিনেয়দ্বয়কে গোন্দলপাড়া রাখিয়া আসিতে হইল। ইহার অল্পদিন পরেই আনন্দী কাল কবলে পতিত হইলেন।"

"বালকদ্বয় এইরূপে সোণার শৈশব কাল ব্যর্থ অতিবাহিত করিলেও তাহাদের হৃদয়ে সেই কবিপ্রতিভা উপ্ত হইতে লাগিল। দুর্গোৎসবের সময় তাহাদের বাড়ীতে মহামায়ার সম্মুখে কবির গাওনা হইত। এই সময় হইতেই কবিগণের প্রতি তাহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। যৌবনের প্রারম্ভে তাহারা গ্রামের কতিপয় ব্যক্তির সহযোগে এক সখের কবির দল গঠিত করিল। হরু ঠাকুর যাহার নিকট রচনা শিক্ষা করেন ইহারাও সেই তন্তুবায় জাতীয় কবিওয়ালা রঘুনাথ দাসের নিকট প্রথম শিক্ষালাভ করে। ১১৫৭ বঙ্গাব্দে তাঁহারা প্রথম কবির দল লইয়া কলিকাতার এক ধনাঢ্য ব্যক্তির ভবনে গাওনা করেন। এখানেই তাঁহাদের ভাবী জীবনের পূর্ণ সাফল্যের সূত্রপাত হয়। এই সময় হরু ঠাকুর প্রভৃতি প্রৌঢ়াবস্থা অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাঁহাদের যশ ও সমৃদ্ধি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। লালু নন্দলাল রাসু নৃসিংহের সমসাময়িক।"

"আমরা কবিদ্বয়ের সখীসম্বাদ ও প্রেমবিরহ-সংগীত ব্যতীত অন্য কোন ভাবের গীত প্রাপ্ত হই নাই।"

"শুনিতে পাওয়া যায়, রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের সহিত রাসু নৃসিংহের একবার সাক্ষাৎ হয়। ভারতচন্দ্র শ্রীবৃন্দাবন বাসে গমনোদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া কিয়দ্দিবস গোন্দলপাড়ায় এক ব্রাহ্মণের আলয়ে অবস্থান করেন। এই সময় তাঁহার সহিত রাসু নৃসিংহের সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয় হয়। ভারতচন্দ্রের তখন প্রৌঢ়াবস্থা এবং রাসু নৃসিংহ কেবল যৌবনে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

ফরাসী গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান স্বর্গীয় ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় কবিগানের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি সময় সময় নানাস্থান হইতে কবির দল বায়না করিয়া আনাইয়া স্বভবনে গাওয়াইতেন। রাসু নৃসিংহও চৌধুরী মহাশয়ের কৃপালাভে বঞ্চিত ছিলেন না। যতদিন চৌধুরী মহাশয় জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহারা তাঁহার আনুকূল্য পাইয়াছিলেন। কবিওয়ালারা এবং অন্যান্য সংগীতকারগণ ফরাসিরাজ্যে এইরূপ সাহায্য পাইতেন বলিয়া এককালে ফরাসডাঙ্গা সংগীতকারদিগের প্রধান আড্ডা হইয়া উঠিয়াছিল।

১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ৭২ বৎসর বয়সে রাসুর মৃত্যু হয়। নৃসিংহ ইহার পরও কয়েক বৎসর জীবিত ছিলেন।"[১]

---

১ নব্যভারত ১৩১১, পৃ ৬৪৫-৬৫০, ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল লিখিত প্রবন্ধ।

হরু ঠাকুর

(১৭৪৯—১৮২৪ খ্রী)

হরু ঠাকুরের পিতার নাম অনেকেরই মতে কালীচন্দ্র দীর্ঘাড়ি।[১] ঈশ্বর গুপ্ত এবং ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল উভয়েই মনে করেন হরু ঠাকুরের পিতার নাম কল্যাণচন্দ্র দীর্ঘাড়ি। ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল লিখেছেন, 'বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ৩৬৭ পৃষ্ঠায় হরু ঠাকুর প্রসঙ্গে এবং কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে হরু ঠাকুরের পিতার নাম—কালীচন্দ্র দীর্ঘাড়ি ছিল। কিন্তু এ লেখকের প্রতি এ প্রবন্ধ লেখকের আস্থা নাই। সে নিজেই অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছে—কল্যাণচন্দ্রই হরু ঠাকুরের পিতার নাম ছিল।"[২]

ঈশ্বর গুপ্ত হরু ঠাকুরের জন্মসাল উল্লেখ করেন নি; তবে জন্মসাল এবং মৃত্যুসালের ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, যখন তিনি জীবনী রচনা করছেন, তার অনূর্ধ্ব চল্লিশ বৎসর পূর্বে হরুর মৃত্যু হয়। সুতরাং হরুর মৃত্যু আনুমানিক ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে। ঈশ্বর গুপ্ত বলছেন হরুর জীবৎকাল পঁচাত্তর বৎসর। সুতরাং তাঁর জন্ম আনুমানিক ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে অথবা ১১৪৫ অথবা ৪৬ সালে। এ পর্যন্ত এই তারিখ না মেনে নেওয়ার কোনো কারণ ঘটে নি। কিন্তু এখন হরুর মৃত্যুর ঠিক তারিখটি পাওয়া যাচ্ছে। তাতে সমস্ত হিসাবেরই কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছে। ১৮২৪, ২১ আগস্টের সমাচারদর্পণে হরুর মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হয়েছিল—

মরণ।—২৩ শ্রাবণ [৬ আগষ্ট] শুক্রবার শহর কলিকাতার সিমুল্যা নিবাসি হরু ঠাকুর পরলোকগামী হইয়াছেন এঁহার মৃত্যুতে এতদ্দেশীয় অনেকে খেদিত হইয়াছেন যে হেতুক ইনি অতি সুরসিক মানুষ ছিলেন এবং বাঙ্গালা কবিতাতে ও গানেতে অতিখ্যাত ও গায়কের অগ্রগণ্য ছিলেন।[৩]

অতএব হরু জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে, বাংলা ১১৫৬ সালে।

---

১ কবিওয়ালাদিগের গীতসংগ্রহ, বঙ্গভাষার লেখক, গুপ্তরত্নোদ্ধার, বাঙ্গালীর গান, বিশ্বকোষ (কবি) প্রভৃতি সর্বত্রই এই নাম দেওয়া আছে।

২ নব্যভারত ১৩১১ ফাল্গুন, পৃ ৫৯৯ পাদটীকা।

৩ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, (১খণ্ড, ৩সং) পৃ ১৪৩। ঐ গ্রন্থের ৩৮১ পৃষ্ঠাও দ্রষ্টব্য।

শিমুলিয়ার ভৈরব সরকারের পাঠশালায় হরেকৃষ্ণ নয় বৎসর বয়সে ভর্তি হন। লেখাপড়ায় বিশেষ মনোযোগ ছিল না। এখানেই তাঁর কবিত্বশক্তির উন্মেষ হয়। "পাঠশালায় প্রবেশের দুই বৎসর মধ্যে কল্যাণচন্দ্র পরলোকগমন করেন। এই ঘটনার পর হইতে হরেকৃষ্ণের স্বভাব একেবারেই বিগড়াইয়া যায়। পিতার জীবদ্দশায় যে একটু লেখাপড়া করিত, এখন তাহাও ছাড়িয়া দিল, দিন রাত সঙ্গীদিগের সহিত আমোদ প্রমোদে বিভোর থাকিত। জননী পুত্রকে সৎপথে আনিতে বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন সত্য, কিন্তু উন্মার্গগামী পুত্র কিছুতেই সৎপথে ফিরিল না। সমস্ত চেষ্টা বিফল হইলে তিনি পুত্রকে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু পুত্র তাহাতেও —কেয়ার নাদারৎ।

এইভাবে ৫।৬ বৎসর কাটিয়া গেল। হরেকৃষ্ণের বয়স এখন পনর ষোল। পিতার সঞ্চিত যে কিছু ধন সম্পত্তি ছিল, তদ্দ্বারা জননী এতদিন তাহার ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিলেন। কিন্তু এখন আর চলে না, মাতা দিন রাত অশ্রুবর্ষণ করেন। পাড়াপ্রতিবাসী সকলেই হরুকে তিরস্কার করে কাজেই তাহাকে বাধ্য হইয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা দেখিতে হইল। কিন্তু তাহার যে বিদ্যা তাহাতে ভাল চাকুরী মিলিবে কেন? বাল্যকাল হইতেই গান বাজনার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ঝোঁক ছিল, এই ঝোঁকেই তাঁহার মাথা খাওয়া যায়। সুতরাং গানই তাঁহার যৌবনকালের একমাত্র সম্বল হইল। ইতপূর্ব্ব হইতেই তিনি গান রচনা করিতে শিখিয়াছিলেন।......অবশেষে নানারূপ চিন্তা করিয়া হরু ঠাকুর—এক সখের দল খাড়া করিলেন। তন্তুবায় জাতীয় রঘুনাথ দাস নামক এক কবিওয়ালার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাহার দ্বারা স্বরচিত সংগীত সংশোধন করাইয়া লইয়া নিজের সখের দলে গাওনা করিতে লাগিলেন।"[১]

এখানে উল্লেখযোগ্য, হরেকৃষ্ণ বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, মূল পদবী দীর্ঘাঙ্গী। কবিওয়ালাদের মধ্যে ইনি ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে সকলে তাঁকে ডাকত ঠাকুর।

ব্যক্তিগত চরিত্রে হরু পরবর্তীদের নিকট শ্রদ্ধেয় ছিলেন বলে মনে হয়। 'সম্বন্ধ জীবনচরিত অভাবে হরু ঠাকুরের চরিত্র বিষয়ে কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করা যায় না, কিন্তু তাঁহার যে অন্তঃকরণের মহত্ব ও ঔদার্য্য ছিল প্রতিভা

১ [illegible], ১৩১১, ফাল্গুন, পৃ [illegible]।

হইতে পারে।'[1] তাঁর জীবনের তিনটি ঘটনা এই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল, গুরুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, মহারাজ নবকৃষ্ণের যোড়া শাল প্রত্যাখ্যানে আত্মমর্যাদাবোধ এবং গুণগ্রাহী নবকৃষ্ণের মৃত্যুর পর সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করে দলত্যাগ।

পৃ ১৪৪। রঘুনাথ দাস। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বার্ধে এঁর জন্ম। রঘুর জন্মস্থান নিয়ে বিভিন্ন কিম্বদন্তী আছে। কেউ বলেন কলিকাতায়, কেউ বলেন শালিখায়, কেউ বলেন গুপ্তিপাড়ায়। জাতিতে ইনি ছিলেন কর্মকার।[2] আবার কেউ কেউ বলেন, ইনি ছিলেন তন্তুবায় জাতীয়।[3] শোনা যায় রঘুনাথ তন্তুবায় জাতীয়ই ছিলেন, নিবাস ছিল চুঁচুড়ায়। এঁর জীবৎকাল আনুমানিক ১৭২৫ থেকে ১৭৯০ খ্রী। রঘুনাথের দুই পুত্র—মাধবরাম এবং নীলাম্বর। রঘুনাথ দাসের অন্যতম বংশধর ছিলেন নবীনচন্দ্র দাস, যাঁর কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজি শিক্ষা আরম্ভ হয়।[4]

আদি কবিওয়ালাদের ইনি অন্যতম। হরু, রাসু-নৃসিংহ এঁর কাছেই সঙ্গীত শিক্ষা করেন। রঘুকে দাঁড়া কবির স্রষ্টিকর্তা বলা হ'য়ে থাকে। হরু তাঁর গানে রঘুর ভণিতা দিতেন বলে, এঁর গান আলাদা করা কঠিন। বঙ্গভাষার লেখক গ্রন্থে 'ধিক্ ধিক্ ধিক্ তার জীবন যৌবন' গানটিকে বলা হয়েছে রঘুর। ঈশ্বর গুপ্ত একে হরুর গান বলে উদ্ধৃত করেছেন। হরুর বলে উদ্ধৃত রঘুর ভণিতাযুক্ত আর একটি গান 'কদম্বতলে কে গো বংশী বাজায়' বাঙালীর গান এবং বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়ে রঘু-রচিত বলে নির্দিষ্ট হয়েছে। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এই সমস্যা সম্পর্কে বলেন,

The tradition alluded to, however, does not disallow the supposition that the revision of the master might have given an entirely new shape to the novice's composition, and as such, therefore, it is only in the fitness of things that the songs should go in the name of the master. It would be difficult

---

১ কবিওয়ালাদের গীতসংগ্রহ, পৃ ৬৬-৬৭ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হরুর স্বভাব-মাহাত্ম্যের উল্লেখ করেছেন, গুপ্তরত্নোদ্ধার পৃ ১১।

২ বাঙালীর গান পৃ ১৭৭, বঙ্গভাষার লেখক পৃ ৩৮০।

৩ গুপ্তরত্নোদ্ধার পৃ ১১। বঙ্গসাহিত্যপরিচয়ে একে রঘু মুচি বলা হয়েছে।

৪ [illegible] চক্রবর্তী, ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য ([illegible]), পৃ [illegible]।

to dogmatise in the absence of evidence but these songs betray an elabarate structure and exuberance of fancy which some may oonnect with the early work of an ambitious youngester but which on the other hand, may be supposed to bear indications of the master hand. [১]

পৃ ১৪৪। **নবকৃষ্ণ দেব**, (আ: ১৭৩২—১৭৯৭ খ্রী)। এন, এন, ঘোষ প্রণীত Memoirs of Raja Nabakissen Deb Bahadur (1901) গ্রন্থে বিস্তৃত জীবন-কাহিনী দ্রষ্টব্য। ফার্শী জানতেন বলে আকস্মিকভাবে ইনি ক্লাইভের সংস্পর্শে আসেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মুনশী নিযুক্ত হয়ে বিপুল অর্থ উপার্জন করেন। নবকৃষ্ণ কাব্যরসিক এবং গুণগ্রাহী ব্যক্তি ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে ইনি লক্ষ টাকার জমিদারী দিতে চেয়েছিলেন। কবিগানের ঐশ্বর্যের যুগে নবকৃষ্ণই বিশেষ করে এর পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন—

Haru Thakur and Nitai Dass, well known as composers of songs, were his *prote'gis*; and he introduced into Calcutta society and popularised the nautch which Englishmen believe to be the chief of our public amusements. It is *Bai Nautch.* The songs of *Kabis* (কবি) were a favourite entertainment of Hindoo society. ···The full name of Haru Thakur was Hurray Kristo Dhirghangi. He was called a Thakur because he was a Brahmin among Kabis It was in Nabakissen's house that this species of entertainment had its origin, its first exhibition.[২]

মহারাজ নবকৃষ্ণ যে বিরাট আড়ম্বরের সঙ্গে মাতৃশ্রাদ্ধ করেছিলেন, বহুকাল পর্যন্ত তা কিম্বদন্তীতে পরিণত হয়েছিল। ঈশ্বর গুপ্ত যে নগরকীর্তনের উল্লেখ করেছেন, সেটা সম্ভবত: এই উপলক্ষেই।

মহারাজ নবকৃষ্ণ ভ্রাতুষ্পুত্র গোপীমোহনকে দত্তক নেন। তারপর তাঁর নিজের একটি পুত্রসন্তান হয়। তিনিই রাজকৃষ্ণ দেব। অতঃপর নবকৃষ্ণের

---

১ History oi Bengali Literature p 846.

২ N. N. Ghosh, Memoirs of Raja Nabakissen Deb Bahadur p 196.

বিরাট সম্পত্তি বিভক্ত হয়ে যায়। নবকৃষ্ণের মৃত্যুর পরও দীর্ঘকাল শোভা-বাজার রাজবাড়ী কবিগানের পৃষ্ঠপোষক ছিল।

পৃ ১৪৪। **রামশঙ্কর ঘোষ**। "ইনি আরপুলির সুবিখ্যাত ঘোষ বংশজাত। সাধারণতঃ শঙ্কর ঘোষ নামে পরিচিত ছিলেন। ইনি এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা দৈবকিনন্দন ঘোষের পুত্র মনোহর ঘোষের পুত্র ছিলেন। ইনি কাপ্তেনের মুচ্ছুদ্দির কাজ করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং তাহার অধিকাংশ ধর্ম্ম কর্ম্মে ব্যয় করিয়াছিলেন। চোরবাগানের কালীর মন্দির তিনিই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।"[১]

পৃ ১৪৬। **সেকালের আমোদ**। 'নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ঘরে শারদীয়া পূজার সময় নবমী-কীর্ত্তন উপলক্ষে নবমী পূজার দিন মহিষ বলিদানের পর কাদাখেউড়ের সময় স্বয়ং মহারাজ যুবরাজ ও আর আর রাজকুমারদিগকে নিজে নিজে এক একটি স-কার বকারের খেউড় রচনা করিয়া গাইতে হইত এবং কখন কখন ছড়া কাটাকাটি ও উত্তর-প্রত্যুত্তর কথা শুনিতে পাওয়া যায়।'[২]

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রই এই শ্রেণীর আমোদের প্রবর্তক—এ-কথা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেছেন। নবকৃষ্ণ দেব এর একজন উৎসাহী রসিক ছিলেন—"এই প্রকারে দুই শত বৎসর অতিবাহিত হইলে সাধারণের মন অজ্ঞান, দৌর্ব্বল্য ও পরাধীনতায় নিমগ্ন হইলে তাহাদের কৌতুক কলাপের পরিবর্ত্তন হয়। সেই পরিবর্ত্তনের আদি কারণ নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়। তিনি সুচতুর ও সুপণ্ডিত ছিলেন ও তাঁহার নিকট গুণিগণের প্রচুর সমাদর ছিল; কিন্তু লাম্পট্যদোষে তাঁহার সে সমুদয় গুণগরিমা কলুষিত হইয়াছিল।

...দেশের কোন অত্যন্ত ধনী ও ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির দৃষ্টান্তে অনেক মন্দ ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারে; কিন্তু তাহার খ্যাতি হ্রাস হইলে ও জ্ঞানা-লোকের কিঞ্চিন্মাত্র ব্যাপ্তি হইলে অবশ্যই সে ব্যবহার দূষ্যবোধে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের প্রচালিত কবি ও খেউড় সে দশা শীঘ্র প্রাপ্ত হয় নাই। কলিকাতার সুবিখ্যাত রাজা নবকৃষ্ণ ও তৎপর কতক জন ধনাঢ্য

---

১ হরিহর শেঠ, প্রাচীন কলিকাতা পরিচয় (১৯৫২), পৃ ৫১১।

২ বিশ্বকোষ, 'কবি'।

ব্যক্তি ঐ কদর্য্য বিনোদের উৎসাহী হন। তাঁহাদিগের অপসৃতির পর গত বিংশতি বৎসরের মধ্যে কবির হ্রাস হইয়াছে।"[১]

পৃ ১৪৭। **হরুর শিষ্যবৃন্দ**। "একমাত্র তাঁহার (নবকৃষ্ণ দেব) উৎসাহে তৎকালে কবিগানের এতদূর সমাদর হইয়াছিল। উক্ত রাজার পরলোকগমনে হরু ঠাকুর বিষাদকাতরতা প্রযুক্ত কবির দল পরিত্যাগ করেন। নিত্যানন্দ বৈরাগী প্রভৃতি কিছু নিজ দল রাখিয়া লোকের মনোরঞ্জন করেন। পরে হরু ঠাকুরের আদেশানুসারে তাঁহার শিষ্য নীলু ঠাকুর, রামপ্রসাদ ঠাকুর ও ভোলানাথ ময়রা দল করিলেন। নীলু ও রামপ্রসাদ দুই সহোদরের একটী দল আর ভোলানাথ ময়রার আর একটী দল। ইহারা সকলে হরু ঠাকুরের রচিত গান গাইতেন। হরু ঠাকুরের সহিত নীলু রামপ্রসাদের কিঞ্চিৎ মনান্তর হওয়ায় নীলু রামপ্রসাদ অন্যের রচিত গান শ্রবণ করাইয়া শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। এমন কি পরিশেষে নীলু রামপ্রসাদের যত্নেই প্রসিদ্ধ ওস্তাদী দল বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়া উঠিল। ভোলানাথ ময়রা কিছুকাল হরু ঠাকুরের রচিত গান গাইতেন, পরে রামসুন্দর রায় প্রভৃতি এই দলের গান রচনা করিতে লাগিলেন। এই দলটীও ক্রমে ক্রমে উৎকৃষ্ট ওস্তাদী দল বলিয়া পরিগণিত হইল।…কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবনে নীলু-রামপ্রসাদের সহিত ভোলানাথ ময়রার প্রথম সংগীতসমর হয়।"[২]

হরু ঠাকুরের সঙ্গে নীলু-রামপ্রসাদের 'মনান্তর' হওয়ার কারণ ঈশ্বর গুপ্ত সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন। ভোলাকে হরু বেশী ভালোবাসতেন বলে নীলু এবং ভবানী হরুর সঙ্গ ত্যাগ করে আলাদা দল গঠন করলেন। সুযোগ পেলে এঁরা হরুকে আক্রমণ তো করতেনই, হরুর প্রিয়পাত্র বলে ভোলাকেও আক্রমণ করতেন।

ভোলার সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে তথ্য নির্ণয় করা কঠিন। ভোলার গান থেকে জানা যায় তাঁর বাড়ী ছিল বলে বাগবাজারে—

আমি ময়রা ভোলা ভিঁয়াই খোলা
সর্দ্দি গর্মি নাহি মানি (ওগো)

---

১ বিবিধার্থসংগ্রহ, ১৭৮০ শক মাঘ. পৃ ২৩৪-২৩৫। নূতন গ্রন্থের সমালোচনা। মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিত।

২ গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাচীন কবিসংগ্রহ (১ম খণ্ড) পৃ ৵০—৶০

ফুরাইলে বারো মাস ষড় ঋতুর হয় নাশ
কেবল এই কথাটা জানি (ওগো) ॥
শীত এলে লেপ লই গর্মি এলে ঘোল মই
যাহা কিছু হাতে আসে 'কবির নেশায়' দিই ঢালি
কালো মেঘে বর্ষাকালে বক উড়ে দলে দলে
ময়ূরের প্যাখম বাহার ॥
নহি কবি কালিদাস (বাগবাজারে করি বাস)
পূজা এলে পুরী মিঠাই ভাজি।
বসন্তের কুহু শুনে ভক্তির চন্দন সনে
মনফুল রামচরণে করি রাজি।
শরতে হেমন্তে বৈশাখে বসন্তে
ভোলার খোলা নাহি খালি।
ষড় ঋতু বারো মাসে মাঘের মেঘের শেষে
পেটের দায়ে জাতির ব্যাপার
তবে যদি কবি পাই ইটে কভু নাহি যাই
হোক ব্যাটা যতই মন্দ।
জাহাজ ডোঙ্গা সোলা নাও
যাহাতে মিলাইয়া দাও
ভোলা নহে কিছুতেই জব্দ ॥[১]

—কেউ বলেন গুপ্তীপাড়ায় তাঁর জন্ম। তাঁর বিবাহ ত্রিবেণীতে। পিতার নাম কৃপারাম। বাগবাজারে সত্যই তাঁর ময়রার দোকান ছিল। ভোলা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। অনেকদিন পর্যন্ত নিজের ব্যবসায় চালাতেন। কবিওয়ালাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা হলে নিজে কবির দল নিয়ে গান করে বেড়াতেন। তখনও তাঁর পিতা জীবিত। সেই সময় ভোলার পিতা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা হৃদয়ই দোকান চালাতেন। পিতার মৃত্যুর পর হৃদয় তালতলায় স্বতন্ত্র দোকান করেন বলে শোনা যায়।

ভোলা একেবারে নিরক্ষর ছিলেন না। ফার্শী সংস্কৃত হিন্দি ভাষাতেও

---

১ নব্যভারত, ১৩১৪ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৬৭-৬৮।

তাঁর কিছু কিছু ব্যুৎপত্তি ছিল।[১] ভোলা পরে পৃথক দল তৈরী করলেও অনেক দিন পর্যন্ত হরুর থেকে তিনি গান নিয়েছেন। ভোলার নিজের রচনা বিশেষ পাওয়া যায় না। ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল তিনটি গান উদ্ধৃত করেছেন,

আমি ময়রা ভোলা ভিঁয়াই খোলা, ময়রাই বারোমাস
জাতি পাতি নাহি মানি (ওগো) কৃষ্ণপদে বাস।···

এবং

পানকে তাম্বুল বলে পর্ণ সাধু ভাষা
বুরুজে বিরাজ করে চাষার বড় আশা।।···

এবং

বামুণ বলে আমি বড় কায়েৎ বলে দাস
বদ্দি বলে ক্ষত্রি আমি (ঢাকা জেলায় বাস)···

"বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন—"বাঙ্গালা দেশের সমাজকে সজীব রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে রামগোপাল ঘোষের ন্যায় বক্তা হুতুম পেঁচার ন্যায় লেখক এবং ভোলা ময়রার ন্যায় কবিওয়ালার প্রাদুর্ভাব হওয়া বড়ই আবশ্যক।" শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও ভোলার গানের বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন। ভোলার কথা উঠিলেই তিনি বলিতেন—Bhola's exodus।"[২]

সাতু রায়, গদাধর মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য ভোলার দলে বাঁধনদার ছিলেন। ৭৩ বৎসর বয়সে এঁর মৃত্যু হয়। বাঙ্গালীর গানে এঁর একটি গান উদ্ধৃত আছে—'চিন্তা নাই চিন্তামণির বিরহ।[৩]

রাম বসুর সঙ্গে হরুর প্রথম দিকে ঠিক কি রকম সম্পর্ক ছিল জানা যায় না। নবকৃষ্ণ দেবের মৃত্যুর পর হরু যখন দল পরিত্যাগ করলেন, তখন রাম বসুর বয়স দশ বৎসর। কিন্তু রাম বসু বোধ হয় হরুর প্রতি একটু ঈর্ষাই পোষণ করতেন। শোভাবাজার রাজবাড়িতে যে সব কবিগান হত

---

১ ভারতী, ১৩০৪, বৈশাখ পৃ ৫৯-৬৬, গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী, 'ভোলা ময়রা।' ভোলা ময়রার আরও কিছু বিবরণ পাওয়া যাবে সাহিত্যসংহিতা, ১৩১১। ধর্মানন্দ মহাভারতী লিখিত 'ভোলা ময়রা'।

২ নব্যভারত, ১৩১৪, জ্যৈষ্ঠ পৃ৭০।

৩ বাঙ্গালীর গান, পৃ ১৮৫। গুপ্তরত্নোদ্ধারে (পৃ ২৮৩) গানটির রচয়িতা কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য।

হরু তার শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করতেন। এই রকম একটি বিচারসভায় হরু রাম বসুর পরাজয় সাব্যস্ত করলে রাম বসু রুষ্ট হয়ে গান করেন—

ঠাকুর বাঁচবেন না আর বিস্তর দিন।
তোমার চক্রে ধরেছে পোকা, স্বর্ণরেখা অতি ক্ষীণ॥

শোনা যায় হরু এতে অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে রাম বসুকে ভর্ৎসনা করতে করতে আসর ত্যাগ করেন।

একবার ভোলা ময়রার সঙ্গে নীলু ঠাকুরের কবির লড়াই হয়। তাতে নীলু ভোলাকে লক্ষ্য করে এই গানটি গায়—

সকল ভণ্ড কাণ্ড ভোলা তোর,
তুই পাষণ্ড নচ্ছার।
ভজিস ঢেঁকি বলিস কিনা গৌর অবতার।
কি সে করিস দ্বেষ, নাই ঘটে বুদ্ধি লেশ,
বুঝিস না সূক্ষ্ম ও মূর্খ, দিস্ কোন ঠাকুরের ঠেস?
তুই কাঠের ঠাকুর টাটে তুলে মিছে করিস পচা ভুর।
সেই হরি কি তোর হরু ঠাকুর।
যিনি বাম করেতে গিরি ধ'রে রক্ষা করেন ব্রজপুর,
যিনি অভয় চরণ শিরে ধরে জীব তরাচ্ছেন গয়াসুর
যে রজক ছেদন করে করে ধ্বংস করলে কংসাসুর
সেই হরি কি তোর হরু ঠাকুর?

স্পষ্টতঃই এই খেউড়টিতে হরু ঠাকুরকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, গানটি রচনা করেছিলেন রাম বসু। আবার কেউ বলেন, নীলু ঠাকুরই রচনা করেছিলেন, মহিমাযুক্ত করবার জন্য রাম বসুর নাম দেওয়া হয়েছে মাত্র।[১] ভোলা এই আক্রমণের কোনো উত্তর না দিলেও নীলু পাল্টা গেয়েছিলেন—

এখন বুঝলি তো এই হরু নয়
সেই হরি সারাৎসার
পূর্ণ ব্রহ্ম সেই হরি
ইনি প্রকাণ্ড অসার।

---

১ জন্মভূমি ১৩০৩, পৃ ২৭৬-২৭৭ এবং অনাথকৃষ্ণ দেব, বঙ্গের কবিতা পৃ ৩০৪-৩০৫।

পৃ ১৪৭। **রামজীদাস**। "of the last disciple of Gomjla Ramji Das nothing absolutely is known except that Bhabani Banik (as well as Nitai Das) was his disciple ; and no work of his has survived. Only one song, however, which is often attributed to Nitai bears the bhanita of Ramji Das."[১] গানটি এই—

সে কেন রাধারে কলঙ্কিনী কোরে রাখিলে
বুঝিতে নারি সখি, শ্যামের এ লীলে।
দ্বারকা হইতে আসি শ্রীহরি,
দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারিলে ॥[২]

অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত গীতরত্নমালা (১ম ভাগ)-এ রামজীর কলঙ্কভঞ্জন ও ঠাকুরাণীর বিষয়ক দু'টি গান সঙ্কলিত আছে।[৩]

পৃ ১৪৮। **কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য**। কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্যের নিজের কবির দল ছিল না। তিনি ছিলেন বাঁধনদার। বেতনভোগী বাঁধনদাররূপে ইনি জীবিকা অর্জন করতেন। মাথুর গান রচনায় বিশেষ খ্যাতি পেয়েছিলেন। নীলু ঠাকুরের দলে কৃষ্ণমোহন বহু গান রচনা করেছিলেন। হরুর দল ত্যাগ করে নীলু যাঁদের কাছে গান নিতেন, কৃষ্ণমোহন তাঁদের অন্যতম। প্রীতিগীতিতে সংকলিত কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য এবং গদাধর মুখোপাধ্যায়ের অধিকাংশ গানই নীলু-রামপ্রসাদের দলে গীত। কৃষ্ণমোহনের এই গানটি অধিকাংশ সংকলনে দেখা যায়—

কও কথা বদন তোলো হও সদয় এই ভিক্ষা চাই।
রাধার অধৈর্য্যে, এলেম অপার্য্যে,
তোমার কংশরাজ্যে অংশলোভে আসি নাই।[৪]

গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাচীন কবিসংগ্রহে কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্যের অনেকগুলি গান উদ্ধৃত আছে।

১, De, Bengali Literature p. 347.

২ সম্পূর্ণ গানটি গুপ্ত রত্নোদ্ধার পৃ ১৮৪, কবিওয়ালাদিগের গীতসংগ্রহ পৃ ১১৬ উদ্ধৃত।

৩ গীতরত্নমালা (১ম) পৃ. ৫৭১ এবং ৯৫৫।

৪ গুপ্তরত্নোদ্ধার পৃ ২১০ কবিওয়ালাদিগের গীতসংগ্রহ, পৃ ১৩১।

পৃ ১৪৮। **গৌর কবিরাজ, রামসুন্দর রায়।** দু'জনেই কবির দলে বাঁধনদার ছিলেন। গৌর কবিরাজ উৎকৃষ্ট বিরহ রচনা করতে পারতেন। এঁর নিবাস ছিল শিমুলিয়া। নিত্যানন্দ বৈরাগীর দলে গাওয়া একটি গান,

হায় কাননে অনলো লাগিলে যেমন
কীট পতঙ্গাদি হয়ো জ্বালাতন।[১]

রামসুন্দর রায়ের দুটি গান গীতরত্নমালায় (১ম ভাগ) উদ্ধৃত হয়েছে। দুটিই বলরাম বৈষ্ণবের দলে গাওয়া, দুটিই সখীসংবাদ।[২] রামসুন্দর কায়স্থ-কুলোদ্ভব ছিলেন, কলকাতার ডিঙ্গেভাঙ্গায় বাস করতেন। ঈশ্বর গুপ্তের মতে রাম বসু এবং রামসুন্দর রায় 'উভয়েই প্রায় তুল্য কবি ছিলেন, কবিতাকল্পে উভয়েরি অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে।' রামসুন্দর রায় নীলু ঠাকুরের দলে খেউড় রচনা করে হরু ঠাকুরকে আক্রমণ করেছিলেন। 'সেই হরি কি তোর হরু ঠাকুর' পদটি রামসুন্দরের রচনা বলে ঈশ্বর গুপ্ত উল্লেখ করেছেন। রামসুন্দর রাম বসুকেও আক্রমণ করেছিলেন,

আকড়া সাজায়েছ ভালো, মাকড়া রাম বাউল
দিয়ে এড়ুয়া বেঁকি নূপুর পায়, ভেড়ুয়া যেন নেচে যায়
মেড়ুয়ারাদির মত ওটার মাথা ভরা কোঁকড়া চুল।

১ প্রীতিগীতি পৃ ২/০

২ অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়, গীতরত্নমালা (১ম) পৃ ৫৮৩ এবং ৫৮৬।

নিত্যানন্দদাস বৈরাগী

(১৭৫১—১৮২১ খ্রী)

নিত্যানন্দের জন্ম ফরাসডাঙ্গায় ইংরেজাধিকৃত চন্দননগরে। নিত্যানন্দ সৎ শূদ্র ছিলেন। তাঁর উর্ধ্বতন তৃতীয় কি চতুর্থ পুরুষ ভেক নিয়ে বৈষ্ণব হন।

পাঠশালায় নিতাইয়ের শিক্ষা হয় নি। তাঁদের অবস্থা বিশেষ সচ্ছল ছিল না। বাল্যকাল থেকেই গান বাজনায় নিতাইয়ের অনুরাগ ছিল বলে শোনা যায়। পিতার কাছে যে সামান্য লেখাপড়া শিখেছিলেন, তাতে গানের বই সংগ্রহ করে নকল করে এবং আবৃত্তি করে সঙ্গীত-পিপাসা চরিতার্থ করতেন। তারপর একদিন নিতাই কলিকাতায় চলে এসে নীলু ঠাকুরের দলে যোগ দিলেন। সেই সময় নীলু ঠাকুরের দল প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছিল। নীলুর দলে তখন দু'জন বাঁধনদার—গোর কবিরাজ ও নবাই ঠাকুর। প্রায় সব কবির দলেই তখন একজন কি দু'জন বাঁধনদার থাকত। একদল গান গেয়ে নীরব হলে অন্য দল তৎক্ষণাৎ গান তৈরী করে গাইতে আরম্ভ করে। এই দ্বিতীয় দলেই বাঁধনদার অধিকারীর বা আচার্যের কাজ করত।

নীলু ঠাকুরের দলে কিছুদিন গান গেয়ে নিতাই দাস যখন পরিচিত হলেন, তখন নিজেই এক আলাদা কবির দল করলেন। নিতাই নিজে ভালো গান রচনা করতে পারতেন না। নীলু ঠাকুরের বাঁধনদার গোর কবিরাজ এবং নবাই ঠাকুর নিতাইয়ের দলেও গান বাঁধতেন। নিতাইদাস ভালো ঢোল বাজাতে পারতেন। ফরাসডাঙ্গার রাম বাইতির পুত্র মোহন বাইতি নিত্যানন্দের ঢোল বাজাত। 'নিত্যানন্দ যখন গান গাহিতে গাহিতে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিতেন তখন মোহনের স্কন্ধ হইতে ঢোল লইয়া নিজেই অভিনব নৃত্যের সহিত তালে তালে বাজাইতে থাকিতেন।"[১] 'বঙ্গভাষার লেখক'এর গ্রন্থকার বলেছেন, নিতাইয়ের আড়ি এবং তেহাই সকলকে মুগ্ধ করত। বোধহয় ভুল করেই হরিমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, নিতাই যেমন বাঁধনদার ছিলেন, তেমনি ছিলেন বাজনদার।[২] ঈশ্বর গুপ্ত ছাড়াও 'কবি-ওয়ালাদিগের গীতসংগ্রহে'ও বলা হয়েছে "কিন্তু তাঁর স্বরমাধুরিই এই প্রতিপত্তির

১ নব্যভারত, ১৩১২ জ্যৈষ্ঠ।

২ বঙ্গভাষার লেখক পৃ ৩৬৯।

নিদান। নিত্যানন্দ যাদৃশ সুগায়ক ও সদ্‌বক্তা ছিলেন, গান রচনায় তাদৃশ পটু ছিলেন না। গৌর কবিরাজ ও নবাই ঠাকুর ইঁহার দলে গান দিতেন; এই দুই ব্যক্তি গান রচনায় নিতান্ত মন্দ ছিলেন না—মধ্যে মধ্যে বিলক্ষণ সুরস পূরিত বাক্যচ্ছটা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমাদের ইচ্ছা ছিল নিতাই দাসের নাম শিরাঙ্কিত না করিয়া রচয়িতাগণের নাম দিয়া গানগুলি মুদ্রিত করিব। এইরূপ করিলে সংগ্রহের সার্থকতা হইত। কিন্তু বিস্তর চেষ্টা করিলেও কোন্ গানটি কাহার রহিত [রচিত] নির্ব্বাচন করা কঠিন হইল; সুতরাং নিত্যানন্দের রচিত না হইলেও তাঁহার দলে গীত হইত, এই অনুরোধে শিরোভাগে তাঁহারই নাম যুক্ত হইল।[১] নিত্যানন্দ বৈরাগীর স্থান কবিওয়ালার ইতিহাসে একটু স্বতন্ত্র। কারণ তিনি ঠিক সঙ্গীত রচনা করেন নি। সেইজন্য তাঁর গানের সাহিত্যিক বিচার প্রকারান্তরে গৌর কবিরাজ এবং নবাই ঠাকুরের সঙ্গীতেরই বিচার।

রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন "নিতাই দাস বৈরাগী এক স্থানে বলিয়াছেন—

বিধি একচিতে, ভাবিতে ভাবিতে
এ তিন অক্ষর করিল সংযোগ
রসিকের সুখ আশ্রয়।

সে তিন অক্ষর পি. রি. তি। যে ব্যক্তি এই কবিতাটি উক্ত করিয়াছেন, তিনি বিশুদ্ধ প্রেমের মহত্ত্ব ও দেবভাব অবশ্যই পরিজ্ঞাত ছিলেন। এ কবিতাটি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংগ্রহে নাই; কোন লোকের মুখে পাইয়াছি।"[২]

নিত্যানন্দ "চুচুড়ায় একটি আখড়া এবং চন্দননগরে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই মন্দিরে বিশেষ জাকজমক সহকারে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উৎসবাদি হইত।'[৩]

নিতাইয়ের মৃত্যুসাল কবিওয়ালাদের গীতসংগ্রহে দেওয়া হয়েছে ১২২০ বঙ্গাব্দ। বাঙ্গালীর গান-এ ঐ তারিখ ১২২৫ বঙ্গাব্দ।

---

১ কবিওয়ালাদিগের গীতসংগ্রহ পৃ ১০৯—১১০

২ সেকাল আর একাল (পরিষৎ সং) পৃ ১৯।

৩ হরিহর শেঠ, 'চন্দননগরে কথক কবিওয়ালা ও যাত্রা' প্রবাসী ১৩৩১ মাঘ পৃ ৫০৮।

রাম বসু

(১৭৮৬—১৮২৮ খ্রী)

হরিমোহন মুখোপাধ্যায় এবং গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে রাম বসুর প্রকৃত নাম রামচন্দ্র বসু। ঈশ্বর গুপ্ত এবং আরও অনেকেই তাঁর নাম রামমোহন বসু বলেই উল্লেখ করেছেন। সম্ভবতঃ ঈশ্বর গুপ্তই ঠিক। ব্রজসুন্দর সান্যাল লিখেছেন[১] হাওড়ার ব্যাটরাতে প্রসিদ্ধ পাঁচালীকার ঠাকুরদাস দত্তের পিতা রামমোহন দত্তের সঙ্গে রাম বসুর বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। নামসাদৃশ্যের জন্য উভয়ে উভয়কে 'মিতা' বলে সম্বোধন করতেন। প্রথমে রাম বসু পেশাদারী দল করেন নি, রামমোহন দত্তের প্ররোচনা ও উদ্যোগেই রাম বসু দল গঠন করেন।

ঈশ্বর গুপ্ত রাম বসুর পিতার উল্লেখ করেন নি। গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় পিতার নাম লিখেছেন জয়নারায়ণ বসু। ব্রজসুন্দর সান্যালের মতে পিতার নাম রবিলোচন।[২] রামবসুর মার নাম নিস্তারিণী। রাম বসুর অনুজ কৃষ্ণমোহন শৈশবেই মারা যায়। পাঁচ বৎসর বয়স থেকেই রাম বসুর কবিত্ব-স্ফূর্তি হয়। কিন্তু পিতার ইচ্ছা, তিনি কোনো ভদ্র পেশা অবলম্বন করেন। সৎ সংসর্গে মানুষ হয়ে উঠবার জন্য পুত্রকে তিনি কলকাতায় পাঠান। এই সময়ে কি করে ভবানী বেণে তাঁর কাছ থেকে গান সংগ্রহ করতেন, ঈশ্বর গুপ্ত তার বর্ণনা করেছেন। ভবানী প্রথমে নাকি রাম বসুর সহাধ্যায়ীদের শরণ নিয়েছিলেন গান সংগ্রহ করতে। তারপর ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ের পর রাম বসু ভবানীর দলে একদিন গান করেন। এতে রবিলোচন অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হন। পিতার তিরস্কারে তিনি কবির দলে গান করা স্থগিত রেখে পড়াশুনায় মন দিলেন। কিছু ইংরেজিও শিখেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর উপস্থিত দায় থেকে মুক্ত হবার জন্য তিনি কিছুদিন কেরানীর কাজও করেছিলেন। কিন্তু বেশী দিন এই কাজে লিপ্ত থাকতে পারলেন না।

---

১ নব্যভারত, ১৩১২ শ্রাবণ, পৃ ১৯৭।

২ নব্যভারত, ১৩১১, পৌষ। লেখক প্রথমে রাম বসুর পিতার নাম রামলোচন লিখলেও অতঃপর আগাগোড়াই উল্লেখ করেছেন রবিলোচন বলে। সাহিত্যসংহিতা (১৩১৪, আষাঢ়) এর প্রবন্ধেও 'রবিলোচন' বলেই উল্লিখিত।

ঠাকুরদাস দত্তের পিতা রামমোহন দত্তের আগ্রহে ও উৎসাহে তিনি গান রচনায় প্রবৃত্ত হলেন। প্রথমে তিনি কবির দলে শুধু গানই লিখে দিতেন, পরে নিজেই দল গঠন করলেন।

রাম বসুর ব্যক্তিগত জীবনের কথা আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। কিংবদন্তী এই যে রাম বসু যজ্ঞেশ্বরী নামে একজনকে ভালোবাসতেন। ঈশ্বর গুপ্ত রাম বসুর জীবনের এই ঘটনার কোনো উল্লেখ করেন নি কিন্তু একটি গানের প্রসঙ্গে রাম বসুর নবানুরাগের ইঙ্গিত দিয়েছেন।[১] তবে কবির প্রেমিকা যজ্ঞেশ্বরীকেই উদ্দেশ করে এই গান রচনা করেছিলেন কিনা, জোর করে বলবার উপায় নেই। যজ্ঞেশ্বরী নিজেও কবিওয়ালা ছিলেন। নীলু ঠাকুরের দলে তাঁর গান অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে গাওয়া হোত। যজ্ঞেশ্বরীর একটি গান,

কর্মক্রমে আশ্রমে সখা
হলে যদি অধিষ্ঠান
হেরে মুখ, গেল দুখ,
দুটো কথার কথা বলি প্রাণ॥
এখন ক্ষান্ত হলে হে ক্রমে ক্রমে
দিয়ে জলাঞ্জলি এ আশ্রমে।[২]

রাম বসুর ব্যক্তিগত নৈতিক চরিত্র সম্পূর্ণ নির্মল বোধহয় ছিল না। নীচের উদ্ধৃতিই তার প্রমাণ—

"রাম বসুর উপর প্রাচীন লোকদিগের যে প্রকার শ্রদ্ধা আছে, তাহাতে তাঁহার রচনার প্রতি বিরোধি অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে আমাদিগের কেবল উপহাসাস্পদ হইবার সম্ভাবনা। তবে তাঁহার চরিত্রগত দোষের উল্লেখ করিলে তাদৃশ ক্ষতি নাই যেহেতু রাম বসুর বিরহ ভক্ত প্রাচীন মহাশয়েরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন যুবকগণ বেশ্যালয়ে না যাইলে ভব্যতা শিখিতে

১ ২৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২ সম্পূর্ণ গান বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ১৫৬১-তে উদ্ধৃত।

পারে না। সে যাছা [যাহা] হউক রাম বসুর সমকল [কাল?] জাত ব্যক্তিদিগের প্রবৃত্তি বিবেচনা করিলে,

"ঘরের ধনে ফেলে প্রাণ পরের ধনকে আগুলে বেড়াও ॥

নাহি জান ঘর বাসা, কি বসন্ত, কি বরষা, সতীকে কোরে নিরাশা, অসতীর আশা পূরায়!"

প্রভৃতি গান রচনার জন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না।"[১]

রাম বসুর কোনো কোনো গান অন্যের নামে চলে এসেছে বলে কেউ কেউ মনে করেন।

একি অকস্মাৎ ব্রজে বজ্রাঘাত
কে আনিল রথ গোকুলে?

—এই গানটি ঈশ্বর গুপ্তের মতে হরু ঠাকুরের। আবার অন্যের গানও রাম বসুর নামে প্রচলিত, এ রকম দৃষ্টান্তও আছে, যেমন—

'বালিকা ছিলাম, ছিলাম—ভাল ছিলাম'

—এই গানটি মহেশ কাণা নামক একজন পরবর্তী কবিওয়ালার।[২] মহেশ নামে দু'জন কবিওয়ালা ছিলেন, মহেশ ঘোষ এবং মহেশ চক্রবর্তী। জন্মান্ধ ছিলেন বলে মহেশ ঘোষ কাণা নামে পরিচিত ছিলেন। এঁর জন্ম ১২১০ সালে বারাশতে মহেশপুর গ্রামে। তিনি ছাতুবাবুর আশ্রিত ছিলেন।[৩]

রাম বসুর পূর্ব্বে কবিগানে উপস্থিত উত্তর-প্রত্যুত্তরের রীতি ছিল না। প্রতিযোগী দল পূর্ব্বে পারস্পরিক আলোচনায় উত্তর প্রস্তুত করে আসরের জন্য তৈরী হতেন। রাম বসুই আসরে বসে উপস্থিত উত্তর-প্রত্যুত্তরের রীতি প্রচলিত করেন।

পৃ ২১০। **ভবানী বেণে**। ভবানী রাম বসুর অপেক্ষা বয়সে বড়ো হলেও রাম বসুর রচিত অনেক গানই তিনি নিজের দলে গেয়েছিলেন। বস্তুতঃ ভবানী বেণেই রাম বসুকে দল গড়বার জন্য আকৃষ্ট করেন বলা যেতে পারে। বর্ধমান জেলার অম্বিকা কালনার নিকট সাতগেছে গ্রামে ভবানীর জন্ম

---

১ কবিওয়ালাদিগের গীতসংগ্রহ, পৃ ১-২। এই সঙ্গীতাংশটি রাম বসুর রচিত কিনা সন্দেহ। এটি গুপ্তরত্নোদ্ধারে (পৃ ২৭০) বাঙ্গালীর গানে (পৃ ১৮৬) এবং প্রাচীন কবিসংগ্রহে (পৃ ১০৩) যজ্ঞেশ্বরীর পূর্ব্বোল্লিখিত গানেরই মহড়া। পূর্ব্বোক্ত 'বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে' এই মহড়াটি নেই।

২ জন্মভূমি, ১৩০৩, পৃ ২৭৮।

৩ নব্যভারত, ১৩১৩ শ্রাবণ, পৃ ২০৩।

হয়। জাতিতে গন্ধবণিক। পরে সাতগেছে ত্যাগ করে ভবানী চলে আসেন বরাহনগরে। সেইজন্য তাঁর জন্মস্থান নিয়ে কিছু মতভেদ আছে। ভবানী নিজে গান রচনা করতে পারতেন, ভালো গাইতেও পারতেন।[১] তিনি প্রথমতঃ হরু ঠাকুরের দলে ছিলেন। হরু ভোলা ময়রাকে বেশি ভালোবাসতেন বলে ক্রমে ভবানী বণিক্ এবং নীলু ঠাকুর হরুকে ত্যাগ করে চলে যান। ভবানী অতঃপর রামজির থেকেই গান নিতে থাকেন। রামজির শিষ্য বলেই তিনি পরিচিত। পরে তিনি রাম বসুর থেকে গান নিতেন। নিত্যানন্দ বৈরাগী এবং ভবানী বণিকের মধ্যে সঙ্গীত-প্রতিযোগিতার বিবরণ ঈশ্বর গুপ্ত দিয়েছেন নিত্যানন্দের জীবনীতে। ভবানীর একটি গানের অংশ[২]—

একবার কুঞ্জবনে কৃষ্ণ বলে ডাকরে কোকিলে।
মধুর কুহুধ্বনি শুনে তাপিত প্রাণ জুড়াবে গোপীগণে,
নীরব হয়ে বসে কেন রইলি তমাল তলে ॥

ভবানী দীর্ঘজীবী ছিলেন—প্রায় সত্তর-পঁচাত্তর বৎসর বেঁচে ছিলেন।[৩]

পৃ ২১০। **নালু ঠাকুর**। সম্পূর্ণ নাম নীলু চক্রবর্ত্তী। রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী এঁর বড়ো ভাই। হরুর দল ছেড়ে নীলু যখন আলাদা দল গঠন করেন, তখন রামপ্রসাদ দলের টাকা কড়ির ভার নিয়ে থাকতেন। এদের দলের নামই নীলু-রামপ্রসাদের দল। কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য, গদাধর মুখোপাধ্যায়, রাম বসু, গৌর কবিরাজ ও রামসুন্দর রায়ের থেকে গান নিয়ে নীলু গুরুর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। নীলু রামপ্রসাদের দল ওস্তাদী দল বলে বিখ্যাত হয়েছিল। নীলু নিজে গান রচনা করতে কতদূর পারতেন বলা যায় না। তাঁর একটি গান—'বাঞ্ছা ফলদাত্রী, ভূধাত্রী, ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্রী আপনি।'[৪]

প্রায় ষাট বৎসর বয়সে ১৮২৫ এর নভেম্বর মাসে নীলু ঠাকুরের মৃত্যু হয়। সংবাদ 'তিমির নাশক'-এ এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল—

"মৃত্যু॥ শুনা গেল যে ২৬ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার শিমুল্যা নিবাসি নীলুঠাকুর অর্থাৎ নীলু রামপ্রসাদ দুই ভাই কবিওয়ালা খ্যাত লোক তাহার মধ্যে নীলু ঠাকুরের ঐ দিবস ওলাউঠা রোগে মৃত্যু হইয়াছে এই ব্যক্তির মৃত্যু-

---

১ নব্যভারত, ১৩১২ জ্যৈষ্ঠ পৃ ১০৭।

২ সম্পূর্ণ গানটি বঙ্গভাষার লেখক, ৩৮২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৩ প্রীতিগীতি, অবতরণিকা পৃ ১৸৶০।

৪ গুপ্তরত্নোদ্ধার, পৃ ৩৪-৩৬।

সংবাদে অনেকের মহাদুঃখ বোধ হইয়াছে যেহেতুক নীলু রামপ্রসাদ কবিওয়ালার মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন ইহারা কবিতা গান দ্বারা এ প্রদেশস্থ লোকেরদিগের অতিশয় সুখী করিতেন ইহাঁরদিগের দুই ভ্রাতার মধ্যে রামপ্রসাদ সংপ্রতি গান ত্যাগ করিয়াছিলেন তথাচ নীলু ঠাকুর সেই দল বল করিয়া ঐ গান করিতেন এক্ষণে ইহার কাল হওয়াতে সে সুখের ব্যাঘাত হইল সুতরাং অনেকের দুঃখ বোধ হইতে পারে।"[১]

সম্ভবতঃ অনুজের মৃত্যুর পর রামপ্রসাদ আবার গান রচনা করতেন। অনেকদিন তিনি দল চালিয়েছিলেন। রামপ্রসাদ প্রায় আশি-বিরাশি বৎসর বয়সে মারা যান। (পরে দ্রষ্টব্য)

পৃ২১০। **মোহন সরকার**। "নিতায়ের স্বজাতীয় আর একজন কবিওয়ালা ছিলেন, তাঁহার নাম মোহনদাস বৈরাগী। ইহাকে লোকে মোহন সরকার বলিয়াও অভিহিত করিতেন। যশোহর জেলায় বনগ্রামের নিকটবর্ত্তী গোপালনগর গ্রামে মোহনের জন্ম হয়। ইহাঁর 'ছুট' সঙ্গীতগুলি অতি মনোহর কাব্যরসে ভরপুর।"[২]

পৃ২১০। **ঠাকুরদাস সিংহ**। ঠাকুরদাস নামে তিনজন কবিওয়ালা ছিলেন, ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী, ঠাকুরদাস দত্ত, ঠাকুরদাস সিংহ।[৩] ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল লিখেছেন, ঠাকুরদাস দত্তের পিতার সঙ্গে রাম বসুর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে ঠাকুরদাস দত্তের জীবনী আছে; কিন্তু তাতে রাম বসুর কোনো উল্লেখ নেই। ঠাকুরদাস দত্তের জন্ম ১২০৭ অথবা ১২০৮ সালে এবং মৃত্যু ১২৮৩ সালে। ঠাকুরদাস দত্তের পিতার সঙ্গে রাম বসুর বন্ধুত্ব সম্ভব। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তও কোথাও এর উল্লেখ করেননি বরং ঠাকুরদাস সিংহের সঙ্গেই রাম বসুর সহযোগিতার উল্লেখ করেছেন। ব্রজ সুন্দর সান্ন্যাল বলেন, রামমোহন দত্তের মৃত্যুর পর রাম বসু "বন্ধুর উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ মধ্যে মধ্যে তৎপুত্রের দলে যাইয়া গান করিতেন। এইরূপ একদা ঠাকুর দাসের দলে গাহিতে গাহিতে রাম বসু আণ্টুনিকে বলিয়াছিলেন,

বল হে অ্যাটুনি আমি একটি কথা জানতে চাই,
এসে এ দেশে এ বেশে তোমার গায়ে কেন কুর্ত্তি নাই।[৪]

১ সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম খণ্ড, ৩য় সং) পৃ ১৪৩।

২ নব্যভারত, ১৩১২ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ১০৮-১০৯।

৩ নব্যভারত ১৩১২ চৈত্রে ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল তিনজনের আলোচনা করেছেন।

৪ নব্যভারত ১৩১২, শ্রাবণ, পৃ ১৯৭। ঠাকুরদাস দত্ত কবির দল করেন নি, পাঁচালীর দল

এই প্রশ্নের উত্তরে আণ্টুনি যা বলেছিলেন, সেটাও অনেকেরই জানা—

এই বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর বেশে আনন্দে আছি
হয়ে ঠাক্‌রে সিংহের বাপের জামাই কুত্তি টুপী ছেড়েছি ॥

প্রশ্ন করেছিলেন রাম বসু কিন্তু আণ্টুনির উত্তরে ঠাকুরদাস দত্তকে আক্রমণ নেই—ঠাকুর সিংহকে তিনি আক্রমণ করেছেন। সুতরাং ব্রজসুন্দর সান্যালের উক্তিতে একটি বিরোধিতা আছে। এই লড়াই ঠাকুরদাস দত্তের দলের সঙ্গে আণ্টুনির দলের নয়, ঠাকুরদাস সিংহের সঙ্গে আণ্টুনির। ঠাকুরদাস দত্ত বিখ্যাত গায়ক ছিলেন। কাশীপ্রসাদ ঘোষ তাঁকে বলেছেন Indian Bard.

ঠাকুরদাস সিংহ সম্পর্কে তথ্য বিশেষ জানা যায় না। ব্রজসুন্দর ঠাকুরদাস সিংহের দু'টি গান উদ্ধৃত করেছেন—

যতনে মম প্রাণ, প্রেয়সি, করেছি তোমায় সমর্পণ

এবং

আমারে সখি ধর ধর !
ব্যথার ব্যথিত কে আছে আমার ॥[১]

তৃতীয় ঠাকুরদাস চক্রবর্তী ১২০৯ সালে নদীয়াতে জন্ম গ্রহণ করেন। কলকাতায় এসে কবির দলে পরিচিত হয়ে পালা রচনা করতেন, নিজে দল গঠন করেন নি। 'প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে ঠাকুরদাস চক্রবর্তী পরলোক গমন করেন'।[২] গুপ্তরত্নোদ্ধারে এর তিনটি গান উদ্ধৃত হয়েছে।

পৃ ২১০। **রাজা হরিনাথ রায়**। রাজা লোকনাথ রায়ের মৃত্যুর পর ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে এক বৎসর বয়স্ক হরিনাথ রায় জমিদারী লাভ করেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে সাবালকত্ব প্রাপ্তির পর তিনিই জমিদারী দেখাশুনা করতে থাকেন। ১৮২৫ এর ২৫-এ ফেব্রুয়ারিতে তিনি রাজা উপাধি পান। ১২২৫ সালের ১৬ই ফাল্গুন হরিনাথের সমারোহ সহকারে বিবাহের বিবরণ সমাচারদর্পণে প্রকাশিত হয়েছিল।[৩] ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে হরিনাথ পরলোক গমন করেন। হিন্দু

করেছেন। দ্রষ্টব্য ব্যোমকেশ মুস্তফী 'পাঁচালিকার ঠাকুরদাস বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৫।

১ নব্যভারত ১৩১২, চৈত্র, পৃ ৬৪৬

২ নব্যভারত, ১৩১২ চৈত্র, পৃ ৬৪৩

৩ সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম খণ্ড, ৩সং) পৃ ২৬৭।

কলেজ স্থাপনে হরিনাথ কুড়ি হাজার টাকা দান করেছিলেন। সংস্কৃত চর্চার তিনি একজন উৎসাহী উদ্যোগী ছিলেন। হরিনাথের মৃত্যুর পর কৃষ্ণনাথ জমিদারী পান।

পৃ ২১১। **দক্ষিণ ভবানীপুরে 'নলদময়ন্তী' যাত্রার দল।** ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় 'কলিরাজার যাত্রা' নামে নূতন যাত্রার পর ১৮২২-এ ভবানীপুরের যুবকেরা 'নলদময়ন্তী' নামে আর একটি নূতন যাত্রার অভিনয় করে। এই সংবাদ সমাচারদর্পণ, ১৮২২-এর ১৩ জুলাই-এ প্রকাশিত হয়েছিল।[১]

পৃ ২১১। **নীলুর দলে রামপ্রসাদ**। নীলুর মৃত্যুর পর রামপ্রসাদ তার দল রেখেছিলেন। শোভাবাজার রাজবাড়ীতে রামপ্রসাদের সঙ্গে একবার রাম বসুর কবির লড়াই বাধে। সেই লড়াইতে রামপ্রসাদ রাম বসুকে হঠাৎ আক্রমণ করে বসেন—

নাইকো রাম বোসের এখন সেকেলে পৌরষ।
এখন দল করে হয়েছেন রাম বোস—রাম কামারের **।

রাম বসুর মৃত্যু ১৮২৯-এ। নীলুর মৃত্যু ১৮২৮-এ। সুতরাং এই লড়াই এই সময়ের মধ্যেই হয়েছিল। তখন রাম বসুর বয়স প্রায় চল্লিশ। রামপ্রসাদের গানে রাম বসুর বয়সের ইঙ্গিত আছে। রাম্ বসু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—

তেমনি এই নীলুর দলে রামপ্রসাদ একটীন্।
যেমন ঢাকের পীটে বাঁয়া থাকে,
বাজে নাকো একটি দিন ॥
যেমন রাতভিখারীর ধামা বওয়া থাকে এক একজন।
হরিনাম বলে না মুখে পেছু থেকে চাল কুড়ুতে মন,
কর্ম্মে অকর্ম্মা, ঐ রামপ্রসাদ শর্ম্মা
মন কাজের কাজী ঠাটের বাজী,—(ভাইরে)
ঠিক যেন ধোপার বিশকর্ম্মা—
যেমন বিত্তে শূন্য বিত্তেভূষণ সিদ্ধিরস্ত বস্তহীন ॥
নীলমণি মলে, নীলমণির দলে
ঢুকলো সিংভাঙা এঁড়ে বাছুরের পালে।

---

১ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (৩য় সং) পৃ ১৮-১৯

যেমন নবাব মলে নবাব হল উজীরালি আড়াই দিন।
যেমন * * কাছে পেগের বড়াই ঘরে করেন জাঁক,
ছুনিয়ার কর্ম্মেতে কুঁড়ে, ভোজনে দেড়ে—
বচনে পুড়িয়ে করেন খাক্।
তেমনি শ্রীছাদ, এই পেটকো মুলুক চাঁদ
তরেন রামপ্রসাদ, ধবে কৃষ্ণপ্রসাদ
যেমন জন্মে কভু হাত পোরে না,—
দোলে লবেদার আস্তীন॥

অবিনাশ ঘোষ বলেন, এই লড়াই হয়েছিল রামপ্রসাদ এবং ভোলা ময়রার মধ্যে।[১] সম্ভবতঃ এই গানে উল্লিখিত নীলমণির নাম দেখে নগেন্দ্রনাথ বসু মনে করেছেন, রামপ্রসাদ নীলমণি পাটনীরও দল রেখেছিলেন।[২] আসলে নীলু ঠাকুরের সম্পূর্ণ নাম ছিল নীলমণি চক্রবর্ত্তী।

১ প্রীতিগীতি, পৃ ২/০

২ বিশ্বকোষ, 'কবি'।

লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস

লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস নামক জনৈক একচক্ষুহীন (সাধারণতঃ "ল'কে কাণা" নামে পরিচিত) কায়স্থকুলোদ্ভব সুরসিক গীতিকবি (lyric poet) গোপীমোহনের [ঠাকুর] অনুগ্রহভাজন ও প্রতিপাল্য ছিলেন। এই কবিরও মাসিক অর্থ বন্দোবস্ত ছিল। লক্ষ্মীকান্ত যেমন সুকবি, তদ্রূপ সুরসিক ছিলেন। তাঁহার গীতিরচনাপ্রণালীর দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে একটী সঙ্গীত উদ্ধৃত হইল—

কি বলি ফুটে দম ফেটে মরি প্রাণ যায়।
জগৎমান্য অগ্রগণ্য ঠাকুরে পিরালী দায়।
একি বিধির বুদ্ধি মোটা পদ্মের মৃণালে কাঁটা
আঁতখালি নীলমণি হালদার মহাশয়।
একি বিধির বিবেচনা সাগরের জল লোণা
লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস কাণা তাও কি প্রাণে সয় !
ইষ্ট নিষ্ঠ অনুব্রত যাগ যজ্ঞে সদা রত !
বিধির বিপাকে হত যশোভাগী নাহি হয়।
বিধাতার এ ভ্রম মাত্র লোকে বলে কর্ম্মমাত্র
রাজবংশে পোষ্যপুত্র রাজপুত্র নাহি জন্মায়॥

লক্ষ্মীকান্ত পরলোকগত হইলে পরে তাঁহার বংশাবশিষ্ট একমাত্র কন্যা অতি বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং "বিশ্বাসের মেয়ে" বলিয়া ঠাকুর পরিবারের প্রতিপাল্য ছিলেন।[১]

পৃ ৩১৯। **গঙ্গানারায়ণ নস্কর**। গঙ্গারাম নস্কর-ও পাওয়া যায়। গঙ্গারাম "is sometimes regarded as the founder of this new type of পাঁচালী"।[২] "ইনি পাঁচালীর গান রচনা করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। গঙ্গানারায়ণ (বা রাম) দাশরথি রায়ের অনেক পূর্ব্ববর্তী। রাজা নবকৃষ্ণের বাটীতে ইনি "পক্ষীর দলকে" পরাভূত করিয়াছিলেন।"[৩]

---

১ গীতিলহরী (১৯০৪) অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত, পৃ ২১-২২।

২ De, History of Bengali Literature p. 441.

৩ শিবরতন মিত্র, বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক পৃ ১৫৬।

পরিশিষ্টে উল্লিখিত কবিদের পরিচয়

সুপরিচিত কবিদের পরিচয় অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপে দেওয়া গেল।

পৃ ৩২৮। **কবিকঙ্কণ**। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে রচিত। চণ্ডীমঙ্গর কাব্যের সূচনাতে কবি তাঁর নিজের ইতিহাস দিয়েছেন। মুকুন্দরাম সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যের বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (৩য় সং), অধ্যাপক সুকুমার সেনের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড, ২ সং), এবং সুকুমার সেন মহাশয়েরই প্রবন্ধ 'মুকুন্দরামের দেশত্যাগকাল' (বিশ্বভারতী পত্রিকা ত্রয়োদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা), সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের কালক্রম (১৯৫৮)।

পৃ ৩২৮। **কৃষ্ণদাস কবিরাজ**। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোকে কিছু পাঠান্তর আছে—

শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যেহ্যসিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥

পাঠান্তর, শাকেহগ্নিবিন্দুবাণেন্দৌ। মোটামুটি বলা যেতে পারে সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম দিকে এই গ্রন্থরচনা সম্পূর্ণ হয়েছিল।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং তাঁর গ্রন্থের আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড); বিমানবিহারী মজুমদার, চৈতন্য চরিতের উপাদান; সুশীলকুমার দে, Early History of Vaisnava Faith and Movement; রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত চৈতন্যচরিতামৃত।

পৃ ৩২৮। **কাশীদাস**। কাশীরাম দাসের মহাভারত বাঙ্গালীর সুপরিচিত কাব্য। মহাভারতের রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমেই। কাশীরাম বৈষ্ণব ভাবাপন্ন কবি ছিলেন। কাশীরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণদাস 'শ্রীকৃষ্ণ বিলাস' নামে কাব্য রচনা করেছিলেন। কবি সম্ভবতঃ আদি সভা বন বিরাট পর্বের কিয়দংশ রচনা করে পরলোক গমন করেন। প্রবাদ—

আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেল স্বর্গপুর॥

কাশীরাম জন্ম গ্রহণ করেন বর্ধমান জেলার সিঙ্গী গ্রামে। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড); দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

পৃ ৩২৮। **কীর্ত্তিবাস**। শুদ্ধ নাম কৃত্তিবাস। সেকালে সকলে 'কীর্ত্তিবাস'-ই বলত। ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল এমন কি মধুসূদনও এ বানান ব্যবহার করেছেন। ১৮০২-তে শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত রামায়ণেও ইংরেজি অক্ষরে এই বানানই আছে। কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণী থেকে অনুমান করা হয়েছে, কবি রামায়ণ রচনা করেন রাজা গণেশের আমলে। তাঁর জন্মসাল ধরা হয়েছে ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দ। সুকুমার সেন অনুমান করেন কৃত্তিবাস জীবিত ছিলেন ১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি।[১]

কৃত্তিবাসের পৈত্রিক বাস ছিল শান্তিপুরের নিকট ফুলিয়ায়। পিতার নাম মুরারি ওঝা।

বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, 'কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ', ভারতবর্ষ ১৩৪৯ জ্যৈষ্ঠ; যোগেশচন্দ্র রায়, 'কৃত্তিবাসের জন্মশক,' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৮, ২০, ৪০ ভাগ; সুখময় মুখোপাধ্যায়, 'রাজা গণেশের আমল।'

পৃ৩২৮। **কেতকী দাস**। সম্পূর্ণ নাম কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। ইনি মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। মনসামঙ্গল কাব্যের ইনি একজন শ্রেষ্ঠ কবি। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল' (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৩)।

পৃ ৩২৮। **রামেশ্বর**। শিবায়ন কাব্যের কবি। সম্পূর্ণ নাম রামেশ্বর চক্রবর্তী ভট্টাচার্য। কাব্যরচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। রামেশ্বর মেদিনীপুরের অধিবাসী এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর উৎকৃষ্ট কবিদের অন্যতম। কবি সত্যপীরের পাঁচালী রচনা করেন বলে জানা যায়। বিস্তৃত আলোচনার জন্য অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যের গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

পৃ ৩২৮। **কমলাকান্ত**। সাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্য রামপ্রসাদের পরবর্তী বিখ্যাত শক্তিসাধক এবং শ্যামা সঙ্গীত রচয়িতা। কমলাকান্ত পূর্বনিবাস অম্বিকা

---

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (২য় সং) পৃ ৯৮।

কালনা পরিত্যাগ করে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানের নিকটে কোলাহাট গ্রামে বাস করতে থাকেন। বর্ধমানাধিপতি তেজচন্দ্র কমলাকান্তকে প্রথমে সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করেন, তারপর গুরুপদে বরণ করেন। বর্ধমান রাজবাড়ী থেকে প্রকাশিত 'সাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য কৃত শ্যামাসঙ্গীত' (১২৬৪, ১৮৫৭ খ্রী) গ্রন্থে সভাপণ্ডিত হওয়ার তারিখ দেওয়া আছে ১২১৬ সাল। মহারাজ তেজচন্দ্র কোলহাটে কমলাকান্তের বসতবাড়ী নির্মাণ করে দেন। এখানে কমলাকান্ত কালী মূর্তি ও পঞ্চমুণ্ডী আসন প্রতিষ্ঠা করেন। জনশ্রুতি, পঞ্চাশ বৎসর বয়সে কমলাকান্ত দেহত্যাগ করেন।[১]

বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সাধক কমলাকান্ত (১৩৩২); শ্রীকান্ত মল্লিক, কমলাকান্ত পদাবলী (১২৯২); কৈলাসচন্দ্র সিংহ, সাধক সঙ্গীত (২য় সং ১৩০৬)। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সাধক কমলাকান্ত।

পৃ ৩২৮। **নরচন্দ্র**। নরচন্দ্র নামে দু'জন শাক্ত সঙ্গীত রচয়িতার নাম পাওয়া যায়। কুমার নরচন্দ্র কৃষ্ণনগর রাজবংশের। তাঁর গান 'যে হয় পাষাণের মেয়ে'।

নরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বর্ধমান জেলার রায়না থানার পাঁচ মাইল উত্তরে জামদো গ্রামে আনুমানিক ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। নরচন্দ্র তান্ত্রিক ছিলেন। ইনিও শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছিলেন।

৩২৮। **নন্দকুমার**। মহারাজা নন্দকুমার একজন সঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন। নন্দকুমারের জন্ম ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে আজিমগঞ্জ নলহাটির নিকট ভদ্রপুর গ্রামে। মৃত্যু সুপ্রীম কোর্টের বিচারে প্রাণদণ্ডে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। নন্দকুমারের বিচার বাংলার ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা। বর্ধমানের মহারাজার দেওয়ান ব্রজকিশোর রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র নন্দকিশোরও একজন সঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন। নন্দকুমার ও নন্দকিশোরের সঙ্গীতের মধ্যে বিভ্রান্তির সম্ভাবনা উপেক্ষণীয় নয়।[৩]

পৃ ৩২৮। **দেওয়ান মহাশয়**। সম্পূর্ণ নাম রঘুনাথ রায়। ইনি ব্রজকিশোর

---

১ অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সাধক কমলাকান্ত (১৩৩২) পৃ ৭৭।

২ শিবরতন মিত্র, বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক (১৩৩৮) পৃ ৩২৯।

৩ S. K. De, History of Bengali Literature. P 421 মহারাজ নন্দকুমারের বিবরণ নিখিলনাথ রায়ের মুর্শিদাবাদ কাহিনীতে দ্রষ্টব্য।

রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র এবং নন্দকিশোর রায়ের ভ্রাতা। রঘুনাথ রায় দেওয়ান মহাশয় নামেই পরিচিত ছিলেন। রঘুনাথের জন্ম ১১৫৭ সালে।

"বর্ধমানে পিতার নিকট থাকিয়া রঘুনাথ সংস্কৃত ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই উভয় ভাষাতে তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীত রচনায় ও পরমার্থ চিন্তায় রঘুনাথের বিশেষ আসক্তি দেখা যাইত। তিনি যখন দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন, তখন মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বর্ধমানের অধিপতি। সঙ্গীতে দেওয়ান মহাশয়ের বিশেষ অনুরাগ দেখিয়া মহারাজ দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ হইতে ওস্তাদ আনাইয়া তাঁহার সঙ্গীত শিক্ষার রীতিমত বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

দেওয়ান মহাশয় প্রতিদিন অল্পক্ষণই দেওয়ানী কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন। তাঁহার অধিকাংশ সময়ই সঙ্গীতচর্চ্চায় ও ধর্ম্মকার্য্যে অতিবাহিত, হইত। তিনি অনেক সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন, তবে তাঁহার রচিত সমস্ত সঙ্গীতই দেবদেবীবিষয়ক, অন্য সঙ্গীত একটিও তিনি রচনা করেন নাই। ভণিতাস্বরূপ এই 'অকিঞ্চন' কথাটি তাঁহার প্রায় প্রত্যেক গানেই দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ প্রবাদ আছে—রঘুনাথ প্রত্যহ প্রাতঃকালে কালী-বিষয়ক একটি গান রচনা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। তাঁহার রচিত কৃষ্ণবিষয়ক গানও অনেক আছে।"[১]

১২৪৩ সালের ১৯এ ভাদ্র ৮৬ বৎসর বয়সে দেওয়ান মহাশয়ের মৃত্যু হয়।

পৃ ৩২৮। **নীলমণি ঘোষ**। ঈশ্বর গুপ্ত নিত্যানন্দের জীবনীতে একজন নীলু ঘোষের উল্লেখ করেছেন—"ইঁহার দলে গোরাচাঁদ ঠাকুর ও নীলু ঘোষ এই দুইজন গায়ক প্রায় তাঁহার তুল্যই ছিলেন।" শিবরতন মিত্র 'বঙ্গীয় সাহিত্য সেবকে' এঁকে শুধু সঙ্গীত রচয়িতা বলে উল্লেখ করেছেন। দু'জনে অভিন্ন কিনা জানিনা। অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় সংকলিত গীতরত্নমালায় (১ম ভাগ) নীলমণি ঘোষের ছয়টি গান উদ্ধৃত আছে, তার মধ্যে চারটি ব্রাহ্মসঙ্গীত একটি দেবীবিষয়ক একটি শ্যামাসঙ্গীত।[২] সুতরাং এঁকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বলেই মনে হয়। জন্ম সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে কারণ নিত্যানন্দের দলে ইনি গান করতেন।

---

১ বাঙ্গালীর গান পৃ ১২৪।

২ গীতরত্নমালা (১ম ভাগ) পৃ ১২৬, ১৪৯, ১৫৫, ৪১৭, ২২৭।

পৃ ৩২৮। **কালী মির্জা**। কালী মির্জা নামে সুপরিচিত কালিদাস চট্টোপাধ্যায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বিখ্যাত সঙ্গীত রচয়িতা এবং গায়ক ছিলেন। হুগলীর গুপ্তিপাড়ায় এঁর জন্ম। পিতার নাম বিজয়রাম চট্টোপাধ্যায়। বিজয়রামের দুই পুত্র—কালিদাস এবং কনিষ্ঠ রঘুনাথ। বাঙ্গালীর গানে বলা হয়েছে পলাশীর যুদ্ধের সাত আট বৎসর আগে কালিদাস চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম এবং মৃত্যু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম কুড়ি বৎসরের মধ্যে। বাল্যাবধি ইনি প্রখর বুদ্ধিশালী ছিলেন। টোলে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ফার্শীও ইনি ভালো জানতেন। ঊনিশ কুড়ি বৎসর বয়সে কাশী যান; সেখানে বেদান্ত ও সঙ্গীত শিক্ষা করেন। সঙ্গীতবিদ্যার অনুশীলনে তিনি চলে যান লক্ষ্ণৌ ও দিল্লী। আনুমানিক ত্রিশ বত্রিশ বৎসর বয়সে স্বগ্রামে ফিরে আসেন।

কালিদাস প্রথমতঃ বর্ধমানের যুবরাজ প্রতাপচন্দ্রের সভাসদ ছিলেন। পরে গোপীমোহন ঠাকুরের আশ্রয়ে চলে আসেন। বর্ধমান ছেড়ে চলে আসবার পরেও প্রতাপচন্দ্র কালিদাসকে ১৫৲ মাসিক দিতেন। গোপীমোহনের আশ্রয়েই তিনি জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। শেষ জীবন অবশ্য কাশী-ধামেই কাটিয়েছিলেন। তিনি প্রায় সত্তর বৎসর বেঁচেছিলেন।

পশ্চিমে বেশি দিন থাকার জন্য এবং পশ্চিমী বেশ ভূষার জন্য তিনি মির্জা বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলে পরিচিত হয়েছিলেন। মুসলমানী বেশভূষা থাকলেও মির্জা কিন্তু অত্যন্ত স্বধর্মপরায়ণ ছিলেন। প্রবাদ আছে, মির্জার মাতৃশ্রাদ্ধ কালে গুপ্তিপাড়ায় ব্রাহ্মণ সমাজের দলাদলি তাঁর অমায়িক ব্যবহারের জন্য দূরীভূত হয়।

রামমোহন রায় মির্জার কাছেই সঙ্গীত শিক্ষা করেন বলে শোনা যায়। "মির্জা মহাশয়ের সমীপে সঙ্গীত শিক্ষা সময়ে মহাত্মা রামমোহনের হৃদয়ে অদ্বৈতবাদিতার বীজ প্রথমে রোপিত হয়। কালক্রমে তাঁহার উর্ব্বর চিত্তক্ষেত্রে এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বহুশাখা প্রশাখা প্রসারণ পূর্ব্বক বিশাল পাদপে পরিণত হইয়াছিল।"[১]

"মির্জা মহাশয় দেখিতে গৌরাঙ্গ ও কিঞ্চিৎ কৃশ ছিলেন। তিনি দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ ও বিশালবক্ষ ছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল আমদীর্ঘ নাসিকা দীর্ঘ ক্ষীণ ও উন্নত ছিল। তাঁহার নিবিড় ও যুগ্ম ভ্রূযুগল আয়ত ও ঈষল্লোহিত লোচনদ্বয় এবং উচ্চ ও সুপ্রশস্ত ললাট-দেশ দেখিলে তাঁহাকে প্রতিভাশালী বলিয়া বোধ

১ অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত গীতিলহরী (১৯০৪) পৃ ১২।

হইত। তাঁহার ঘনকুঞ্চিত কেশকলাপ পশ্চাদ্দেশে প্রলম্বিত থাকিত।"[১] শোনা যায় কলিকাতার ধনিসম্প্রদায়ের অনেকে মির্জার অনুকরণে বেশভূষা করতেন।

পৃ ৩২৮। **রাজা রামকৃষ্ণ**। নাটোরের রাণী ভবানীর দত্তক পুত্র। তাঁর সময়ে জমিদারীর অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে। রাণী ভবানী জমিদারীর ভার আবার গ্রহণ করবার চেষ্টা করেন; কিন্তু কোম্পানী সম্মত হয় না। এই সময় নাটোরের জমিদারী খণ্ডিত হয়ে যায়। রাজা রামকৃষ্ণ বিষয় সম্পত্তিতে নিস্পৃহ হয়ে কালী সাধনায় মগ্ন থাকতেন। মুর্শিদাবাদ বড়নগরের গঙ্গাতীরে এঁর সাধনার স্থান ছিল। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়। বাঙ্গালীর গানে এঁর সাতটি গান উদ্ধৃত হয়েছে।

পৃ ৩২৮। **রাজা গিরিশচন্দ্র**। নদীয়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর রাজা গিরিশচন্দ্র রাজা হন (১৮০২—১৮৪১)। কৃষ্ণচন্দ্রের সময় ৮৪টি পরগণা নদীয়ার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। গিরিশচন্দ্রের সময়ে মাত্র ৫।৭ খানা পরগণা বাকী থাকে। এই জমিদারীর প্রসিদ্ধ উখড়া পরগণা এঁরই সময়ে নীলামে বিক্রী হয়ে যায়। তারপরে একজন তান্ত্রিক ব্রহ্মচারীর প্ররোচনায় অত্যন্ত সুরাসক্ত এবং অমিতব্যয়ী হয়ে পড়েন। গিরিশচন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।[২] কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী এঁরই সভাকবি ছিলেন।

পৃ ৩২৮। **রাধামোহন সেন**। তাঁর জীবন কাহিনী বিশেষ কিছু জানা যায় না যদিও তাঁর 'সঙ্গীত তরঙ্গ'র নাম অনেকেই জানেন। সাহিত্য সাধক চরিতমালা (১ম খণ্ডে) এঁর রচনাবলীর বিবরণ এবং আরো কিছু তথ্য দেওয়া হয়েছে। "বঙ্গদেশের প্রসিদ্ধ কবিদিগের মধ্যে কৃত্তিবাস অতি প্রাচীন বোধ হয়। তিনি প্রসিদ্ধ রামায়ণের অনুবাদ করেন। তৎপরে কাশীদাস, কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র ও বহুকাল পরে ইদানীন্তন রাধামোহন সেন কবি হইয়াছিলেন।"[৩]

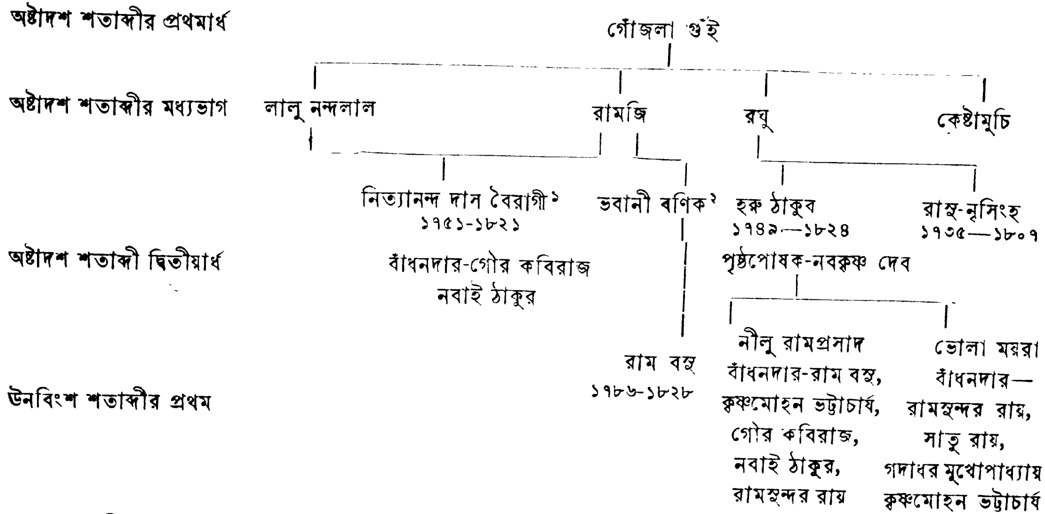
---

১ পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ১৬।

২ শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (৩য় সং) পৃ ১০—১১।

৩ বিবিধার্থ সংগ্রহ, ১৭৭০ শক, ৫ সংখ্যা।

কবিজীবনীতে উল্লিখিত কবিওয়ালাদের শিষ্যপরম্পরা



১ নিত্যানন্দ লালু নন্দলালের শিষ্য ছিলেন বলে ঈশ্বর গুপ্ত উল্লেখ করেছেন (দ্র. পৃ. ৩৪৬)। কিন্তু 'সে কেন রাধারে কলঙ্কিনী করে রাখিলে' গানটিতে রামজীর ভণিতা আছে। অনুমান হয়, নিত্যানন্দ রামজির কাছেও শিক্ষানবিশি করেছিলেন।

২ 'ভবানে বেনে ও নীলু ঠাকুর ভোলাময়রা প্রভৃতি প্রথমে হরু ঠাকুরের দলে জিল দিত। পরে দোহার অর্থাৎ গায়কের পদে নিযুক্ত হন। এইরূপে কিছুদিন গত করিয়া সকলে ভিন্ন ভিন্নরূপে স্ব স্ব দল নামে স্থাপন করিলেন।' হরু সকলকেই গান ও সুর দিতেন। পরে ভবানী রামজির নিকট থেকেই গীত নিতে থাকেন। (দ্র. পৃ ১৩৭)।

কবিজীবনীর কালপঞ্জী

১৭০১	মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলার দেওয়ান
১৭০২	বর্ধমানে কীর্তিচন্দ্রের রাজ্যলাভ
১৭০৬	ভারতচন্দ্রের জন্ম
১৭০৭	ঔরঙ্গজীবের মৃত্যু
১৭১০	নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম
১৭১২	কীর্তিচন্দ্রের ভুরশুট্ অধিকার
১৭১৭	মুর্শিদকুলী সুবাদার নিযুক্ত
১৭২০	রামপ্রসাদের জন্ম
১৭২৭	মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যু
১৭৩২	(আ°) মহারাজ নবকৃষ্ণ দেবের জন্ম
১৭৩৫	রাসুর জন্ম
১৭৩৮	নৃসিংহের জন্ম
১৭৪০	আলিবর্দি খাঁ বাংলার সুবাদার
১৭৪১	রামনিধির জন্ম
১৭৪২	বর্গীর হাঙ্গামা ; ভারতচন্দ্রের উড়িষ্যা-ভ্রমণ
১৭৪৫-৪৬	চন্দননগরে ভারতচন্দ্র
১৭৪৬	কৃষ্ণনগরে ভারতচন্দ্র
১৭৪৯	হরু ঠাকুরের জন্ম
১৭৫০	ভারতচন্দ্রের নাগাষ্টক রচনা
১৭৫১	আলিবর্দির মৃত্যু ; নিতাই বৈরাগীর জন্ম
১৭৫৩	ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল
১৭৫৬	ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর মৃত্যু
১৭৫৭	পলাশীর যুদ্ধ
১৭৬০	ভারতচন্দ্রের মৃত্যু

১৭৬৫	ইংরেজের দেওয়ানী লাভ
১৭৭১	ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ;
	তিলকচন্দ্রের মৃত্যু
১৭৭২	ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তন ,
	রামনিধির ছাপরা যাত্রা
১৭৭৪	রামমোহন রায়ের জন্ম
১৭৮১	কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের মৃত্যু
১৭৮২	নবদ্বীপরাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যু
১৭৯৩	চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
১৭৯৪	রামনিধির কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন
১৭৯৭	নবকৃষ্ণ দেবের মৃত্যু
১৮০০	ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা
১৮০৪	কলিকাতায় সংশোধিত আখড়া স্থাপন
১৮০৭	রাসুর মৃত্যু
১৮১২	ঈশ্বর গুপ্তের জন্ম
১৮১৪	রামমোহনের কলিকাতায় বাস
১৮১৭	হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা (২০ জানুয়ারী) ;
	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম (১৫ মে)
১৮১৮	গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য-সম্পাদিত 'বাঙ্গাল গেজেটি' ;
	শ্রীরামপুর মিশন-সম্পাদিত 'দিগদর্শন' এবং 'সমাচার-দর্পণ' প্রকাশ ;
	গোপীমোহন ঠাকুরের মৃত্যু
১৮২১	নিত্যানন্দ বৈরাগীর মৃত্যু
১৮২৪	হরু ঠাকুরের মৃত্যু (৬ আগষ্ট) ,
	মধুসূদন দত্তের জন্ম ;
	সংস্কৃত কলেজ স্থাপন
১৮২৫	নীলু ঠাকুরের মৃত্যু (নভেম্বর মাসে)
১৮২৬	ডিরোজিও হিন্দু কলেজে শিক্ষক নিযুক্ত
১৮২৮	রাম বসুর মৃত্যু ;
	রামমোহনের ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন (২০ আগষ্ট)

১৮৩০	ধর্মসভা স্থাপন (১৭ জানুয়ারী)
১৮৩১	সংবাদপ্রভাকর প্রকাশ (২৮ জানুয়ারী) ; ডিরোজিও হিন্দু কলেজ থেকে অপসারিত ; তাঁর মৃত্যু (২৬ ডিসেম্বর)
১৮৩২	হাফ আখড়াইয়ের সূচনা
১৮৩২	সংবাদ রত্নাবলী (২৪ জুলাই)
১৮৩৩	ব্রিষ্টলে রামমোহনের মৃত্যু ; ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত রামপ্রসাদের 'কালীকীর্তন' প্রকাশ
১৮৩৬	বারত্রয়িক সংবাদপ্রভাকর (১০ আগষ্ট)
১৮৩৭	গোপীমোহন দেবের মৃত্যু
১৮৩৮	সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা স্থাপন ; বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম (২৬ জুন)
১৮৩৯	রামনিধির মৃত্যু (৬ এপ্রিল) ; দৈনিক সংবাদ প্রভাকর (১৪ জুন) ; তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপন (৬ অক্টোবর)
১৮৪২	'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকা প্রকাশ
১৮৪৯	বীটন স্কুল স্থাপন (৭ মে)
১৮৫২	বীটন সোসাইটিতে রঙ্গলালের 'বাঙ্গালা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ' পাঠ
১৮৫৩-১৮৫৫	সংবাদপ্রভাকরে কবিজীবনী প্রকাশ
১৮৫৫	রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশ
১৮৫৬	বিধবা বিবাহ আইন পাশ
১৮৫৭	সিপাহী যুদ্ধ
১৮৫৯	ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু (২৯ জানুয়ারী)

গ্রন্থপঞ্জী

অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সাধক কমলাকান্ত, ১৩৩২

" সাধক রামপ্রসাদ, ১৩৩০

অনাথকৃষ্ণ দেব, বঙ্গের কবিতা, ১৯১১

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, ১৩৬৩

আনন্দবাজার পত্রিকা, পূজাসংখ্যা ১৩৬১

আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ৩ সং ১৯৫৮

" বাংলার লোক সাহিত্য, ২ সং ১৯৫৮

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের জীবন বৃত্তান্ত, ১৮৫৫

কবিওয়ালাদিগের গীত সংগ্রহ, ১৮৬২

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, শ্যামাসঙ্গীত, বর্ধমান, ১২৬৪

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস—নবাবী আমল, ১৩০৮

কালী মির্জা, গীতিলহরী, ১৯০৪, অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত

কুমুদনাথ মল্লিক, নদীয়া কাহিনী ১৩১৯,

কৈলাসচন্দ্র সিংহ সাধকসঙ্গীত, ১৩০৬

গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য, হাফ আখড়াই সঙ্গীত সংগ্রামের ইতিহাস, ১৩২৬

গীতরত্নমালা, ১৩০৩, অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

গীতাবলী, ২ সং ১৩০৩, বৈষ্ণবচরণ বসাক প্রকাশিত

গুপ্তরত্নোদ্ধার, ১৩০১, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংগৃহীত

জন্মভূমি, ১৩০৩

জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার, বংশপরিচয়, ৪র্থ খণ্ড, ১৩৩১

দীনেশ ভট্টাচার্য, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন (সাহিত্য সাধক চরিতমালা)

দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৭ম সং

নব্যভারত ১৩১১, ১৩১২, ১৩১৩, ১৩১৪

নারায়ণ ১৩২৩

নিখিলনাথ রায়, মুর্শিদাবাদ কাহিনী, ২ সং ১৩১০

নিরঞ্জন চক্রবর্তী, উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য, ১৮৮০, শক

পূর্ণচন্দ্র দে, রসসাগর কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর বাঙ্গালা সমস্যা পূরণ, ১৩২৭
প্রফুল্ল পাল, প্রাচীন কবিওয়ালার গান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৮
প্রবর্তক ১৩২৯
প্রবাসী, ১৩৩১
প্রসাদ প্রসঙ্গ ১ম সং ১৮৬৫ ; ২ সং, ১২৮৩
প্রাচীন কবি সংগ্রহ, ১২৮৪, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
প্রীতিগীতি, ১৩০৫, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত
প্রেমসঙ্গীত, ১২৯৪
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গ্রন্থাবলী বিবিধ প্রবন্ধ (সাহিত্য পরিষৎ)
বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, ২য় খণ্ড, ১৯১৪
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৫, ৩৫, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫৯ ভাগ
বাঙ্গালীর গান, ১৯০৫, দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত
বিজয়রাম সেন, তীর্থ মঙ্গল, ১৯১৫, নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত
বিদ্যাপতি, কীর্তিলতা, ১৩৩১, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত
বিনয় ঘোষ, পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতি, ১৯৫৭
বিবিধার্থসংগ্রহ, ১৭৭৩, ১৭৮০ শক
বিশ্বকোষ
বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৬২ , শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৩
বীরভূমি (নবপর্যায়) ১৩১৯, ১ম, ২য়, ৩য় সংখ্যা
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অমৃতলাল বসু' (সাহিত্যসাধকচরিতমালা, ৬ষ্ঠ খণ্ড)
" বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, ৩ সং
" 'রাধামোহন সেন' (সাহিত্যসাধকচরিতমালা, ১ম খণ্ড)
" 'রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার' (সাহিত্যসাধকচরিতমালা, ২য় খণ্ড)
" সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দুই খণ্ড, ৩য় সং, ১৩৫৬
ভবানন্দের হরিবংশ, ১৩৩৯, সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত
ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ)

ভারতী, ১৩০৪
মদনমোহন গোস্বামী, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, ১৯৫৫
মনোমোহন বসু, গীতাবলী, ১৮৮৭
মন্মথনাথ ঘোষ, সেকালের লোক, ১৩৩০
মোহিতলাল মজুমদার, রবিপ্রদক্ষিণ, ১৩৫৬
যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রামপ্রসাদ, ১৩২৪
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সাধক রামপ্রসাদ, ১৯৫৪
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ (দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা)
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রচনাবলী ২, ৬, ১৭ খণ্ড।
রাজনারায়ণ বসু, সেকাল আর একাল, (সাহিত্য পরিষৎ)
রামনিধি গুপ্ত, গীতরত্ন, ১ম ১২৪৪, ২য় ১২৬৩, ৩য় ১২৭৫, সংস্করণ
রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দর, ২য় সং, বঙ্গবাসী, ১৩১৩
রামপ্রসাদের গ্রন্থাবলী, বসুমতী, ৬ষ্ঠ সং, ১৯৫০
রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের জীবন চরিত, ২ সং, ১৮৯৬
শশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, ১৩৫৯
শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ৩সং
শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদ, ১৯৫৬
শিবরতন মিত্র, বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক, ১৩৩৮
শ্যামাধব রায়, রসসাগর কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর জীবনচরিত, ১৩০৫
শ্রীকান্ত মল্লিক, কমলাকান্ত পদাবলী, ১২৯২
সঙ্গীতকোষ, ১৮৯৬, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সংগৃহীত
সংবাদপ্রভাকর, ১২৫৫, ১২৫৯, ১২৬০-৬১
সাহিত্য সংহিতা, ১৩১১, ১৩১২, ১৩১৩, ১৩১৪, ১৩১৫
সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২ সং, ১৯৪৮
" মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙ্গালী, ১৩৫২, (বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ)
সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, বঙ্কিম প্রসঙ্গ
সুশীলকুমার দে, নানা নিবন্ধ, ১৩৬০
হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, কবিচরিত, ১৮৬৯
বঙ্গভাষার লেখক, ১৩১১

হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা সেকালের ও একালের, ১৯১৫

হরিহর শেঠ, প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়, ১৯৫২

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্‌, ১৮৫২

Bengal District Gazetteer, Bankura 1908 ; Burdwan, 1910 ; Nadia, 1910 ; Saran, 1908.

Bengal Harkaru and Chronicle, 1832.

Bengal : Past and Present, Vol. 41 & 1950. volume.

Bengal Spectator, 1843.

Bhandarkar, R. G. Vaisnavism, Saivism and other minor Religious cults. Strasburg 1913.

Bolts, William, Considerations on Indian Affairs, London, 1772.

Broome. History of the Rise and Progress of the Bengal Army, Calcutta, 1850.

Calcutta Review, 1845, 1846, 1851, 1873, 1910.

Cambridge History of India, Vol V 1929, Chapters XIII, XXV.

Caraccioli, Charles, Life of Lord Clive, Vol I London, 1775 ?

Dacca University, History of Bengal Vol II, 1948.

Dasgupta, S.N. & De, S. K. History of Sanskrit Literature, Calcutta University, 1941.

De. S. K. History of Bengali Literature in the Nineteenth Century, Calcutta, 1919.

De, S. K. Early History of Vaisnava Faith and Movement in Bengal, Calcutta, 1942.

Duff, Alexander, India and India Mission, 2nd Edition, Edinburgh, 1840.

Dutt, R. C. Economic History of India under Early British Rule, 5th Ed.

Fifth Report from the Select Committee on the Affairs of East India Company Vol I, 1812, Ed. Firminger, Calcutta 1917.

Friend of India, 1838, 1839.

Ghose, Grish Chandra. Life of Ramdulal Dey, Calcutta, 1868.

Ghose. Lokenath, The Modern History of Indian Chiefs, Rajas and Zemindars, Part II, Calcutta, 1881.

Ghose, N. N. Memoirs of Maharaja Nabakissen Deb Bahadur, Calcutta 1901.

Good Old Days of Hon'ble John Company, Vol I, 1882.

Grant, Robert, Early History of East India Company London, 1813.

Hobson Jobson, being A Glossary of Colloquial Anglo-Indian Words & Phrases by Yule & Burnell, London 1886.

Holwell, J. Z. Interesting Historical Events Relative to the Province of Bengal, Part I, London 1766.

Hunter, William. Annals of Rural Bengal, London 1868.

Hunter, William. Bengal MS. Record. Vol I, London 1894.

Journal of the Bengal Academy of Literature, Vol I. No. 6.

Kennedy, M. T. Chaitanya Movement, Calcutta, 1925.

Long. Descriptive Catalogue, Calcutta, 1855.

Mitra, Kissory Chand, Life of Mutty Lal Seal. Calcutta, 1869.

Seid Gholam Hassain Khan, Seir-ul-Mutaquerin Vol II, Calcutta, 1902.

Vansittart Henry, A Narrative of the Transaction in Bengal Vol III, London, 1776.

Verelst, Harry. View of the Rise and Present state of the English Government in Bengal, London, 1772.

ঈশ্বর গুপ্ত সংগৃহীত গানের সূচী

রামনিধি গুপ্ত

রামপ্রসাদ

কেষ্টা মুচি

গোঁজলা গুঁই

নিত্যানন্দদাস বৈরাগী

রাম বসু

রাম বসু

রামসুন্দর রায়

রাসু নৃসিংহ

নির্দেশিকা

জ

ট

ঠ

ড

ঢ

ত

দ

ধ

ন

হ

অবতারণা

ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হবে
[৪৩]	২৩	seens	scenes
৫৬	১০	নবীব	নকীব
৩৬৭	শিরোনাম	১৭০৬–১৬৬০	১৭০৬–১৭৬০

বিষয়-সূচী

অবতারণা

কবি

কবিওয়ালা

পরিশিষ্ট

আনুষঙ্গিক তথ্য

পরিশিষ্ট

এতদ্দেশীয় সর্ব্ব সাধারণ ব্যক্তির প্রতি বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন*

[১৪] এতদ্দেশীয় যে সকল প্রাচীন কবি মহাশয়েরা বঙ্গভাষায় কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাঁহারদিগের প্রণীত পুরাতন কবিতা ও সংগীত সকল এবং সেই সেই পুরুষের জীবন বৃত্তান্ত লিখিয়া যিনি আমারদিগের নিকট প্রেরণ করিবেন, আমরা মহোপকার স্বীকার পূর্ব্বক যাবজ্জীবন তাঁহার স্থানে কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ রহিব, এবং তাঁহাকে দেশহিতৈষি-দলের প্রধান শ্রেণী মধ্যে গণ্য করিব। এই মহা মঙ্গলময় ব্যাপারে ক্লেশ ও শ্রম স্বীকার জন্য যদিস্যাৎ কেহ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রত্যাশা করেন, আমরা যথাসাধ্য ও যথাসম্ভব তৎপ্রদানেও বিরত হইব না। জগদীশ্বর অস্মদাদিকে ধন দেন নাই, কেবল এক মন দিয়াছেন, সুতরাং ধনের দ্বারা কিছুই করিতে পারি না, শুদ্ধ মনের দ্বারা পণের ব্যাপার যতদূর পর্য্যন্ত করিতে পারি, তাহাই করিয়া থাকি। অস্মদ্দেশীয় ধনি মহাশয়-দিগের এ বিষয়ে অনুরাগ থাকিলে আমারদিগের এই দারুণ দুঃখ সহজেই দূর হইত, ও দেশের এত দুর্দ্দশা কখনই হইত না। ক্রমে বহুল ব্যাপারে কত প্রকার উপকার হইত, তাহা সুবোধ সমূহের অবোধের বিষয় কি? যাহা হউক, যদবধি এই দেহের সংকার্য্য না হয় তদবধি এই সংকার্য্য সাধনে যদ্যপি সর্ব্বস্ব যায়, নিঃস্ব হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হয় তথাচ আমরা এই কর্ত্তব্য কর্ম্মে কখনই ক্ষান্ত হইব না। এই স্থলে আক্ষেপ এই, যে, ভবাধ্যক্ষ ভগবান্ আমাকে অর্থ দেন নাই, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষোভ করি না, যদি শরীরটা সর্ব্বদা সুস্থ রাখিতেন তাহা হইলেও বাহুল্যরূপে এরূপ বিলাপ করিতে হইত না। একে সঙ্গতি শূন্য জন্য ধনাগম তৃষা কৃশা হয় না, তাহার উপর আবার নানা প্রকার রোগ ভোগ করিলে কি প্রকারে নিস্তার পাইতে পারি? প্রাণনাশা "নাসা" নাসা বাসায় বাসা করিয়া নিয়তই সর্ব্বসুখের আশা হরণ করিতেছে। হর্ষনাশক "অর্শঃ" বপুর্ব্বর্ষ স্পর্শ করিয়া মধ্যে মধ্যে অতিশয় বিমর্ষ করিতেছে। বাতের কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য হইলে বাতের আর অত্যাচারের পরিসীমা থাকে না, তাহার চর্ম্মভেদি ও মর্ম্মভেদি যন্ত্রণার সময়ে মনের মধ্যে কোনরূপ মন্ত্রণার আবির্ভাব হয় না। অতি সুবিখ্যাত "কালাচাঁদ" ও "গোরাচাঁদ"

---

* সংবাদপ্রভাকর, শনিবার ১ শ্রাবণ ১২৫১ সাল। ইং ১৫ জুলাই ১৮৪৪।—স.

কবিরাজ মহাশয়েরা উদরাময়ের দৌরাত্ম্য নিবারণে পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। একখানা নয়, নানা খানা। আবার সময়ে সময়ে ফোড়া পাচ্ড়া প্রভৃতি ছ্যাচ্ড়া ব্যাধি অত্যন্ত জ্বলাতন করিতে থাকে। কি করি, ইহার কোন উপায় নাই, জগদীশ্বর যাহা করেন সন্তোষপূর্ব্বক তাহাই ভোগ করিতে হয়।

পুরাতন গ্রন্থকর্ত্তা "কবিকঙ্কণ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বিদ্যাধর, কাশীদাস, কীর্ত্তিবাস, কেতকীদাস, রামেশ্বর, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র" প্রভৃতির জীবন চরিত ও প্রকাশিত গীত বা পদ অথবা পদ্য সকল।

"কমলাকান্ত, নরচন্দ্র, দুর্গারাম, অন্ধ রামচন্দ্র, নন্দকুমার, দেওয়ান মহাশয়, নীলমণি ঘোষ, কালী ব্রহ্মা, [১৫] রাজা রামকৃষ্ণ, রাজা শ্রীকণ্ঠ, রাজা গিরিশচন্দ্র, রাধামোহন সেন" ইত্যাদি মহাশয়দিগের জীবন বৃত্তান্ত ও সংগীত সকল।

সংকীর্ত্তন ও ঢপ এবং কালীয় দমন যাত্রার সৃষ্টিকর্ত্তাদিগের জীবনচরিত ও পদাবলী।

"রাসু নৃসিংহ, রঘু, রামজী, হরু ঠাকুর, নীলু ঠাকুর, নিতাই দাস বৈষ্ণব, ও রামবসু" প্রভৃতি প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের কৃত উত্তম কবিতা ও জীবন চরিত।

যে মহাশয়েরা অনুগ্রহ করিয়া প্রার্থিত বিষয়ে আমারদিগের মনোরথ পরিপূর্ণ করিবেন, আমরা বিনা বেতনে চিরকাল তাঁহারদিগের নিকট বিক্রীত রহিব।

অপিচ যাহারা উপকারের বিনিময়ে ধনের প্রার্থনা করেন সে পক্ষেও আমরা কোনমতে সাধ্যের ত্রুটি করিব না।

অপরন্তু, অধুনা যে যে কবি মহাশয়েরা সজীব থাকিয়া কবিতা রচনা করিতেছেন, তাঁহারা অনুকম্পা পুরঃসর আপনাপন বিবরণ ও আপনাপন বিরচিত কবিতা সমস্ত লিখিয়া প্রেরণ করত চিরবাধ্য করিবেন।

আমরা যে উদ্দেশ্যে অদ্য এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলাম, যিনি পাঠ করিয়া ইহার মর্ম্ম গ্রহণ করিবেন তিনিই সুখী হইবেন, এতদ্বারা গত কালের কত গৌরব প্রকাশ পাইবে তাহা অনির্ব্বচনীয়।

সর্ব্বশেষে এই মাত্র প্রার্থনা, সর্ব্বতোভাবে সম্পন্ন না হউক, যিনি অধিক, বা অত্যল্প যাহা সংগ্রহ করিতে পারিবেন তাহাই পাঠাইবেন।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

প্রভাকর সম্পাদক।

কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত

ভূমিকা

বঙ্গভাষাভূষিত প্রাচীন পদ্যপুঞ্জ এবং তত্তৎপ্রচক পুরাতন কবি কদম্বের জীবনচরিত সংগ্রহ পূর্ব্বক সাধারণের সুগোচর করণার্থ আমি প্রায় দশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞাপথের পথিক হইয়া প্রতি নিয়তই উৎসাহরথের চালনা করিতেছি, এই বিষয়ের নিমিত্ত ধন, মন, জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়াছি,—সাংসারিক সমুদয় সুখ হইতে প্রায় বঞ্চিত হইয়াছি। নিয়তই আহার নিদ্রা ও আর আর কার্য্যের নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছি। স্থলপথে ও জলপথে ভ্রমণ পূর্ব্বক নানাস্থানি হইয়া নানালোকের উপাসনা করিতেছি। স্থান বিশেষে গমন পূর্ব্বক প্রার্থিত পদের ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে তৎপ্রতি নেত্র নিক্ষেপ করিতে করিতে এমত বিবেচনা করিতেছি, যেন এই পদ দ্বারা অদ্য ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইলাম, কি শিবপদ প্রাপ্ত হইলাম, কি ব্রহ্মপদই প্রাপ্ত হইলাম। তৎকালে পূর্ব্বকার সকল দুঃখ এককালেই দূর হইয়া যায়, সমুদয় উদ্যোগ, সমুদয় যত্ন এবং সমুদয় শ্রম সফল জ্ঞান করিয়া আনন্দ সাগরে ভাসমান হইতে থাকি। অপিচ সম্যক্ প্রকার চেষ্টা দ্বারা তাহা সংগ্রহ করিতে না পারিলে জগদীশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক শুদ্ধ আক্ষেপ করিয়াই অন্তঃকরণকে প্রবোধ প্রদান করি। অধুনা এই বিষয়ে আমার মনের অবস্থা যেরূপ হইয়াছে তাহা কেবল সর্ব্বান্তর্যামী জগদীশ্বর জানিতেছেন। এই জগতের অপর কোন আমোদেই আমোদ বোধ হয় না, অপর কোন কর্ম্মেই প্রবৃত্তি জন্মে না, কিছুতেই মন স্থির হয় না, অনবরত মনে মনে শুদ্ধ পুরাতন কবি-[২]-তার ভাবনাই করিতেছি। মনের মত একটি কবিতা প্রাপ্ত হইলে আর আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না, তখন বোধ হয় যেন এই ব্রহ্মানন্দ সাক্ষাৎকার হইল।

দশ বৎসর পর্য্যন্ত সঙ্কল্প করিয়া ক্রমশঃ অনুষ্ঠান করিতে করিতে প্রায় দেড় বৎসর গত হইল আমি এই কার্য্যের দৃষ্টান্তদর্শক হইয়াছি অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রেই অদ্বিতীয় মহাকবি কবিরঞ্জন-রামপ্রসাদ সেনের "জীবনবৃত্তান্ত" এবং তাঁহার প্রণীত "কালীকীর্ত্তন" ও কৃষ্ণকীর্ত্তনাভিধান-ভক্তিরস-প্রধান মধুর গান এবং অবয়াজেদের শান্তি, করুণা, হাস্য, ভয়ানক, অদ্ভুত ও বীর প্রভৃতি কতিপয়

রসঘটিত পদাবলী ১২৬০ সালের পৌষ মাসের প্রথম দিবসীয় প্রভাকরে প্রকটন করিয়াছি, তৎপাঠে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন।

অনন্তর ৺রামনিধি সেন অর্থাৎ "নিধুবাবু" ৺হরু ঠাকর। ৺রাম বসু। ৺নিতাইদাস বৈরাগী। ৺লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস। ৺রাসু ও নৃসিংহ এবং আর আর কয়েকজন মৃত কবির জীবনচরিত ও কবিতাকলাপ এক এক মাসের প্রথম দিনের পত্রে শ্রেণীবদ্ধরূপে প্রকাশ করিয়াছি, সেই সমস্ত বিষয় পাঠক মাত্রেরি পক্ষে সম্যক প্রকারে সন্তোষকর হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত স্বতন্ত্ররূপে তাহার কোন বিষয়টীই পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করা হয় নাই, কেবল সংবাদপত্রে পত্রস্থ করিয়াই রাখিয়াছি, অবিলম্বে মূল্য নির্দ্দিষ্ট পূর্ব্বক পুস্তক প্রকাশ করিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিব এমত মানস করিয়াছি, ফলে মনোময় পরম পুরুষের মনে কি আছে বলিতে পারি না। কোনরূপ দৈবঘটনা দ্বারা ভবিষ্যতে আর কোন ব্যাঘাত না জন্মিলে উৎসাহের কুৎসা নিবারণ পূর্ব্বক অভিপ্রেত বিষয় সুসিদ্ধ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব, নচেৎ এই পর্য্যন্তই শেষ করিতে হইল।

ইহাতে এতদ্রূপ আশঙ্কা করণের কারণ এই যে এই উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গেই দুর্যোগের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। অনুষ্ঠান করণ মাত্র গাত্র পাত্র অমনি বিষম ব্যাধির আধার হইয়াছে, অতিশয় দুর্ব্বল ও উত্থানশক্তি রহিত হইয়া দুই মাস কাল শয্যা সার পূর্ব্বক [৩] অপর কয়েক মাস নৌকাযোগে কেবল জলে জলে বহুস্থলে ভ্রমণ করিলাম, অথচ অদ্যাপি সুস্থ হইয়া পূর্ব্ববৎ সবলাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারি নাই, এই ঘোরতর ভয়ঙ্কর সময়েও ক্ষণকালের নিমিত্ত কবিতা সংগ্রহের অনুষ্ঠান হইতে বিরত হই নাই; রোগের ভোগের যাতনায় জড়িত হইয়া সময়ে সময়ে প্রাণের প্রত্যাশা পরিহার করিয়াছি, তথাচ এ প্রত্যাশা পরিত্যাগ করি নাই। সুপ্তির যথার্থ রূপ তৃপ্তি ভোগ প্রায় রহিত হইয়াছিল, অথচ স্বপ্নে স্বপ্নে এমত অনুমান হইয়াছে, যেন আমি আপনার অভিপ্রায়ানুযায়ি কার্য্য সাধন করিতেছি।

আমি সজীব থাকিয়া এই গুরুতর ব্যাপার সহজে সম্পন্ন করিতে পারি এমত সম্ভাবনা দেখিতে পাই না, কেননা একে ধনাভাব, তাহাতে আবার দৈহিক বলের হ্রাস হইয়া ক্রমে মৃত্যুর দিন নিকট হইয়া আসিতেছে। যদি মনের মত ধন থাকিত তবে কখনই এতাদৃশ খেদ করিতে হইত না, অর্থ ব্যয় দ্বারা অনেকাংশেই অভিলাষ পরিপূর্ণ করিতে পারিতাম। যাহা হউক, আমরা

এপর্য্যন্ত সাধ্যের অতীত অনেক ব্যয় করিয়াছি ও করিতেছি এবং ইহার পর যত দূর সাধ্য তত দূর করিব, কোনমতেই ক্রটি করিব না, ইহার নিমিত্ত যখন মহারম্ভ পরমায়ুঃ পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন সামান্য ধনে অধিক কি স্নেহ জন্মিতে পারে।

এতদ্দেশীয় পূর্ব্বতন কবিদিগের জীবন বৃত্তান্ত পূর্ব্বে কেহ লিখিয়া রাখেন নাই, এবং সেই সেই কবি মহাশয়েরাও আপনাপন বিরচিত প্রবন্ধ প্রকরণ প্রকটন পুরঃসর তন্মধ্যে স্ব স্ব পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন নাই, সুতরাং এইক্ষণে তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বলোকের সুগোচর করা যদ্রূপ কঠিন ব্যাপার হইয়াছে তাহা বিজ্ঞজনেরাই বিবেচনা করুন। আমি একপ্রকার সর্ব্বত্যাগী হইয়া শুদ্ধ এই বিষয়েই প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহাতে আমার অবস্থা যদ্রূপ হইয়াছে তাহা আমিই জানিতেছি, এবং যিনি সর্ব্বসাক্ষী তিনিই জানিতেছেন। আশা ও সাহসের আশ্রয় লইয়া [৪] অনুরাগ সহযোগে চেষ্টা এবং যত্ন না করিয়া যদিস্যাৎ আর পাঁচ বৎসর আলস্যের ক্রীতদাস হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বৃথা কালযাপন করিতাম, তবে এই দেশে ঐ সমস্ত কবিদিগের কবিতা ও সর্ব্ববিষয়ের পরিচয়াদি প্রকাশ হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহারদিগের নাম পর্য্যন্ত একেবারে লোপ হইয়া যাইত, যুবকেরা ইহার কিছুই জানিতে পারিতেন না। এই স্থলে ১০০ এক শত বৎসরের পূর্ব্বকার কথা উল্লেখ করণের প্রয়োজন করে না। ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যে যেরূপ নানা প্রকার চমৎকার চমৎকার বাঙ্গালা কবিতার ও গীতাদি রচনার ব্যাপার হইয়া গিয়াছে, বাক্যদ্বারা তাহার ব্যাখ্যা হইতে পারে না।

এতৎ কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে কোন কোন ধনি সম্ভবমত সাহায্য করণে অঙ্গীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু অধুনা সেই সেই ধনির সেই ধ্বনি শরৎকালের মেঘধ্বনির ন্যায় সমুদয় মিথ্যা হইল। যদি ধনাঢ্য মহাশয়েরা ধনের আনুকূল্য এবং কাব্যপ্রিয় উৎসুক মহাশয়েরা সংগ্রহের নিমিত্ত মনের ও শ্রমের আনুকূল্য করেন, তবে গুরুভারকে এত ভার বোধ করিতে হয় না, এই গুরু ভার সহজেই লঘু হইয়া আইসে।—যাহাতে দশের সংযোগ তাহাতেই যশের সংযোগ, ইহাতে সংশয় কি? কিন্তু এ পক্ষে কোন মতেই আর বিলম্ব বিধেয় নহে, কারণ প্রায় সমুদয় প্রাচীনলোক ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, এইক্ষণেও যে দুই এক ব্যক্তি জীবিত আছেন, তাঁহারাই অভ্যাস করিয়া রাখিয়াছেন, ইহার পর সেই রকম লোকের অভাব হইলেই সমুদয় অভাব হইয়া পড়িবে। তখন

কুবেরের ভাণ্ডার মুক্ত করিয়া বিতরণ করিলেও কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। যদিও সংপূর্ণরূপে সমস্ত সঙ্কলন করা সম্ভব নহে, তথাচ যে পর্য্যন্ত হইয়া উঠে তাহাই উত্তম। যখন সর্ব্বস্বই লোপ হইবার লক্ষণ হইয়াছে, সুতরাং তখন যৎকিঞ্চিৎ যাহা হস্তগত হয়, তাহাই সৌভাগ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক, উত্তমের অল্পাংশই অধিক। ঘৃত ও ক্ষীরের বিন্দুমাত্র ভোজন করিলেই তৃপ্তি জন্মে। [৫] তিমিরময় কুটীর মধ্যে আলোকের কিঞ্চিন্মাত্র আভাকেই যথেষ্ট বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবে।

কেহ যেন এমত বিবেচনা করেন না যে আমরা কেবল উপকারের কামনায় এই শুভসূত্রের সঞ্চার করিতেছি, ইহাতে আমারদিগের মনে অর্থের আশা কিছুমাত্রই নাই শুদ্ধ এইমাত্র অভিলাষ করিতেছি যে, এই অভিপ্রায়ানুসারে অপ্রকটিত পদ্যপুঞ্জ প্রকটিত হইলে পূর্ব্বতন মৃত কাব্যকর্ত্তারা আপনাপন কীর্ত্তি সহিত পৃথ্বী সমাজে পুনর্ব্বার সজীব হইবেন। দেশের উচ্চ সম্মান রক্ষা পাইয়া গৌরবপুষ্পের সৌরভ সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইবে। আধুনিক অহঙ্কারি অনিপুণ কবিদিগের গর্ব্ব পর্ব্বত চূড়া সহিত অধোভাগে পতিত হইবেক, এবং যাঁহারা কবিতা প্ররচনাপথে প্রবেশ করিয়া চরণ চালনা করিতেছেন, তাঁহারা চরণ চালনার পক্ষে বিশেষ সদুপায় প্রাপ্ত হইবেন। অনায়াসেই পদ লাভের পদ পাইবেন।

যে সকল নব্য সভ্য সম্প্রদায় বাঙ্গালা কাব্যের মর্ম্মজ্ঞ নহেন, সংপ্রতি প্রীতিচিত্তে অনুরোধ করি, আমরা যে সকল প্রাচীন কবিতা পত্রস্থ করিয়াছি ও করিতেছি, তাঁহারা কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ পূর্ব্বক তৎপ্রতি নেত্র নিক্ষেপ করিয়া যত্নযোগে স্থিরভাবে ভাব গ্রহণ করিলে অত্যন্ত সুখি হইবেন, এবং অতি সহজেই জানিতে পারিবেন যে বঙ্গভাষায় কবি সকল কবিতাদ্বারা কতদূর পর্য্যন্ত ভাবুকতা, রসিকতা ও প্রেমিকতা প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহারা কি বিচিত্র কৌশলে স্বভাবকে স্বভাবে রাখিয়া স্ব স্ব ভাবে মনের ভাব উদ্দীপন করিয়াছেন! শব্দের কি লালিত্য! মধুরত্ব! ভাবের কি মাধুর্য্য! সৌন্দর্য্য! রসের কি তাৎপর্য্য! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! কোন পক্ষেই অপ্রাচুর্য্য দেখিতে পাই না। আমরা যৎকালে সময় বিশেষে রসবিশেষের পদ্যপ্রবন্ধ পাঠ করি, তৎকালে যেন এমত প্রত্যক্ষ হয়, যে, সেই সকল রসসমুদ্র প্লাবিত হইয়া লহরী লীলাদ্বারা তরঙ্গ রঙ্গ বিস্তার করিতেছে। বিশেষতঃ নায়ক নায়িকা উক্তিভেদের দুই একটী বিষয় পাঠ করিয়া দেখিলে এখনি বোধ হইবে যেন স্ত্রী, [৬] পুরুষ অথবা

সহচরীগণ পরস্পর একত্র হইয়া আমারদিগের সাক্ষাতেই নানাভাবে নানা ভঙ্গিমায় নানা কৌশলে নানারসে কথোপকথন করিতেছেন, কিছুই অসাক্ষাৎকার বোধ হইবে না।

পূর্ব্বে কয়েকজন কবির জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া গতমাসের প্রথম দিবসের প্রভাকরে বিশ্ব বিখ্যাত মহাকবি ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন-চরিত উদিত করিয়াছি, এবং অদ্য সেই বিষয় স্বতন্ত্ররূপে উদ্ধৃত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম। এতন্মধ্যে উক্ত মহাশয়ের প্রণীত অনেকগুলীন অপ্রকাশিত উৎকৃষ্ট পদ প্রকটিত হইয়াছে,—সেই সকল কবিতা এ-পর্য্যন্ত কাহারো নেত্র কর্ণের গোচর হয় নাই, তাহার মধ্যে সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দি ও পারস্য ভাষার চমৎকার চমৎকার কবিতা আছে, যিনি অভিনিবেশ পূর্ব্বক তৎপ্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিবেন, তিনিই আশ্চর্য্যে অভিভূত হইবেন, তিনিই ভারতচন্দ্রের অসাধারণ ক্ষমতা ও পাণ্ডিত্য বিষয়ের প্রচুর প্রতিষ্ঠা করিতে থাকিবেন। অপিচ আমরা এই গ্রন্থে অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দরের কয়েকটী কঠিনতর ভাব-ভূষিত গূঢ়ার্থ-ঘটিত কবিতা টীকা সহিত প্রকটন করিয়াছি, তাহাতে সকলের মনে সন্তোষের সঞ্চার হইতে পারিবেক। এই পুস্তক বিদ্যালয়ের ছাত্র প্রভৃতি সর্ব্ব সাধারণের পক্ষেই অত্যন্ত হিতকর ও আনন্দকর হইবেক। এই স্থলে লিপি বাহুল্য করণের প্রয়োজন করে না, কিঞ্চিৎ বিবেচনা পূর্ব্বক পাঠ করিলে ভাবগ্রাহি মহাশয়েরা ভাবতরঙ্গে কখনো ভাসিতে ও কখনো ডুবিতে থাকিবেন।

যদিস্যাৎ সকলে সমাদর পূর্ব্বক এই গ্রন্থ গ্রহণ করেন, তবে আমরা বহুকালের পরিশ্রম ও যত্নের সার্থকতা জ্ঞান করিয়া ক্রমে ক্রমে অভিলষিত বিষয় সুসিদ্ধ করণে উৎসাহি হইব। ভারতচন্দ্রের কৃত অন্নদামঙ্গলের সমুদয় কবিতার টীকা করিয়া প্রকাশ করিব, এবং এই প্রণালীক্রমে কবি-রঞ্জন রামপ্রসাদের কালীকীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন, বিদ্যাসুন্দর এবং অবস্থাভেদের সমস্ত পদ টীকা সম্বলিত পুস্তকাকারে প্রকটন করিব। অপিচ কবিকঙ্কণের চণ্ডী-মধ্যে যে সকল [৭] প্রবন্ধ অতিশয় কঠিন, তাহারো ভাবার্থ ব্যাখ্যা করিব, এবং অপরাপর প্রাচীন কবিদিগের ভিন্ন ভিন্ন ভাব ভেদের পদাবলীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ স্বরূপার্থ সাধ্যমতে বর্ণনা করত সর্ব্ব লোকের সুবিদিত করিতে কখনই ত্রুটি করিব না। এইক্ষণে গত কালের কথাই নাই, জীবনের অবশিষ্ট কাল যাহা এ পর্য্যন্ত বক্রী আছে তাহা শুদ্ধ এই কার্য্যেই যাপন করিব।

যদিও আমারদিগের এই সঙ্কল্প উচ্চ তরু-ফল-গ্রহণেচ্ছু বামনের ন্যায় হাস্য-জনক হইতেছে, অর্থাৎ এই নরলোকে বাস করিয়া পরলোকে গমন করিতে না হয়। আর ব্রহ্মার ন্যায় পরমায়ুঃ কুবেরের ন্যায় ধন, ব্যাসের ন্যায় লিপিশক্তি এবং ভীমের ন্যায় বল, এই কয়েকটীর একত্র সংযোগ হয়, তবে একদিন প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য কিনা তাহাতেও সন্দেহ করিতে হয়। যাহা হউক, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান কদাচ নিন্দনীয় নহে; সর্ব্বতোভাবে সম্পন্ন না হয়, কি করিব, পরমেশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক সাধ্যমত চেষ্টার অন্যথা করিব না। ভাবি ভাবনা ভাবনা করিয়া ক্ষান্ত থাকা কর্ত্তব্য হয় না, ইহাতে আমারদিগের ভাগ্যক্রমে বাঞ্ছাফলপ্রদ পরম কারণিক পরমেশ্বর যাহা করিবেন তাহাই হইবেক।

এই বিষয় সংগ্রহ করণার্থ আমরা বহু ব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক বহু স্থান ভ্রমণ ও বহু লোকের উপাসনা করত বহুবিধ ক্লেশ গ্রহণ করিয়াছি, বহুকালের পর বহু পরিশ্রমে অদ্য অভিলষিত ফল সুসিদ্ধ করিলাম। যদিও এই পুস্তক অধিক পৃষ্ঠায় পরিপূরিত হয় নাই, কিন্তু ভূমিকা এবং কবিতা সকল অতি ক্ষুদ্রাক্ষরে মুদ্রিত হওয়াতে বিষয়ের স্বল্পতা কিছুই দেখিতে পাইবেন না, বড় অক্ষরে ক্ষুদ্র শরীরে প্রকাশ করিলে ইহার দ্বিগুণ অপেক্ষা বরং অধিক হইত। সুতরাং ১ একটাকা মূল্য নির্দ্ধারিত না করিলে কোনক্রমেই আমারদিগের গুরুতর পরিশ্রম, যত্ন, চেষ্টা এবং ব্যয়ের সফলতা হইতে পারে না। বোধ করি কাব্যানুরাগি গুণগ্রাহি মহাশয়েরা গুণাকর [৮] ভারতের "জীবনবৃত্তান্ত" ও পদ্যসমুদয় অমূল্য রত্ন তুল্য বিবেচনা করিয়া এই মূল্যের প্রতি কোনপ্রকার আপত্তি উপস্থিত করিবেন না, সকলেই অতি সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া অস্মদাদির উৎসাহ পথের কণ্টক নিবারণ করিবেন।

ইহার পূর্ব্বে কোন মহাশয় এতদ্দেশীয় কোন কবির জীবনচরিত প্রকাশ করেন নাই,—এবং এতৎ প্রকাশের কি ফল তাহাও কেহ জ্ঞাত হয়েন নাই—আমরা প্রথমেই ইহার পথপ্রদর্শক হইলাম। এতৎপাঠে বিশেষ উপকার বিবেচনা করিয়া যদি সকলে গ্রাহকতা ব্যাপারে উপযুক্তরূপ প্রযত্ন প্রকাশ করেন, তবে আমরা অশেষানন্দ লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে এই নিয়মে এক এক কবির বিষয়ে এক এক গ্রন্থ প্রকাশ করিব, তদ্দ্বারা দেশের যে কত প্রকার উপকার হইবে তাহা বাক্যযোগে ব্যক্ত হইবার নহে।

এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি আমারদিগের এই প্রভাকর যন্ত্রালয়ে, তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে, হুগলী কালেজের ছাত্র বাব নবকৃষ্ণ

রায়ের নিকট অথবা পটলডাঙ্গার চিপলাইব্রেরীতে স্বয়ং যাইলে কিম্বা মূল্য সহিত লোক পাঠাইলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ইত্যলং বিস্তরেণ।

কলিকাতা।	
১ আষাঢ় ১২৬২।	শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।	সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক।

সংশোধিতা মপিময়া বহুলপ্রয়াসৈ
বাক্যাবলীং পুনরিমাং প্রতি শোধয়ন্ত।
সন্তঃ সুশান্ত নয়নান্তনিরীক্ষণেন কৃত্বা
কৃপামিহ্ ময়ীশ্বরচন্দ্র গুপ্তে॥

এই স্থলে মহাকবি কবিরঞ্জন ৺রামপ্রসাদ সেন মহাশয়ের কয়েকটী সঙ্গীত উদ্ধৃত করিলাম।*

যথা।

[৫] "মনরে আমার এই বিনতি।
তুমি পড়া-পাখী হও করি স্তুতি॥
অবু তবু গিরি সুতা, পড়্লে শুন্লে দুদি ভাতি।
ওরে, জাননা কি ডাকের কথা, না পড়িলে ঠেঙ্গার গুতি॥ ১॥
কালী, কালী, কালী পড় মন্, কালীপদে, রাখ প্রীতি।
ওরে, পড় বাবা আত্মারাম্, আত্মজনোর্ কর গতি॥ ২॥
উড়ে উড়ে, বেড়ে বেড়ে, বেড়্য়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি।
ওরে গাছের ফলে, ক-দিন চলে, করবে, চার্ ফলে স্থিতি॥ ৩॥
রাম্ প্রসাদ্ বলে, ফলাগাছে, ফল্ পাবি মন্ শোন্ যুকতি।
ওরে, বোসে মূলে, কালী বোলে, গাছ নাড়া দেও, নিতি নিতি॥ ৪॥

তথা।

আর কায্ কি আমার কাশী।
ওরে, কালীপদ, কোকনদ্, তীর্থ রাশি রাশি॥
ওরে, হৃৎ কমলে, ধ্যান্ কালে, আনন্দ সাগরে ভাসি।

কালী নামে পাপ কোথা, মাথা নাই মাথা ব্যথা, অনল দাহন যথা, করে তুলারাশি॥ ১॥

গয়ায়্ করে পিণ্ড দান, পিতৃঋণে পায় ত্রাণ, যে করে কালীর ধ্যান্, তার গয়া শুনে হাসি॥ ২॥

কাশীতে মোলেই মুক্তি, বটে সে শিবের উক্তি, সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী॥ ৩॥

নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল, চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি॥ ৪॥

কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে, চতুর্ব্বর্গ করতলে, ভাব্লে এলোকেশী॥৫॥

* সংবাদপ্রভাকর, শুক্রবার ১ আশ্বিন ১২৬০ সাল। ইং ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩ সাল।—স.

মহাকবি মৃত রামপ্রসাদ সেন মহাশয় কিরূপ রসিক, কিরূপ প্রেমিক, কিরূপ ভাবুক, কিরূপ ভক্ত ও কিরূপ জ্ঞানী ছিলেন এই সঙ্গীত দ্বারাই প্রেমভক্তি-শালি মহাশয়েরা সহজে তাহার মর্ম্মজ্ঞ হইতে পারিবেন। যাঁহারা নিরাকার-বাদি, তাঁহারাও এই গান শুনিয়া প্রেমার্দ্র চিত্ত হইবেন, যেহেতু ইহা জ্ঞানযুক্ত প্রেমভক্তি রসে পরিপূরিত। নিরাকারবাদিরা 'ব্রহ্ম' শব্দ উল্লেখ পূর্ব্বক যাঁহার ভজন ও উপাসনা করেন, ইনি "কালী" নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহারি আরাধনা ও উপাসনা করিয়াছেন। ইহাতে নামান্তর জন্য ভাব, রস, ভক্তি, প্রেম এবং জ্ঞানগত বৈলক্ষণ্য কিছুই হইতে পারে না। উভয় পক্ষের উদ্দেশ্যই এক। যথার্থ ভাবে ব্রহ্মোপাসনা উভয় পক্ষেরি তুল্য হইতেছে। তাঁহারা যেমন তীর্থ পর্য্যটনাদি ক্রিয়া কর্ম্ম গ্রাহ্য করেন না, ইনিও তদনুরূপ করিয়াছেন। অতএব মহাত্মা রামপ্রসাদ সেন কি প্রকার জ্ঞানী ছিলেন তাহার প্রমাণ করণার্থ এই স্থলে আর একটী পদ প্রকটন করিলাম, সকলে অভিনিবেশ পূর্ব্বক তাহার ভাবার্থ গ্রহণ করুন।

যথা।

আর বাণিজ্যে কি বাসনা।
ওরে আমার মন বলনা॥
ঋণী আছেন্ ব্রহ্মময়ী,
সুখে সাধো সেই লহনা॥

ব্যজনে পবন বাস, চালনেতে সুপ্রকাশ, মনরে। ওরে, শরীরস্থা ব্রহ্মময়ী নিদ্রিতা জন্মাও চেতনা॥ ১

কাণে যদি ঢোকে জল, বার্ করে যে জানে কল, মনরে, ওরে, সে জলে মিশায়ে জল ঐহিকের এরূপ ভাবনা।২

ঘরে আছে মহারত্ন, ভ্রান্তিক্রমে কাঁচে যত্ন, মনরে, ওরে শ্রীনাথ্ দত্ত, কর তত্ত্ব, কলের কপাট্ খোলনা॥৩

অপুত্র জন্মিল নাতি, বুড়া দাদা দিদী ঘাতী, মনরে। ওরে, জনন মরণা-শৌচ্ সন্ধ্যা পূজা বিড়ম্বনা।৪

প্রসাদ বলে বারে, বারে, না চিনিলে আপনারে, মনরে। ওরে, সিন্দুর বিধবার ভালে, মরি কিবে বিবেচনা।৫

এই কবিতার যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ যিনি করিবেন তিনিই মহানন্দ-সাগর সলিলে নিমগ্ন হইবেন। এতদ্দ্বারা কবিরঞ্জনের তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রচুর রূপেই প্রকাশ পাইতেছে, তিনি ফলভোগ-বিরাগী অর্থাৎ নিষ্কামী হইয়া প্রগাঢ় ভক্তি ভরে সুপবিত্র প্রীতি চিত্তে পরম-পূজনীয় প্রেম-ময় প্রিয় উপাস্তের উপাসনা করিয়াছেন। সেন মহাত্মা স্বীয় কবিতায় স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছেন "যিনি জ্ঞানী তাঁহার সন্ধ্যা পূজার কিছুমাত্র প্রয়োজন করেনা। "অপূর্ব্ব জন্মিল নাতি, বুড়া দাদা দিদী ঘাতী, জনন মরণাশৌচ, সন্ধ্যা পূজা বিড়ম্বনা" এই পীযূষ পূরিত পদের নিগূঢ়ার্থ ও ভাব যাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইবেক, তিনিই অত্যন্ত প্রীত হইবেন। রামপ্রসাদী পদ সকল রত্নাকরবৎ, যত্ন পূর্ব্বক তাহার ভিতরে যত প্রবেশ করা যায় ততই অমূল্য রত্ন লাভ হইতে থাকে।

পাঠকগণ অবধান করুন।

যথা।

মায়ারে পরম কৌতুক্।
মায়াবদ্ধ জনে ধাবতি, অবদ্ধে লুটে সুখ্॥

[৬] আমি এই আমার্ এই, এভাবে ভাবে মূর্খ সেই, মনরে, ওরে, মিছা-মিছি সার্ ভেবে, সাহসে বাঁধে বুক্॥১॥

আমি কেবা আমার কেবা, আমা ভিন্ন আছে কেবা, মনরে, ওরে, কে করে কাহার সেবা, মিছা সুখ্ দুখ্॥২॥

দীপ জ্বলে আঁধার ঘরে, দ্রব্য যদি পায়, করে, মনরে, ওরে, তখনি নির্ব্বাণ্ করে, না রাখে এক্ টুক্॥৩॥

প্রাজ্ঞ অট্টালিকায় থাকো, আপনি আপন্ দেখো, মনরে, রামপ্রসাদ্ বলে মশারি তুলিয়া দেখ মুখ্॥৪॥

তথা।

মন কর কি তত্ত্ব তারে।
ওরে, উনমত্ত, আঁধার্ ঘরে॥
সে, যে, ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত, অভাবে কি ধর্ত্তে পারে॥

মন অগ্রে শশি-বশীভূত, কর তোমার শক্তিসারে।
ওরে, কোটার্ ভিতর্ চোর্‌কুটারী, ভোর হোলে সে লুকাবেরে ॥১॥
ষড়্‌দর্শনে দর্শন্ পেলেনা, আগম্ নিগম তন্ত্র ধোরে।
সে, যে, ভক্তি রসের রসিক্, সদানন্দে বিরাজ্ করে পুরে ॥২॥
সে ভাব্ লোতে পরম যোগী, যোগ্ করে যুগ্ যুগান্তরে।
হোলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন্, লোহাকে চুম্বুকে ধরে ॥৩॥
রামপ্রসাদ বলে, মাতৃ ভাবে, আমি তত্ত্ব করি যারে।
সেটা চাতরে কি ভাংবো হাঁড়ী বুঝরে মন্, ঠারে ঠোরে ॥৪॥

তথা।

এই সংসার ধোঁকার টাটি।
ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি ॥
ওরে ক্ষিতি, বহ্নি, বায়ু, জল, শূন্যে এত পরিপাটি।
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা, অহঙ্কারে লক্ষ কোটি ॥
যেমন শরার জলে সূর্য্য ছায়া, অভাবেতে স্বভাব যিটি ॥১॥
গর্ভে যখন যোগ তখন, ভূমে পোড়ে খেলেম মাটি।
ওরে, ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, দড়ির বেড়ী কিসে কাটি ॥২॥
রমণী বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটী।
আগে ইচ্ছা মুখে পান্ কোরে, বিষের জ্বালায় ছট্‌ফটি ॥৩॥
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদি পুরুষের আদি মেয়েটী।
ওমা যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, মা তুমি পাষাণের বেটী ॥৪॥

তথা।

ত্যজ মন, কুজন ভুজঙ্গম সঙ্গ।
কাল মত্ত মাতঙ্গেরে, না কর আতঙ্ক॥
অনিত্য বিষয় ত্যজ, নিত্য নিত্যময় ভজ, মকরন্দ রসে মজ, ওরে মন ভৃঙ্গ ॥১॥
স্বপ্নে রাজ্য লভ্য যেমন্, নিদ্রা ভঙ্গে ভাব কেমন, বিষয় জানিবে তেমন্, হোলে নিদ্রাভঙ্গ ॥২॥

অন্ধস্কন্ধে অন্ধ চড়ে, উভয়েতে কূপে পড়ে, কর্ম্মিকে কি কর্ম্ম ছাড়ে, তার কি প্রসঙ্গ ।৩।

এই যে তোমার ঘরে, ছয় চোরে চুরি করে, তুমি যাও পরের ঘরে, এত বড় রঙ্গ ॥৪॥

প্রসাদ্ বলে কাব্য এটা, তোমাতে জন্মিল যেটা, অঙ্গহীন হোয়ে সেটা, দগ্ধ করে অঙ্গ ॥৫॥

প্রাচীন কবি*

[২] রাম বসু প্রভৃতি প্রাচীন কবি-দিগের কৃত কবিতা সকল সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত আমরা ধন, মন ও জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়াছি। এজন্য সাংসারিক সমুদয় সুখ হইতে প্রায় বঞ্চিত হইয়াছি, নিয়তই আহার নিদ্রার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছি। স্থলপথে ও জলপথে গমন পূর্ব্বক নানাস্থানি হইয়া নানা লোকের উপাসনা করিতেছি। অমুক স্থানের অমুক মহাশয় অমুক গীতটী জানেন, ইহা শ্রুতিগোচর হইবামাত্রই তৎক্ষণাৎ যে উপায়ে হউক তাহার আশ্রয় লইয়া সেই গীতটী আনয়ন করিতেছি। তাহা না পাইলে জগদীশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক কেবল আক্ষেপ করিতেছি। অধুনা এ বিষয়ে আমার মনের অবস্থা যেরূপ হইয়াছে তাহা কেবল সর্ব্বান্তর্যামী জগদীশ্বর জানিতেছেন। এই জগতের কোন সুখই সুখ বোধ হয় না—কিছুতেই মন স্থির হয় না—অপর কোন কর্ম্মেই প্রবৃত্তি জন্মে না, শুদ্ধ পুরাতন গান গান করিয়া মনে মনেই ভাবনা করিতেছি। গীতের মত একটী গীত পাইলে আনন্দের পরিসীমা থাকে না, তৎকালে বোধ হয় যেন ব্রহ্মানন্দ সাক্ষাৎকার হইল।

কিছুদিন পূর্ব্বে যদি আমরা এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতাম তবে এতদিনে বোধ হয় আশার অর্দ্ধেক ফল লাভ হইত। এইক্ষণে উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গেই দুর্যোগের সাক্ষাৎ হইতেছে, কারণ অনুষ্ঠান করণমাত্র গাত্র-পাত্র বিষম ব্যাধির আধার হইল; দুই মাস কাল নিয়ত শয্যা সার করত পরিশেষ দুই মাস কেবল জলে জলে বহুস্থলে ভ্রমণ করিয়াছি। এই ঘোরতর ভয়ঙ্কর সময়েও ক্ষণকালের নিমিত্ত কবিতা সংগ্রহের অনুষ্ঠান হইতে বিরত হই নাই, রোগের ভোগের যাতনায় জড়িত হইয়া সময়ে সময়ে প্রাণের প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়াছি, তথাচ, এ প্রত্যাশায় বিরত হই নাই। সুপ্তির যথার্থ তৃপ্তি ভোগ প্রায় রহিত হইয়াছে, স্বপ্নে স্বপ্নে এমত বোধ হইয়াছে, যেন আপনার অভিপ্রায়ানুযায়ি কার্য্য সাধন করিতেছি।

আমরা সজীব থাকিয়া এই গুরুতর ব্যাপার সহজে সুসম্পন্ন করিতে পারি এমত সম্ভাবনা নাই, কেননা একে ধনাভাব, তাহাতে আবার দৈহিক বলের

---

*সংবাদপ্রভাকর, ১ অগ্রহায়ণ ১২৬১ সাল। ইং ১৫ নবেম্বর ১৮৫৪।—স.

হ্রাসতা হইয়া ক্রমে মৃত্যুর দিন নিকটস্থ হইতেছে। যদি মনের মত ধন থাকিত তবে কখনই এতাদৃশ খেদ করিতে হইত না, যেহেতু ধনের দ্বারা সুসিদ্ধ না হয় এমত কর্ম্ম প্রায় দেখা যায় না, অর্থ পাইলে লোভাকুল হইয়া অনেকেই আমারদিগের এই মনোরথ পূর্ণ করণে যত্নশীল হইতে পারেন। কি করিব? সে পক্ষে কোনরূপ উপায় দেখিতে পাই না, আমরা এ পর্য্যন্ত সাধ্যের অতীত অনেক ব্যয় করিয়াছি ও করিতেছি, আরো যত দূর সাধ্য ততদূর করিব। কেহ যদি অস্মদাদির যন্ত্রালয়াদি সর্ব্বস্ব লইয়া [৩] পুরাতন সমুদয় কবিতা প্রদান করেন, আমরা তাহাতে সর্ব্বতোভাবেই সম্মত আছি, পরাঙ্মুখ না হইয়া এই দণ্ডেই উন্মুখ হইব। ইহার নিমিত্ত যখন অমূল্য মহারত্ন পরমায়ুঃ পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন সামান্য অর্থে কি অধিক মায়া জন্মিতে পারে?

এতৎ কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে কোন কোন ধনি সম্ভবমত সাহায্য করণে অঙ্গীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু এইক্ষণে সেই সেই ধনির সেই সেই ধ্বনি শরৎ কালের মেঘ-ধ্বনিবৎ মিথ্যা হইল। ধনাঢ্য জনেরা যদিস্যাৎ এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ উৎসাহ প্রকাশ করেন, তবে এত আক্ষেপ প্রকাশ কেন করিতে হইবে? সকলেই ধনের কেনা, ধন পাইলে কে না যত্ন করিবেন? ফলে এখনো সময় বহির্ভূত হয় নাই, ইহার পর আর কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইলে সুফল সিদ্ধ করা এককালেই নিষ্ফল হইয়া উঠিবেক, কারণ প্রাচীন লোকের অভাব হইলে আর কাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে? তখন কুবেরের ভাণ্ডার শূন্য করিয়া ধন বিতরণ করিলেও ফলোদয় হইবে না। একে তো প্রাচীন অনুরাগি লোক সকল পূর্ব্বেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইদানীং যে দুই একজন অবশিষ্ট আছেন, তাঁহারদেরও আর বড় অপেক্ষা নাই, তাঁহারা কেহ কেহ কিছু কিছু জ্ঞাত আছেন, ইহার পর ঐ মহাশয়দিগের অভাব হইলে সংপূর্ণরূপেই তাহার অভাব হইয়া যাইবে। কেহই এসকল কবিতা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই, কেবল মুখে অভ্যাস করিয়া রাখিয়াছেন, সুতরাং সে অভ্যাস বৃথা হইতেছে। অক্ষরবদ্ধ থাকিলে অন্বেষণ দ্বারা প্রাপণ পক্ষে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। অভ্যাসকর্ত্তা স্বয়ং যতদিন জীবিত থাকেন তত দিন তাঁহার অভ্যাসে ফল দর্শে, পরে সমুদয় বিফল হইয়া যায়।

যদিও অর্থ ব্যয় ও শারীরিক শ্রম দ্বারা পরিপূর্ণরূপে সমুদয় সঙ্কলন করা সম্ভব নহে, তথাচ যে পর্য্যন্ত হয় তাহাই উত্তম, উত্তমের অল্পাংশই অধিক। ঘৃত ও ক্ষীরের বিন্দুমাত্র ভোজন করিলেই রসনার তৃপ্তি জন্মে। তিমিরময় কুটীর

মধ্যে আলোকের কিঞ্চিন্মাত্র আভাকেই যথেষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যখন সর্ব্বস্বই লোপ পাইবার লক্ষণ হইয়াছে তখন যৎকিঞ্চিৎ যাহা হস্তগত হয় তাহাই সৌভাগ্য বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবেক।—আমরা এই দৃষ্টান্তের অনুগামি হইয়া সাহসকে সহায় করত প্রবৃত্তি দেবীর চরণ শরণ লইয়াছি। এ বিষয়ে এরূপ চেষ্টা ও যত্ন না করিয়া যদি আর পাঁচ বৎসর কাল আলস্যের কৃতদাস হইয়া বৃথা যাপন করি, তবে এদেশে ঐ সমস্ত কবিরদিগের প্রণীত কবিতা গুলীন্ প্রকাশ হওয়া দূরে থাকুক্ তাঁহারদিগের নাম পর্য্যন্ত লোপ হইয়া আসিবে। নব্য জনেরা ইহার কিছুই জানিতে পারিবেন না। এক শত বৎসরের অধিককালের কথা প্রসঙ্গ করিতে চাহি না, ৪০।৫০ বর্ষের মধ্যে এই বঙ্গদেশে কবিগণের দ্বারা যে সকল আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কবিতা রচনা হইয়াছে তাহার যথার্থ গুণ ব্যাখ্যা করিতে হইলে প্রকৃত একখানি পুস্তক প্রকটন করিতে হয়। অদ্য বাসরীয় পত্রে যে কয়েকটী গীত উদিত হইল ইহার কোন কোন গীতে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেই অনায়াসে জানিতে পারিবেন।

স্থানাভাব জন্য অদ্য আমরা কেবল নিতাইদাস বৈরাগী ও রাম বসুর গান মাত্র প্রকাশ করিলাম, ক্রমে শ্রেণীবদ্ধরূপে অন্যান্য কবিদিগের কবিতা পত্রস্থ করিব, তখন তাবতেই পাঠ করিতে করিতে চমৎকৃত হইবেন।

কোন কোন গান অসংপূর্ণ প্রকাশ হওয়াতে দুঃখরূপ অনলে আমারদিগের অন্তঃকরণ অহরহঃ দগ্ধ হইতেছে। যথা রাম বসুর কবিতা।

"যদি অনলো, হোতো প্রবলো, জলে হইত নির্ব্বাণ্।
নহে কাল্ ভুজঙ্গ, দংশিলে অঙ্গ, মন্ত্রেতে বাঁচিত প্রাণ্॥"

হে পাঠকগণ! আপনারা বিবেচনা করুন, ইহার পর ঐ কবি কিরূপ বিচিত্র বাক্ কৌশলে মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা অব্যক্ত থাকা সাধারণ শোকের ব্যাপার নহে। আহা! ঐ কথাগুলীন্ লুপ্ত হওয়াতে ভাবগ্রাহি পাঠকের মন কেমন চঞ্চল হইতেছে! মধুকর প্রফুল্লপঙ্কজ-মধুপানে—চাতক নব-নীল নীরদ-নির্গত নীর-পানে—চকোর পরিপূর্ণ শরদিন্দু সুধা-পানে—ভুজঙ্গ সুশীতল মৃদুল দক্ষিণ সমীরণ সেবনে ভূপতি স্বীয় প্রিয় সিংহাসনে—সাধ্বী স্ত্রী পতিসুখ সম্ভোগে—রসিকজন রসালাপ আস্বাদনে—এবং কৃপণ আপন ধনে বঞ্চিত হইলে যাদৃশ দুঃখিত না হয়, আমরা উত্তম উত্তম কবিতার অপ্রাপ্য অসংপূর্ণ পূর্ণ করণে বঞ্চিত হওয়াতে তদপেক্ষা সহস্র গুণে ক্ষুব্ধ হইয়াছি। যদি পরমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া এই অভাব বিমোচন করিয়া দেন, তবেই খাস্তকে

শান্ত করিতে পারিব, নচেৎ তাহার চাঞ্চল্য নিবারণ পক্ষে কোনরূপ উপায় দেখিতে পাই না।

যৎকালে আমরা মনে মনে সংকল্প করিয়া এই মহাব্রতে ব্রতি হই, তৎকালে কৃতকার্য্য হওন পক্ষে কিছু মাত্রই ভরসা ছিল না, কিন্তু এই ক্ষণে বাঞ্ছাফলপ্রদ করুণাময় করুণ কটাক্ষ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে সেই আশার সুসার করিতেছেন। অতিশয় অভাবনীয় ও অচিন্তনীয় ঘটনার যোটনা হইতেছে। যাঁহার সহিত কস্মিন্‌কালে সাক্ষাৎ হয় নাই, তিনি হঠাৎ আসিয়া আপনিই দয়া বিতরণ করিতেছেন।—যাঁহার দ্বারা এ [৪] বিষয়ের আশা পূর্ণ হওনের অসম্ভাবনা জ্ঞান করিয়াছিলাম তাঁহার দ্বারাই বাঞ্ছা পূর্ণ হইতেছে।—দেশ বিদেশীয় অনেকেই অনুকূলভাবে আমারদিগের সহিত সমান উৎসুক হইয়া শ্রম ও চেষ্টা দ্বারা সমান অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন। এইরূপে যত উৎসাহি লোকের সংখ্যার আধিক্য হইবে ততই আমরা চরিতার্থ হইতে থাকিব। এই কার্য্য কখনই এক জনের সাধ্যাধীন নহে। ইহাতে বহুজনে সমভাবে অনুরত হইলে অনায়াসে বিড়ম্বনার পক্ষে বিবিধ প্রকার বিড়ম্বনাই হইতে পারে।—যাহাতে দশের মনোযোগ, তাহাতেই যশের সংযোগ, ইহাতে সংশয় কি? অতএব আমরা অত্যন্ত কাতর হইয়া বারম্বার বিপুল বিনয়ে ব্যক্ত করিতেছি, সকলে এই মহোৎসাহে কুৎসা না করিয়া যত্ন রত্ন অবলম্বন করিলেই কৃতার্থ হইতে পারিব।

কেহ যেন এমত বিবেচনা না করেন, যে, এইরূপ উপকার দ্বারা কেবল আমারদিগেরই উপকৃত করিবেন। আমরা উপকারের কামনায় কদাচ এই শুভসূত্রের সঞ্চার করি নাই। ইহাতে আমরা যেরূপ উপকৃত হইব, তাঁহারা বরং ততোধিক উপকৃত হইয়া অধীনস্থ সমস্ত লোককে উপকার গুণে বদ্ধ করিবেন। এবং চন্দ্রাদিত্যের স্থায়িত্ব কাল পর্য্যন্ত দেশের প্রধান হিতৈষি বন্ধুরূপে পরিগণ্য হইবেন। এই সকল কবিতা প্রকাশ পাইলে পূর্ব্বতন মৃত কবি মহাশয়েরা কীর্ত্তির সহিত পৃথ্বীতলে পুনর্ব্বার সজীব হইবেন। দেশের উচ্চ সম্মান রক্ষা পাইয়া গৌরব পুষ্পের সৌরভ সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইবে। আধুনিক অহঙ্কারি অনিপুণ কবিদিগের গর্ব্ব পর্ব্বত চূড়া সহিত অধোভাগে নিপতিত হইবেক। যাঁহারা কবিতা প্রবচনা পথের পথিক হইয়াছেন তাঁহারা সহজেই কার্য সিদ্ধির উপায় পথ প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

কতকগুলীন্ যুবক, যাঁহারা বিলিতি বিদ্যা অভ্যাস ও বিলিতি কবিতার

চালনাপূর্ব্বক কেবল বিলিতি রসিকতাই শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা বাঙ্গালা কবিতার রসজ্ঞ কি রূপে হইতে পারেন? কারণ প্রথমাবধি তাহার অনুশীলন হয় নাই, কিছুই শুনেন নাই। হাটে বাজারে, সামান্য যাত্রাওয়ালাদিগের মুখে দুই একটা ইতর কবিতা শুনিয়া উপহাস ও ঘৃণা করিয়া থাকেন। ফলে ইহাতে আমরা ঐ নব্যগণকে অভব্য বলিয়া দোষার্পণ করিতে পারি না, কেননা তাঁহারা অপরিচিত ব্যাপারে কি প্রকারে অনুরাগি হইবেন।—সংপ্রতি আমরা প্রীতিচিত্তে বিশেষ অনুরোধ করি, উক্ত মহোদয়েরা স্ব দেশীয় এই সমস্ত কবিতার প্রতি কিঞ্চিৎ প্রীতি প্রকাশ করিবেন। স্থির ভাবে অবলোকন করিয়া মনের যত্নে মর্ম্ম গ্রহণ করিলে অত্যন্ত সুখি হইবেন। দেশস্থ প্রাচীন কবি কদম্ব কবিতা দ্বারা কত দূর পর্য্যন্ত ভাবুকতা, রসিকতা ও প্রেমিকতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অনায়াসেই জানিতে পারিবেন।—ইঁহারা কি বিচিত্র কৌশলে স্বভাবকে স্বভাবে রাখিয়া স্ব স্ব ভাবে মনের ভাব উদ্দীপন করিয়াছেন। শব্দের কি লালিত্য! কি মধুরত্ব! ভাবের কি মাধুর্য্য! সৌন্দর্য্য! রসের কি তাৎপর্য্য! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! কোন পক্ষেই অপ্রাচুর্য্য দেখিতে পাই না। ইঁহারা যখন যে রসের কবিতা রচিয়াছেন, তখন সেই রসকে মূর্ত্তিমান করিয়াছেন, আমরা সময়ে সময়ে যৎকালে রস-বিশেষের পুরাতন কবিতা পাঠ করি, তৎকালে যেন এমত প্রত্যক্ষ হয়, যে, সেই সকল রস-সমুদ্র প্লাবিত হইয়া লহরীলীলা দ্বারা তরঙ্গ রঙ্গ বিস্তার করিতেছে।

আমরা অদ্য কেবল দুইজন কবির কবিতা পত্রস্থ করিলাম, এই সমস্ত হইতে বাছনী পূর্ব্বক নায়ক নায়িকার উক্তি ভেদের দুই একটি গান গান করিয়া অথবা পাঠ করিয়া দেখুন, এখনি বোধ হইবে, যেন স্ত্রী পুরুষ কিম্বা সহচরীগণ পরস্পর একত্র হইয়া আমারদিগের সাক্ষাতেই নানা ভঙ্গিমায় নানা কৌশলে নানা ভাবে নানা রসে কথোপকথন করিতেছেন। বিশেষতঃ রামবসু যেমন সরল শব্দে অতি সহজে মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন তেমন কেহই পারেন নাই, কিন্তু অপরাপর মহাশয়দিগে্য কোন অংশেই ন্যূন বলিতে পারি না, তবে কোন কোন বিষয়ে কোন কোন পক্ষে কিঞ্চিৎ তারতম্য মাত্র।

আমরা গত কালের গত ব্যাপার যত অন্বেষণ করিতেছি ততই সুখি হইতেছি, কত কাণ্ড পুস্তক রচিলে গত কাণ্ড শেষ হইয়া উঠে তাহার নির্ণয় করিতে পারিলাম না। অধুনা দুই শত বৎসরের পূর্ব্বকার কথা উত্থাপন করণে বিরত হইলাম। ১৪০ বা ১৫০ বর্ষ গত হইল "গোঁজলা গুঁই" নামক

এক ব্যক্তি "পেশাদারি" দল করিয়া ধনিদিগের গৃহে গাহনা করিতেন, ঐ ব্যক্তির সহিত তাহার প্রতিযোগিতা হইত তাহা জ্ঞাত হইতে পারি নাই, তৎকালে "টিকেরার" বাদ্যে সঙ্গত হইত। "লালুনন্দলাল, রঘু, ও রামজী" এই তিনজন কবিওয়ালা উক্ত "গোঁজলা গুঁই" প্রভৃতির সংগীত শিষ্য ছিলেন। রঘুর নিবাস ফরাসডাঙ্গায়, তিনি তন্তুবায় কুলে জন্ম গ্রহণ করেন, গান ও সুর করিতে ভাল পারিতেন। লালুনন্দলাল ও রামজীর বিবরণ অদ্যাপি জানিতে পারি নাই, এই তিন জন পুরাতন কবিওয়ালা, ইঁহারদিগের সময়ে "কাড়ার" বাদ্যে সঙ্গত হইত। হরুঠাকুর প্রভৃতির সময়ে "যোড়খাই" তৎপরে "ঢোলের" সঙ্গত আরম্ভ হইল।

[৫] হরুঠাকুর রঘুর শিষ্য, ভবানে বেনে রামজীর শিষ্য এবং নিতে বৈষ্ণব লালু নন্দলালের শিষ্য। ইঁহারা গাহনা সমাপন সময়ে আপনাপন "ওস্তাদ" অর্থাৎ গুরুর নামে ভণিতা দিতেন। যে কালে লালু নন্দলাল প্রভৃতি দল করিয়াছিলেন, সে কালে "কৃষ্ণ" নামক এক জন চর্ম্মকার, যাহাকে সাধারণে "কেষ্টা মুচী" বলিয়া উল্লেখ করিত, সেই ব্যক্তি কবিতা রচনা দ্বারা অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়াছিল, সম্ভ্রান্ত লোকেরা অতিশয় সমাদর পূর্ব্বক তাহার গান শ্রবণ করিতেন। বড় বড় "ওস্তাদি" দলেরা তাহার নিকট গান লইয়া তদ্দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করিত। ঐ মুচি হরুঠাকুরকে অনেকবার পরাজয় করিয়াছে। আমরা ঐ কেষ্টার গীতের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করি নাই, দেশটা ভ্রমণ করিয়া শেষ্‌টা কেবল একটা মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি।

যথা।

মহড়া।

"হরি কে বুঝে, তোমার এ লীলে।
ভাল প্রেম্ করিলে॥
হইয়ে ভূপতি, কুবুজা যুবতী, পাইয়ে শ্রীপতি, শ্রীমতী রাধারে রহিলে ভুলে।

চিতেন।

শ্যাম্ সেজেছ হে বেশ্, ওহে হৃষীকেশ্, রাখালের বেশ্ এখন্ কোথা লুকালে।

মাতুলো বধিলে, প্রতুলো করিলে, গোপো গোপীকুলে, গোকুলে অকূলে ভাসায়ে দিলে॥"

ইহার অপরাংশ প্রাপ্ত হই নাই। এ গানের বয়স ৭০ বর্ষ হইবে।

আহা!—যখন এত শুচি।—সংগীত সুধায় এত রুচি তখন ইহাকে "মুচি" বলিয়া কে সম্বোধন করিবে?

এই স্থলে দেখুন,—এতদ্ভিন্ন "নিমে শুঁড়ি" একজন গণনীয় কবি ছিল। যে দেশের তাঁতি, শুঁড়ি, মুচি হাড়ি, এতদ্রূপ সৎ কবি, সে দেশের ভদ্র লোকেরা আরো কত উত্তম হইবেন।

নিতাই দাসের "ওস্তাদ" লালু নন্দলালের কৃত একটী গান সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিলাম, সকলে দেখুন।

যথা।

মহড়া।

"হোলো এই সুখো লাভো পীরিতে।
চির দিন্ গেল কাঁদিতে॥

চিতেন।

হয়েছে না হবে কলঙ্ক আমার, গিয়েছে না যাবে কূল্।
ডুবেছি না ডুব্ দিয়ে দেখি পাতালো কত দূর॥
শেষে এই হোলো, কাণ্ডারি পালালো, তরণি লাগিলো ভাসিতে।

অন্তরা।

ধনো প্রাণো মনো যৌবনো দিয়ে, শরণো লইলাম্ যার্।
তবু তার্ মন্ পাওয়া সখি, আমারে হোলো ভার্॥
না পূরিলো সাধো, উদয়ে বিচ্ছেদো, মিছে পরিবাদো জগতে॥"

এই গানের বয়স ৮০ আশী বৎসরের ন্যূন নহে।—এ রচনাকে প্রশংসাই করিতে হইবে।

১৪০ এক শত চল্লিশ বৎসরের এদিক্ নহে, বরং অধিক হইবে, "গোঁজলা গুঁই" যে সমস্ত গান প্রস্তুত করেন, কোন বিশেষ বন্ধুর করুণায় তাহার দুইটী গীতের কিয়দংশ লাভ করত সাধারণের গোচরার্থ প্রফুল্লান্তঃকরণে প্রকটন করিলাম।

যথা।

"এসো এসো চাঁদ্‌বদনি।
এ রসে নিরসো কোরোনা ধনি॥

[illegible]

তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ, তুমি কমলিনী আমি সে ভৃঙ্গ, অনুমানে বুঝি আমি সে ভুজঙ্গ, তুমি আমার তায় রতনমণি। ১

তোমাতে আমাতে একই কায়া, আমি দেহ প্রাণ্ তুমিলো ছায়া, আমি মহাপ্রাণী তুমিলো মায়া, মনে মনে ভেবে দেখ আপনি ॥ ২

তথা।

"প্রাণ্ তোরে হেরিয়ে, দুখো দূরে গেলো মোর্।
বিরহ অনলো, হইলো শীতলো, জুড়ালো প্রাণো চকোর্ ॥"

ইহার প্রথম গানটি কি চমৎকার!—বেদান্ত সিদ্ধান্তবৎ সিদ্ধান্ত সূচক শব্দ বিন্যাস দ্বারা মনের ধ্বান্ত মোচন করিয়াছে। হায়রে, গুঁই, তুই, কি মানুষ ছিলিরে! মহাশূন্যের ন্যায় যাহার বিস্তার, তাহার নাম "গোজ্‌লা" আঁজ্‌লার দ্বারা কি এই গোঁজ্‌লার নিরূপণ হইতে পারে? তোমার সঙ্গীতে ভঙ্গিতে ও ও ইঙ্গিতের গুণে আমি যাবজ্জীবনের জন্য বদ্ধ রহিলাম।

এই সময়ে অগ্রে চিতেন ধরিয়া গাহনার প্রথা ছিল না। টপ্‌পার নিয়মানুসারে প্রথমে মহড়া ধরিয়া পরে পরে চিতেন ও অন্তরা গাহিত।

প্রাচীন কবি*

[দুই]

[৩] বঙ্গভাষা ভূষিত প্রাচীন কবিতা ও পুরাতন কবিদিগের জীবন চরিত প্রকাশ করিয়া সাধারণের সুগোচর করণার্থ আমরা প্রতিজ্ঞাপথের পথিক হইয়া যে প্রকার ক্লেশ ভোগ করিতেছি তাহার সাক্ষী কেবল এক পরমেশ্বর মাত্র। ইহার সুফল সিদ্ধির নিমিত্ত সময়াসময়, স্থানাস্থান, ও পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া মনুষ্যের যেরূপ উপাসনা করিতেছি এরূপে পরম পিতা পরম পুরুষের উপাসনা করিলে বোধ করি এত দিনে তাঁহাকে সাক্ষাৎকার করা যাইত। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমরা এই বিষয়ে এ পর্য্যন্ত মানুষের উপাসনা করিয়াছি কি মানুষের উপাসনা করি নাই, ইহার স্থিরতা কিছুই করিতে পারিলাম না, কারণ যাহারদিগের নিকট অধিক প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, এবং যাঁহারদিগের দ্বারা অধিক উপকারের সম্ভাবনা আছে, তাঁহারাই বারম্বার মুখে আশা প্রদান করিয়া পরিশেষ কার্য্য ঘটিত ব্যবহারে বঞ্চনা করিতেছেন, কি করি, উপায়াভাব। আমারদিগের ধন ও প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করা হইয়াছে, তাহার অধিক আর কি করিতে পারি— ইহাতে যদি কৃতকার্য্য না হই, তবে মনের আক্ষেপ মনেই রাখিয়া প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তি নীরে নিক্ষেপ করিব।

এই ব্যাপারে যিনি আমারদিগের মনের স্বরূপাভিপ্রায় উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই জানিতেছেন, ইহা কতদূর পর্য্যন্ত হিতকর ও মহৎ কার্য্য। দুঃখের কথা লিখিতে হইলে চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হয়, আমরা এ বিষয়ে যেরূপ দায়গ্রস্ত হইয়াছি, মা বাপ মরিলে লোকে ইহার অপেক্ষা কি অধিক দায়গ্রস্ত হইতে পারেন, বেদের টোল নাড়ার ন্যায় দপ্তর বগলে করিয়া দ্বার দ্বার টোটো করিতে বাকি রাখি নাই। যাঁহারা কবি বিশেষের অধিক বা অল্প কবিতা জ্ঞাত আছেন, তাঁহারদিগের পাত্র বিশেষে পায়ে ধরিয়াছি, হাতে ধরিয়াছি, কত বিনয় করিয়াছি—স্বয়ং গিয়াছি, লোক পাঠাইয়াছি, পত্র লিখিয়াছি,— পরের দ্বারা অনুরোধ করিয়াছি যাহা করিবার তাহা করিয়াছি ও যাহা

*সংবাদপ্রভাকর, শুক্রবার ১ পৌষ ১২৬১ সাল। ইং ১৫ ডিসেম্বর ১৮৫৪।—স.

না করিবার তাহাও করিয়াছি। অবশেষে দেশে জলাঞ্জলি দিয়া জলে ভাসিয়াছি, কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছি,—আহার নিদ্রার সুখে বর্জ্জিত হইয়াছি, প্রাণের প্রতি প্রত্যাশা ছাড়িয়াছি। কোথা আছি, কি করিতেছি এবং কোথাই বা যাইতেছি, তাহারো নিরূপণ নাই। আহা!—আমারদিগের এবম্প্রকার ব্যাকুলতা, ব্যগ্রতা, কাতরতা ও একাগ্রতা দেখিয়া ও শুনিয়া তাঁহারদিগের মনে কি কিঞ্চিন্মাত্র দয়ার উদ্রেক হয় না! তাঁহারা কি অন্তঃ-করণকে পাষাণবৎ কঠিন করিয়াছেন?—তাঁহারা কি ভ্রমেও এই অনুষ্ঠানকে সদনুষ্ঠান বলিয়া গণনা করিবেন না?

হায় কি পরিতাপ!—কি চমৎকার! যাঁহারা প্রথমেই প্রচুররূপে প্রবৃত্তি প্রদান করিয়া প্রধান পথ-প্রদর্শক হইয়াছিলেন—এবং যে যে মহাশয়ের ভরসায় আমরা ভরসা করিয়াছিলাম, অধুনা তাঁহারদিগের সেই ভরসা "দাদার ভরসা বাঁয়ে ছুরির" ন্যায় পেটের ছুরি হইয়া বসিল, গাছের উপর তুলিয়া দিয়া অনায়াসেই নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন, কি উপায়ে এই উৎসাহের কুৎসা ভঞ্জন হয় তাহা এককালেই বিস্মৃত হইয়াছেন। হা বিধাতঃ! যাঁহারদিগের ধনের সাক্ষি, বড় বড় বাড়ী, গাড়ী, জোড়া, ঘোড়া, জমিদারী ও কোম্পানির কাগজ, কোন বিষয়কেই তাহারদিগের মনের সাক্ষী দেখিতে পাই না, শুদ্ধ সাক্ষিগোপালের ন্যায় খাড়া থাকিয়া সম্পদের সাক্ষি জারি করিতেছেন। অপিচ ইঁহারা কেহ কেহ যেমন সত্যবাদি, তাহার সাক্ষি "সত্যবাদির সাক্ষিগোপাল" অর্থাৎ তাঁহাকে যেরূপ জানিতে পারিয়া মানিতে হয়, ইঁহারদিগেরো সেইরূপ জানিতে পারিয়া মানিতে হয়। আপনার বিষয়ের বিষয়ে যদ্রূপ, দেশের [৪] বিষয়ে তদ্রূপ হইবার বিষয় কি? হা জগদীশ্বর! তুমি আর কতদিনে এই দেশের প্রতি প্রীতি করিয়া বাঙ্গালির বুদ্ধি ও খোট্টার বল এবং ধনির ধন ও উৎসাহির মন, এই উভয়ের একত্র সংযোগ করিবে? ইহার দুই খানা না হউক, একখানা হইলেও রক্ষা পাই। এতদ্দেশীয় ব্যক্তিব্যূহের এবম্ভূত অদ্ভুত ব্যবহার না হইলে সকল বিষয়েই দেশের এপ্রকার দুরবস্থা কেন হইবে? আমরা অচ্ছেদ্য অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া এত অপমান কেন সহ্য করিব? ভিন্ন জাতীয় লোকের নিকট এতই বা উপহাস্য কেন হইব? পূর্ব্বতন গৌরব পুষ্পের সৌরভের এমন হ্রাসতা কেনই হইবে?

যাহা হউক, স্থানাভাব ও সময়ের স্বল্পতা বশতঃ অদ্য আমরা এ বিষয়ে প্রস্তাবের প্রাচুর্য্য করণের প্রার্থনা করি না, যখন প্রতিজ্ঞারথে আরোহণপূর্ব্বক

বিবিধ প্রকার বিঘ্ন পাইয়াও এ পর্য্যন্ত ভগ্নোদ্যম হই নাই, তখন বাঞ্ছা-ফলপ্রদ বিশ্বেশ্বর অবশ্যই বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। অতি সহজে ও শীঘ্র কার্য্যোদ্ধার হইত, না হয় অতি ক্লেশে ও বিলম্বে হইল। আমি সজীব থাকিয়া শেষ পর্য্যন্ত সমাধা করিতে না পারি, নাই পারিলাম, ইহার পর যিনি এই আসনে আরূঢ় হইবেন, তিনিই করিবেন। তবে স্বয়ং সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারিলে জীবনের সার্থকতা জ্ঞান করিতাম, তাহাই না করিলাম, যত দূর করিতে পারি তাহাতেই সুখী হইব।

বহুকাল যত্ন করিয়া অতি কষ্টে সংগ্রহ পূর্ব্বক হরুঠাকুরের জীবন বৃত্তান্ত ও কতকগুলীন গান অদ্যকার প্রভাকরে প্রকাশ করিলাম, পাঠকগণ অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে অপর্য্যাপ্ত আহ্লাদ প্রাপ্ত হইবেন।

প্রাচীন কবি*

[তিন]

[৩] এতদ্দেশীয় প্রাচীন কবিকদম্বের জীবন বৃত্তান্ত ও কবিতাকলাপ প্র-[৪]কাশার্থ আমরা এ পর্য্যন্ত ক্রমশই উৎসাহ-রথে আরোহণ করিয়া প্রতিজ্ঞা-পথে ভ্রমণ করিতেছি, এবং ভবিষ্যতে আর কতদিন এইরূপ অবস্থায় অবস্থান করিব তাহার কিছু নির্ণয় করিতে পারিলাম না। ফলে যে পর্য্যন্ত দেহের সহিত জীবনের সম্বন্ধ থাকিবে বোধ করি সেই পর্য্যন্তই এই ব্রত পালন করিতে হইবেক, ইহার মধ্যে উদ্‌যাপন হয় এমত সম্ভাবনা দেখিতে পাই না; তবে জীবনের উদযাপনেই উদযাপন বটে, কারণ ব্যাপার অত্যন্ত বৃহৎ, পরমায়ুঃ অতি অল্প, কি প্রকারে এই অল্প সময়ের মধ্যে কল্প সমাধা হইতে পারে? তবে যে পর্য্যন্ত হয় তাহাই যথেষ্ট, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া শ্লাঘা প্রকাশ করিব। আমরা বহুকালাবধি নিয়ত নিকর চেষ্টা ও প্রচুর প্রযত্নে প্রকর পরিশ্রম পুরঃসর এ পর্য্যন্ত যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার অধিকাংশ পত্রস্থ করিয়াছি, ক্রমে করিতেছি এবং ক্রমে ক্রমে আরো প্রকাশ করিব, কিছুই গোপন রাখিব না। যে উপায়ে হউক যত পাইব ততই মুদ্রিত করিব।

আমরা পূর্ব্বে ৺রামপ্রসাদ সেন, ৺রামনিধি গুপ্ত অর্থাৎ নিধুবাবু, ৺রাম বসু, ৺নিতাইদাস বৈরাগী ও তাঁহার সাহায্যকারিগণ, ৺হরু ঠাকুর, ৺অজু গোঁসাই, গোঁজ্‌লা গুঁই, কৃষ্ণ মুচী ও লালুনন্দলাল প্রভৃতি কতিপয় মৃত কবিকে- কীর্ত্তির সহিত সজীব করিয়াছি। অদ্য আবার ৺রাসু নৃসিংহ ও ৺লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাসকে জীবিত করিলাম, অদ্যাবধি ইঁহারা এই বিশ্ববিপিনে অমর হইয়া বিচরণ করিবেন। প্রভাকরের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেই সকলে ইঁহারদিগ্যে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন। পরন্তু এতদ্রূপ যত্নযোগে প্রতিমাসেই দুই এক ব্যক্তির প্রাণদান করিব। কীর্ত্তিকুশল জনেরা পৃথ্বী হইতে অবসৃত হয়েন না; যতদিন তাঁহারদের কীর্ত্তি থাকে, ততদিন তাঁহারা সজীব থাকেন; ফলে বিবিধ প্রকার বিড়ম্বনা ও দৈবঘটনা দ্বারা আর আর প্রকার কীর্ত্তি সকল অনায়াসেই নাশের গ্রাসে পতিত হইতে পারে, কিন্তু কবিগণের কবিতা-কীর্ত্তি

* সংবাদপ্রভাকর, শনিবার ১ মাঘ ১২৬১-সাল। ইং ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৫।—স.

কিছুতেই বিনষ্ট হইবার নহে, যত দিন বিচিত্র গগন ক্ষেত্র মধ্যে নক্ষত্রগণ ও চন্দ্র সূর্য্য স্ব স্ব ভাবে স্বভাবের শোভা বিস্তার করিতে থাকিবেন, ততদিন কাব্য-কর্ত্তারা মনুষ্যসমাজে বিরাজমান থাকিবেন তাহাতে সন্দেহ কি।

যিনি (পিতামহ) তিনি চিরকালই পিতামহ নামে পরিচিত রহিয়াছেন। এই সংসারে কত পিতামহ, ও কত পৌত্র হইতেছে ও লয় পাইতেছে, কিন্তু আদি কবি পিতামহ (যিনি) তিনি তিনিই আছেন। মনুমণ্ডলে (মনু) মনু রূপেই বিহার করিতেছেন। মনুর মনু জনু নাশ হয় নাই, মনুর তনু লয় পায় নাই। মহর্ষি বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, গৌতম, অষ্টাবক্র,—বেদব্যাস, শুক, কালিদাস প্রভৃতি মহাকবি মহাত্মারা কেহই ইহলোক পরিত্যাগ করেন নাই। তাবতেই জ্ঞান পূরিত গ্রন্থরূপ কলেবর ধারণ করিয়া উপদেশ দ্বারা আমাদিগ্যে কৃতার্থ করিতেছেন। সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টির ন্যায় তাঁহারদিগের সৃষ্টি সকল দৃষ্টিপথের তুষ্টিকর হইয়াছে। শুদ্ধ এই মহাশয়েরাই জীবিত আছেন এমত নহে। ইঁহারা কত কত মৃত সম্রাট, কত কত মৃত রাজমন্ত্রি, কত কত মৃত মহাযোদ্ধা, কত কত মৃত সদ্‌গুণান্বিত ব্যক্তি, কত কত মৃত রাজধানী, কত কত মৃত দ্বীপ উপদ্বীপ,—কত কত মৃত নদী, নদ, কত কত পর্ব্বত ও কত কত মৃত বন উপবনকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন তাহার নিরূপণ হয় না। অধুনা যাহারদের চিহ্নমাত্রও নাই তাহারা বিলক্ষণ মূর্ত্তিমান্ হইয়া কবির বর্ণনাপথে অস্মদাদির নয়ন নিকটেই নৃত্য করিতেছে। তাহারদিগের তাবৎকেই যেন প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি। সেই সমস্ত রাজা, সেই সমস্ত রাজমন্ত্রি, সেই সমস্ত যোদ্ধা, সেই সমস্ত সুধীর, সেই সমস্ত গহন, উপবন, দ্বীপ উপদ্বীপ, ও নদী নদাদি সকলি আমারদিগের সম্পাদকীয় আসনের অগ্রেই যেন রহিয়াছে। তন্মধ্যে কেহই অদৃশ্য-···নের অদৃশ্য নহে। অতএব এই স্থলে লেখনী পরিত্যাগ করনের পূর্ব্বেই একবার পূর্ব্বতন কবি মহাশয়দিগের চরণে প্রণিপাত করিলাম।

ইঁহারদিগের তুলনায় প্রাচীন বাঙ্গালি কবি মহোদয়েরা যদিও সমুদ্র সম্বন্ধে গোষ্পদ ও চন্দ্র সম্বন্ধে খদ্যোতবৎ, তথাচ সর্ব্বতোভাবেই আমারদিগের পূজ্য বটেন। এই ব্যক্তি-ব্যূহের অসাধারণ ক্ষমতার অসাধারণ প্রশংসা অবশ্যই করিতে হইবে। যাহা হউক,—কবির প্রণীত কবিতা সকল গোপন থাকা কি দুঃখের বিষয়! এই বিষয় যত প্রকাশ হইবে, ততই দেশের গৌরব বৃদ্ধি হইবে, ততই অনুশীলনের আধিক্য হইবে। ততই সভ্যতা ও সুখের সঞ্চালন হইবেক,—রত্ন গোময় মধ্যে গুপ্ত থাকিলে কেহই জানিতে পারে না,

সুতরাং সে রত্নের যত্নের সূত্র কি রূপে হইতে পারে। অতএব দেশস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে বিনয় পূর্ব্বক অনুরোধ করি, সকলে আমারদিগের সহিত সমান অনুরাগি হইয়া এতদ্বিষয়ে বিহিত মনোযোগ করুন।

আমরা যে সকল গীত প্রকাশ করিতেছি, তাহার লেখার দোষ কেহ ধর্ত্তব্য করিবেন না। কারণ গানের সুর যে রূপ তদনুসারে লিপিবদ্ধ করিতে হয়। নচেৎ কোন মতেই গাহনা করা যাইতে পারে না। পয়ার, ত্রিপদীর, যেরূপ নিয়ম, গীতের নিয়ম তদ্রূপ নহে। সুরানুযায়ি উচ্চারণ এবং উচ্চারণানুযায়ি লিখন। গীতের অগ্রে মহড়া, পরে চিতেন, সর্ব্বশেষ অন্তরা লিখিতে হয়। কিন্তু পড়িবার কি গাহিবার কালে প্রথমে [৫] চিতেন, পরে মহড়া, তৎপরেই অন্তরা ধরিতে হইবে। গত কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিবসীয় পত্রে আমরা বিস্তারিতরূপে তদ্বিশেষ উল্লেখ করিয়াছি, সেই পত্র দৃষ্টি করিলেই ইহার সমুদয় নিয়ম ও প্রণালী জানিতে পারিবেন। এইক্ষণে পুনর্ব্বার লেখা বাহুল্য মাত্র, পুরাতন গ্রাহক মহাশয়েরা সমস্তই জ্ঞাত আছেন, তাঁহারদিগের নিমিত্ত কিছুই লিখিতে হইবে না, কেবল নূতন গ্রাহকগণের নিমিত্ত সঙ্কেত মাত্র করিলাম।

প্রেরিত পত্র*

[এক]

[১] হাফ আখ্ড়াই।

শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

গত কার্ত্তিক পূজার রাত্রিতে যোড়াসাঁকোবাসি যশোরাশি, প্রিয়ভাষি, হিতাভিলাষি ধনিবর শ্রীযুত বাবু নবকুমার মল্লিক মহাশয়ের ভবনে "হাফ আখড়াই" নামক সংগীত সংগ্রামের বিশেষ আমোদ হইয়াছিল, ইহার প্রথম পক্ষের যোদ্ধা বাগবাজারের দল, অপর পক্ষের যোদ্ধা যোড়াসাঁকোর দল। এ বিষয়ে জয় পরাজয় উল্লেখ করিতে ও সংবাদ পত্রে ব্যক্ত করিতে আমার কিছুমাত্র অভিলাষ ছিল না, চন্দ্রিকা পত্রে কিঞ্চিৎ পক্ষপাতিতা প্রকাশ হওয়াতে স্থতরাং লেখনী ধারণ করিতে হইল, বাগবাজারের দল অগ্রে গাহিয়াছিলেন, যোড়াসাঁকোর দল তাহার উত্তর দেন, আমি সাধারণের গোচরার্থ পক্ষ প্রতিপক্ষের গীত গুলীন পশ্চাদ্ভাগে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম, এতদ্দৃষ্টে গীত বিষয়ের জয় পরাজয় সকলেই জানিতে পারিবেন। গাহনার বিষয় কি কহিব, বাগবাজারের গাহনা একটীবারো আছাড় খাইয়া আঘাত পায় নাই। যোড়াসাঁকোর গাহনা মধ্যে মধ্যে আছাড়ের ব্যাপারে সংপূর্ণরূপ সুখ্যাতি সংগ্রহ করিয়াছে, কিন্তু সাবাসি এই, যে, ভাঙ্গার পরে আবার যোড়া লাগিয়াছিল, ইহাতেই সকলে মর্ম্মানুধাবন করিবেন, হাটের মধ্যে আগড় খাটে না, দশের মুখে যশের ধ্বনি ধ্বনিত হইতেছে, অতএব এই ঘটনার শালিস মহাশয়দিগের রসের কথা প্রকাশ করণের প্রয়োজন করে না।

বাটীর অধ্যক্ষ বাবু নবকুমার মল্লিক এবং তদনুজ বাবু শ্যামচরণ মল্লিক মহাশয়ের শীলতা, সরলতা, সদ্ব্যবহার ও সুসম্ভাষণের কথা আমি লিপি দ্বারা শেষ করিতে পারি না, সৌজন্য জন্য ইহারা অতিশয় ধন্য ও অগ্রগণ্য হইয়াছেন, সমস্ত রাত্রি ও পরদিবস...

[২] ভয়ে সভা মধ্যে কেবল দণ্ডায়মান ছিলেন, একটী বারো বিশ্রামার্থ উপবেশন করেন নাই। ধনির ব্যবহার গুণে এতদ্রূপ অকপট সারল্যসূচক ধ্বনি ধ্বনিত হইলে তাহার নিকট কোন ধনীই ধনী হইতে পারে না।

---

* সংবাদপ্রভাকর, বুধবার ৮ অগ্রহায়ণ ১২৬১ সাল। ইং ২২ নবেম্বর ১৮৫৪।—স.

এইস্থলে পুনর্ব্বার একটী কথা লিখিতে হইল, আখড়াই গাহনায় ভাঙ্গা ও তালকাটা কত দোষ তাহা সকলেই বিবেচনা করুন। শালিস মহাশয়েরা সংগীত বিদ্যায় অত্যন্ত নিপুণ, অদ্বিতীয় বলিলেও হয়,—তাঁহারা ভাঙ্গার শালিসি কি করিলেন এবং খেউড়ের এই উত্তরকে কি সদুত্তর বিবেচনা করিলেন? এবং সখী সংবাদ দুটির কি যথার্থ উত্তর হইয়াছিল?

মাথার মণি রত্ন হইয়া রত্নের গুণ প্রকাশ করিলেই ভাল হয়। যত্নের ধন রত্নের মহিমা আমি বিশেষ জানি, তবে ফণির মস্তকে মণি স্থাপিত হইলে কিঞ্চিৎ ভয় করিতে হয়।

শিবের মুখে শিবের ধ্বনি ব্যক্ত হইলে জীবের পক্ষে অশিবের ব্যাপার কি হইতে পারে? তবে শিব ভোলানাথ, ইহাতে যাহা হইক।

বাগবাজারের দলের সখীসংবাদের প্রথম গীত।

মহড়া।

কৃষ্ণ কৃষ্ণময় হলো ব্রজে সকলে।

কৃষ্ণরূপ ভেবে কৃষ্ণরূপ, একি রূপ, অপরূপ, হয়ে যতনে কৃষ্ণপক্ষ, দিবসে কৃষ্ণ পক্ষ, কৃষ্ণ হে রাধায় কৃষ্ণ করিলে॥

এ সময় কোথা রহিলে।

জিনি কমলিনী, ব্রজের কমলিনী।

আহা শ্রীমতী কিশোরীর, হইল কি শরীর, তারে করিলে কালা, কালী কুরূপিনী॥

রাধা যেন রাধা নয়।

শ্রীরাধার সে আকার, নাহি আর, চেনা ভার, আহা তার, হাহাকার প্রাণে নাহি সয়॥

শ্রীমুখ কমল ভাসে কমলে।

চিতেন।

কে সব কে শব দেখ, শ্যাম শ্যাম হে বিরহে তোমার।

সুখ বৃন্দাবন, শ্মশান সম, কৃষ্ণ হে সবাকার শবাকার॥

যেন শব সবে, সব সঙ্গে সবে।

ভাবে ভাবিয়ে পরিণাম, করিছে হরি নাম দহে শুধু প্রাণ মধুর কৃষ্ণ রবে রবে॥

তোমা বিনে গোকুলে।

প্রতিকূল অনুকূল, শোকাকুল, উভয় কূল, গোপকুল, গোপীকুল ভাসে অকূলে ॥

হা কৃষ্ণ বলেও কাঁদে কুটিলে।

যোড়াসাঁকোর দলের প্রথম সখীসংবাদের উত্তর গীত।

মহড়া।

ওগো · য়ী শ্রীমতী তোমার ভাব দেখে হয়েছি বিস্ময়।

বাজায় শ্যাম গুণধাম, তোমার নাম বাঁশিতে,

তুমি মন দিলে শ্যামের ঠাঁই, শ্যামের মন নিলে রাই, তার সনে তোমার বিচ্ছেদ বিচ্ছেদ নয় ॥

চিতেন।

শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে, খেদে, কেন শোকাকুল।

গোপকুল, আর গোপীকুল, মিছে ভাবিয়ে আকুল ॥

আমরা জানি শ্যামের মন, কৃষ্ণ ছাড়া নহে এই শ্রীবৃন্দাবন।

হলে কি জন্যে এত উচাটন ॥

শ্যাম অঙ্গ, আর রাই অঙ্গ, আমরা জানি এক অঙ্গ, সে প্রেম হবে ভঙ্গ, মনে নাহি লাগে।

মিছে ভাব অনুরাগে ॥

প্রেমডোরে বান্ধা কৃষ্ণ রসময়।

অন্তরা।

আমরা সঙ্গিনী তোমার।

তোমার সকল জানি কেন ভুলাও গো আর। তুমি গোলকেশ্বরী মূলাধার ॥

রাধাকৃষ্ণ দুটি নাম, নামের অগ্রে তোমার নাম, এত মান দিয়াছেন, শ্যাম তোমায় ভালবেসে।

সে ভাবে অভাব ঘটিবে কিসে ॥

এ ভাবে বিচ্ছেদ কে করে প্রত্যয়।

বাগবাজারের দলের সখীসংবাদের
দ্বিতীয় অর্থাৎ পাল্টা গীত।

মহড়া।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম কোরে আমরা ত্যজি প্রাণ।

এ সময়, দীন দয়াময়, ধর রূপ মনোময়, ভবের ভরসা তুমি হরি, তব রূপ ধ্যানে মরি, প্রাণান্তে পদপ্রান্তে, দিও স্থান॥

দেখা দেও করুণা নিধান।

দুঃখে প্রাণে মরি, নাহি ভাবি হরি।

এই ভাবনা অন্তরে, কলঙ্ক সাগরে, পাছে ডুবে হে হরি, হরি নামের তরি॥

রাধা শ্যাম যুগল নাই।

রাধা শ্যাম যুগল নাম, মোক্ষধাম, তাহে বাম, এখন শ্যাম জপি নাম, কুবুজা কানাই॥

দুই বাঁকায় কর সখা পরিত্রাণ।

চিতেন।

জীবনে জীবন ত্যজি, শ্যাম শ্যাম হে কৃষ্ণ প্রণয়ে।

ওহে নিদয় শ্যাম, সদয় হয়ে গোপিকার উদয় হও হৃদয়ে॥

কোথা প্রাণহরি, আমরা প্রাণ হরি।

বাঁকা ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিঠাম, জন্মের শোধ হেরি শ্যাম, ভব জলধি তরি, দেহ পদ তরি॥

প্রাণের আশা নাহি আর।

সবিশেষ সদা দ্বেষ, কৃপালেশ করে শেষ, হৃষীকেশ ব্রজের বেশ, দেখাও একবার॥

কর আজ্ মরণকালে চরণ দান।

যোড়াসাঁকোর দলের দ্বিতীয় সখী সংবাদের উত্তর গীত।

মহড়া।

তোমার বিচ্ছেদ জ্বালা রবেনা, খেদে খেদে ত্যজনা ত্যজনা পরাণ।

ব্রজধাম, সুখধাম, নিত্যধাম জাননা।

তোমরা অবলা কুলবালা, হইওনা উতলা, সময়ে শ্রীচরণে পাবে স্থান॥

চিতেন।

জীবন ত্যজনা খেদে, মলে কি হবে।

দুদিন পরে পাবে প্রাণেশ্বর ব্রজে, প্রাণ জুড়াবে॥

[৩] যাবে বিচ্ছেদ যন্ত্রণা, মিছে আকুল হয়ে দুকূল হারাইওনা, পাবে ব্রজের ধন ব্রজে, ভেবোনা।

ধড়া চূড়া পীতাম্বর, পোরে বাঁকা বংশীধর, নয়নেতে নটবর, দেখিবে নিশ্চিন্তে।

যাবে যাবে সব বিচ্ছেদ চিন্তে॥
ব্রজেতে হবে শীতল তাপিত প্রাণ।

বাগবাজারের দলের খেঁউড়ের প্রথম গীত।

মহড়া।

কেন ওরে প্রাণ, প্রাণরে হয়েছ এমন।
কি ভাবেতে ঢল ঢল, কি রসেতে টলটল, তায়, খল খল হাস কি আভাষ,
ওরে প্রাণ প্রাণরে খল খল হাস, কি আভাষ,
আবার ছল ছল দেখি দুনয়ন।

চিতেন।

এসেছি আশাতে পেয়ে দুখ।
সদয় হও, একবার কথা কও, প্রাণরে তুলে বিধুমুখ॥
হবে প্রেমযাগ, নবরাগ, অনুরাগ দেখি তার।
বল ধনি, কেন মুখের ধ্বনি হয়নাকো প্রচার॥
ক্ষুধিত অতিথি আমি বঞ্চিত কোরনা।
ওরে প্রাণরে প্রাণ আমার, বঞ্চিত কোরনা॥
আমায় প্রেম সুধা কর বিতরণ।

যোড়াসাঁকোর দলের খেঁউড়ের প্রথম গীতের উত্তর।

মহড়া।

মাগ বলে আমায়, একি দায়, সুপাদ গোছালে।

মন্তরাম বাবাজী হয়ে, আমারে চাও কর্ত্তে বিয়ে, তোমার সোহাগিনী বোন্ ফেলে॥

চিতেন।

ঢল ঢল, টল টল, খল খল হাস।

ছল ছল, কেন চক্ষে জল, শুন তার আভাষ॥

ধোরে অতিথ বেশ, এলে শেষ, কর্ত্তে প্রেম যাগ।

মাথায় জটা, তায় কপ্নী আঁটা তুলসী বনের বাগ॥

আমি মৌনবতী, নবীনে যুবতী, একি জ্বালা হোলো, কথা কওয়ালে আজ কোন ছলে।

বাগবাজারের দলের খেঁউড়ের দ্বিতীয় অর্থাৎ পাল্‌টা গীত

মহড়া।

মৌনব্রত আজ প্রাণরে ভেঙ্গে গেল প্রাণ।

মৌনবতী রসবতী, হাসিয়ে বলেছ পতি,

সাধের পীরিতি, যুবতী, ওরে প্রাণ, প্রাণরে সাধের পীরিতি, যুবতী,

আমায় বরমালা তবে কর দান।

চিতেন।

বলনা ছলনা কেন আর।

বচনে, গেল এক্ষণে, প্রতিজ্ঞা তোমার॥

ডাকো পুরোহিত, কর হিত, সুবিহিত, হবে যশ।

রব বশে, তোমার নবরসে, করবো কত যশ॥

যতনে রাখিবো তোমায় হৃদয় নিবাসে,

ওরে প্রাণরে প্রাণ আমার হৃদয় নিবাসে।

যাকে প্রেম সুধা কোরে সুধা পান।

যোড়াসাঁকোর দলের খেঁউড়ের দ্বিতীয় অর্থাৎ পাল্টা গীতের উত্তর।

মহড়া।

তুষনাড়া রোগ, বিষম রোগ, স্বভাব গেল না।

তিলক কুতলি ঝুলি ধরে, তুলসী তলায় বেড়াও ঘুরে, তোমার বোন্‌মেগো নাম ঘুচোল্‌ না॥

চিতেন।

যা বল তা বল আমায় বেজার হব না।
এই আপশোষ, তোমার বোনের দোষ, দেখেও দেখ্‌লে না।
পেট্‌কো মুলুক চাঁদ, পেতে ফাঁদ, বোন্‌কে কল্লে বশ।
জেলের হাঁড়ি, সেই কড়ে রাঁড়ি, জানে কত রস॥

বকা ধার্ম্মিক হয়ে, রয়েছে বসিয়ে ঘরে মজা মেরে, তুমি ধর্ম্ম পানে চাইলে না।

——

প্রেরিত পত্র*

[দুই]

[৩] সন্দেহ তিমির সন্দোহ দূরীকর শ্রীযুত প্রভাকর প্রকাশক মহাশয় গুণাকরেষু।

শ্রীশ্রী৺কার্ত্তিকেয় পূজোপলক্ষে শ্রীযুত বাবু নবকুমার মল্লিক মহাশয়ের বাটীতে (হাফ আখড়াই) গান হইয়াছিল, তাহাতে বাগবাজার ও যোড়াসাঁকোবাসি দুইদলভুক্ত অনেক ভদ্র সন্তান গান করিয়াছিলেন, এবং সেই গান শ্রবণার্থেও অনেক ভাগ্যবান্ ভদ্র সন্তানের সমাগম হইয়াছিল, উভয় দলেই উচ্চৈঃস্বরে গান করত সজ্জন গণের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। উভয় দলেরি গলার মেল এবং যন্ত্রাদির মেল ছিল, বিশেষতঃ যোড়াসাঁকোর দলে এক বালকের ঢোল বাদ্যে মৃদঙ্গের বোল শুনিয়া সকলে চমৎকৃত এবং পরদিবস প্রাতে বাগ্‌বাজার নিবাসীয় দলের বাদ্য বিশারদের বাদ্যে অনেকেই আমোদিত হইয়াছিলেন।

বাগ্‌বাজারীয় দল আসর পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারদিগের সখীসংবাদ গানের যে প্রকার সানুপ্রাস ও শ্রুতি যমক সংযুক্ত বচন রচনা হইয়াছিল তাহা আলোচনা ও বিবেচনা করিয়া গান বিদগ্ধ কে না মুগ্ধ হইয়াছিলেন?

রচকের নাম প্রকাশ নাই, গুপ্ত কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় গুপ্ত ও অগুপ্ত এবং সুরদাতার নাম যদিও লুপ্ত কিন্তু মোহন সুরে চিত্ত মোহিত হওয়াতে সকলেই মোহন মোহন শব্দোচ্চারণ করিয়াছেন, যোড়াসাঁকোর দলস্থ সকলে ও বাগবাজারীয় দলের বহুকাল বিবেচিত সুরচিত সুমার্জ্জিত সখী সম্বাদ শুনিয়া উপস্থিত মতে যথা [৪] বিহিত সদুত্তর দেওয়াতে তাঁহারা ও প্রশংসিত হইয়াছিলেন, কেহ তাঁহারদিগকে নিন্দিত করেন নাই, বরং দ্রুতকবির কবিশক্তিতে সকলেই তৃপ্তি পাইয়াছিলেন, সখী সংবাদ গানের আভাস মাথুর শ্রীকৃষ্ণ বিরহে গোপীদিগের শ্রীবৃন্দাবনে বিলাপ তাহার যৎকিঞ্চিৎ সে অতি সুমধুর অর্থাৎ পাঠকদিগের নিদর্শনার্থে লিখিতেছি।

"কে সব কে শব দেখ, শ্যাম শ্যাম হে বিরহে তোমার।
সুখ বৃন্দাবন শ্মশান সম কৃষ্ণ হে সবাকার শবাকার॥

---

* সংবাদপ্রভাকর, বুধবার ৮ অগ্রহায়ণ ১২৬১ সাল। ইং ২২ নবেম্বর ১৮৫৪ সাল।—স.

যেন সব সবে, সব সবে শবে, দীন নাথ দীননাথ, ভাবে ভাবিয়া পরিণাম, করি হে হরি নাম, দেহে শুধু প্রাণ-মধুর কৃষ্ণ রবে রবে॥

তোমা বিনা গোকুলে।

প্রতিকূল অনুকূল শোকাকুল, উভয় কূল, গোপকূল, গোপীকূল, ভাসে অকূলে, হা কৃষ্ণ বোলেও কাঁদে কুটীলে।" ইত্যাদি

এই গানের বাক্‌চাতুর্য্য ও মাধুর্য্য বিচার্য্য হইয়া ভাব বিদগ্ধ সকলে যে বিমুগ্ধ হইবেন ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

এ গানের উত্তরে যোড়াসাঁকো নিবাসীয় দলেরাও যে উত্তর তৎক্ষণাৎ রচনা করিয়া দেন তাহাও অতি প্রশংস্য যেহেতুক বচন রচনার যদিও তাদৃশ মাধুর্য্য ও সৌকুমার্য্য না থাকুক কিন্তু কালাপেক্ষা ব্যতিরেকে আশু সদুত্তর দেওয়া হইয়াছে ইহা কেনা স্বীকার করিবেন? সে গানেরো কথা কিঞ্চিৎ লিখিতেছি · যথা।

"শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদ খেদে কেন শোকাকুল, গোপকুল, আর গোপীকুল, মিছে ভাবিয়া আকুল, আমরা জানি শ্যামের মন, কৃষ্ণ ছাড়া নহে এই বৃন্দাবন, প্রাণ সই ওগো প্রাণ সই।

হোলে কি জন্মে এত উচ্চাটন শ্যাম অঙ্গ আর রাই অঙ্গ (সই প্রাণ সইরে) আমরা জানি একাঙ্গ, সে প্রেমে হবে ভঙ্গ, মনে নাহি লাগে, মিছে ভাব প্রেমে অনুরাগে, প্রেম ডোরে বাঁধা কৃষ্ণ রসময়॥" ইত্যাদি।

এইরূপে দুই সখীসম্বাদের দুই গানের উত্তর প্রতিউত্তর হইলে পরে তদুত্তর মৌনবতীর ভাবে বাগবাজারীয় দলে এক গীত গান করেন সে গানের প্রতিউত্তর অতি সুকঠিন যে হেতুক মৌনবতীর ইতিহাস প্রকাশ আছে, যে মৌনবতী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে যে ব্যক্তি মৌনব্রত ভঙ্গ করিবেক তাহাকেই মাল্য প্রদান করিবেন তাহাতে মৌনবতীকে উত্তর দিতে হইলেই মৌনাবলম্বন ভঙ্গে হারিতে হয়, অর্থাৎ বিবাহ করিতে হয়, এবং মৌন থাকিলেও গানের উত্তরে নিরুত্তর হওয়াতেও হারি হয়, অতএব এমত উভয় সঙ্কটস্থলে যোড়াসাঁকো নিবাসীয় দলেরা যে সদ্‌যুক্তি ক্রমে ব্যঙ্গোক্তিতে উত্তর দিয়াছিলেন, ইহাতেই তাঁহারদিগের বুদ্ধি চাতুর্য্য ও ভাব মাধুর্য্য মানিতে হইবেক, ফলিতার্থ ঐতিহাসিক গানের আলাপনে ইতিহাসবেত্তা ব্যতিরেকে সর্ব্বসাধারণের বোধ সাধারণতা হেতুক তত্তৎকালে অনেকের ভাব গ্রহণ হয় নাই, কেবল ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া সকলে হাস্য করিয়াছিলেন, সে সকল গানের ভাষায়

অনেক অপভাষ মিলিত আছে, এজন্য তদ্বিস্তার বর্ণনে অশক্ত, যাঁহারা শ্রবণ করিয়াছেন তাঁহারা মস্তরাম বাবাজীর কথায় অবশ্যই মস্ত হইয়া থাকিবেন।

উভয় দলের সঙ্গীত বিচারার্থে মধ্যস্থ দুইজন হইয়াছিলেন, তাঁহারা উভয়ের কোন দলকে ঢোল বাজিতে দেন নাই, উভয়কেই ধন্যরূপে গণ্য করিয়া মান্য করিয়াছিলেন, তথাপি মধ্যস্থের কোন কালে যশ নাই, শুনিতে পাই যে বাগবাজারীয়েরা ঢোল বাজিতে না পাইয়া পক্ষপাতের গোল করিয়াছেন, করুন কিন্তু পক্ষপাত হইয়াছে একথা অপক্ষপাতি কোন ব্যক্তি বলিতে পারিবে না, যেহেতুক উভয় পক্ষের কোন পক্ষেই জিত হইয়াছে এমত বলিয়া মধ্যস্থেরা পাক্ষিকতা প্রকাশ করেন নাই, বরং উভয় পক্ষকেই প্রশংসা করিয়াছিলেন, তবে যোড়াসাঁকো নিবাসীয় দলেরা যে আসর না পাইয়াও তত্তৎকালে গানের উত্তর দিয়াছিলেন এবং স্পষ্ট স্পষ্ট গান করিয়াছিলেন ইহাতে তাঁহারদিগের বচন রচনা বাগবাজারীয় দলের সমান না হওয়াতেও তাঁহারদিগের ন্যূনতা হয় নাই, ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, এ সিদ্ধান্ত কুসিদ্ধান্ত কিম্বা ইহাতে পক্ষপাতের কোন সম্বন্ধ গন্ধ ছিল, এমত বলা যায় না। বিশেষতঃ যে ভদ্র সন্তানের ভবনে এরূপ ভদ্র সন্তানদিগের সমাগম ও গানোদ্যম হইয়াছিল সে নবকুমারবাবুর নৈপুণ্য ও সৌজন্যে কোন অংশে ত্রুটি হয় নাই, তাঁহারা উভয় সহোদরে স্ব স্ব বন্ধু সমভিব্যাহারে তাবৎ রাত্রি পরদিন প্রাতঃকালে এক প্রহর বেলা পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান এবং চলায়মান ছিলেন, এক দণ্ডও উপবেশন করেন নাই, তাঁহারদিগের সম্বন্ধে কোন পক্ষের পক্ষত সুদূরপরাহত, বরং উভয় পক্ষেরি সপক্ষতা সংপূর্ণ ছিল, অতএব এস্থলে অন্যায় হইয়াছে এমত সন্দেহ করিলেই অন্যায়। কিমধিকং।

কস্যচিদপক্ষপাতিনঃ।
সঙ্গীত সংগ্রাম দর্শিনঃ।

অবতারণা

কবিজীবনী রচনায় প্রেরণা

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৫-এর মধ্যে সংবাদপ্রভাকরে প্রাচীন কবি ও কবিওয়ালাদের যে জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করেছিলেন, তার একটা পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা। কবিজীবনী যে টুকু প্রকাশিত হয়েছিল, তাঁর পরিকল্পনা ছিল তার চেয়েও অনেক বড়ো। পাঠকদের সহযোগিতা প্রার্থনা করে তিনি যে আবেদন করেছিলেন, তাতে কৃত্তিবাস কাশীরাম কৃষ্ণদাস কবিরাজ রামেশ্বর ভট্টাচার্য মুকুন্দরাম প্রভৃতি কবিদের বিশেষ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর শাক্তসঙ্গীত রচয়িতাদের জীবন কাহিনী বর্ণনা করবেন বলে তিনি সংকল্প করেছিলেন। হয় তো মধ্যযুগের অনেক কবি সেকালের পাঠকদের কাছে তখন অপরিচিত ছিলেন বলে ঈশ্বর গুপ্তের পরিকল্পিত তালিকা থেকে বাদ গিয়েছেন ; বিশেষ করে বৈষ্ণব পদাবলীর কবিদের অনুল্লেখ চোখে পড়বারই মতো। আবার সপ্তোবিগত অষ্টাদশ শতাব্দীর শাক্ত কবিদের সংখ্যা-বাহুল্যও লক্ষণীয়। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের এই তালিকাকে তাঁর পরিকল্পনার সম্পূর্ণ তালিকা বলে মনে করবার কারণ নেই। আবার এ কথাও ঠিক যে কবিওয়ালাদের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের যোগ প্রত্যক্ষ ছিল বলেই সেই কাব্যধারা এবং সে সময়ের গীত সাধকদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল অনেক বেশি নিবিড়।

আমাদের দেশের প্রাচীন কবিদের প্রতি ঈশ্বর গুপ্তের এই মমতাকে তাঁর রক্ষণশীল মনোভাবের লক্ষণ বলে মনে করা কিছু অস্বাভাবিক নয়। বিশেষ করে যখন দেখা যাচ্ছে সমাজে আধুনিক শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন রসরুচির প্রসার ঘটেছে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশীয় সাহিত্য কীর্তি উদ্ধারের সঙ্গে আর একটি ঘটনারও যোগ কল্পনা করা যেতে পারে। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল বীটন সোসাইটিতে হরচন্দ্র দত্ত Bengali Poetry নামে একটি প্রবন্ধ পড়েন। বাংলা কাব্যে আদিরসের আতিশয্য, অতিশয়োক্তি এবং পরাধীনতার ফলে সমগ্রভাবে কাব্যসৃষ্টির অনুপযোগিতার ইঙ্গিত করা হয়েছিল। প্রবন্ধের আলোচনায় কৈলাসচন্দ্র বসু-ও লেখকের বক্তব্যকে সমর্থন করেন। হরচন্দ্র দত্ত এবং কৈলাসচন্দ্র বসু উভয়েই ইংরেজি শিক্ষার অনুরাগী নব্যবঙ্গের দলভুক্ত।

কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩ই মে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে বীটন সোসাইটিতে 'বাঙ্গলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি পূর্ববর্তী সমালোচনার উত্তর দেবার চেষ্টা করেন। এই প্রসঙ্গে রঙ্গলাল ইয়ং বেঙ্গলদের উদ্দেশ্যে কটাক্ষ করে বলেন—

'স্বরবোধে ইংরাজেরা আমারদিগকে হাজার "Lovers of Tom Tom" অর্থাৎ ঢাকবাদ্য প্রেমিক বলিয়া উপহাস করুন কিন্তু যথার্থ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্বরানুমেলকতা অনুভাবে আমারদিগের দেশীয় লোকেরা অতিশয় ক্ষমতাবান্ তথাপিও যদ্যপি ইয়ং বেঙ্গল বাবুরা সাধ করিয়া বেসুরা ও বেতালা হইতে চাহেন, হউন, তাহাতে ক্ষতি কি ?'[১]

রঙ্গলাল এখানে সম্ভবতঃ কবিগানকেই সমর্থন করতে চেয়েছেন। কারণ কবিগানেই এই শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার থাকত। রঙ্গলাল আরো বলেছেন—

'ভারতচন্দ্র রায়ের গাথায় শ্বাস প্রবহন এবং ভাবজালে অনল প্রভবন হইয়াছে কিনা তাহা রতিবিলাপ এবং বিদ্যাসুন্দরের পূর্ব্বরাগ অর্থাৎ প্রথম মিলনের পূর্ব্বাবস্থা পাঠ করিলেই প্রমাণীকৃত হইবেক, আমারদিগের ইয়ং বেঙ্গল বাবুরা যদি বিলাতীয় বিজাতীয় কুসংস্কার এবং দ্বেষ মৎসরতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উক্ত বর্ণনা সকল পাঠ করেন, তবে তত্তাবতে লার্ড বাইরনের ন্যায় প্রখর ভাবসমূহ দেখিতে পাইবেন। কবিকঙ্কণের ন্যায় ভারতচন্দ্র রায় যে সময়ে ছিলেন, সেই সময়ের প্রচলিত দেশাচার প্রভৃতি যথার্থরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন,. তাঁহার কাব্যসকলের বয়ঃক্রম অদ্য একশত বৎসর পূর্ণ হয় নাই, তথাচ এই শতাব্দের মধ্যে অস্মদ্দেশের আচার ব্যবহার কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা মনে করিলে নয়নপথে অশ্রুধারার শেষ হয় না।'[২]

রঙ্গলালের এই মন্তব্য এবং মনোভাবের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের অনুরূপ মন্তব্য তুলনীয়।[৩] রঙ্গলাল প্রাচীন বাঙালী কবিদের মধ্যে যাঁদের উল্লেখ করেছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত-ও তাঁদের নাম করেছিলেন—কবিকঙ্কণ, কৃত্তিবাস, কাশীদাস, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, দুর্গাপ্রসাদ, রামচন্দ্র, রামেশ্বর, দেওয়ান রঘুনাথ রায়,

১ বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ, (১৮৫২), দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা, পৃ ৬।

২ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ২৬।

৩ বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ৩৪৪-৩৪৫।

নিধুবাবু, রাম বসু, রাধামোহন সেন। অবশ্য ঈশ্বর গুপ্ত আরো কোনো কোনো কবির নাম করেছিলেন, যাঁরা ছিলেন নিকট অতীতের। রঙ্গলাল সংবাদ প্রভাকরের অন্যতম লেখক ছিলেন, এটাও সর্বজনবিদিত। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিলের সংবাদপ্রভাকরে ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছিলেন, 'রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অস্মদ্দিগের সংযোজিত লেখক বন্ধু।' সুতরাং উভয়ের ঘনিষ্ঠতা বীটন সোসাইটির ঘটনার বহু পূর্বের। রঙ্গলালের প্রবন্ধের মূলে ঈশ্বর গুপ্তের প্রেরণা থাকা কিছুই বিচিত্র নয়। বিশেষতঃ এই সময়েই তিনি কবিজীবনী এবং তাঁদের গান সংগ্রহ করছেন। এক বছর পর থেকেই তিনি সেগুলি প্রকাশ করতে থাকেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি তথ্যও উল্লেখ করা যেতে পারে। রঙ্গলাল কবির দলে গানও বাঁধতেন বলে জানা যায়। কলকাতায় রামদুলাল সরকারের দুই পুত্র ছাতুবাবু এবং লাটুবাবু একটি কবির দল করেন; তাতে রঙ্গলাল কবি নিযুক্ত হয়েছিলেন।[১] কবিগানের প্রতি অনুরাগও উভয়ের অন্তরঙ্গতার কারণ হওয়া সম্ভব।

রঙ্গলালের প্রবন্ধে দেশের সাহিত্য এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে রক্ষণশীল দৃষ্টির পরিচয় আছে, ঈশ্বর গুপ্তের জীবনী-সংগ্রহের মূলে সেই রক্ষণশীল মনোভাবেরই অনুপ্রেরণা ছিল। তবু আধুনিক বাংলার জাগরণে ঈশ্বর গুপ্তের ভূমিকার যথার্থ স্বরূপ যাঁরা জানেন, তাঁরা জানেন নবযুগের প্রভাব অনেক দিক দিয়েই তাঁর চেতনাকে আলোকিত করেছিল। ব্রাহ্ম ধর্মের সঙ্গে সহযোগিতায়, স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে, নবশিক্ষাকে বরণ করে নেওয়াতে এমন কি বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সময়েও অন্ধ প্রতিবাদের পরিবর্তে সংযত মন্তব্যে ঈশ্বর গুপ্তের একটি উদার ব্যক্তিত্বের আভাস পাওয়া যায়। এই ঈশ্বর গুপ্তকে চিনতে হলে কবিতা অপেক্ষা সংবাদপ্রভাকরের সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলিকেই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা দরকার। নব্যবঙ্গ এবং আধুনিক যুগকে কখনো কখনো আক্রমণ করলেও আধুনিক অনেক দানকেই তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ইতিহাস-সংরক্ষণ তাদের মধ্যে একটি।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা স্বদেশের প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনা প্রবর্তন করে। তারপর থেকে শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে সাধারণ ভাবে ইতিহাসবোধ ক্রমে

---

১ দ্রষ্টব্য 'রঙ্গলালের জীবনী', রঙ্গলালের গ্রন্থাবলী, বসুমতী।

ক্রমে সঞ্চারিত হতে থাকে।[১] আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে ইতিহাস-বোধ এমন ভাবে মিশ্রিত হয়ে গেল যে ঐতিহ্য-মমতার দ্বারা চালিত হলেও কবি ঈশ্বর গুপ্ত জীবনী রচনা করতে গিয়ে সন তারিখ স্থান ঘটনার ক্রম ইত্যাদি যথাযথ বর্ণনা করবার চেষ্টার ক্রুটি করেন নি। বিশেষতঃ ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ রচনার সময় নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। রামনিধি গুপ্তের জীবনীতেও তিনি সেকালের ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ ঘটনার উল্লেখের দ্বারা সময় নির্দেশ করেছেন। তা ছাড়া আখড়াই সঙ্গীত প্রভৃতিরও ঐতিহাসিক উপাদান যা তিনি পেয়েছিলেন, সযত্নে লিখে রেখে গিয়েছেন। এর মূলে হয় তো অতীতপ্রীতি ছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক প্রেরণাও কম ছিল না কারণ তিনি জানতেন, তাঁর সময়েই কবি সঙ্গীতের সমাদর হ্রাস পেয়ে আসছে। অনেকেই এর সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতে আরম্ভ করেছে। প্রায় মাত্র পনর, ষোল বৎসর আগে নিধুবাবুর মৃত্যু হলেও "অনেকেই নিধু নিধু কহেন, কিন্তু নিধু শব্দটি কি, অর্থাৎ এই নিধু, কি গীতের নাম, কি সুরের নাম, কি রাগের নাম, কি মানুষের নাম, কি কি? তাহা জ্ঞাত নহেন।"[২] অবশ্য এটা নিশ্চয়ই অনুমান করা যায় সঙ্গীত-রসিকেরা নিধুবাবুকে ঠিকই জানতেন, কিন্তু ইংরেজি শিক্ষিত আধুনিকের নিকট নিধুবাবু বিস্মৃত হয়ে আসছেন। এই শিক্ষা ও রুচি দেশকে ব্যাপ্ত করবে; তখন হয় তো প্রাচীন সাহিত্য ও সমাজ সম্পর্কে ঐতিহাসিক আলোচনার প্রয়োজন ঘটবে। এই শিক্ষিত সমাজই ছিল ঈশ্বর গুপ্ত-রচিত জীবনীগুলির লক্ষ্য। রঙ্গলাল যেমন ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের রসিক হয়েও দেশীয় সাহিত্যের প্রতি নিবিড় মমতা ত্যাগ করতে পারেন নি, ঈশ্বর গুপ্তও তেমনি নবযুগের চিন্তাধারার স্পর্শ পেয়েও প্রাচীনের প্রতি মমত্বকে ত্যাগ করেন নি; বরং এই মমত্ববোধকে আধুনিক পদ্ধতিতে পরিবেশন করবার চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বলতে আজকাল যা বোঝায় ঈশ্বর গুপ্তের এই জীবনীগুলি ঠিক সে রকম হয়ে ওঠে নি। তিনি জীবনী সংগ্রহ করেছেন এবং তাঁদের রচনাও যথাসম্ভব রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন; কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসের যুগভাগ কিংবা যুগচেতনার ধারাবাহিকতার প্রতি পূর্ণ

১ ভবতোষ দত্ত, 'বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলার ইতিহাস', বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৬৩।

২ বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ১১৫।

মনোযোগ দিয়ে ইতিহাস লেখা হয় নি। তিনি বিভিন্ন কবিদের উপরেই বিশেষ করে জোর দিয়েছেন। তিনি সংকল্প করেছিলেন, ভিন্ন ভিন্ন কবিদের জীবনী ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে প্রকাশ করবেন। বর্তমান সংস্করণে কবিদের জীবৎকালের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে জীবনীগুলি সাজানো হয়েছে। তাতে ইতিহাসের অনুক্রম লক্ষ্য করার সুবিধা হবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতচন্দ্রের জন্ম থেকে এর আরম্ভ, রামপ্রসাদ এবং রামনিধি গুপ্ত দিয়ে কবিদের এই ইতিহাস শেষ। আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে রাসু নৃসিংহকে দিয়ে কবিওয়ালাদের ইতিহাসের আরম্ভ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে রাম বসুর মৃত্যু এবং লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাসের কাহিনী দিয়ে এই ইতিহাসের শেষ করা হয়েছে। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দী সমগ্রভাবে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি কাব্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় দেড়শ' বৎসর ঈশ্বর গুপ্তের পর্যালোচনার বিষয় ছিল। পরিশিষ্টে সংযোজিত 'প্রাচীন কবি' অধ্যায়ে তিনি আরও যে কবিদের জীবনী প্রকাশ করবেন বলে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেছেন তাঁরাও অধিকাংশই এই সময়েরই। আধুনিক পদ্ধতিতে ইতিহাস রচনা করতে গেলে সমসাময়িক দেশ ও কালের পূর্ণ সহযোগে সাহিত্যের ইতিহাসকে সম্পূর্ণ করে তুলতে হয়। ঈশ্বর গুপ্তের পরে হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে 'কবিচরিত' প্রকাশ করেছিলেন। তাতেও ঈশ্বর গুপ্তের পদ্ধতিই অনুসৃত হয়েছিল। বস্তুতঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের রূপ কল্পনা করতে দীর্ঘ সময় কেটে গিয়েছে। ঈশ্বর গুপ্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তার একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মাত্র।

ইতিহাসের উপকরণ কি ভাবে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন তার বিবরণ পাঠকদের প্রতি আবেদন, 'প্রাচীন কবি' শিরোনামায় প্রবন্ধ তিনটিতে ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্তের ভূমিকায় বিস্তৃত ভাবেই বলে গিয়েছেন। তা' ছাড়া জীবনী আলোচনাতেও তথ্য সংগ্রহের রীতিটি বুঝতে পারা যায়। দেখা যায় কবি ও কবিওয়ালাদের জীবনীর উপকরণ ঠিক একই রীতিতে সংগৃহীত হয় নি।

ভারতচন্দ্রের জীবনীর উপকরণ তিনি পেয়েছিলেন কবির মধ্যম পুত্র রামতনু রায়ের পুত্র তারকনাথ রায়ের নিকট থেকে। রামপ্রসাদের জীবন কাহিনী তিনি কিভাবে পেয়েছিলেন স্পষ্ট করে সে কথা তিনি বলেন নি তবে এই প্রসঙ্গে রামপ্রসাদের নিকর ভূমির সনন্দ পরীক্ষা করেছিলেন

বটে।[১] কুমারহট্ট হালিশহর ঈশ্বর গুপ্তের বাড়ী থেকে খুব বেশী দূরে নয়; সুতরাং কিম্বদন্তী ছাড়াও রামপ্রসাদের বংশধরদের সাক্ষাৎ পাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। রামপ্রসাদের জীবনী ১২৬০ সালের ১লা পৌষের সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হলে জনৈক পাঠক লিখেছিলেন গ্রামবৃদ্ধগণ সে সব বর্ণনা সত্য বলে স্বীকার করেছেন।[২] এই পত্রপ্রেরকই রামপ্রসাদ-সিরাজদ্দৌল্লার সাক্ষাৎকারের কিম্বদন্তীর সংবাদ দিয়েছিলেন। রামনিধি গুপ্তের জীবনী সংগ্রহ করতে তাঁকে বিশেষ বাধা পেতে হয় নি। ঈশ্বর গুপ্ত নিধুবাবুকে অবশ্যই দেখেছিলেন। তিনি বলেছেন বহু বৎসর যাবৎ তিনি তথ্যাদি সংগ্রহ করছিলেন; স্বভাবতঃই নিধুবাবুর সঙ্গে পরিচয় থাকা কিছু অপ্রত্যাশিত নয়। অন্ততঃ নিধুবাবুর পুত্র জয়গোপালের সঙ্গে সে ঈশ্বর গুপ্তের ঘনিষ্ঠতা ছিল তাতে সন্দেহ নেই। নিধুবাবুর গীতরত্ন গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে জয়গোপাল পিতার যে জীবনী দিয়েছেন, মাঝে কোনো কোনো অংশ বাদ থাকলেও ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদপ্রভাকরে প্রকাশিত নিধুবাবুর জীবনীর সঙ্গে তার আক্ষরিক সাদৃশ্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। নিধুবাবুর জীবন-কথা হয় তাঁর কাছ থেকেই, নয় জয়গোপালের নিকট থেকে ঈশ্বর গুপ্ত পেয়ে থাকবেন।

কবিওয়ালাদের জীবনী ও গান সংগ্রহ করতে তাঁকে যথেষ্ট ক্লেশ স্বীকার করতে হয়েছিল। কবিওয়ালারা কেউ সমাজে প্রতিষ্ঠিত মর্যাদাসম্পন্ন ছিল না; তাদের জীবনী সুজ্ঞাত থাকবার কথা নয়। দ্বিতীয়তঃ তাদের গান কখনোই পুঁথিবদ্ধ হয় নি। লোকের মুখে মুখে প্রচারিত ছিল মাত্র। সুতরাং তথ্য এবং গান সংগ্রহ করতে ঈশ্বর গুপ্তকে গ্রামাঞ্চলে এবং অন্যত্র ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। কেউ একটা গান জানে শুনলে তিনি যান বাহনের অসুবিধা সত্বেও সেখানে উপস্থিত হয়ে গানটি লিখে নিয়েছেন এবং এ রকম করেও অনেক সময় সম্পূর্ণ গান পান নি। এইজন্য ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদ এবং নিধুবাবুর জীবনী যত বিস্তারিত এবং তাতে যত তথ্য আছে, কবিওয়ালাদের জীবনীতে তা নেই। যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ, সনন্দ প্রভৃতি দলিল পরীক্ষা এবং কিম্বদন্তীর সাক্ষাৎ—মোটামুটি এই তিনটি ছিল ঈশ্বর গুপ্তের গবেষণার পদ্ধতি। প্রথম ও তৃতীয়টি পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের গবেষকদের

১ বর্ত্তমান গ্রন্থ, পৃ ৫৯।
২ বর্ত্তমান গ্রন্থ, পৃ ৮১।

নিকট পরম মূল্যবান। কারণ এই দুটির সুপ্রচুর ব্যবহার ঈশ্বর গুপ্ত যদি না করতেন, তা' হলে কালের সঙ্গে তারা চিরদিনের জন্যই লোপ পেত। দ্বিতীয় পদ্ধতিটিও খুবই মূল্যবান্ সন্দেহ নেই ; কিন্তু হয় তো অতটা নিশ্চিহ্নপ্রায় ছিল না। এই দলিল পরীক্ষা করেই ইদানীং ভারতচন্দ্রের জীবনের ঘটনায় নতুন সঙ্কেত পাওয়া যাচ্ছে। আধুনিক ইতিহাসকার কুলপঞ্জী, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদান, জীবনীগ্রন্থ এবং উনবিংশ শতাব্দীর সমসাময়িক সংবাদপত্র থেকে ঈশ্বর গুপ্তের দেওয়া তথ্যকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলবার চেষ্টা করেছেন। তবু ঈশ্বর গুপ্তের দেওয়া তথ্যই যে মূলতঃ অখণ্ডিত এবং আমাদের একমাত্র প্রধান অবলম্বন—এ কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও ভারতচন্দ্র

যে বিশিষ্ট সামাজিক পরিমণ্ডলের মধ্যে আমাদের দীর্ঘ মধ্যযুগের সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে তার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। আমাদের দীর্ঘকালের সাহিত্য সৃষ্টির বৈচিত্র্যহীনতা মধ্যযুগের একটা অপরিবর্তিত পট-ভূমির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এর মধ্যে ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যের আবির্ভাব সেই নিস্তরঙ্গ জাতীয় মানসে কিছু দিনের জন্য আলোড়ন এনে দিয়েছিল বটে কিন্তু সে আলোড়নও সম্প্রদায় এবং প্রথাবদ্ধতায় অবলুপ্ত হল, বৃহত্তর জাতীয় মানসের কাব্যসৃষ্টিতে কোনো মৌলিক পরিবর্তন বা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করতে পারল না অষ্টাদশ শতাব্দীতে মঙ্গল কাব্যের ধারা অব্যাহত থাকল। শাক্ত এবং স্মার্ত ধর্মের পুনরভ্যুত্থানের ফলে বৈষ্ণব ধর্ম এবং তার সংস্কৃতি গণ্ডীবদ্ধ হয়ে পড়ে। বৈষ্ণব ধর্মের তখনও যাঁরা ছিলেন ধারক, পদাবলীর সংকলন কিংবা পূর্ব গৌরবের ইতিহাস রচনায় তাঁরা তখন ব্যাপৃত। আর এদিকে শাক্ত ধর্মের জীবন্ত প্রভাব তখন নতুন এক সঙ্গীতের বন্যায় দেশকে প্লাবিত করছিল। বৈষ্ণব পদের রচনা তখনও যে চলে নি, তা' নয় ; কিন্তু এই শাক্তপদগুলি তখন বিশেষ এক অনুকূল পরিবেশে যুগান্তরণের সহায়কদের দ্বারাই জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল। এই সহায়করা ছিলেন প্রধানতঃ দেওয়ান অথবা রাজা এবং কখনো বা অন্য শ্রেণীর কেউ। আগে মঙ্গল কাব্য যাঁরা রচনা করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন সমাজের কৃষিজীবী মানুষ। পদাবলী যাঁরা রচনা করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন প্রধানতঃ সমাজের সাধারণ

স্তরেরই মানুষ। বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি যাদের উপর ন্যস্ত, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সেই সমাজের একটা মন্থর পরিবর্তন দেখা দিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মঙ্গলকাব্যের চরম উৎকর্ষ যিনি ঘটিয়েছিলেন, সেই ভারতচন্দ্র ছিলেন এক প্রাচীন রাজবংশের সন্তান। রামপ্রসাদ কোনো সচেতন প্রয়াস নিয়ে গান রচনা করেন নি, সে ছিল তাঁর ধর্মসাধনারই অঙ্গ। বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনায় তিনি পুরনো ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করেছিলেন। রামপ্রসাদ যদিও শ্রেষ্ঠ কুলীন বংশের সন্তান, প্রপিতামহ জয়কৃষ্ণের আমল থেকেই বংশে দৈন্যদশা দেখা দেয়। রামপ্রসাদের সময়ে সংসারে চরম দারিদ্র্য। ঈশ্বর গুপ্তের জীবনীর তৃতীয় কবি রামনিধি গুপ্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৃষ্ট মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কবি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজস্ব ব্যবস্থার ফলে ভূমিহীন কৃষিবঞ্চিত নিম্ন শ্রেণীর একদল মানুষ কোম্পানীর প্রসাদপুষ্ট ধনীদের সন্তোষ বিধানে কবিগানের প্রবর্তন করল। শাক্তগান যাঁরা রচনা করেছিলেন তাঁরা ছিলেন আবার ভিন্ন আর এক শ্রেণী। এঁরা কেউ প্রাচীন রাজবংশের, আবার কেউ মুর্শিদকুলী খাঁর আমলের দেওয়ান, কেউ কেউ অবশ্য কোম্পানীর আমলের দেওয়ান।

পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের প্রতি অবহিত হয়ে আমরা যদি আজ প্রশ্ন করি, এঁদের মধ্যে কার আদর্শ রক্ষা পেয়েছে, তা' হলে স্পষ্টতঃ রামনিধি গুপ্তই সেই গৌরব লাভ করবেন। ভারতচন্দ্রের মঙ্গলকাব্যের আদর্শ আপন শিল্প রূপের মধ্যে চরম উৎকর্ষ পেয়েছিল, উনবিংশ শতাব্দীর মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'বাসবদত্তা' কিংবা রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' সেই আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে নি। বিদ্যাসুন্দরের ব্যর্থ অনুকরণে তার অপমৃত্যু ঘটল। কবিওয়ালাদের শিল্পরীতি কিংবা ভাবের আদর্শ আমাদের নতুন যুগচেতনা এবং নতুন রুচি প্রবর্তনের সঙ্গে বিলীন হয়ে গেল; শাক্তগানে সত্যকার গীতি চেতনা ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু এর বিষয়বস্তু বা প্রকাশ-রীতি কোনোটাই আধুনিক সাহিত্যে বাহিত হয়ে আসে নি। এ-সব দিক্ বিবেচনা করলে দেখা যায় নিধুবাবুর প্রেমের গানগুলি বিষয় এবং প্রকাশ রীতির দিক্ দিয়েও পরবর্তী বাংলা প্রেমের কবিতার সঙ্গে যোগ রক্ষা করেছে। এই সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করা যাবে, মধ্যযুগের অবসানে যে নতুন সাহিত্যের প্রসার ঘটল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিমানসই ছিল তার উৎস। নিধুবাবুই ছিলেন আমাদের বাংলা সাহিত্যে প্রথম ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত কবি।

পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে এবং পরে—অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস এবং সাহিত্যকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করে দেখা যেতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ প্রধানতঃ মুর্শিদকুলী খাঁ এবং আলিবর্দী খাঁর শাসনকাল। সে সময় দেশের শাসন ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং সেই সঙ্গে সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার যে-ব্যবস্থা ছিল, দ্বিতীয়ার্ধে তা আর থাকেনি। ভারতচন্দ্রকে সত্য সত্যই প্রথমার্ধের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি বলা চলে। ভারতচন্দ্র সম্রান্ত উচ্চ বংশের সন্তান ছিলেন বলে দেশের বিভিন্ন সংঘাত প্রত্যক্ষভাবে তাঁর পরিবারকে স্পর্শ করেছিল। তাঁর জীবনে এমন ঘটনা ঘটেছিল, যেগুলির মূলে বৃহত্তর জাতীয় তাৎপর্য নিহিত ছিল। ভারতচন্দ্রের বাল্যকালে বর্ধমানরাজ কীর্তিচাঁদ পেঁড়োর গড় অধিকার করে নেন (১৭১২ খ্রী)। এই ঘটনার সময় বাংলার দেওয়ান মুর্শিদকুলী খাঁ। বাংলা দেশের ইতিহাসে মুর্শিদকুলী খাঁর শাসনকাল নিন্দা এবং প্রশংসা দুইই অর্জন করেছে। মুর্শিদকুলীর আগে বাংলাদেশ প্রায় সবটুকুই জায়গীর স্বরূপ মোগল কর্মচারীদের দেওয়া হয়েছিল। বেতনের পরিবর্তে ছিল এই ব্যবস্থা। সুতরাং রাজ্যের একমাত্র রাজস্ব ছিল নানা রকমের শুল্ক। সুবাদার এবং দেওয়ানরা ইংরেজদের উপরেই শুল্কের জন্য বেশি চাপ দিতেন। কারণ তারাই ছিল সবচেয়ে বড়ো ব্যবসায়ী। মুর্শিদকুলী খাঁ বাদশাহের অনুমতিক্রমে সমস্ত ব্যবস্থারই পরিবর্তন করলেন এবং প্রধান কানুনগো দর্পনারায়ণ এবং রঘুনন্দনের সহায়তায় রাজস্ব আদায়ের নতুন পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করলেন।[১] জায়গীরদারের জায়গীর বাংলা দেশ থেকে সরিয়ে উড়িষ্যায় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল। বাংলার জায়গীরগুলিকে খালসায় পরিবর্তিত করে বাদশাহের রাজস্ব বিভাগের অধীনে নিয়ে আসা হয়।[২] এ ছাড়াও আর একটি রীতিরও প্রবর্তন করা হল। রাজস্ব আদায়ের ভার ইজারাদারদের হাতে ছেড়ে দেওয়ায় এক নতুন শ্রেণীর জমিদারের উদ্ভব হল। বাংলা দেশে প্রাচীন কাল থেকে কোনো কোনো রাজবংশ তখনও পর্যন্ত মর্যাদা রক্ষা করে যাচ্ছিল। রাজস্ব ব্যাপারে বাদশাহের সঙ্গে তাদের যোগ ছিল প্রত্যক্ষ। কিন্তু মুর্শিদকুলীর আমলে রাজস্ব আদায় করবার জন্যই একশ্রেণীর বিত্তশালী লোক জমির ইজারা পেল।

১ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালার ইতিহাস-নবাবী আমল', (১৩০৮), ৫ম অধ্যায়।

২ *History of Bengal*, Vol II, (D. U.) p. 408-410.

তারাও জমিদার আখ্যা পেল, কিন্তু আসলে তারা জমিদার-তালুকদার।[১] বর্ধমানের রাজপরিবার সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে স্থাপিত হয়েছিল। কৃষ্ণরামের সময়ে শোভাসিংহের বিদ্রোহে (১৬৯৬ খ্রী) বর্ধমানের বিপর্যয় ঘটে। কিন্তু তার পরে কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরাম শাহজাদা আজিমুশ্বানের অনুগ্রহে বর্ধমান ছাড়াও শোভাসিংহের অধিকৃত ভূসম্পত্তিও পেলেন। মুর্শিদকুলী খাঁর বন্দোবস্তে বর্ধমান চাকলার অধিকাংশ, মুর্শিদাবাদের মনোহরশাহী পরগণা প্রভৃতি বড়ো বড়ো পরগণার রাজস্ব আদায়ের অধিকার জগৎরামের পুত্র কীর্তিচন্দ্রের হাতে এল। এই নতুন ব্যবস্থায় প্রাচীন রাজবংশের অনেকেই সন্তুষ্ট হয় নি। মুর্শিদকুলী খাঁ এই অবাধ্য জমিদারদের বলপূর্বক উৎখাত অথবা বশীভূত করেন। বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের সঙ্গে ভুরশুটরাজের বিবাদ এই সময়ের।[২] মূলতঃ এই কারণেই কিনা বলতে পারি না, কীর্তিচন্দ্রের ভুরশুট অধিকারে (১৭১২) সুবাদার হস্তক্ষেপ করেন নি।

ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্তে উল্লিখিত রাজ্যক্ষয়ের ঘটনাটি এই সময়কার দেশব্যাপী সাধারণ ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্তনের একটি দৃষ্টান্ত। যাঁদের হাতে জমি ন্যস্ত হল, তাঁরাও যে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারলেন তা নয়। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ রামজীবন, রামকৃষ্ণ এবং রঘুরামকে মুর্শিদকুলীর কারাগারে কিছুকাল বাস করতে হয়েছিল[৩]। আর একটি ঘটনা ঈশ্বর গুপ্ত উল্লেখ করেছেন, সেটিও কম অর্থপূর্ণ নয়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নাকি মাঝে মাঝে চন্দননগরের ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কাছে দু'চার লক্ষ টাকা ঋণ নিতে আসতেন। সেই সূত্রেই ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় লাভ করেন। মুর্শিদকুলী খাঁর পূর্বে বাংলার প্রাচীন রাজবংশ একরকম স্বাধীনই ছিল বলা যায়। কিন্তু এখন কেন্দ্রীয় রাজকোষের চিন্তায় তাঁদের বহু উদ্বিগ্ন রজনী যাপন

১ Peary Chand Mitra, *The Zeminder and the Ryot*, Calcutta Review, 1846

২ কীর্তিচন্দ্রের জননী বিষ্ণুকুমারী আলমচন্দ্র এবং ক্ষেমচন্দ্রকে পাঠিয়ে ভুরশুট অধিকার করেছিলেন, ঈশ্বর গুপ্তের এই বিবরণ ভুল। কীর্তিচন্দ্র গদি লাভ করেন ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে। বিষ্ণুকুমারী কীর্তিচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র তিলকচন্দ্রের পত্নী—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশে পুত্র তেজচন্দ্রের পক্ষে জমিদারী পরিচালনা করেছিলেন। কীর্তিচন্দ্রের জননীর নাম ব্রজকিশোরী।—দ্রষ্টব্য D. K. Mukherji, *The Annals of Burdwan Rajfamily*, Calcutta Review, 1910. বিস্তৃত আলোচনার জন্য 'আনুষঙ্গিক তথ্য—ভারতচন্দ্র' দ্রষ্টব্য।

৩ 'ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত', টীকা-অংশ পৃ ৬১। আলিবর্দীর সময়ে কৃষ্ণচন্দ্রকেই বাকী রাজস্বের জন্য কারাবাস করতে হয়েছিল।

করতে হচ্ছে। নিশ্চিন্ত কলাচর্চার বদলে অর্থসংগ্রহের চিন্তাটা ক্রমেই বড়ো হয়ে উঠছে। অর্থ সংগ্রহের জন্য তাঁরা নির্ভর করেছেন সমাজের এক নতুন বিত্তবান্দের উপর। বিদেশী বণিকের দেওয়ানরা[১] এখন ধনকুবের। সংস্কৃতি ও সাহিত্যের এতদিনের পৃষ্ঠপোষকেরা এঁদেরই দ্বারস্থ হতে আরম্ভ করেছেন। ভারতচন্দ্র নিজে যেমন রাজ্য-বঞ্চিত হয়ে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীরই আশ্রয় পেয়েছিলেন, অগ্নিহোত্রী রাজপেয়ী শ্রীমান্ মহারাজ রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র রায়-ও তেমনি এঁর কাছেই সাহায্য ভিক্ষা করতেন। শুধু তিনি নন, সম্ভবতঃ বর্ধমানরাজ-পরিবারও ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সাহায্য নিতেন। বর্গির হাঙ্গামার সময় (১৭৪০-৪৪) কাউগাছীতে বর্ধমানের তিলকচন্দ্রের বিবাহ হয়। সেই বিবাহে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ছিলেন মাঙ্গলিক কর্মের অধ্যক্ষ। তাঁরই অনুরোধে ফরাসডাঙ্গা থেকে পাঁচশ সৈন্য কয়েক দিন কাউগাছীর রাজভবন রক্ষা করেছিল। দেখা যাবে ধীরে ধীরে অষ্টাদশ শতাব্দী প্রাচীন রাজবংশের ইতিহাসের পরিবর্তে দেওয়ান মুন্সী এবং কোম্পানীর-সৃষ্ট রাজাদের ইতিহাসে পূর্ণ হয়ে উঠবে। সাহিত্য-সংস্কৃতি পোষণের দায়িত্বভার এঁদেরই হাতে চলে যাবে। পেঁড়ো প্রভৃতি ছোট ছোট রাজ্যের রাজাদের পরিণাম ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্তেই সুস্পষ্ট। ভারতচন্দ্র সংস্কৃত শিক্ষা করে এসেছিলেন বলে ভ্রাতারা তাঁকে তিরস্কার করেছিল। কারণ এতে নাকি জীবিকার কোনো ব্যবস্থাই হবে না। নতুন এক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভবের লক্ষণ যে দেখা যাচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই।

সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাহিত্য পল্লী-পরিবেশ ত্যাগ করে রাজসভার মুখাপেক্ষী হয়েছে[২] একথা সত্য বটে, কিন্তু রাজারাও পূর্বতন শতাব্দীর মতো

---

১ 'দেওয়ান কথাটির চার রকম অর্থ: (১) মুসলমান আমলের অর্থ, প্রধান রাজস্ব সচিব (২) দেশীয় রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী (৩) টাঁকশাল প্রভৃতি সরকারী সংস্থার সর্বাধ্যক্ষ, কিংবা জমিদারের দেশীয় প্রধান কর্মচারী (৪) পরিবারের কর্মভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।—দ্রষ্টব্য Hobson Jobson or a Glossary of Anglo-Indian words and Phrases compiled by Yule and Burnell, (London 1886).

২ রামেশ্বর ভট্টাচার্য শিবায়নে (১৭১২) মেদিনীপুর কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহের; ঘনরাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গলে (১৭১১) কীর্তিচন্দ্রের; কবিচন্দ্র রামায়ণে ও মহাভারতে বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহ দেবের (১৭১২-৪৮); রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মমঙ্গলে (১৭৩২) গোপাল সিংহদেবের প্রশস্তি করেছেন।

নিরুদ্বিগ্ন জীবন যাপন করতে পারছিলেন না। ফলে তাঁদের আশ্রয়ে রচিত কাব্যে ক্ষণিক চিত্তবিনোদনের জন্য ভাষার চাকচিক্য, অনুপ্রাস ও ছন্দের চমক প্রবেশ করল। দীর্ঘ মঙ্গলকাব্যগুলি প্রাণহীন ভাষাসর্বস্ব হয়ে দাঁড়াল; কাব্যের গভীরতর রসাস্বাদনের পরিবর্তে এল বুদ্ধিগত শিল্পচর্চা। ঈশ্বর গুপ্ত ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের প্রসঙ্গে বলেছেন, "এই মহাশয় অন্নদামঙ্গল রচনার পূর্ব্বে কিম্বা পরে যে সকল ভাষা কবিতা রচনা করিয়াছেন, অন্নদামঙ্গলের সহিত তাহার তুলনা কোন ক্রমেই হইতে পারে না, ইহাতে বিশিষ্টরূপেই প্রমাণ হইতেছে যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভায় আশ্রয় লওয়াতেই নানা কারণে এই অন্নদামঙ্গল অনেক প্রকারে দোষশূন্য ও প্রকৃষ্ট হইয়াছে, পরন্তু পদ্যের দ্বারা ইঁহার পাণ্ডিত্য, বিদ্যা, পরিশ্রম এবং যত্নের ব্যাপার যত প্রকাশ পাইয়াছে, দৈবশক্তির পরিচয় তত প্রকাশ পায় নাই ফলতঃ যে পর্য্যন্ত ব্যক্ত হইয়াছে তাহাও সাধারণ নহে।" বলা বাহুল্য 'সর্ব্বপ্রকারে দোষশূন্য' কথাটির অর্থ বহিরঙ্গ ত্রুটিহীনতা। বস্তুতঃ জীবনে ভারতচন্দ্রের অভিজ্ঞতা বড়ো কম হয় নি। মুকুন্দরামের দারিদ্র্য এবং দেশত্যাগ তাঁর কাব্যে গভীরতা এনে দিয়েছিল সত্য, কিন্তু ভারতচন্দ্রের অভিজ্ঞতাও বড়ো বিচিত্র। লোকচরিত্রজ্ঞান ও নিয়তিচেতনা কি তাঁর কাব্যে গভীর রস সঞ্চার করতে পারত না? কিন্তু তার পরিবর্তে ভাষাচাতুর্য এবং শব্দসৌন্দর্যই সেকালের রাজার সহজ অনুগ্রহ লাভের উপায় ছিল। যে সব কবি ঠিক রাজার সভায় থাকতেন না, রাজাকে শোনাবার জন্য কাব্যের প্রসাধনে তাঁরাও যত্নবান্ হতেন, এটা সহজেই অনুমান করা যায়। এই রকম পদ্যচাতুর্যের একটি দৃষ্টান্ত ছিল পাদপূরণ-রীতি। উদ্ভট পদের অপ্রত্যাশিত পদ্য-সমাধান সম্ভবতঃ ভারতচন্দ্রের সময় থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। ঈশ্বর গুপ্ত নিজে এই রসের রসিক ছিলেন,[১] এমন কি উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেও অবসর-বিনোদনের লঘু উপায় হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানাতেও এর চর্চা চলেছে।[২] অষ্টাদশ শতাব্দীর উচ্চশ্রেণীর সমাজে ভোগমত্ততা বৃদ্ধি পেয়েছিল, এ কথা কতদূর ঠিক জানি না; কিন্তু তাঁদের জীবনযাত্রা যে অনিশ্চিত হয়ে উঠেছিল—নিরঙ্কুশ ভোগবিলাসে মগ্ন থাকা যে বাস্তব কারণেই কঠিন হয়ে পড়ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

---

১ দ্রষ্টব্য মন্মথনাথ ঘোষ, 'সেকালের লোক', (১৩৩০) পৃ ২৮, পাদটীকা।

২ দ্রষ্টব্য সুরেশ সমাজপতি, 'বঙ্কিম প্রসঙ্গ', পৃ ৮৩-৮৪।

এই সময়েরই কবি ছিলেন রামপ্রসাদ। ভারতচন্দ্রের জীবনী থেকে ইতিহাসের যে নির্দেশ পাই, রামপ্রসাদের জীবনে সেটা কতদূর প্রযোজ্য? দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় রামপ্রসাদের গানের দুঃখবাদের মূল নির্ণয় করেছিলেন যুগের পরিমণ্ডলে।[১] কিন্তু ভারতচন্দ্রের পরিবার সমাজে প্রতিষ্ঠিত এবং সম্রান্ত, সেইজন্য রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ঝড় তাঁকে যত প্রত্যক্ষভাবে সহ্য করতে হয়েছিল, দরিদ্র রামপ্রসাদ ঠিক সেভাবে ঝড়ের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ান নি। সাধারণ মানুষ তখন অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফল ভোগ করছে, তার সঙ্কেত পেলেও তাঁর জীবন থেকে ইতিহাসের দিগ্দর্শন পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। বিশেষতঃ রামপ্রসাদের স্মরণীয়তা যে গানে, সে ছিল ভারতচন্দ্রের কাব্যের এবং কবিমানসের সম্পূর্ণ বিপরীত। রামপ্রসাদের গানে নিঃসঙ্গ সাধনার নিভৃত হৃদয়ের অকৃত্রিম ব্যাকুলতার পরিচয় আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃত্রিম কাব্যকলার সঙ্গে এর যেন ঠিক তুলনা চলে না। এর প্রসঙ্গে দুটি তথ্য দেখানো হয়। একটি অষ্টাদশ শতাব্দীর শাক্তধর্মের পুনরুভ্যুত্থান এবং দ্বিতীয়, বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব। কোনোটাকেই অবশ্য অস্বীকার করবার হেতু নেই। রামপ্রসাদ প্রথম জীবনে বিদ্যাসুন্দর রচনা করেছিলেন; সে দিক্ থেকে তিনি প্রচলিত কাব্যকলাকে অনুসরণ করেছিলেন। তিনিও রচনাকালে জনৈক রাজকিশোরের উল্লেখ করেছেন যাঁর আদেশে তিনি কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পিসা শ্যামাসুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের জামাতাই হোন, অথবা হুগলীর দেওয়ানই হোন, দেখা যাচ্ছে কবি হিসাবে রামপ্রসাদের সাহিত্যিক সূচনা সেকালের সাধারণ নীতির ব্যতিক্রম ছিল না। এমন কি সাধন-সঙ্গীত রচনাকালেও দেওয়ান গোকুল ঘোষাল অথবা দেওয়ান দুর্গাচরণ মিত্র রামপ্রসাদের সাধনার পথের বাধা মুক্ত করে দিয়েছিলেন। রামপ্রসাদের সঙ্গীতকে আমরা আজ সাহিত্যের মানদণ্ডে বিচার করছি সত্য, কিন্তু কোনো পার্থিব শ্রোতার মুখ চেয়ে কখনোই তিনি গান লেখেননি, সেই জন্য সাধারণ সাহিত্যের নীতি দিয়ে বিচার করা বোধহয় ঠিক হবে না। বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে এর প্রধান পার্থক্যই এই যে, পদাবলীর একটি রসশাস্ত্র ছিল। সে ছিল একটা সম্প্রদায়ের সঙ্গীত। সেইজন্য কথাকে শিল্পশ্রীতে মণ্ডিত করে বৈষ্ণব সাধন সঙ্গীতের সাহিত্যিক রূপও বিচার্য হল।

---

১ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৭ম সং) পৃ ৫৩৩-৫৩৮।

কিন্তু রামপ্রসাদের গানের পশ্চাৎপটে কোনো রসশাস্ত্র বা সম্প্রদায় ছিল না। এগুলি একান্তই ব্যক্তিগত।

বস্তুতঃ এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য দিয়েই কবি রামপ্রসাদের সাহিত্যিক মূল্য বিচার হবে। রামপ্রসাদের যে এক নিজস্ব ভঙ্গি আছে—সেই ভঙ্গি বিষয়ে, প্রকাশ রীতিতে, গানের সুরে সমানভাবেই প্রকাশিত, আধুনিক সমালোচনার পরিভাষায় তাকে বলা চলে ষ্টাইল। আত্মপ্রকাশের আবেগে কবি বাঁধা রীতিকে বর্জন করে নিজেই এক স্বাধীন রীতি খুঁজে নিলেন। সে কথা বিবেচনা করলে রামপ্রসাদের মৌলিকতা অসামান্য। কবির এই স্বাতন্ত্র্য-স্পৃহার সত্যিই কি কিছু কারণ ছিল; দুঃখকে তিনি আভরণ করেছেন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধকে তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন, সুতরাং সমাজ বা জীবনের কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁর উপর কল্পনা করা সত্যই কঠিন। তবে ধর্মসাধকদের নির্জন উপলব্ধি অসম্ভব কিছু নয়; আমরা বরং ধর্ম-চেতনার বিশিষ্টতার কারণ কিছু সন্ধান করে দেখতে পারি মাত্র।

রামপ্রসাদের গানে এই ব্যক্তিমানসের প্রাধান্য বাংলা সাহিত্যের রূপান্তরণের সূচনা করেছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। মধ্যযুগের সাম্প্রদায়িক সাহিত্য সৃষ্টির কাল অবসানের মুখে—ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক হয়েও রামপ্রসাদ তারই ইঙ্গিত বহন করেছেন। ভারতচন্দ্র নিজেও দীর্ঘ মঙ্গল কাব্যের সঙ্গে ছোট ছোট কবিতা লিখেছেন। যদিও তার লক্ষ্য আলাদা, বিষয়ও আলাদা, কিন্তু আট রাত্রি বসে জাগরণ শোনবার সময় যে ফুরিয়েছে, সেই ব্যস্ততার সাড়া যেন সাহিত্যে দেখা দিল। নিধুবাবু আর মঙ্গল কাব্য লিখলেন না, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয় নিয়ে রামপ্রসাদের মতোই আত্মগত রীতিতে লিখলেন টপ্পা। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তো ক্ষুদ্রকায় সাহিত্য সৃষ্টিরই প্রাধান্য। রামপ্রসাদ পুঁথিপড়া রূপক বা অলঙ্কার ব্যবহার না করে দৈনন্দিন জীবনের থেকে তার উপকরণ সংগ্রহ করলেন—এতে কাব্যে এক নতুন ধরণের বাস্তবতা এল প্রাচীন মঙ্গল কাব্যের স্থূল বাস্তব এ নয়। এই বাস্তব কবির ব্যক্তিগত ভাবব্যাকুলতায় অর্থান্বিত।

হয় তো সাহিত্যরসাস্বাদনের সমাজ ভেঙে যেতে লাগল; তাই কবি হলেন নিঃসঙ্গ। আর এল নতুনতর অনুভূতি—দারিদ্র্যের শক্তির অনুভূতি। মঙ্গল কাব্যের ধর্মও ছিল শক্তির ধর্ম।[১] কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শক্তির কল্পনা

১ রবীন্দ্রনাথ, কালান্তর, 'বাতায়নিকের পত্র' দ্রষ্টব্য।

কাহিনী-রূপ ত্যাগ করে রামপ্রসাদের কণ্ঠে গীতিস্বরে ধ্বনিত হল। মঙ্গল কাব্যে শক্তিধর্ম দৈবী লীলায় প্রকাশিত হয়েছিল। কাহিনীর প্রয়োগে সেই ধর্ম-চেতনা ব্যক্তিস্পর্শহীন প্রথায় পর্যবসিত হয়েছিল। কিন্তু রামপ্রসাদ শক্তিকে ব্যক্তিগত উপলব্ধির নিবিড়তায় গীতিকবিতার আকারে রূপ দিলেন।

রামপ্রসাদের গানে অনেক জায়গাতেই দারিদ্র্যের কথা ব্যক্ত হয়েছে। রামপ্রসাদ সমাজের যে স্তরের মানুষ সেখানে দারিদ্র্য অভূতপূর্ব নয়, বিশেষতঃ শাসনকর্তার উৎপীড়নের ফলে দরিদ্রের দুঃখ দুর্দশা বৃদ্ধিই পেল। দারিদ্র্য-দুঃখ রামপ্রসাদ ভালো করেই জানতেন, আবার আকস্মিক নিরাকরণের অভিজ্ঞতাও তাঁর ছিল। ঈশ্বর গুপ্তের লিখিত জীবনবৃত্তান্তে তার যথেষ্ট উল্লেখ আছে। রামপ্রসাদের অধ্যাত্ম উপলব্ধি এই মিশ্র অভিজ্ঞতা থেকে উৎপন্ন। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দেওয়ান রাজা অথবা রাজকুমাররা যে শাক্ত সঙ্গীত রচনা করেছিলেন, তাঁরা শক্তিকে দেখেছিলেন দেশের পরিব্যাপ্ত ঘনঘটায়, অনিশ্চিততর ভাগ্যপরিবর্তনে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বৈষ্ণব ধর্মের প্লাবন যখন মন্দীভূত, তখন রামপ্রসাদের গানে এক নতুন ধর্মচেতনার আভাস দেখা দিল। রামপ্রসাদ কতকগুলি অভিনব কবিতা লিখলেন। যেমন কালীকীর্তনের রাসলীলা, গোষ্ঠলীলা এবং গৌরচন্দ্রিকা। এ ছাড়া লিখেছিলেন নৌকাখণ্ডের সঙ্গীত। কৃষ্ণকীর্তনের কয়েক পংক্তি-ও ঈশ্বর গুপ্ত উদ্ধার করেছেন। রামপ্রসাদ বৈষ্ণব বিষয়কে কখনো সোজাসুজি গ্রহণ করলেন; কখনো কালীকীর্তনের সঙ্গে মিশিয়ে নিলেন। এটা তিনি একটি অভিনব শিল্পপদ্ধতি রূপে রচনা করেছিলেন কিনা রচনাকাল জানা না থাকায় সুনিশ্চিতরূপে তার মীমাংসা করা যায় না। কিন্তু শাক্ত রামপ্রসাদের ধর্মমতের যে বৈশিষ্ট্য ঈশ্বর গুপ্ত লক্ষ্য করেছিলেন,[১] তাতে বৈষ্ণব এবং শাক্তধর্মের গোঁড়ামি ছিল না। এই সময়ের আর এক শ্রেণীর বিচিত্র কাব্যসৃষ্টিও উল্লেখযোগ্য। সত্যনারায়ণ বা সত্যপীরের পাঁচালীর উদ্ভবও এই সময়ের। তাতে শুধু সাম্প্রদায়িক ব্যবধান উত্তরণের চেষ্টাই নেই, ধর্মের ব্যবধানকেও অতিক্রম করার চেষ্টা আছে। বাংলা দেশ তখন এক বিপর্যয়ের দিকে অগ্রসর, রক্ষণশীল সাম্প্রদায়িকতা তখন অর্থহীন হয়ে রামপ্রসাদের কাছে শক্তিরূপার এক সর্বব্যাপী প্রভাব দেখা দিচ্ছিল। বহুকাল

---

১ দ্রষ্টব্য বর্তমান গ্রন্থ: পৃ ৮২ এবং ৩৩৭।

পর বঙ্কিমচন্দ্রই বলেছিলেন, ঈশ্বর গুপ্তের ঈশ্বরকে পিতৃভাবে কল্পনায় এবং রামপ্রসাদের মাতৃভাবে কল্পনায় প্রভেদ বড়ো অল্প। রামপ্রসাদের সঙ্গীত ও সাধনায় ভবিষ্যৎ সমাজ আভাসিত হচ্ছিল—এর থেকেই সেটা বোঝা যায়।[১]

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ ও রামনিধি

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি যেমন ছিলেন ভারতচন্দ্র, দ্বিতীয়ার্ধের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি তেমনি ছিলেন রামনিধি গুপ্ত। আমাদের মনে হয়, রামনিধি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যথাযোগ্যভাবে আলোচিত হন নি। বাংলা সাহিত্যে আত্মনিষ্ঠ ভাবের তিনিই সূচনা করেছিলেন, এ তথ্যটি অবশ্য সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু রামনিধি গুপ্তের জীবনীও ভারতচন্দ্রের জীবনীর মতোই ইতিহাসের নানা সঙ্কেতে পূর্ণ। এই দীর্ঘজীবী কবি বর্গির হাঙ্গামার সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন (১৭৪১)। পলাশীর যুদ্ধকালে তাঁর বয়স ষোলো। ইংরেজদের দেওয়ানী লাভের সময় তিনি চব্বিশ বৎসরের যুবক। রামমোহনের জন্ম ও মৃত্যু দুই-ই তাঁর জীবৎকালে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ এবং হিন্দু কলেজ স্থাপনও তিনি দেখেছিলেন; নব্যবঙ্গের আন্দোলন, ব্রাহ্ম ধর্মের সূচনা—এ সব কিছুরই তিনি দ্রষ্টা। ব্রহ্মসভার সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল বলেও শোনা যায়। ইংরেজি তিনি ভালো জানতেন, কিন্তু আধুনিক বাংলা দেশের মধ্যযুগীয় সংস্কৃতি-ধারার সঙ্গে তিনি যোগ রেখে চলেছিলেন।

এই বিচিত্র অভিজ্ঞতাময় ব্যক্তির জীবনে ইতিহাসের যে যুগান্তরণ ঘটছিল, যদিও সেটা খুব গৌরবময় নয়, নানাদিক্ দিয়েই সেটা অনুধাবনযোগ্য। ঈশ্বর গুপ্ত নিধুবাবুর জীবনে বাংলা দেশের ভূমি-ব্যবস্থার বিভিন্ন পরিবর্তনের উল্লেখ করেছেন। মীর কাশিমের সঙ্গে সংঘর্ষের পর ইংরেজরা ক্ষমতা করায়ত্ত করল এবং ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পুরোপুরি দেওয়ানী লাভ করল। ইংরেজেরা মুর্শিদকুলী খাঁর রাজস্ব বন্দোবস্তের মূল নীতি অক্ষুণ্ণ রেখে প্রথমতঃ চলেছিল। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব পর্যন্ত তাই নিয়ে নানা পরীক্ষা করতে হয়েছে। কিন্তু এসব পরীক্ষাতেও তাদের মূল লক্ষ্যটি বিচলিত হয় নি। রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন,

---

১ আনন্দবাজার পত্রিকা, পূজাসংখ্যা, ১৩৬১: প্রবোধচন্দ্র সেন, 'রামপ্রসাদ'।

The people of Bengal had been used to tyranny, but had never lived under an oppression so far reaching in its effects extending to every village market and every manufacturers' loom. They had been used to arbitrary acts from men in power, but had never suffered from a system which touched their trades, their occupations, their lives so closely. The springs of their industry were stopped, the sources of their wealth were dried up.[১]

ইংরেজরা নিজেদের বাণিজ্য শুল্ক রহিত করে নিলে পর দেশীয় শিল্প বাণিজ্যে যে বিপর্যয় এল, রমেশচন্দ্র তার ছবি গাঢ় বর্ণে এঁকেছেন। কোম্পানীর শুল্ক তো রহিত হলই, এই সুযোগে কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের সুবিধাও করে নেওয়া হল।[২]

দেশীয় শিল্পদ্রব্যের এই সর্বনাশের সময় প্রজাদের এবং জমিদারদের থেকে অর্থসংগ্রহের ত্রুটি হল না। হাণ্টার লিখেছেন, এই আসন্ন সর্বনাশের সময়েও নায়েব-দেওয়ান রেজা খান এবং তাঁর অধীন কর্মচারীরা কোম্পানীকে কোনো আভাস না দিয়ে রাজস্ব আদায় এবং শাসনকার্য চালিয়ে যেতে লাগল।[৩] ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে বাংলা দেশের এক তৃতীয়াংশ লোক প্রাণত্যাগ করল। জমি আবাদ করবার লোকের অভাব দেখা দিল। কৃষিজীবীদের মধ্যে দুটি শ্রেণী গড়ে উঠল—'খুদ কস্ত' যারা জমি আঁকড়ে পড়ে থাকল, আর 'পাইকস্ত', যারা নিজের জমি ছেড়ে নতুন জমির সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। শ্রমের মূল্য কমে গিয়েছে, কারণ জমির দাম হ্রাস পেয়েছে। এই অবস্থা চলেছে প্রায় ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই অবস্থায় আবার জমির মালিকদের মধ্যে কলহ দেখা দিল। তাদের এক তৃতীয়াংশ জমি অকর্ষিত পড়ে থাকল। সবাই অন্যের প্রজাকে প্রলুব্ধ করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে থাকল। তাদের অবস্থা যতই দরিদ্রতর হতে থাকল, ততই অধিকতর মূল্য দিয়ে কৃষক

---

১ R. C. Dutt, Economic History of India (5th ed) p. 27.

২ ১৭৬৬-৬৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আমদানী ছিল ৬২৪,৩৭৫ পাউণ্ড আর রপ্তানী ছিল ৬,৩১১২৫০ পাউণ্ড। —Harry Verelst, *View of the Rise and Present State of the English Government in Bengal* (London 1772) Appendix p 117.

৩ Hunter, *The Annals of Rural Bengal* (London 1868) p 24.

নিয়োগের চেষ্টা হল ; শেষ পর্যন্ত পাইকস্ত প্রজা জমি পেতে লাগল অর্ধ মূল্যে খুদকস্ত কৃষিজীবী এই প্রতিযোগিতায় হার মানল। এক সময়ে তারাই ছিল সবচেয়ে সম্পন্ন। এখন তারা পর্যুদস্ত হয়ে জমির অধিকার ছেড়ে দিল। এই ক্ষয়িষ্ণুতায় শঙ্কিত হয়ে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট এ বিষয়ে অনুসন্ধানের আদেশ দিতেও বাধ্য হয়। আশ্চর্যের বিষয় দেশের এই ভয়ঙ্কর সর্বনাশেও সাধারণ মানুষ গান গেয়ে কাটিয়ে দিল—কবিওয়ালাদের এটাই ছিল সমৃদ্ধির যুগ। বিদেশী ঐতিহাসিক সর্বনাশের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন,

The Bengali bears existence with a composure that neither accident nor chance can ruffle. He becomes silently rich or uncomplainingly poor. The emotional part of his nature is in strict subjection : his resentment enduring but unspoken ; his gratitude of the sort that silently descends from generation to generation.[১]

ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জমিদার বংশের অনিশ্চয়তা বুঝতে পারা গিয়েছিল দ্বিতীয়ার্ধে তাদের ভগ্নদশা ঠেকিয়ে রাখা গেল না। নিধুবাবুর জীবনবৃত্তান্তে নতুন যুগের নতুন পরিবেশ পাওয়া গেল। ইংরেজদের বাণিজ্য বিস্তার, দেশের দূরতম স্থানেও কুঠি স্থাপন করে অর্থাকর্ষণ ; আর একদিকে মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের মতো দেওয়ান মুনশীদের অসাধারণ প্রতিপত্তি, তারই সঙ্গে আবার কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যেই উৎকোচ গ্রহণের মতো প্রকাশ্য দুর্নীতির প্রচলন—রামনিধির জীবন কাহিনীতে এই সময়ের বাংলা দেশের অর্থপূর্ণ চিত্রাংশ ছড়িয়ে আছে। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের বর্ণনায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কোনো উল্লেখ নেই। মন্বন্তর বাংলা দেশের একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা।[২] এই ঘটনার ফলেই রাজস্ব ব্যবস্থার নানা রকম পরীক্ষা করতে করতে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূচনা হল। ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তনের উল্লেখ রামনিধির জীবন কাহিনীর দিগ্‌দর্শনস্বরূপ। প্রত্যক্ষভাবে রামনিধি সম্ভবতঃ মন্বন্তরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন নি ; হলে ঈশ্বর গুপ্তের বিবরণে তার উল্লেখ থাকত।

---

১ Hunter পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ২৫-২৬।

২ শ্রীরামপুর মিশনারী প্রকাশিত দিগ্‌দর্শন পত্রিকায় (এপ্রিল ১৮২০) পৃ ১৬৭-১৭৭ মন্বন্তরের একটি দীর্ঘ বর্ণনা প্রকাশিত হয়েছিল। রচনাটির নাম 'বঙ্গভূমির মহাদুর্ভিক্ষ'।

কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত উল্লেখ না করলেও মন্বন্তরের ফলে বাংলা দেশের সাহিত্যের উপর পরোক্ষ প্রতিক্রিয়াটি ইতিহাস থেকেই জানতে পারি। বাংলা দেশে কৃষি ছিল প্রজাদের প্রধান উপজীবিকা, কিন্তু কোম্পানীর আমলে কৃষির অবনতি হতে লাগল। প্রাচীনকাল থেকে ভূস্বামীরা বংশানুক্রমিকভাবে সামন্ততান্ত্রিক অধিকার পেয়ে এসেছেন; তাঁরা নবাবকে কর দিয়েছেন, প্রয়োজনমতো সৈন্য সরবরাহও করেছেন কিন্তু নিজেদের অধিকারে পূর্ণ শাসন কার্য পরিচালনা করেছেন স্বাধীনভাবেই। প্রজারা তাঁদের রাজা বলেই মনে করেছে। শৃঙ্খলা রক্ষা তাঁরাই করেছেন, কলহ-বিবাদের মীমাংসা তাঁরা করেছেন, অপরাধীর শাস্তিবিধান, ধর্মের পোষণ, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা—এ সবই এই ভূস্বামীদের হাতেই ন্যস্ত ছিল। মুর্শিদকুলী খাঁ এবং মীর কাশিম তাঁদের পীড়ন করেছেন সত্য, কিন্তু ভূমি থেকে সম্পূর্ণ উৎখাত করেন নি। কোম্পানী কিন্তু তাঁদের এই বংশানুক্রমিক অধিকারকে অগ্রাহ্য করে জমিদারী রাজস্বের দায়ে নীলামে তুলে দিল।[১] ফলে যাঁরা এককালে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন তাঁরা কঠিন দুঃসময়ের সম্মুখীন হলেন। এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে যাঁদের প্রশস্তি উচ্চারণ করে কবিরা কাব্য রচনা করতে গিয়েছিলেন, তাঁরা এই সময়ে প্রায় সকলেই বিপন্ন হয়ে পড়লেন। বর্ধমানরাজ তিলকচন্দ্র ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে মারা গেলে পুত্র তেজচন্দ্র পিতার শ্রাদ্ধের জন্য কোম্পানীর কাছে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করলেন। রাজ্যের অবস্থা এতই শোচনীয় হয়ে পড়ল[২] যে বিষ্ণুকুমারী স্বয়ং শাসনভার গ্রহণ করলেন। কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর (১৭৮২) সময় রাজ্যের অবস্থা এতই খারাপ হল যে তিনি শেষের দিকে দায়িত্বভার পুত্র শিবচন্দ্রের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন।[৩] নাটোরে তখন ছিলেন রানী ভবানী। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর পর রানী ভবানী রাজ্য পরিচালনা করছিলেন, তখন তাঁর আয় ছিল দেড় কোটি সিক্কা টাকা এবং তিনি রাজস্ব দিতেন সত্তর

---

১ R. C. Dutt, *Economic History of India under Early British Rule* (5th. Ed.) P. 43.

২ "The very earliest letter preserved in the records of the Burdwan collectorate contains a suggestion that his property should be attached and a few months afterwards in 1788 we find the threat executed."

—*Bengal District Gazetteer*, Burdwan, (1910) P. 36.

৩ কুমুদনাথ মল্লিক, 'নদীয়াকাহিনী' (১৩১৯) পৃ ৬৪।

লক্ষ টাকা। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর তিনিও বিপন্ন হলেন। তাঁর জমিদারীও নীলাম হবার উপক্রম হল।[১] বিষ্ণুপুরের রাজপরিবার এতকাল ধর্ম ও সাহিত্যের একটি প্রধান ভরসাস্থল ছিল। কিন্তু এতোদিন পর দ্বিতীয় দামোদর সিংহ তাঁর জমিদারীর কিছু কিছু অংশ বিক্রয় করলেন; গৃহদেবতা মদনমোহনকে বন্ধক রাখলেন বাগবাজারের গোকুলচন্দ্র মিত্রের কাছে। লোকে বলত, এরই ফলে বিষ্ণুপুর রাজবংশের ক্রমেই অধঃপতন হয়েছে।[২]

জীবনের নিশ্চিন্ত অবসরের দিন চলে গিয়েছে। সাধারণ প্রজাদের মধ্যে এল প্রচণ্ড জীবনসংগ্রাম আর যাঁরা অলস অবসরে মঙ্গল-কাব্য শুনবেন, তাঁদের দুর্দশাও চরমে এসে পৌছল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই দেখা গিয়েছিল ভূস্বামীদের অস্তিত্ব রক্ষা করা ক্রমেই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল, আর এই শতাব্দীর শেষার্ধে সেই বিপদের আর বাকী থাকল না। জমিদারদের প্রতিপত্তি যেমন ক্ষয় পেতে থাকল, নতুন এক বিত্তবান্ সম্প্রদায় সেই লুপ্ত প্রতিপত্তিকে নিজেদের মতো করে ফিরিয়ে আনল। এই সব দেওয়ান এবং বেনিয়াদের হাতে অর্থ সঞ্চিত হতে থাকলে সমাজের সংস্কৃতি রক্ষার ভার তাদের হাতেই চলে গেল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে সব ভাগ্যান্বেষী কেরানী ভারতবর্ষে আসত, বেনিয়ারাই তাদের অর্থ এবং অন্যান্য প্রকারের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসত।

The 18th century Banian has been described as "interpreter, head book-keeper, head secretary, head broker, the supplier of cash and cash-keeper and in general secret-keeper......serving to further such acts and proceedings as his master darest nct avow." The young writer landed in India without money but

---

১ হাণ্টার রাজশাহীর বনোয়ারী নাম্নী এক রাণীর উল্লেখ করেছেন (*Annals*, P. 58)। পরবর্তী গবেষকগণও তাঁকে অনুসরণ করেছেন; দ্রষ্টব্য S. K. De, *Bengali Literature*, P. 24 (পাদটীকা) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য' (১৩৬৩), পৃ ৬; কিন্তু উত্তর বঙ্গের তিনটি বৃহৎ জমিদারী নাটোর, পুটিয়া, দীঘাপতিয়া কিংবা দিনাজপুরে রাণী বনোয়ারী নামে কাউকে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ, রাণী ভবানীকে ভুল করে হাণ্টার বনোয়ারী বলে উল্লেখ করেছেন।

২ বাঁকুড়ার রাজপরিবারের এই সময়ের অবস্থা সম্পর্কে দ্রষ্টব্য *Bengal District Gazetteer*, Bankura (1908), P. 35.

with a desire of wealth. The banian took possession of him, got from him the ticket of an Englishman's name, the power which it naturally conferred and supplied him the money which he needed.[১]

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসায়ের প্রথম দিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে শেঠ এবং বসাকরা সুতানুটিতে ছিল ইংরেজদের দালাল। শেঠরা ছিল তাঁতী; পরে কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসায়ে ধনী হয়ে ওঠে। ওয়ারেন হেষ্টিংসের আমলে শেঠেরাই বসাকদের নিয়ে আসে। আলীবর্দি খাঁর আমলে বসাকরা রেশমের ব্যবসা করত। এই শেঠ এবং বসাকদের থেকেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বড়বাজারের পরিবর্তে গোবিন্দপুরের জমি কিনে নিয়েছিল। সে যুগে উচ্চ-বর্ণের লোকদের মধ্যে এই জীবিকার প্রাধান্য দেখে মনে হয়, ইংরেজদের এদেশে বাণিজ্য এবং রাজ্যবিস্তারে এরাই ছিল প্রধান সহায়ক। ভূকৈলাসের কন্দর্প ঘোষাল, বাগবাজারের গোবিন্দরাম মিত্র, শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ দেব, জোড়াসাঁকোর দর্পনারায়ণ ঠাকুর, শান্তিরাম সিংহ, 'নবরঙ্গকুলপতি' দুর্গাচরণ মিত্র—এঁরা ভাগীরথীর তীরে প্রতিপত্তিশালী হয়ে নতুন ধরণের অর্থকৌলিন্য এবং নতুন সমাজের পত্তন করলেন। স্মৃতি-শাসিত বাঙালী সমাজ যে কতখানি বিত্ত-শাসিত হয়েছে, তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় রামদুলাল দেব জীবনকাহিনীতে।[২] মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব মাতৃশ্রাদ্ধে চার লক্ষ টাকা খরচ করেছিলেন। রামপ্রসাদের জীবনীতে উল্লিখিত চূড়ামণি দত্ত মৃত্যুকালে প্রচুর অর্থব্যয় এবং সমারোহ করে গঙ্গাযাত্রা করেছিলেন। এ রকম দৃষ্টান্ত সেকালের বেনিয়াদের জীবন-কাহিনী থেকে বহু সংগ্রহ করা যেতে পারে। ব্যক্তিগত খেয়াল চরিতার্থতার জন্য, আচারের শূন্যগর্ভ আস্ফালনে ঐশ্বর্যের অপচয় করে সমাজে এঁরা সম্ভ্রমের পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কবিগানের আয়োজন এঁদের গৃহেই হত। উত্তর প্রত্যুত্তরে বিজয়ী পক্ষকে এঁরাই পুরস্কৃত করতেন। অর্থাৎ খেউড়ে যে পক্ষ প্রতিপক্ষকে অতিক্রম করে যেতে পারত, তারাই শ্রোতার কাছ থেকে বাহবা পেত।

---

১ *Bengal : Past & Present*, 1950. N. K. Sinha, *Mayor's Court Records* (1749-74) *and Supreme Court Records of the 18th Century in the Calcutta High Court*. P. 23.

২ Grish Chunder Ghose, *A Lecture on the Life of Ramdoolal Dey*, (1868), P. 50-51.

বণিক সভ্যতার সৃষ্ট এই ধনীরা যেমন পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করেন নি, তেমনি আবার অর্থোপার্জনে স্বভাবতঃই নৈতিক আদর্শবাদিতারও পরিচয় দেন নি। কাশিমবাজারের কৃষ্ণকান্ত নন্দী যিনি কান্তবাবু নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি ছিলেন ওয়ারেন হেষ্টিংসের অনুগ্রহভাজন।[১] হেষ্টিংসকে ইনি ছায়ার মতো অনুসরণ করেছেন। কাশীর রাজার বাড়ি লুণ্ঠন করবার চেষ্টার সময় কান্তবাবু ছিলেন সহায়ক। হেষ্টিংস কান্তবাবুকে ন্যায়ভাবে হোক অন্যায়ভাবে হোক পুরস্কৃত করবার ত্রুটি করেন নি। উত্তর বঙ্গের বহু জমি রাজশাহীর থেকে কেড়ে নিয়ে হেষ্টিংস কান্তবাবুকে দিয়েছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ সিং এবং দেবী সিং উভয়েই হেষ্টিংসের আশ্রয়গত ছিলেন।[২] মহারাজ নবকৃষ্ণ ছিলেন ক্লাইভের অনুগ্রহপুষ্ট। দেওয়ান নন্দকুমারের বিচারের মূলে নবকৃষ্ণের প্ররোচনা বড়ো কম ছিল না। নবকৃষ্ণ নিজে একবার একটি লজ্জাজনক নৈতিক অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন[৩]। মহারাজ নন্দকুমারও যে আদর্শ চরিত্রের ব্যক্তি ছিলেন এ কথা বলা যায় না। ঐতিহাসিক বলেছেন, মহারাজ নবকৃষ্ণকে ঠিক বেনিয়া বলা যায় না। তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল শাসন-বিভাগের কূটনীতি পরিচালনায়। মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে তিনি চমৎকার ইংরেজিতে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। আর একটি মামলায় জয়নারায়ণ ঘোষাল ইংরেজিতেই সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। ইম্পের বিচারে মেজর রেণেলের সাক্ষ্যে দেখা যায়, ইংরেজি জানা লোকের সংখ্যা তখন একহাজারের বেশি হবে না। সাধারণ বেনিয়ারা যে সে-রকম ভালো ইংরেজি জানতেন, এ কথা বলা যায় না।[৪] বেনিয়ারা ছাড়া বড়ো ছোটো দেওয়ান নামে পরিচিত কোম্পানীর নানারকম সহায়ক কর্মচারীদের সাক্ষাৎ এই সময়েই পাওয়া যাবে। রামনিধি গুপ্তের জীবনীতে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ এবং উনবিংশ শতাব্দীর

---

১ It must be admitted that the Governor-general had shown much laxity in permitting his banyan Krishna Kantu Nandi (the wellknown "Cantoo Baboo") to hold lucrative farms....Kantu Babu held farms in his own name whose annual rental exceeded thirteen lakhs of rupees and, in addition, he held farms in the name of his son Loknath Nandi, a child of twelve or thirteen years." *Cambridge History of India*, Vol. V, Pp. 421-422.

২ নিখিলনাথ রায়ের 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী'তে এঁদের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

৩ Bolts, *Consideration on Indian Affairs*, (1772), Pp. 95 97 এবং মুর্শিদাবাদ কাহিনীতে, (২ সং ১৩১০), 'মহারাজ নন্দকুমার', পৃ ৩৬৬-৬৯ দ্রষ্টব্য।

৪ N. K. Sinha, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, P. 24.

প্রথমার্ধে কবিওয়ালাদের জীবন কাহিনীতে বহু দেওয়ানের উল্লেখ পাওয়া যাবে।

দ্বৈত শাসনের ফলে সমগ্র দেশে শাসন কর্মচারীদের মধ্যে দায়িত্বহীনতা এবং দুর্নীতির অবাধ প্রসার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম যুগকে কলঙ্কিত করেছে। কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায় নিয়ে মীর কাশিমের সঙ্গে যুদ্ধ বাধল। মীর জাফর এসে কোম্পানীকে তুষ্ট করবার উদ্দেশ্যে জমিদারদের উপর অর্থ আদায়ের জন্য পীড়ন করতে লাগলেন। ফলে কর্মচারীরা নিজেরাও অসাধু উপায়ে অর্থোপার্জনে লিপ্ত হল। দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অর্থকৌলিন্যের প্রতিষ্ঠার ফলে নৈতিক চেতনা হ্রাস পেল আবার কোম্পানীর শাসনকার্যের মধ্যেই দুর্নীতি প্রায় সর্বব্যাপী হয়ে পড়েছিল। কোম্পানীর দেশীয় কর্মচারীরা এবিষয়ে নিরঙ্কুশ হয়ে উঠেছিল। জেলায় জেলায় পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদানে এই কর্মচারীরা presuming on the rights and the general ascendency of the British name, treated the officers of the Nabob with insolence and the people with injustice and oppression. সেকালের ইংরেজরা এই অবস্থার কথা ভালো করেই জানত। কিন্তু তারাই বিবেক দংশন থেকে মুক্তির উপায় বের করেছিল, ইতিহাস-বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ করছে—এই সান্ত্বনা দিয়ে—

In whatever manner we may chuse to account for that precariousness and instability—whether we resolve it into some necessity in the nature of things or are content simply to believe that the actual state of affairs during the period in question operated as a temptation to revolutionary projects, or sit down with the still lower supposition that revolution was then in fashion,—there is no great reason, to wonder that the English should have felt the common law of that necessity, should have yielded to that general temptation or should have been seduced by the contagion of that fashion.[১]

---

[১] **Robert Grant, *A Sketch of the History of the East India Company* (1818) P. 167.**

এই অসাধুতা শাসনযন্ত্রের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছিল। রামনিধির জীবন কাহিনীতেও ঈশ্বর গুপ্ত এই রকম একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ছাপরার কুঠির দেওয়ান জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় প্রকাশ্যে ঘুষ নেবার জন্য কর্মচারীদের প্ররোচনা দিয়েছিলেন। রামনিধি এতে অস্বীকৃত হয়ে কাজ ছেড়ে দেন। *অসাধুতা এমনি একটি সাধারণ নীতিতে পরিণত হয়েছিল যে এতে কোথাও লজ্জা বা সঙ্কোচের প্রশ্ন ছিল না। এমন কি দেওয়ান রামমোহন রায়ের পক্ষেও উৎকোচ গ্রহণ করা অস্বাভাবিক ছিল না, রামমোহনের আদর্শে শ্রদ্ধাশীল নব্যবঙ্গের অন্যতম কিশোরীচাঁদ মিত্রই এরকমের আভাস দিয়েছিলেন।*

If Rammohan Roy did keep his hands clean and abstain, as in the absence of all positive evidence to the contrary we are bound to suppose from defeating the ends of justice for a consideration,—he must have been a splendid exception. Constituted as human nature ordinarily is, it is preposterously absurd to calculate upon a faithful and conscientious discharge of duties by men who while clothed with all but an irresponsible authority are paid a pittance which hardly suffices to meet their pocket expenses. The same causes which led the European functionaries before the time of Cornwallis to be more true to their own interests than to those of their Honorable masters must inevitably operate in producing the same results among the natives. For the system of small pay and large responsibility, heretofore, the pet system of our Government makes official corruption the rule, the official integrity the exception.[১]

রামমোহন পূর্বে বেনিয়াও ছিলেন বলে জানা যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা দেশের এই গৌরবহীন ইতিহাস কোনো মহৎ সাহিত্যকে সম্ভব করে তুলতে পারেনি। এই যুগের সৃষ্টি ছিল কবিগান, শাক্তগান এবং টপ্পা। মঙ্গল কাব্যও রচিত হয়ে এসেছে। সে-সব

---

১ *Calcutta Review*, 1845, P. 365 Kissory Chand Mitra, *Raja Rammohan Roy*. এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য 'সাহিত্যসাধকচরিতমালা'র রামমোহনের জীবনী (৪র্থ সং) পৃ ৩২।

কাব্যের মধ্যে কোনো কোনো কাব্য ভারতচন্দ্রের অনুকরণে বহিরঙ্গ প্রসাধনে চাকচিক্যময়, কিন্তু সেগুলো অন্ধ অনুবৃত্তি মাত্র। এ-জন্ত এ সময়ে কোনো কাব্যই আর উল্লেখযোগ্য ছিল না। নতুন রীতির রচনা বলে যে তিনজাতীয় বস্তু এই যুগে লক্ষ্য করা গেল, তারা সবই গান। পাঁচালীও গাওয়া হত বটে; কিন্তু এগুলি আকারে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় হল। ভারতচন্দ্রের সময়েই খণ্ড কবিতার উদ্ভব হয়েছিল; রামপ্রসাদের গানও ব্যক্তি-চেতনায় সমুজ্জল হয়ে অবসরহীন ক্ষণগুলিকে সুধারসে পূর্ণ করেছিল। দরিদ্র কবি ব্যক্তিগত উপলব্ধিতে দারিদ্র্য-শক্তিকে দেখেছিলেন ভক্তির মাধুর্যে, বৈষ্ণবের মতোই প্রশ্নহীন আত্মনিবেদনে। বৈষ্ণবের মতোই শক্তিকে তিনি সংসার-জীবনেই কন্যারূপে অবতীর্ণ হতে দেখেছিলেন। রামপ্রসাদের সঙ্গে বৈষ্ণব কবিদের আর একদিক দিয়ে সাদৃশ্য ছিল। বৈষ্ণব ভক্তির মতোই রামপ্রসাদের ভক্তিও স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই ভক্তিসাধনা রামপ্রসাদকে তৃপ্ত করেছিল। যদিও দারিদ্র্যের কথা তাঁর অনেক গানেই আছে, কিন্তু তাঁর ভক্তি-সাধনা শেষ পর্যন্ত অভাবাত্মক ছিল না। রামপ্রসাদের পরে যাঁরা শাক্তসঙ্গীত রচনা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে শিবচন্দ্র শম্ভুচন্দ্র ছিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রেরই দুই পুত্র। কৃষ্ণচন্দ্র নিজেও গান রচনা করেছেন। নরচন্দ্র, শ্রীশচন্দ্র এবং নরেশচন্দ্রও কৃষ্ণনগর রাজপরিবারেরই। মহারাজ নন্দকুমারও ছিলেন শাক্তপদকর্তা। বর্ধমানের দেওয়ান রঘুনাথ এবং তাঁর ভ্রাতা দেওয়ান নন্দকিশোরও অনেকগুলি গান রচনা করেছিলেন। আর একজন বিখ্যাত শাক্তসাধক ছিলেন নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ। অবশ্য রাজা এবং দেওয়ান ছাড়াও শাক্তপদকর্তা ছিলেন, সে-কথা বলাই বাহুল্য। কমলাকান্ত সঙ্গীত রচনায় রামপ্রসাদের অপেক্ষা বিশেষ হীন ছিলেন না। তবু এই যুগে আকস্মিকভাবে সমাজের উচ্চস্তরের ব্যক্তিদের বৈরাগ্যসূচক গানে মত্ত হওয়া বিস্ময়কর সন্দেহ নেই। এই যুগে রাজত্বের যে ভাঙাগড়া চলেছিল এঁদের ভূমিকা তাতে মোটেই লঘু ছিল না, এও আমরা জানি। রামপ্রসাদ রাজসম্মান প্রত্যাখ্যান করে কালীর সাধনা করেছেন; কিন্তু এঁরা সম্মানের এবং অর্থের প্রতিযোগিতায় নিবৃত্ত না হয়েও কালীর উদ্দেশ্তে বৈরাগ্যের সুর ধরেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে এঁরা ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলেন, একথা হয়তো সত্য নয়। কিন্তু রাজসম্পদ এবং এবং ক্ষমতা কাড়াকাড়ির যুগের অনিশ্চিত পরিবেশে শক্তির একটা খেয়ালী রূপকে তাঁরা

দেখেছিলেন।[১] পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে এই গানে সত্যকার বৈরাগ্যের কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যাবে, কিন্তু রামপ্রসাদের তুলনায় এই ভক্তিকে অভাবাত্মক (negative) না বলে উপায় নেই। এই যুগ এবং এই সামাজিক অবস্থার পটভূমিতে গানগুলি বিচার করলে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয়। এদের যথার্থ তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য জীবনী জানার প্রয়োজন আছে। বাংলা সাহিত্যের আগের যুগে কবিদের জীবনী জানার ততটা প্রয়োজন ছিল না, কারণ সে সাহিত্য ছিল রীতিবদ্ধ স্থিতিশীল সমাজের সৃষ্টি।

অবশ্য কবি ঈশ্বর গুপ্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করলেও শেষ পর্যন্ত এঁদের জীবনী লিখে উঠতে পারেন নি। নিধুবাবু এবং কবিওয়ালাদের জীবন-কাহিনীতে অনেক দিক থেকে এই পরিবর্তনশীল সমাজের ছবি ফুটে উঠেছে। নিধুবাবুর জীবনীতে ঈশ্বর গুপ্ত আখড়াই সঙ্গীতের উদ্ভব বিকাশ ও বিলোপের যে ইতিহাস দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে চলিত থাকলেও সেই শতাব্দীর শেষের দিকেই এর সমৃদ্ধি এবং প্রায় ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আখড়াই সঙ্গীতের বেশ চর্চা হয়েছে। যে সব বিভিন্ন আখড়াই দলের উল্লেখ ঈশ্বর গুপ্ত করেছেন, তারা বাগবাজার শোভাবাজার বড়বাজার পাথুরিয়াঘাটার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আশ্রয়েই টিঁকে ছিল। রামনিধি গুপ্ত ছিলেন এই সঙ্গীত স্রোতের একজন প্রধান নিয়ন্তা।

কিন্তু শুধু অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যের জন্যই নয় নিধুবাবুর রচিত কাব্যও তাঁকে এই যুগে এক অনন্যসাধারণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর কাব্যেই আধুনিক যুগের আভাস প্রথম পাওয়া গেল। বাংলা ভাষার মাধুর্যকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করে গানের সুরে তিনিই প্রথম আবেগমুগ্ধ কণ্ঠে প্রকাশ করলেন। 'নানান ভাষা'র সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন ভারতচন্দ্রের মতোই; কিন্তু ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্যে আত্মপরিচয়ের প্রসঙ্গে কাব্যরসের সৃষ্টির জন্য 'যাবনীমিশাল' ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজনের উল্লেখ করেছিলেন।

---

১ তুলনীয় কুমার নরচন্দ্রের—

যে ভাল করেছ কালি আর ভালতে কাজ নাই,
ভালয় ভালয় বিদায় দে মা আলোয় আলোয় চলে যাই।

অথবা দেওয়ান রঘুনাথের—

উপায় না দেখি আর অকিঞ্চন ভেবে সার
তরঙ্গে দিয়ে সাঁতার দুর্গা.নামের ভেলা ধরি।

তিনি ছিলেন সচেতন শিল্পী। তাই শিল্প-প্রয়োজন ছিল তাঁর কাছে মুখ্য। কিন্তু নিধুবাবু যখন বলেন,

কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর
ধারাজল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা ॥

তখন এই মাতৃভাষাপ্রীতি প্রকাশ পায় প্রাণেরই নিজস্ব ব্যাকুলতায়। নিছক শিল্পকলার চেয়ে প্রাণের এই আবেগ আজও সহজেই আমাদের চিত্তকে স্পর্শ করে। এ এক নতুন মূল্যবোধ ; আধুনিক চেতনার সঙ্গে সঙ্গে যা গভীরতা অর্জন করেছে। কিন্তু নিধুবাবুর কাব্যে এটা আভাসের আকারেই থেকে গিয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে এই চেতনা আরও ছড়িয়ে পড়েছিল। নিধুবাবুর সময়ে ইংরেজি ভাষার সঙ্গে সবে মাত্র আমাদের পরিচয় হয়েছে। তখনও ইংরেজি সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌গুলি আমাদের কাছে এসে পৌছয় নি। তথাপি নিধুবাবু ইংরেজি জানতেন, ইংরেজি গ্রন্থও পাঠ করতেন। অনুমান হয়, এই পরিচয়ের ফলেই মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগও যেন আরও নিবিড় হয়েছিল।

রেণাশাঁর মূল কথা যদি হয় আত্ম আবিষ্কার, তবে নিধুবাবুর গানেই কি তার ক্ষীণ সূচনা পাচ্ছি না ? শুধু বিশেষ এই গানটিতে নয়, নিধুবাবুর প্রেমের গানগুলির মধ্যে একটা অনুভূতি বেজে উঠল, সে অনুভূতি আপন অন্তরের রহস্য-রসে স্নিগ্ধ। ধর্ম এবং শাস্ত্রের বন্ধন থেকে তিনি প্রেমকে মুক্তি দিলেন। বৈষ্ণবীয় প্রেমের সঙ্গে এর যোগ নেই ; শাস্ত্রের বিধি দিয়ে এ প্রেম নির্ধারিত নয়। ব্যক্তির প্রেমানুভূতির এক স্বাধীন বিকাশ ঘটল এই গানগুলিতে। ব্যক্তির রুদ্ধ হৃদয়দ্বারকে উন্মোচিত করে কবি এবার সত্যই আত্মআবিষ্কার করলেন। নিধুবাবুর প্রেমের কল্পনায় সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয়তা নেই, এ-কথা সত্য। তাঁর প্রেম দেহাশ্রয়ী, দেহাতীত নয়। তবু প্রেমের বিচিত্র মুহূর্তগুলিকে তিনি গানে গেঁথে দিয়েছেন। এই বৈচিত্র্য শাস্ত্র-সম্মত বা শাস্ত্র-নির্দিষ্ট নয় কিন্তু মানবহৃদয়ের অপরিমেয় সম্ভাবনাকে তিনিই প্রথম স্বীকার করে নিলেন। নিধুবাবুর কোনো কোনো গান রবীন্দ্রনাথের গানকে কখনো কখনো মনে করিয়ে দেয় প্রেমের বিচিত্র রূপকল্পনার জন্য।[১] রবীন্দ্রনাথের প্রেমের

---

১ (১) কাজল নয়নে আর দিও না কখন।

(২) আমারে কি তার আছয়ে মনে
মনেতে করিত যদি, তবে কি মরি হে কাঁদি
নিরখিয়ে থাকি পথ পানে।

কল্পনায় প্রকৃতির পরিবেশ অসাধারণ ব্যঞ্জনা এনে দিয়েছে যা নিধুবাবুর কাব্যে নেই। কিন্তু প্রেমের অফুরন্ত ভঙ্গি এবং তার কমনীয়তা এই চিরকালের হৃদয়ানুভূতিতে এক গভীর প্রত্যয় এবং অবিচল মগ্নতা এনে দিয়েছে, যা মধ্যযুগের সাহিত্যে বিরল।

হৃদয়বৃত্তিকে এইভাবে স্বীকার করে নেওয়ার নামই মানবীয়তা। বলা বাহুল্য, স্থূল বাস্তবতার অনুসরণকে মানবীয়তা বলে না। আদিম প্রবৃত্তির অন্ধ সম্ভোগ সমাজের শিক্ষাহীন কল্পনাহীন লোকজীবনের ক্ষেত্রেও চিরকাল এক ধরণের আনন্দ দিয়ে এসেছে, তাকে কেউ মানবীয়তা বলবে না। এই কথাটির একটি বিশেষ অর্থ আছে। ইহজগৎ সম্পর্কে ঔৎসুক্য, বিস্ময় এবং গভীর বিশ্বাসের মিলিত মূল্যবোধ 'মানবীয়তা'র আদর্শকে সৃষ্টি করেছে। মঙ্গলকাব্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবানুকৃতির মধ্যে মানবীয়তা নেই, কিন্তু মধুসূদনের পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে লেখা মেঘনাদবধের মধ্যে সেটা আছে। কবিওয়ালাদের রাধাকৃষ্ণের মুখ দিয়ে উচ্চারিত স্থূল প্রবৃত্তির বাঁধা প্রকাশে মানবীয়তার আভাস পাওয়া যায় বলে মনে হলেও আসলে নিধুবাবুর প্রেমের প্রথামুক্ত বৈচিত্র্যকল্পনাতেই এই মানবীয়তা যত সূচিত, কবিওয়ালাদের গানে তত নয়।

---

(৩) নয়ন-নীরে কি নিবে মনের অনল।

(৪) মনে করি বারে বারে নাহিক হেরিব তারে।

(৫) যেমন আমারে ভাসালে নয়ন জলেতে।
তেমতি নয়ন, করি মরণ, হইবে প্রাণ তোমারে ভাসিতে।

(৬) নয়ন মন ডুবিল প্রাণ নয়নে তোমায়। —ইত্যাদি

আখড়াই ও কবিগান

ঈশ্বর গুপ্তের উক্তি থেকে অনুমান করা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে প্রথমেই কিংবা তার কিছু আগে আখড়াই সঙ্গীতের উদ্ভব।[১] এই উক্তি সত্য। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত বিদ্যাসুন্দরে ভারতচন্দ্র লিখেছিলেন 'নদে শান্তিপুর হৈতে খেঁড়ু আনাইব নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব'। ঈশ্বর গুপ্ত বলেছেন তখন আখড়াইতে ভবানী বিষয়ক গান ছিল না, ছিল শুধু খেউড় এবং প্রভাতী। সম্ভবতঃ খেউড়ই বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। আখড়াই গানের তখনও স্বতন্ত্র উৎকর্ষ কিছু দেখা দেয় নি। সুরের দিক্ দিয়ে টপ্পার দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত ছিল এবং বিষয় বস্তুর দিক্ দিয়ে 'অতিশয় অশ্রাব্য কদর্য্য বাক্যে গীত সমুদয়' রচিত হত। পরবর্তীকালে আখড়াই গানে বাদ্যযন্ত্রের বৈচিত্র্য এসেছিল, তাও এতে তখন ছিল না।

আখড়াই সঙ্গীতের চর্চা ক্রমে চুঁচুড়া এবং কলকাতায় ছড়িয়ে পড়ল। সুর এবং বাদ্যযন্ত্রেরও পারিপাট্য এল; খেউড় এবং প্রভাতীর পূর্বে ভবানী বিষয়ক গান গাওয়ারও প্রথা প্রবর্তিত হল। প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত আখড়াই গানের এই ধারা চলে এসেছে। কিন্তু যতদূর মনে হয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আখড়াই এতদিন পর্যন্ত পুরোভাগে এসে দাঁড়াতে পারে নি। হয়তো সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণবদের আখড়ায় এর জন্ম হয়েছিল।[২] বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিপত্তি হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ লীলার লৌকিক তলানিটুকু আখড়াই গানে থেকে গিয়েছিল। কিন্তু মঙ্গল কাব্যের শিল্পরূপ বিকাশ লাভ করার ফলে এর চর্চা রাজসভার বাইরে লোকজীবনে আশ্রয় নিল। তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে শাক্ত প্রভৃতি গীতি সাহিত্যের প্রাধান্যের ফলে আখড়াই গানও ভবানী বিষয়কে স্বীকার করে নাগরিক রুচির কাছে স্বীকৃত হল। এর প্রসারের পথটি লক্ষ্য করবার বিষয়। শান্তিপুর থেকে গঙ্গার তীর দিয়ে চুঁচুড়া এবং কলকাতার ইংরেজ বণিক এবং তাদের সৃষ্ট এক নতুন

---

১ "সর্ব্বাগ্রে শান্তিপুরস্থ ভদ্রসন্তানেরা আখড়াই গাহনার সৃষ্টি করেন, ইহা প্রায় ১৫০ বৎসরের ন্যূন নহে।" —বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ১২৭।

২ গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য, 'হাফ আখড়াই সঙ্গীত সংগ্রামের ইতিহাস' (১৩২৬) পৃ ১। এই ইতিহাস কতদূর নির্ভরযোগ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

সমাজের ছায়ায় এই সঙ্গীতের ধারা এগিয়ে এল। প্রধানতঃ আখড়াই তখন ছিল পেশাদারি দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। শুধু কাশীনাথ বাবুর বাগানে বড়বাজারে একটি সখের আখড়াই লড়াই হয়েছিল। দেওয়ান কাশীনাথকে নিয়ে সুপ্রীম কোর্টের সঙ্গে ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিবাদ হয়েছিল ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং অন্ততঃ এই সময় পর্যন্ত আখড়াই গান প্রধানতঃ পেশাদারের হাতেই ছিল। নিধুবাবু এই সময় ছাপরায়।

অতঃপর আখড়াই ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্ব সুরু হল নিধুবাবুর মাতুল কুলুইচন্দ্র সেনের দ্বারা নবকৃষ্ণ দেবের সভায়। তিনি এই গানকে লোক-চর্চার মালিন্য থেকে মুক্তি দিয়ে উচ্চ সমাজের যোগ্য করে এর জন্মান্তর ঘটালেন। কুলুইচন্দ্রের সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা যায় না। ঈশ্বর গুপ্ত ভোলা ময়রার গানের যে একটি পংক্তি উদ্ধৃত করেছেন—'আখড়ায়ের গীত কল্লে কুলুইচন্দ্র সেন'—তাতে বুঝতে পারা যায় আগের রীতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে নতুন রূপ দেওয়ার অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল তাঁর। নবকৃষ্ণ দেবের মৃত্যু ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সুতরাং তার কিছু আগে এই ঘটনা ঘটে থাকবে। অতঃপর ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রামনিধি কলকাতায় ফিরে এসে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে সখের আখড়া স্থাপন করেন। এতে তিনি সংশোধিত পদ্ধতিতে আখড়াই সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। মোহনচাঁদ বসু এই প্রসঙ্গেই নিধুবাবুর যোগ্য শিষ্য হয়েছিলেন। নিধুবাবুর এই শুভ সূচনার ফলে কলকাতায় অনেকগুলি সখের দল স্থাপিত হয়। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবার, যোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবার, গরাণহাটার কৃষ্ণমোহন বসাক এবং শোভাবাজারের কালীশঙ্কর ঘোষের পরিবার ছাড়াও আরো অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবার সখের দল করেছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, নিধুবাবু এবং মোহনচাঁদ বাগবাজার দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

আখড়াই সঙ্গীতের তৃতীয় পর্ব ১৮২৫-এর কাছাকাছি। মহারাজ গোপীমোহন (খুব সম্ভবতঃ গোপীমোহন দেব, মৃত্যু ১৮৩৭)-এর বাড়ীতে আখড়াই গানের চর্চা খুব বেশী ছিল; নবকৃষ্ণের আমলের সঙ্গীতপ্রিয়তা তখনও অম্লান ছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য, দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পুত্র গোপীমোহন ঠাকুরও (মৃত্যু ১৮১৮) একজন বিশেষ সঙ্গীত-রসিক ছিলেন। কালী মির্জা তাঁর সভাতেই ছিলেন। পাঁচালীকার লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাসকে তিনিই আশ্রয় দিয়েছিলেন। কিন্তু আখড়াই সঙ্গীত ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে গেল।[১]

১ '৩০ বৎসর হইল আখড়াই গাহনা রহিত হইয়াছে'। পৃ ১১৩।

লোপ পাওয়ার প্রধান কারণ ছিল হাফ-আখড়াইয়ের উদ্ভব। মোহনচাঁদ বসুই এই নতুন সঙ্গীত পদ্ধতির সৃষ্টি করলেন ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে।[১] এই নতুনত্ব আখড়াই গানকে বাঁচিয়ে রাখতে পারল না। তখন কলকাতায় নব্যবঙ্গের প্রবল আন্দোলন। নতুন শিক্ষা এবং রুচির বিপ্লব। মোহনচাঁদ-কৃত নতুনত্ব সঙ্গীতকে নতুন রুচির অনুগামী করে নি, বরং কবি-গানের সঙ্গে মিশ্রণ ঘটিয়েছিল। এতে কবিগানের মর্যাদা কিছুমাত্র বাড়ল না, আবার সংশোধিত আখড়াইয়ের মার্জিত রূপটিও অক্ষুণ্ণ থাকল না। শোনা যায়, নিধুবাবু এতে মোহনচাঁদের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের উক্তি থেকে জানা যায় ১২৬০ সালে (১৮৫৩-৫৪) শ্যামপুকুরে একবার আখড়াই গানকে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছিল; কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।

এই ইতিহাস থেকে অনুমান করা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকটি বাদ দিলে আখড়াই গান সে রকম লক্ষণীয় উৎকর্ষ অর্জন করতে পারে নি। বিশেষতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সাহিত্যের আদর্শ ছিল প্রধানতঃ মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্য শিল্পের দিক্ দিয়ে যতটা উৎকর্ষ লাভ করতে পারে, ততখানিই পারিপাট্য এসেছিল। শেষের দিকে যখন সাহিত্য-সৃষ্টির সেই সমাজ ভেঙে যেতে লাগল, তখন এই অলক্ষিত সাহিত্যই পুরোভাগে এসে দাঁড়াল। প্রচলিত আখড়াইকে সংশোধিত করে তার জন্মান্তর ঘটানো হল, আর হল কবিগান। কবিগানও আগে থেকে প্রচলিত ছিল বলে শোনা যায়। তখন কবিগানকে বলা হত দাঁড়া কবি। 'দাঁড়া কবি' কথাটার অর্থ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। দীনেশচন্দ্র সেন[২] সুশীলকুমার দে[৩] উভয়েই আসরে দাঁড়িয়ে গাওয়া গান অর্থেই এই শব্দটিকে গ্রহণ করেছেন। সুকুমার সেনের মতে, যে কবিগানে উত্তর প্রত্যুত্তরের ধরাবাঁধা পালা বা গান ছিল তাকেই বলা হত 'দাঁড়া কবি'। আর যেখানে পালা বা গান উপস্থিতমত রচনা করা হত তাকে বলত সাধারণ কবি বা 'কবিগান'।[৪] ঈশ্বর গুপ্তের একটি উক্তি থেকে দাঁড়া কবির অর্থের আভাস পাওয়া যায়—'তাঁহারা

---

১ বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ৪০৭-৯।

২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৭ম সং) পৃ ৫৫০।

৩ *History of Bengali Literature*, P. 304.

৪ মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, ১৩৫২), পৃ ৫০।

পেশাদারি দাঁড়া কবির স্বরে গান করিয়া কেবল বসিয়া গাহিতেন' (পৃ ১১০)। এতে বোধহয় দাঁড়িয়ে গান গাওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এসব বাদ বিতর্কে প্রবেশ না করেও আখড়াই এবং দাঁড়া কবির যুগপৎ অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিতে বাধা নেই। কবিগানের মর্যাদা তখনও ছিল না, অষ্টাদশ শতাব্দীতে শেষের দিকে এর মর্যাদা স্বীকৃত হল। কবিগানের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় জয়নারায়ণ ঘোষালের করুণানিধানবিলাস কাব্যে।[১] যদিও এই সময় থেকে বিদ্যাসুন্দর এবং মুসলমানী প্রণয়-কাহিনীর অনুকরণে এক ধরনের কাহিনী-কাব্য রচনারও বিশেষ প্রসার ঘটেছিল, কিন্তু আখড়াই এবং কবিগানই বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। ঈশ্বর গুপ্ত যে কবিওয়ালার জীবনী রচনা করেছেন, তাদের সকলেরই জন্ম এই সময়েই।

এই সময়ে বাংলা দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ইতিহাসের আমূল পরিবর্তন চলেছিল। এই পরিবর্তনের স্রোত দেশের নিম্নতম স্তরটিকেও আলোড়িত করল। এই আঘাতেই যেন দেশের অন্তরালবর্তী এক সাহিত্যধারা ঐতিহ্যগত সাহিত্যাদর্শের শূন্য স্থান পূর্ণ করতে এগিয়ে এল। বৈষ্ণব সাহিত্যের অভাবনীয় বিকাশ রুদ্ধ হয়েছে ; মঙ্গলকাব্যধারার সম্ভাবনাও মানুষের নিশ্চিন্ততার অভাবে নিঃশেষিত হল। এদের পরিত্যক্ত আসরে কবিগান এসে বসল। কবিগানের সৃষ্টি আকস্মিক নয়, তবে কবিগানের প্রাধান্য পাওয়াটা আকস্মিক বটে। বোধহয় এভাবে বলাও ঠিক হবে না। পূর্বাপর ইতিহাসের গতি মনে রাখলে একে স্বাভাবিকই মনে হবে। রবীন্দ্রনাথের উক্তি[২] এই অর্থেই সত্য। আমাদের এতকালের সাহিত্যিক ঐতিহ্য খণ্ডিত করে কবিগান যেন অসঙ্গত মর্যাদার অধিকারে পুরোভাগে এসে দাঁড়াল। কবিগান যদি সত্য সত্যই বৈষ্ণব পদাবলীরই পরিণাম হত, তা' হলে তাকে অসঙ্গত বলা চলত না ঠিকই। কিন্তু আমাদের ধারণা বৈষ্ণব পদাবলী একে কিছুটা প্রভাবিত করলেও এর উদ্ভব নিম্নতম লোকজীবনের ক্ষেত্রে। কবি-গানকে ঠিক লোকসাহিত্য বলা যাবে না, কারণ এগুলি বিশেষ ব্যক্তির সৃষ্টি,

---

১ সুকুমার সেন, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড (২ সং) পৃ ৯৬৯।

২ 'একদিন হঠাৎ গোধূলির সময়ে যেমন পতঙ্গ আকাশ ছাইয়া যায়, মধ্যাহ্নের আলোকেও তাহাদিগকে দেখা যায় না এবং অন্ধকার ঘনীভূত হইবার পূর্বেই তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায়, এই কবির গানও সেইরূপ এক সময়ে বঙ্গসাহিত্যের স্বল্পক্ষণস্থায়ী গোধূলি আকাশে অকস্মাৎ দেখা দিয়াছিল।'—'কবিসঙ্গীত', লোকসাহিত্য. রবীন্দ্ররচনাবলী, ৬ খণ্ড।

সমাজের সৃষ্টি নয়। রবীন্দ্রনাথ কবিসঙ্গীতকে লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করেছেন বটে, কিন্তু পরবর্তী গবেষকরা সেটা স্বীকার করেন নি।[১] লোক-সাহিত্যের লক্ষণ দিয়ে বিচার করলে কবিগানকে তার অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, সে কথা সত্য। কিন্তু কবিসঙ্গীতের সৃষ্টি যে এক ধরণের লৌকিক চেতনা থেকে, সেটা বোধহয় অস্বীকার করা যায় না।

কবিগানের বিষয় প্রধানতঃ রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা। বৈষ্ণব পদাবলীর মান মাথুর এতে আছে। কবিগানের সখীসংবাদ পদাবলীর কথা স্বভাবতঃই মনে করিয়ে দেবে। সুশীলকুমার দে বলেছেন,

It must be noted that the latter (songs of kaviwalas) in many cases debased and vulgarised, while they borrowed the ideas and conceptions of Baisnab poetry. One particular section of Baisnab poetry, remarkable for its passion and its poetic quality, which is generally grouped under the heading of প্রেমবৈচিত্ত is practically non-existent in Kabi literature.[২]

বৈষ্ণব কবিতার অতীন্দ্রিয়তা কবিগানে থাকল না, থাকল রক্তমাংসের স্থূলতাটুকু। এই অতীন্দ্রিয়তাই রাধাকৃষ্ণের কাহিনীকে অসামান্য করে তুলেছে, তা' না হলে রাধাকৃষ্ণের কাহিনী বহুকাল প্রচলিত গ্রাম্য কাহিনী ছাড়া কিছুই নয়। লোক-জীবনের ক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণ নিয়ে লৌকিক কাহিনীর ধারা চৈতন্য-ধর্মের পূর্বে এবং পরেও অব্যাহত রূপে চলে এসেছে। এর ইতিহাস বহু প্রাচীন।

The dalliance of Krisna with cowherdesses which introduced an element inconsistent with the advance of morality into the Vasudeva religion was also an aftergrowth consequent upon the freer intercourse between the wandering Abhiras and their more civilised Aryan neighbours.[৩]

---

১ দ্রষ্টব্য S. K. De, *Bengali Literature*, P. 317. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলার লোকসাহিত্য' (২ সং) পৃ ৫৯-৬০)

২ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, p. 316.

৩ R. G. Bhandarkar, *Vaishnavism, Saivism, etc.*, (1913), P. 38.

অধ্যাপক সুশীলকুমার দে-ও বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশে লৌকিক রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর প্রভাব অনুমান করেছেন।

After the epics and philosophies came the popular puranas, which set forth the Krisna legend against the exuberant and luscious background of myth, theology and mystical eroticism. They poetised and emotionalised the amorphous story, and thus came to occupy an important place in Vaisnava sectarian literature.[১]

জয়দেবের গীতগোবিন্দের রাধাকৃষ্ণলীলা কল্পনার মূলে এই লৌকিক কাহিনীর প্রভাব কিছুই বিচিত্র নয়; কারণ 'গীতগোবিন্দে'র কাহিনীর উৎস কোনো পুরাণেই নির্ণয় করা যায় নি। রাধাকৃষ্ণ প্রণয়-কাহিনীর লৌকিক রূপটির আভাস প্রাকৃত অপভ্রংশ অবহট্‌ঠে রচিত ছোট ছোট পদে পাওয়া যায়। হালের 'গাহা সত্তসইতে' 'কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়ে', 'প্রাকৃত পৈঙ্গলে', রাধা-কৃষ্ণলীলা বিষয়ে খণ্ডিত চিত্র ছড়িয়ে আছে।[২] বিদ্যাপতি বৈষ্ণব ছিলেন না। তিনি ছিলেন স্মার্ত পঞ্চোপাসক। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উক্তি উদ্ধৃতিযোগ্য—

"বিদ্যাপতি সংস্কৃতে যে বই লিখিয়াছেন তাহাতে স্মৃতি অর্থাৎ হিন্দুয়ানী ত আছেই তার উপর শিব আছেন, দুর্গা আছেন, গঙ্গা আছেন, কৃষ্ণ একেবারেই নাই। আবার মৈথিল ভাষায় যে গান লিখিয়াছেন, তাহাতে শিবও আছেন, সেই সঙ্গে দুর্গাও আছেন, বেশীর ভাগ কৃষ্ণরাধা আছেন। ইহার অর্থ কি? যখন পণ্ডিত হইয়া লিখিতেছেন, তখন কৃষ্ণের নামও করেন নাই। কিন্তু যখন মৈথিলী লিখিতেছেন তখন রাধা ও মাধবে ভরপুর।

বিদ্যাপতি যেখানে আদিরসের গান লিখিতেছেন সেইখানেই রাধা ও কৃষ্ণের নাম বেশী। আদিরসের গান লিখিতে গেলেই যেন রাধাকৃষ্ণ আপনিই আসিয়া পড়িয়াছে। এখনও আমাদের দেশে দেখা যায় আদিরসের গান লিখিতে গেলেই লোকে রাধাকৃষ্ণেরই নাম করে।

আমাদের দেশের কবিরা আদিরসের গান লিখিতে গেলেই রাধাকৃষ্ণের দোহাই দিতেন। নিজের মনের ভাব ছল করিয়া রাধাকৃষ্ণের ঘাড়ে চাপাইয়া

---

১ S. K. De, *Early History of Vaisnava Faith & Movement*, (1942), p. 4.

২ সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ১ম খণ্ড (২ সং) পৃ ২৪, ৪০, ৪৩। শশিভূষণ দাশগুপ্ত, 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ' (১৩৫৯) পৃ ১৪০-১৭৫।

দিতেন ; পাঁচালী-ওয়ালারাও এই কাজ করিতেন, কবিওয়ালাও করিতেন, তরজাওয়ালারাও অনেক সময় করিতেন। বিদ্যাপতিও যেন তাই করিয়া গিয়াছেন।"[১]

রাধাকৃষ্ণের লৌকিক কাহিনী নিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' বর্ণিত রাধাকৃষ্ণলীলা-কাহিনী কোনো পুরাণে নেই। কিন্তু এই কাহিনী বাংলা দেশে আগাগোড়াই চলে এসেছে। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা এই লৌকিক কাহিনীকে সর্বাংশে মেনে নেন নি।[২] চৈতন্যদেব হয় তো এই কাহিনী আস্বাদন করেছেন, তিনি বিদ্যাপতির গানও আস্বাদন করেছেন, বলা বাহুল্য, এঁরা বৈষ্ণব বলে নয়, লৌকিক কাহিনী চৈতন্যদেবের ধর্মানুভূতিতে অলৌকিক হয়েছিল বলেই। ষোড়শ শতাব্দী থেকেই বৃন্দাবন গোস্বামীদের রসশাস্ত্রকে অনুসরণ করে পদকর্তারা পদাবলী রচনা করতে থাকেন। তখন থেকেই বাংলা সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কাহিনীর দুটি রূপ দাঁড়িয়ে যায়। চৈতন্যধর্মের দ্বারা মার্জিত কাহিনীটি একটা উচ্চ দার্শনিক-কল্পনার প্রতীকে পরিণত হল। বলা বাহুল্য, এই সূক্ষ্ম দার্শনিক অনুভূতি স্বভাবতঃ একটা বিশিষ্ট সম্প্রদায়েই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের এই রূপ অষ্টাদশ শতাব্দীতেও চলে এসেছে। এই প্রসঙ্গে ১২২৫ সালে স্বকীয়-পরকীয়বাদের প্রসিদ্ধ বিচারসভাও স্মরণীয়। স্বকীয়বাদের প্রধান সমর্থক ছিলেন জয়পুরের মহারাজার সভাপণ্ডিত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য, আর পরকীয়বাদের মুখ-পাত্র ছিলেন রাধামোহন ঠাকুর। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে উজ্জ্বলনীলমণির টীকাগ্রন্থ রচনা করেন উজ্জ্বলচন্দ্রিকা নামে। এই সময়েই পদসংকলন গ্রন্থ-গুলিতে রসশাস্ত্র অনুসারে পদ সাজানো হয়। বলদেব বিদ্যাভূষণের সুবিখ্যাত গোবিন্দভাষ্য এই সময়েরই রচনা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাক্তধর্ম লোকপ্রিয় হয়েছিল সত্য, বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক ভিত্তিও অটল ছিল। মঠে এবং আখড়াতে গণ্ডীবদ্ধ হয়ে পড়লেও নিজেদের মধ্যে ধর্মের পটভূমি অবিকৃত ছিল বলেই মনে হয়। পদাবলী রচনাও অব্যাহত ছিল। অবশ্য তার মধ্যে পূর্বযুগের প্রাণস্পর্শ ছিল না ; কিন্তু এর থেকে প্রত্যক্ষভাবে কবিগানের সৃষ্টির কারণ দেখা যায় না। বিশেষ করে কবিগানের মহড়া চিতেন অন্তরার অনুক্রমে গান রচনার আদর্শ পদাবলী সাহিত্যে কোথাও পাওয়া যায় না।

১ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'কীর্তিলতা' (১৩৩১) ভূমিকা, পৃ ১৮৶-২/০।

২ সুকুমার সেনের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১৭৩ দ্রষ্টব্য।

কবিওয়ালাদের মধ্যে এমন বৈষ্ণব সাধক কেউ নেই, যাঁর সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে তিনি বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

নিত্যানন্দদাস বৈরাগীর দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। যদিও বিখ্যাত কবিওয়ালাদের মধ্যে তিনি একক, তবু আমাদের উদ্দিষ্ট বক্তব্যের সমর্থক-দৃষ্টান্ত হিসাবেই তাঁকে গ্রহণ করব। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র খড়দহের উৎসবে বৈষ্ণবধর্মের দ্বার সমাজের নিম্নতন শ্রেণীর কাছেও উন্মুক্ত করে দিলেন। তাদের থেকেই পরবর্তী বৈরাগী বৈষ্ণবের উদ্ভব হয়েছিল।[১] কবিওয়ালাদের মধ্যে অনেকেই সমাজে নিম্নবর্ণের থেকে এসেছিল। সে কথাও স্মরণ করা দরকার। লৌকিক কৃষ্ণরাধার লীলাকাহিনী এদের মধ্যেই অব্যাহত ছিল। চৈতন্যপূর্ব যুগে লৌকিক কাহিনী নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনার পরেও এই শ্রেণীর কাব্যের সন্ধান আরও পাওয়া গিয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীর কবিশেখর রায় রচিত 'গোপালবিজয়' "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র অনুরূপ"। ভবানন্দের 'হরিবংশ'ও পৌরাণিক হরিবংশের সংশ্রবমুক্ত। "কৃষ্ণলীলা-কাহিনীর যে মৌলিক আদি-রসাত্মক ধারাটি শ্রীচৈতন্যের ভক্তিধর্মের কথঞ্চিৎ পাশ কাটাইয়া ক্ষীণভাবে বহিতেছিল ভবানন্দের কাব্যে তাহাই প্রবাহিত হইয়াছে।"[২] 'হরিবংশে'র সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় ভাগবতের সঙ্গে তুলনায় এর কাহিনীর বিভিন্নতা ভালো ভাবেই দেখিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যে আলোচনা করেছেন, তাও প্রণিধানযোগ্য—

"কৃষ্ণকীর্তন কাব্যখানি গীতিনাটক বিশেষ। ইহার প্রায় সর্বত্রই কণ্ঠ গানের সখী সংবাদের ছল ও বিদ্রূপ পূর্ণ। চাপান ও উতোর এর মত উক্তি প্রত্যুক্তি দেখা যায়।"[৩]

এই উক্তি থেকেই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' কবিগানের একটি পূর্বাভাস কল্পনা করা যায়। এই অনুমান সত্য হোক বা মিথ্যা হোক, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' যে লোক-কাহিনীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সেই কাহিনীর ধারাতে কবিগানের সৃষ্টি হয়েছিল, এ কথা মনে করবার কারণ আছে।

---

১ M. T. Kennedy, *The Chaitanya Movement* (Oxford University Press, 1925) Chapter V. The Generation following Chaitanya.

২ সুকুমার সেনের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ২১৫ এবং ৪২৮।

৩ সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত 'ভবানন্দের হরিবংশ' (১৩৩২) ভূমিকা, পৃ ৩৸/০।

ঝুমুর গান থেকে যে কবিগানের উদ্ভব—একথা কেউ কেউ স্পষ্ট করেই বলেছেন।[১] তাঁদের মতে প্রাচীন কালিয়-দমন যাত্রার কৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ ঘটিত সঙ্গীতগুলির নাম ছিল ঝুমুর। বালকেরা ঐকতানে ঝুমুর গান করত ; এই ঝুমুর গান থেকেই শ্রোতারা বুঝতে পারত কোন পালার যাত্রা হবে। বাংলা ঝুমুরের সঙ্গে সাঁওতালি ঝুমুরের সাদৃশ্যও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বৈষ্ণব পদাবলীর পরিবেশ-চিত্রের সঙ্গে মিল দেখলেও বিস্মিত হতে হয়।[২] কোনো একটি আদিম লৌকিক কাহিনী বাংলার সংস্কৃতির নিম্নতম স্তরে প্রবাহিত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণ-ধামালী নামক গানের কথাও মনে পড়বে। বস্তুতঃ ঝুমুর এবং কৃষ্ণধামালীর মধ্যে ভাবগত পার্থক্য নেই। কৃষ্ণধামালী এতই অশ্রাব্য যে গ্রামের বাইরে গাইতে হত। নগেন্দ্রনাথ বসু দেবতার সম্মুখে গাওয়া হত বলে যে ঝুমুরের উল্লেখ করেছেন, সম্ভবতঃ সেটা ছিল শুকুল বা শুক্ল ধামালী।[৩] ধামালী গ্রাম্য আদিরসাত্মক কাহিনী নিয়ে রচিত হত, এর ভঙ্গিও ছিল উত্তর প্রত্যুত্তরমূলক। এই প্রণয়-কাহিনীতে প্রেমবৈচিত্ত ভাবসম্মিলন বা পদাবলীর বিরহের মতো সূক্ষ্ম কল্পনা যেমন সম্ভব ছিল না, তেমনি প্রেমে প্রবঞ্চনা, কপটতা, গঞ্জনা বা দীন অভিমানই ছিল প্রায় সর্বস্ব। কৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণ-রাধার প্রণয় এই গ্রাম্য কল্পনার উর্ধ্বে উঠতে পারে নি। কৃষ্ণকীর্তনে চরিত্র তিনটি, কৃষ্ণ রাধা, বড়াই। কবিগানেও তিনটি চরিত্রই আছে, কৃষ্ণ রাধা এবং দূতী। কৃষ্ণকীর্তনে বড়াই দূতী ছাড়া তো আর কিছুই নয়। সেকালের সমাজবহির্ভূত নীতিহীন প্রেমের নায়ক নাগর কৃষ্ণের ছবি যেমন পাওয়া যাবে কৃষ্ণকীর্তনে, তেমনি অসহায় কিশোরীর প্রথমে কঠোর প্রতিবাদ এবং পরে আত্মসমর্পণের ও হাহাকারের নিখুঁত ছবিও তাতে পাওয়া যায়। এই ছবিই গানের আকারে কবিসঙ্গীতেও ফুটে উঠেছে। গান হলেও একটা কাহিনীর ক্ষীণ সূত্রও আছে, যা ধামালী প্রভৃতি লোক-শিল্পেরই অনুরূপ। কেউ কেউ মনে করেছেন, কবিওয়ালাদের গানে প্রথম আত্মগত ভাব বা আধুনিক আদর্শের মানবীয়তার উন্মেষ ঘটেছে। কিন্তু

১ দ্রষ্টব্য, বিশ্বকোষ, 'কবি', প্রবন্ধ ; সাহিত্যসংহিতা, ১৩১২, ভাদ্র, পৃ ৩২২।

২ অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য এই সাদৃশ্যের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। দ্রষ্টব্য, 'বাংলার লোকসাহিত্য' (২ সং) পৃ ১৯৭-২০০। তিনি বলেন, 'সাঁওতাল প্রেমসঙ্গীতের নায়ক এই কাল ছোঁড়াই বাংলার লোকসঙ্গীতে কৃষ্ণের রূপ লাভ করিয়াছে।'

৩ শুক্ল ধামালী নামে এক শ্রেণীর ধামালীর কথা দীনেশচন্দ্র সেনই উল্লেখ করেছেন। দ্রষ্টব্য, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৭ সং) পৃ ২১১।

কবিগান যে বহুকাল প্রচলিত গ্রাম্য কাহিনীর অতিজীর্ণ কল্পনারই অভিব্যক্তি, একথা মনে হলে এর সেই অভিনবত্বে সংশয় জাগে। রবীন্দ্রনাথ এই কল্পনার জীর্ণতাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন—

'কলঙ্ক ও ছলনা ইহাই কবিওয়ালাদের গানের প্রধান বিষয়। বারম্বার রাধিকা এবং রাধিকার সখীগণ কুব্জাকে অথবা অপরাকে লক্ষ করিয়া তীব্র সরস পরিহাসে শ্যামকে গঞ্জনা করিতেছেন। তাঁহাদের আরও একটি রচনার বিষয় আছে, স্ত্রী-পক্ষ এবং পুরুষ-পক্ষের পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ পূর্বক দোষারোপ করা।...এই অভিমান জিনিসটি বাঙালি প্রকৃতির মজ্জাগত নির্লজ্জ দুর্বলতার পরিচায়ক।[১]

কবিসঙ্গীতের এই লৌকিক উদ্ভবের সঙ্গে অবশ্য একথাও মনে রাখা দরকার ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব ধর্মের যে প্রবল প্রসার ঘটেছিল, কবিগান তার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে নি। চৈতন্যধর্মের ঐতিহ্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রাণহীন হয়ে এলেও এই শতাব্দীর কবিগানের ভিন্নতর রূপবন্ধে এবং অত্যন্ত শিথিল আদর্শে গিয়ে মিশেছিল, একথা ঠিক বলা যায় না। তার কারণ আমরা পূর্বেই বলেছি, আদর্শটাকে আঁকড়ে থাকার চেষ্টা সে যুগেও হয়েছিল। তবু আদর্শে দৃঢ় বিশ্বাস এবং গভীরতর অনুপ্রেরণার অভাবে লোকজীবনের এই কাহিনীই বল সঞ্চয় করে এগিয়ে এল। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর আদর্শকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা অসম্ভব ছিল বলেই রাধাকৃষ্ণের লৌকিক কাহিনী বৈষ্ণব ভাবকেও কিছু কিছু গ্রহণ করেছে। প্রথম দিককার কবিরাই বিশেষ করে এই প্রভাবকে স্বীকার করেছে। রুক্মিণী, সত্যভামা, ইন্দ্রযজ্ঞ, হিরণ্যকশিপু বধ, বিশ্বরূপ দর্শন—প্রভৃতি শাস্ত্র পুরাণের প্রসঙ্গ মাঝে মাঝেই এসেছে। আবার 'আমি যে সই গৌরবিণী তারি গৌরবে' কিংবা 'যখন মদনমোহন আসি রাধা রাধা বোলে বাজাত বাঁশি'—প্রভৃতি পংক্তি বৈষ্ণব পদাবলীকে স্মরণ করিয়ে দেয়, সে কথা সত্য। একথাও সত্য, রাম বসুর কোনো কোনো গান ভাবের আন্তরিকতায় অপূর্ব; মনে হয় কবি যেন গভীর আবেগে আপন মর্মবেদনাকেই প্রকাশ করেছেন।[২] কিন্তু এতে

১ লোকসাহিত্য, 'কবিসঙ্গীত', রবীন্দ্ররচনাবলী ৬, পৃ ৬৩৫-৩৬।

২ রাম বসুর যে গানগুলি রবীন্দ্রনাথ গাইতে ভালবাসতেন, তার মধ্যে একটি হচ্ছে 'মনে রহিল সই মনের বেদনা'। এই গানটির স্বরলিপি করেছেন শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। দ্রষ্টব্য, বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৬২, পৃ ১৬৭।

কবিগানের বৈষ্ণবীয় উৎস যেমন প্রমাণিত হয় না, তেমনি আকস্মিক আন্তরিকতায় অন্তর্মুখী ভাবাবেগের সূচনাও প্রমাণিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনেও 'ফুটিল কদম ফুল ভারে নোয়াইল ডাল' প্রভৃতি পদে ব্যক্তি-হৃদয়ের আর্তির পরিচয় আছে। তথাপি এই কাব্যকল্পনার লৌকিক উদ্ভবের ভিত্তি সন্দেহাতীত।

কবিগানের সঙ্গে পদাবলীর কয়েকটি শাস্ত্র পুরাণের কাহিনীর উল্লেখ এবং কিছু কাহিনীগত প্রসঙ্গ ছাড়া আর কোনা দিক্ দিয়েই সাদৃশ্য পাওয়া কঠিন। কবিগানের রূপ-রীতির সঙ্গে পদাবলীর বিন্দুমাত্র মিল নেই। পরবর্তী বৈষ্ণব ধর্মে গৌরনাগর ভাবের অনুপ্রবেশকে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা কেউ সমর্থন করেন নি; তবু যে প্রকৃতিতেই হোক গৌরাঙ্গকে বাদ দিয়ে বৈষ্ণব ধর্মের চর্চা কখনও চলে নি; কিন্তু কবিগানে গৌরাঙ্গের কোনো রকম ভূমিকা নেই। গৌরচন্দ্রিকার পদ রাধাকৃষ্ণের মিলন-গানকে দিব্য অর্থে পরিবর্তিত করত; সেই অলৌকিকত্বের স্পর্শ তো নেই-ই, নেহাত রীতি হিসাবেও গৌরাঙ্গের অস্তিত্বও কেউ মনে রাখল না। যে যুগে পদসংকলন গ্রন্থ হয়েছে, সে-যুগে এতখানি বিস্মরণ অর্থপূর্ণ।

বৈষ্ণব মতে, রাধাকে যদি সংসারের সম্পর্কে বিচার করা যায়, তবে রাধা কৃষ্ণের পরকীয়া; কিন্তু কৃষ্ণের সম্পর্কে বিচার করলে তিনি কৃষ্ণের স্বকীয়া। দ্বিতীয় অর্থে কৃষ্ণ রাধার স্বামী। কবিওয়ালাদের গানে দেখতে পাই, রাধা কৃষ্ণকে প্রায় সর্বদাই 'প্রাণপতি' বা 'স্বামী' সম্বোধন করেছে, যদিও অপ্রাকৃত অর্থের পরিমণ্ডলটি কোথাও সৃষ্ট হয় নি। এখানে সম্পর্ক নেহাতই লৌকিক জীবনের ক্ষেত্রে নেমে এসেছে। কৃষ্ণের ভূমিকাও একটি চরিত্রভ্রষ্ট যুবকের ছাড়া কিছুই নয়। 'The process is the process of dethroning a god for the purpose of humanising a scoundrel.'

এখানে আর একটা দিক্‌ও বিবেচ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাক্তধর্মের প্রভাব এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে বৈষ্ণব ধর্ম মাত্র কয়েকটি স্থানে গণ্ডীবদ্ধ হয়ে পড়ে। দেশের শিক্ষিত সমাজ বৈষ্ণব ধর্মের কথা এক রকম ভুলেই গিয়েছিল, কিংবা তাঁদের কাছে একান্ত গৌণ হয়ে পড়েছিল। ঈশ্বর গুপ্ত উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে কবিদের জীবনী রচনার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিলেন, তাদের মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ছাড়া কোনো বৈষ্ণব কবি নেই। তিনি গৌরচন্দ্রিকা, প্রেমবৈচিত্ত্য বা এই শ্রেণীর খাঁটি বৈষ্ণবীয় ভাবের গান একটিও

সংগ্রহ করেন নি, এটা লক্ষ্য করবার বিষয়। অথচ কবিগানের ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। বৈষ্ণব ধর্ম এবং কাব্যের আলোচনা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহের পূর্বে বিশেষ দেখা যায় না। বৈষ্ণব ঐতিহ্যের এই বিস্মৃতিকে কবিওয়ালাদের গান কেন রোধ করতে পারে নি? আসলে এই ঐতিহ্যের সঙ্গে তাদের কোনো যোগ ছিল না বলেই বৈষ্ণব ধর্ম ধীরে ধীরে অন্তরালে চলে গেল, কিন্তু কবিগান নিম্নতম জনসমাজ থেকে দেওয়ান এবং রাজাদের সমান মনোরঞ্জন করতে পারল।

কবিগান ও ঈশ্বর গুপ্তের যুগ

কবিওয়ালাদের গানের সঙ্গে সমসাময়িক যুগের প্রত্যক্ষ কার্যকারণসূত্র আবিষ্কার করা কঠিন। 'সপ্তমী' নামে যে গানগুলি কবিসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত, সেই গানে শক্তির চেয়ে বাৎসল্যই প্রকাশ পেয়েছে; সখীসংবাদ বা বিরহের বিষয়ের সঙ্গে শ্রোতাদের বা স্রষ্টাদের কোনা যোগ কল্পনা করা যায় না। একমাত্র খেউড় গানেই রচয়িতার বা প্রতিপক্ষের প্রত্যক্ষ ছায়াপাত হয়েছে। খেউড় গানের মধ্যে কবিওয়ালাদের কিছু সংবাদ পাওয়া যেতে পারে,[১] যদিও তারা অনেকখানি বিকৃত এবং বিদ্রূপাচ্ছন্ন। বলা বাহুল্য, সাহিত্য হিসাবে এদের বিন্দুমাত্র উৎকর্ষ নেই। কবিগানের মধ্যে যদি সমসাময়িক সমাজের ইঙ্গিত কিছু খুঁজতে চাওয়া যায়, তা হলে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। তবু পরিবেশের মধ্যে এমন আনুকূল্য এসেছিল যার ফলে দেশের প্রচ্ছন্ন লৌকিক চেতনা হঠাৎ এত মুখর হয়ে উঠল। দীর্ঘ কাব্য রচনার ঐতিহ্য সমাপ্তপ্রায় এবং খণ্ড গানের যুগ যে এসে গিয়েছিল তাও আমরা দেখেছি। রাজসভার নিশ্চিন্ততাও যে বিগত তাও পরিবর্তমান জাতীয় ঘনঘটায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে কৃষি-জীবিকাও যে প্রবল আঘাত পেয়েছিল, তাও মন্বন্তরে এবং বারবার রাজস্ব-ব্যবস্থার পরিবর্তনে সহজেই বুঝতে পারা যায়। এই সময় সাহিত্য স্বভাবতঃই অর্থকরী হয়ে উঠেছিল। কবির দল করে গান শুনিয়ে অর্থোপার্জন একটা প্রয়োজনেই পরিণত হল বলা যায়।[২] আখড়াই

১ দৃষ্টান্তস্বরূপ ভোলা ময়রার 'আমি ময়রা ভোলা ভিয়াই খোলা' অথবা রাম বসুর হরুর প্রতি সঙ্গীত-শর 'ঠাকুর বাঁচবেন না বিত্তর দিন' কিংবা এন্ট নি ফিরিঙ্গির 'ভজন পূজন জানিনে মা'—ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়।

২ যাত্রা, পাঁচালী, কীর্তন প্রভৃতি সব কিছুই একই পরিণামে পৌঁছেছিল।

গানের লক্ষ্যের সঙ্গে কবিগানের এখানে একটা খুব বড়ো প্রভেদ ছিল। নিধুবাবু সঙ্গীতটাকে শিল্প হিসাবেই চর্চা করেছিলেন; কবিওয়ালারা কিন্তু ধনীর প্রসাদ লাভ এবং অর্থলাভের জন্যই মুখ্যতঃ গান করেছে। পূজা উপলক্ষে বায়না পাওয়া কিংবা খেউড় শুনিয়ে অশিক্ষিত জনসাধারণের কাছে প্রিয় হওয়া কবিওয়ালাদের সাফল্যের অন্যতম মানদণ্ড ছিল। নিতে-ভবানীর লড়াই শুনতে নাকি দূর গ্রামাঞ্চল থেকে লোক ভেঙে পড়ত। বলা বাহুল্য, লড়াইটাই ছিল প্রধান, শিল্পটা গৌণ। মোহনচাঁদ বসু যখন আখড়াই গানকে এই কবিগানের সঙ্গে মিশিয়ে হাফ আখড়াইয়ের সৃষ্টি করলেন, শিল্পরসিক নিধুবাবুর তাতে রুষ্ট হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল।

এ সব সত্বেও স্বীকার করতে হবে মঙ্গল কাব্যে যেমন কবিওয়ালাদের গানেও তেমনি বাংলা দেশের সংস্কৃতির একটা দিক্ প্রতিফলিত হয়েছিল। কবিগানের এই সাংস্কৃতিক পরিচয় তেমন বলিষ্ঠ নয়। যে নৈতিক দুর্গতির পরিচয় এর মধ্যে আছে সেটা অষ্টাদশ শতাব্দীতেই প্রবল হয়ে উঠেছিল। শুধু খেউড়েই নয়, সখীসংবাদ বা বিরহেও সেই দুর্গতির ছাপ আছে। কৃষ্ণের ব্যবহার কলঙ্কে ও ছলনায় ক্লেদাক্ত। তার সঙ্গে রাধার অভিমান প্রণয়ের দুর্বল রুগ্ন ভাবালুতা মাত্র। জীবনে বলিষ্ঠ আদর্শ নেই। এমন একটি সর্বজন পরিচিত চরিত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন, যাঁর স্বাস্থ্যকর প্রভাব কবির কল্পনাকে ঋজু ও শক্তিমান্ করে তুলতে পারে। যাঁরা এসব গান শুনতেন, ক্ষমতার ক্ষেত্রে তাঁদের আদর্শও অকলঙ্ক বা ঋজু ছিল না। কৃষ্ণের প্রবঞ্চনা ও রাধার লাঞ্ছনা এবং তাই নিয়ে সখীদের প্রতিকারহীন অনুযোগ শুনতে বিবেকের অসম্মতি ছিল না। এগুলি যে বাঙালী সংস্কৃতির উত্তম এবং প্রাণবান্ ফল—একথা অবশ্যই স্বীকার্য নয়। শেষ পর্যন্ত তাই তারা স্থায়ী হল না, যদিও একে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা যথেষ্টই হয়েছে। কবিগান ফিরে গিয়েছে সেইখানে, যেখান থেকে একদিন সমাজের চিত্তশূন্যতার সুযোগ নিয়ে উঠে এসেছিল। গ্রামাঞ্চলেও নিম্নতর লোকসমাজে এখনও কবিগানের চর্চা হয়, কিন্তু বলিষ্ঠতর চিন্তা এবং কল্পনায় যে আসন পূর্ণ, সেখানে আর সে স্থান পায় না।

ইংরেজি শিক্ষার ফলেই আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এই বিপুল পরিবর্তন এসেছিল, এটা সকলেই জানেন। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতেও কবিগানের চর্চা চলেছে। কলকাতাতেই কবিগান ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও সমাদৃত ছিল। আবার ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর এক শ্রেণীর সমাজ

গড়ে উঠতে লাগল, কবিগানকে যারা ঘৃণাই করেছে। শেষে এই দলের প্রভাবই উচ্চতর স্তরে স্থায়ী হয়েছে এবং তারই ফলে কবিগান হল নির্বাসিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সাংস্কৃতিক জীবনকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে দুটি বিপরীত আদর্শের সংঘাত সেকালের ভাবজীবনকে আলোড়িত করেছে। সাধারণভাবে আমরা এই দুটি আদর্শকে বলতে পারি রক্ষণশীল এবং প্রগতিপন্থী। সমাজ সংস্কারে এই দুটি দল দুই বিপরীত পথে যাত্রা করেছিল। রক্ষণশীল দল দেশীয় আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতিকে অক্ষুণ্ণ রাখবারই চেষ্টা করেছিল। তাদের মমতার বস্তুর মধ্যে কবিগানও অন্যতম। ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিগানের আশ্রয়দাতা ছিলেন যাঁরা, তাঁরা সকলেই রক্ষণশীল দল, এমন কি ধর্মসভার নেতা ছিলেন। রক্ষণশীল দলই সতীদাহ নিবারণ আইনের প্রতিরোধ করতে ধর্মসভা স্থাপিত করেছিল (ইং ১৮৩০, ১৭ই জানুয়ারি)। রাধাকান্ত দেব ছিলেন এর সভাপতি। রাধাকান্ত ছিলেন কবিগানের প্রধান আশ্রয়দাতা মহারাজ নবকৃষ্ণ দেবের পৌত্র। রাধাকান্ত দেব কবিগানকে কতখানি পোষণ করেছেন বলা কঠিন। তিনি ধর্মসভার নেতা হয়েও অনেক দিক দিয়ে নূতনত্বের প্রয়াসী ছিলেন। ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে তাঁর আগ্রহ ছিল, আবার স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারেও তিনি সমান উৎসাহী ছিলেন। ধর্মসভায় যখন দলাদলি আরম্ভ হল, তখন রামদুলাল সরকারের দুই পুত্র আশুতোষ দেব এবং প্রমথনাথ দেব নতুন ধর্মসভার সঙ্গে যুক্ত হলেন। এঁরা উভয়েই কবিগানের উৎসাহদাতা ছিলেন। আশুতোষ দেব স্বয়ং গান রচনা করেছেন। তাঁদের বাড়ীতে যে কবির দল হয়, তার গান বেঁধে দিতেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—একথা আগেই বলা হয়েছে। ধর্মসভার একজন উৎসাহী নেতা ছিলেন মতিলাল শীল। তিনিও বাল্যকালে কবির দলে গান করতেন।[১] অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে যোগাযোগ করে যাঁরা বিত্ত অর্জন করেছিলেন, তাঁরা স্বভাবতই সংস্কৃতির শ্রমসাধ্য দিকটির চর্চা করেন নি। সহজ আনন্দের লঘু গানের আয়োজন করে তাঁরা অবসর যাপন করেছেন। এদের বংশধর ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর 'বাবু'। পৈতৃক সম্পত্তির অকুণ্ঠ অপব্যয় করে এরা তাদের যুগটাকে কাটিয়ে দিয়েছে। সময়ের দিকে

---

১ "He took a· active part in his youth in Saker Kobees, and other amateur performances which were frequently got up in those days during the Saraswati and other Poojahs'.

—Kissory Chand Mitra, *Life of Mutty Lall Seal* (1869), p. 3

তাকাবার উৎসাহও ছিল না, অবসরও ছিল না। কবির গান শোনার বিলাস এদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকল। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাচার নকশা'য় এদের বর্ণনা সকলেরই মনে পড়বে। জীবন যেমন এদের কাছে রুদ্ধ ও অচল হয়ে পড়েছিল, কবিগানের বিকাশহীন ধারাও এদের মধ্যে গিয়ে বদ্ধ এবং পরে এদের সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়ে গেল। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় সেকালের সমাজ এবং কবিগানের একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল।

Our enumeration of the amusements of the Bengalis would be incomplete if we made no mention of the *Kavis*, which deserve a place in this list, not because of their intrinsic importance, but because of the vast influence they exert, and the great attractions they possess for nine-tenths of the people of Bengal. Kavi in the original Sanskrit means a poet ; but how this honourable appellation came to be applied to a crew of half-witted poetasters and songsters, it is difficult to say. A band of *Kavis* or Kaviwalas as they are often called is composed of a number of songsters of different castes leagued together under a leader, who gives name to the association. The leader may be a Brahmin, a confectioner or of any caste. The manner of singing is one of which Young Bengal may well be ashamed. *Kavis* must be seen, heard and tasted in order to be known and appreciated. The houses of some of the Babus of Calcutta are annually the seens of this disgraceful exhibitions. Others have got heartily tired of them and have substituted the less barbarous but not less immoral *naches.* But the *Kavis* are in high repute in the Moffusil and women from behind the screens may be observed greedily devouring their licentious effusions.[১]

[১] *The Calcutta Review*, 1851. January-June, p. 349-350. *Bengali Games & Amusements.*

বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা বিশেষ করে দুটি পরিবারের প্রতি অবহিত হতে চাই উনবিংশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে যারা দু'দিক্ থেকে অর্থান্বিত করে তুলেছে। একটি পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবার আর একটি যোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার। এঁদের পূর্বপুরুষ জয়রাম ঠাকুরের মৃত্যু হয় ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র দর্পনারায়ণ ঠাকুর পাথুরিয়াঘাটার বংশের প্রতিষ্ঠাতা; আর তৃতীয় পুত্র যোড়াসাঁকোর বংশের প্রতিষ্ঠাতা। আধুনিক বাঙ্গালী সমাজ গঠনে এই দুই বংশের ভূমিকা দুই রকম। দর্পনারায়ণের পুত্র গোপীমোহন ঠাকুর হিন্দু কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস এবং কালী মির্জার ইনিই ছিলেন আশ্রয়দাতা। অনেক দিন পর ঈশ্বর গুপ্তও গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহায়তায় সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা প্রকাশ করেন। ঈশ্বর গুপ্ত সংবাদ প্রভাকরে যাঁদের ঋণ বিশেষভাবে স্বীকার করতেন, তাঁদের অধিকাংশই এই পরিবারভুক্ত। যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের কাব্যচর্চার অভ্যাস ছিল; কবির দল রচনাতেও তিনি উৎসাহী ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্র ছিল সম্ভবতঃ এটাই। এখানে আর একটি তথ্যও উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীকালে ঈশ্বর গুপ্তের জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। গোপাল মুখোপাধ্যায় আবার যোগেন্দ্র মোহনের আত্মীয়।[১] ঈশ্বর গুপ্ত যোগেন্দ্রমোহনের মৃত্যুর পর সংবাদ-প্রভাকর পরিত্যাগ করেন, পরে তিনি আবার রত্নাবলী (১২৩৯) সম্পাদন করতে আরম্ভ করেন আন্দুলের জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিকের আশ্রয়ে। জগন্নাথ-প্রসাদও ধর্মসভার একজন সভ্য ছিলেন। রত্নাবলীও ধর্মসভারই মুখপত্র ছিল।[২] জগন্নাথপ্রসাদও একজন কবি ছিলেন।

ঈশ্বর গুপ্তের বাল্যকাল সম্পর্কে যে সংবাদ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্র সংগ্রহ করেছিলেন তাতে দেখা যায় ঈশ্বর গুপ্ত কবি গানের একটি নিবিড় পরিবেশের মধ্যেই মানুষ হয়েছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে অনেকেই পাঁচালী কবি প্রভৃতিতে যোগ দিতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতার এবং পিতৃব্যদেরও সঙ্গীত রচনার শক্তি ছিল। কাঁচরাপাড়ায় সখের

---

১ গোপাল মুখোপাধ্যায় ছিলেন যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের খুড়তুত ভাই রাজেন্দ্রমোহনের দৌহিত্র। দ্রষ্টব্য, জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার, বংশ পরিচয়, ৪র্থ খণ্ড, (১৩৩২) পৃ ৩৪।

২ জন্মভূমি, সপ্তম ভাগ, ১১শ সংখ্যা, কার্ত্তিক; পৃ ৩২৭।

দলেও তিনি উত্তর গান প্রস্তুত করতেন। সমস্যা পূরণেও তিনি অত্যন্ত পটু ছিলেন। মাতামহের গৃহে ঈশ্বর গুপ্ত পালিত হয়েছিলেন। গোপীমোহন ঠাকুরের পরিবারের সঙ্গে এঁদের পরিচয় ছিল। এই সূত্রেই তিনি যোগেন্দ্র মোহন ঠাকুরের সঙ্গে পরিচিত হন। ঈশ্বর গুপ্তের প্রাচীন কবিদের প্রতি অনুরাগের পরিচয় এই সময় থেকেই পাওয়া যায়। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রামপ্রসাদের 'কালীকীর্তন' তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।

ঈশ্বর গুপ্ত যখন কলকাতায় সম্পাদকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন তখন তিনি রক্ষণশীল দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 'বেঙ্গল হরকরা এ্যাণ্ড ক্রণিকল' পত্রে প্রভাকর সম্পাদক সম্পর্কে যে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল তার থেকেও পত্রিকার বৈশিষ্ট্য বোঝা যায়—

He has merely abused the infidels by which he has gained much regard among the Hindoos ; for no respectable person thinks of arguing with an infidel. Consequently the Prubhakar has filled his paper with the meanest terms of speech. Now, however he has attacked religion and if he continues in this course we shall know the power of the son of a leech and his supporters.[১]

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমাচারচন্দ্রিকা' পত্রিকাও ইংরেজি পত্রিকাগুলির দ্বারা অনুরূপ ভাষাতেই নিন্দিত হত। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এককালে রামমোহনের 'সম্বাদকৌমুদী' সম্পাদনায় তাঁর সহযোগী ছিলেন। কিন্তু ধর্মবিষয়ে মতানৈক্যের ফলে তিনি রামমোহনের সংশ্রব ত্যাগ করে ধর্মসভায় যোগ দেন। সমাচারচন্দ্রিকা তিনি তার বহুপূর্বেই ১৮২২-এ প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাটি ধর্মসভার মুখপত্র হয়ে দাঁড়ায়। সংবাদপ্রভাকরের প্রকাশের পর তার ইতিহাস থেকে মনে হয় 'সমাচারচন্দ্রিকা'র থেকে তার দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য বিশেষ ছিল না। সংবাদপ্রভাকরের সাধারণ মনোভাবের দিক্ দিয়ে শুধু নয়, এই সময় নব্যবঙ্গের প্রবল আন্দোলনে ঈশ্বর গুপ্ত রক্ষণশীল দলের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিলেন। এই আন্দোলনে টম পেইনের

---

১ *The Bengal Hurkaru and Chronicle*, **January 28, 1832. Native Papers.**

Age of Reason ইন্ধন দিয়েছিল।[১] সংবাদপ্রভাকরে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে এই বইয়ের অনুবাদ বেরিয়েছিল।

Someone soon after took the trouble to translate some part of Tom Paine's Age of Reason into Bengalee and to publish it in the Prubhakar calling upon the missionaries and upon the venerable character by name to reply to it.[২]

এই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ("the venerable character") খুব সম্ভবতঃ ডাফ। ডাফ লিখেছেন,

The editor of one of these, published a separate pamphlet, attacking the Bible on the score of its alleged inconsistencies. A copy of it he transmitted to me, with his compliments, challenging a reply.[৩]

সংবাদপ্রভাকরে প্রকাশিত এই অনুবাদটি সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্তেরই করা বলে মনে হয়। লঙের বিবরণে দেখা যায় ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পেইনের অনুবাদটি পুস্তকাকারে বেরিয়েছিল,

In 1834 a book had appeared against Christianity chiefly a translation of Payne's Age of Reason.[৪]

রক্ষণশীল দলের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের সংশ্রবের আর একটি দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। হিন্দুকলেজের শিক্ষাপ্রণালীর বিরুদ্ধে তখন প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে তীব্র প্রতিবাদ হচ্ছিল। ঈশ্বর গুপ্তও এই বাদ বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন। তখন তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করা হবে বলেও কলেজের ডিরেকটর সভা স্থির করেছিলেন।[৫] শনিবার ৩০শে জুলাই ১৮৩১-এর কার্য-বিবরণীতে দেখা যায়,

Resolved that the Papers relative to the Editors of Prubhakar Isher Chundro Goopto be sent to Baboo Chandro Coomar Tagore who promised to get the matter settled and has

---

১ Alexander Duff, *India and India Mission* (1840), Appendix, p. 642.

২ *Bengal Hurkaru*, পূর্বোক্ত সংখ্যা, Native Papers, সমাচারদর্পণ থেকে উদ্ধৃত।

৩ Duff, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ঐ।

৪ Long, *Descriptive Catalogue*, Tract Society's Tract, no. 881.

৫ হিন্দু কলেজ ডিরেক্টর সভার কার্যবিবরণ (পাণ্ডুলিপি) p. 41, 42, 43, 56, 62.

the authority of prosecuting him if necessary without further reference.[১]

এখানে উল্লেখযোগ্য চন্দ্রকুমার ঠাকুর গোপীমোহন ঠাকুরের পুত্র এবং যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের জ্যেষ্ঠতাত। এই সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত শুধু যে ধর্মসভার পক্ষে সংবাদপত্র সম্পাদনা করছেন তা' নয়, কবির দলেও পূর্ণোদ্যমে গান রচনা করছেন। সংবাদপ্রভাকরের শিরোভাগের শ্লোক রচনা করে দিয়েছিলেন প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ। ইনি কবির দলে একজন বাঁধনদার ছিলেন। ১৮২৬-এর কিছু পরে ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়; কবিগানের মধ্যে দিয়েই উভয়ের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।[২]

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই ঈশ্বর গুপ্তের মতবাদের পরিবর্তন হতে থাকে বলে অনুমান করি। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পত্র লিখেছিল,

The Chundrika rose into notice on the shoulders of the Subha, and cannot fail, in some measure to participate in the effects of its prostration. The Editor has now a powerful rival in the Prubhakar which is supported by the influence of the liberal party and is edited by a native of the medical tribe who has few superiors as a Bengali writer.[৩]

তারপর আস্তে আস্তে ঈশ্বর গুপ্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে জড়িত হলেন। তাঁর গোঁড়ামির মনোভাবটি পরিবর্তিত হতে থাকে এবং নতুন যুগের নতুন ভাবধারাকে কিছু কিছু গ্রহণ করেন। যোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হলেন; সমাজসংস্কার মূলক আন্দোলন সম্পর্কেও তাঁর সহানুভূতিপূর্ণ অভিমত প্রকাশিত হতে থাকে। এই পরিবারে কিন্তু সঙ্গীত ইত্যাদি শিল্পকলার আবহাওয়া থাকলেও কবিগানের আদর ছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের পিতা দ্বারকানাথের সঙ্গে রামমোহনের বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। হিন্দু কলেজে পড়বার আগে দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের এ্যাংলো হিন্দু স্কুলেও পড়েছিলেন।

১ কার্যবিবরণ, p. 79. চন্দ্রকুমার ঠাকুর ছিলেন হিন্দু কলেজের গভর্ণর।

২ রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়, 'প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের জীবনচরিত' (২ সং) পৃ ৩৮–৩৯, ৪৭-৫০।

৩ *The Friend of India*, Nov. 8, 1838.

রামমোহনের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সকলেই জানেন, রামমোহন মধ্যযুগীয় ঐতিহ্যের মধ্যে থেকেও আধুনিক ভাবধারায় কতখানি উদ্বুদ্ধ ছিলেন। রামমোহনের সমাজসংস্কারের একজন সহযোগী ছিলেন দ্বারকানাথ। রামমোহনের একটি প্রধান কীর্তি সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধেই প্রথমতঃ ধর্মসভা গঠিত হয়েছিল এবং ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন প্রথম দিকে ধর্মসভার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু ১৮৪৮-এ ঈশ্বর গুপ্ত স্পষ্টতঃই ধর্মসভার প্রতিকূলে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন—

"ধর্মসভা, এই শব্দ শুনিতে অতি উত্তম কারণ ধর্ম্ম শব্দ অতিশয় জাঁকজমকে পরিপূর্ণ কিন্তু ইহাদের ভিতরের মর্ম্ম অন্বেষণ করিলে তন্মধ্যে কোন পদার্থ ই দৃষ্ট হয় না, কেননা এক সভাতেই সকল শোভা নষ্ট করিয়াছে, সতীরীতি সংস্থাপনের নিমিত্ত যৎকালীন ঐ সভার সৃষ্টি হয়, তৎকালীন দেশের অবস্থা অতি ভয়ঙ্কর হইয়াছিল, ধর্মবিষয়ের গোলযোগে অনেকের মনে নানাপ্রকার ভাবের আন্দোলন হয়, হিন্দুগণ ভিন্ন ভিন্ন দলাক্রান্ত হইয়া পরস্পর বিবাদ কলহে প্রমত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে প্রায় সকলেরই আত্মপর ও হিতাহিত বিবেচনা-রহিত হইয়াছিল। সে সময়ে প্রতিযোগিপক্ষের উন্নতির উচ্ছেদ করণের মানসে অনেক ধনাঢ্য ও দলপতিবর্গ পরস্পর স্থির প্রতিজ্ঞায় দলবদ্ধ করত একত্র হইয়া ধর্মসভা স্থাপিত করেন কিন্তু জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য ইচ্ছা, সত্যের কি নির্মল প্রতিভা, দলাধ্যক্ষ মহাশয়ের যে অভিপ্রায়ে সভা করিয়া দ্বেষানলে দগ্ধ হইলেন সে ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, "ধর্ম্ম" আপনি আপনার রক্ষক হইয়া তাঁহারদিগের মর্ম্মভেদ ও শর্ম্মচ্ছেদ করিলেন···মূল আশাভঙ্গ হইলে স্থূলবুদ্ধি সভ্যেরা আর কি করেন কিছুই ভাবিয়া পান না···"[১]

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র কোনো একটি সংখ্যায় এই রকম অভিমত প্রকাশ করা হয় যে ব্যবস্থাপক সভায় বারোজন ভারতীয় যদি নিযুক্ত হন, তাহলে তাঁদের কাজ হবে প্রধানতঃ দুটি, লেক্স লোসির উচ্ছেদ এবং সতীপ্রথার প্রবর্তন। ঈশ্বর গুপ্ত 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র সমালোচনা করে লেখেন[২] প্রথমটি হলে ভালোই, কিন্তু দ্বিতীয়টি হবে না; কারণ "বর্তমান সময়ের হিন্দুদিগের অভিমত বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা প্রকাশ হইয়াছে—" বস্তুতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে যে প্রচণ্ড আন্দোলন

১ সংবাদপ্রভাকর, মঙ্গলবার, ১৬ই মে, ১৮৪৮।

২ সংবাদপ্রভাকর, বুধবার, ১ সেপ্টেম্বর, ১৮৫২।

সমাজে এসেছিল, ঈশ্বর গুপ্ত প্রথমটায় রক্ষণশীলদের পক্ষে থাকলেও পরে পক্ষ পরিবর্তন করেছিলেন। পঞ্চম দশকে আন্দোলন কতকগুলি স্থির মূল্যবোধে রূপ নিতে আরম্ভ করেছিল। ঈশ্বর গুপ্তের এই মতান্তরে উত্তরণ প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতির নবযুগে উত্তরণের প্রতীক। সে দিক থেকে তাঁকে অনায়াসেই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধি-স্থানীয় কবি বলতে পারি।

ঈশ্বর গুপ্ত যে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দেও কবির দলে গান বেঁধেছেন, বর্তমান গ্রন্থে পরিশিষ্টে উদ্ধৃত জনৈক অপক্ষপাতী সঙ্গীত-সংগ্রামদর্শীর বিবরণে তার প্রমাণ আছে।[১] আশ্চর্যের বিষয় সমাজ-চিন্তার দিক দিয়ে সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত অন্ধ রক্ষণশীল ছিলেন না; কিন্তু বাংলা দেশের প্রাচীন সংস্কৃতিকে তিনি যে ভালোবাসতেন, তা' যেমন কবিওয়ালাদের জীবনী রচনায় তেমনি কবির লড়াইয়ের বাঁধনদারের ভূমিকাতেও বুঝতে পারা যায়। এই দ্বিধা সেকালের সাধারণ বাঙালীর মধ্যে দীর্ঘকাল টিঁকেছিল। রামমোহনের চিন্তায় আধুনিক সংস্কৃতির চেতনা প্রথম দেখা দিলেও নব্যবঙ্গের দলই প্রবল উচ্ছ্বাস ভরে প্রাচীন আদর্শের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার মুখপত্র The Bengal Spectator পত্রিকায় যে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল তা উদ্ধৃতিযোগ্য—

It is said that the idol is pleased to hear the vulgar expressions used in Kubees and other hateful songs and that in the presence of the females.[২]

এই মনোভাবকে শিক্ষিত বাঙালী সমাজের মনোভাব বলেই ধরে নেওয়া যায়। পুরোপুরি সংস্কারমুক্ত ইয়ং বেঙ্গল এবং ব্রাহ্মধর্মের নেতা দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে এ বিষয়ে বোধহয় আদর্শের ঐক্য ছিল। হিন্দু কলেজের ছাত্র দেবেন্দ্রনাথ নব্য বঙ্গের একটি স্থায়ী আদর্শকে ধ্রুবরূপে গ্রহণ করেছিছিলেন। সেটা হচ্ছে নৈতিক আদর্শ। এই নীতিবোধকে শুধু আচরণে নয়, রুচির ক্ষেত্রেও রক্ষা করেছিলেন।

ঈশ্বর গুপ্তের জীবনকাল হচ্ছে সেই যুগে যখন সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী নবযুগের চিন্তাকে ধীরে ধীরে গ্রহণ করছে। ঈশ্বর গুপ্ত তাদেরই কবি—

---

১ "রচকের নাম প্রকাশ নাই, তবে কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় গুপ্ত ও অগুপ্ত—" বর্তমান গ্রন্থ, পৃ [illegible]।

২ *The Bengal Spectator*, 24th October. 1848.

এইজন্য তাঁর গদ্যপ্রবন্ধে এবং কবিতায় এত প্রভেদ। প্রবন্ধে তিনি নতুন যুগকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন আর কবিতায় তিনি তাই নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন। তাঁর কবিতার বিদ্রূপের ভঙ্গিটা যে কবিওয়ালাদের খেউড়ের থেকে এসেছিল, সে বিষয়ে সংশয় করা চলে না। ইংরেজি সাহিত্যের স্যাটায়ারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না। ঈশ্বর গুপ্তের পরের থেকেই বাংলার মুখ্য চিন্তাকেন্দ্রে দ্বিধার ভাব কেটে গেল। বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙালীপ্রীতি গভীর হলেও একটি বলিষ্ঠ সংস্কৃতির চিন্তাই তিনি করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন অন্যান্য মনীষীদের চিন্তাতেও একটা উচ্চতর যুগোপযোগী মূল্যবোধ দেখা দিল। বঙ্কিমচন্দ্র কবিওয়ালাদের সম্বন্ধে বলেছেন,

'তৎপরে কতকগুলি 'কবিওয়ালার' প্রাদুর্ভাব হয়, তন্মধ্যে কাহারও গীত অতি সুন্দর। রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিতাই দাসের এক একটি গীত এমন সুন্দর আছে যে ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে তত্তুল্য কিছুই নাই। কিন্তু কবিওয়ালাদিগের অধিকাংশ রচনা অশ্রদ্ধেয় ও অশ্রাব্য সন্দেহ নাই।'[১]

বঙ্কিমচন্দ্রের এই মনোভাবটাই আধুনিক পাঠকদের সাধারণ মনোভাব। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে মূল্যবিচারের ক্ষেত্রে দুটি বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা যে একেবারেই চলে গিয়েছিল, তা হয়তো বলা যাবে না। ঈশ্বর গুপ্তের পরে হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'কবিচরিত' এবং 'বঙ্গভাষার লেখক'-এ তার জের চলেছে। আর একবার এই বিরোধী আদর্শের প্রকাশ্য সঙ্ঘর্ষ ঘটে গেল বিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম দিকেই। নতুন রুচি এবং রসের আদর্শের কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রাচীন রুচির অনুরাগীদের মধ্যে বিতর্ক দেখা দিল 'কবিসঙ্গীত' নিয়েই। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'গুপ্তরত্নোদ্ধার' (১৩০১) প্রকাশ করলে রবীন্দ্রনাথ সাধনায় তার যে সমালোচনা লেখেন, সেটা 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনার উত্তর দিতে গিয়েই ব্রজসুন্দর সান্যাল কবিওয়ালাদের জীবনী সংগ্রহ করে তাদের সত্যকার সাহিত্যিক মূল্য বিচার করতে চেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে এমন কটাক্ষ করা হয়েছিল, যাকে কবিগানের অঙ্গ খেউড়েরই অন্তর্ভুক্ত করা চলে।[২] একে অবশ্য ঠিক বিতর্ক বলা চলে না।

---

১ বঙ্কিম গ্রন্থাবলী, বিবিধ (সাহিত্য পরিষদ) পৃ ৩৪৭। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, ঈশ্বর গুপ্তের খাঁটি বাঙালীত্বের প্রশংসা করেও বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, খাঁটি বাঙালী 'কবি জন্মিবা আর কাজ নাই'।

২ দ্রষ্টব্য, নব্যভারত, ১৩১১, পৃ ৫২৭-২৯, জন্মভূমি, ১৩০৩, পৃ ২৯৯।

কারণ রবীন্দ্রনাথ আর তার উত্তর দিয়েছিলেন বলে জানা নেই। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে এই সাহিত্যিক দ্বন্দ্ব বেধেছিল, ইতিহাসের দিক্ থেকে এটা সঙ্কেতপূর্ণ। বিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের অধিনায়কতায় এমন রুচি এবং আদর্শে এসে পৌঁছচ্ছে, যেটা নানা দিক্ থেকেই নতুন। বৃহত্তর ভারতীয় এবং বিশ্বতোমুখী ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে এই লৌকিক আদর্শের কোনো স্থানই আর থাকল না।

এদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিবারের ঐতিহ্যকেই রক্ষা করেছিলেন। দ্বারকানাথ বা দেবেন্দ্রনাথের সময়ে তাঁদের গৃহে কবিগানের অনুষ্ঠানের কথা শোনা যায় না। সম্ভবতঃ তাঁরা এটা পছন্দ করতেন না, রবীন্দ্রনাথও শেষ পর্যন্ত তাঁদের রুচিকে রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু কবিগানের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতামত বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই ছিল। তিনিও বিশ্বাস করতেন, কবিওয়ালাদের গানে মাঝে মাঝে উৎকৃষ্ট রসসম্পদও আছে। রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল যে সাহিত্যিক পরিবেশের মধ্যে কেটেছিল, তাতে মধ্যযুগের বাঙালী কবিদের স্থান গৌণ ছিল না। 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি লিখেছেন,

'অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় জ্যোতিদাদার সহপাঠী বন্ধু ছিলেন। তিনি ইংরেজি সাহিত্যে এম-এ। সে সাহিত্যে তাঁহার যেমন ব্যুৎপত্তি তেমনি অনুরাগ ছিল। অপর পক্ষে বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদকর্তা, কবিকঙ্কণ, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, হরু ঠাকুর, রাম বসু, নিধুবাবু, শ্রীধর কথক প্রভৃতির প্রতি তাঁহার অনুরাগের সীমা ছিল না। বাংলা কত উদ্ভট গানই তাঁহার মুখস্থ ছিল।···সাহিত্যভোগের অকৃত্রিম উৎসাহ সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের চেয়ে অনেক বেশি দুর্লভ। অক্ষয়বাবুর সেই অপর্যাপ্ত উৎসাহ আমাদের সাহিত্যবোধগুলিকে সচেতন করিয়া তুলিত।'[১]

কিন্তু এই সাহিত্যের রুচি এবং চিরন্তন মূল্যমান সম্পর্কে তাঁর সন্দেহ ছিল। আধুনিক যুগের ইতিহাস-জিজ্ঞাসার দ্বারা চালিত হয়ে প্রাচীন লোকশিল্পকে তিনি রক্ষা করতে চেয়েছিলেন বটে[২] কিন্তু দ্রষ্টব্য হিসাবেই, উপভোগ্য হিসাবে নয়। লোকজীবন থেকে ছড়া ইত্যাদি সংগ্রহ এবং শান্তিনিকেতনে পৌষমেলায় কবিগানের আয়োজন করলেও উচ্চতর সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে কবিগানের পুনঃপ্রবর্তনের কথা তিনি ভাবতে পারেন নি।

---

১ জীবনস্মৃতি, 'অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী'।

২ মোহিতলাল মজুমদার, রবিপ্রদক্ষিণ, 'পদ্মাবক্ষে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ, পৃ ১৭৪।

তবু নতুন ভাবধারার মধ্যেও কবিগানের সখের অনুষ্ঠান যে শিক্ষিত মহলে হয় নি তা নয়। যাঁরা উদ্যোগী ছিলেন, তাঁদের মধ্যেও লুপ্ত সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগও অবিশ্বাস করা যায় না। দীনেশচন্দ্র সেন পরবর্তীকালে সবিনয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন।[১] যতদূর মনে হয়, হাফ আখড়াই সঙ্গীতের সর্বশেষ অনুষ্ঠান হয় কলকাতায় ইংরেজি ১৯১৮, ২১ অগ্রহায়ণ ১৩২৫-এ।—

'বাংলার পুরাতনের প্রতি অমৃতলালের অকৃত্রিম অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল। ১৩২২ সালের চৈত্র সংক্রান্তিতে (ইং ১৯১৬) অনুষ্ঠিত জেলেপাড়ার সঙের ছড়াগুলি তিনিই রচনা করিয়া দিয়াছিলেন; ইহার কয়েকটি 'অমৃত গ্রন্থাবলী'র ৪র্থ ভাগে মুদ্রিত হইয়াছে। ২১ অগ্রহায়ণ ১৩২৫ (ইং ১৯১৮) শোভা বাজারের গোপীনাথ-প্রাঙ্গণে জোড়াসাঁকো ও কাঁসারি পাড়া—দুই দলের মধ্যে হাফ আখড়াই সঙ্গীত সংগ্রাম হয়। অমৃতলাল জোড়াসাঁকোর পক্ষে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গানগুলি তৎসম্পাদিত 'বীণার ঝঙ্কারে' (১ম সং পৃ ৬০১-৬) স্থান পাইয়াছে।'[২]

এই সঙ্গীতসংগ্রামের বিবরণ পাওয়া যাবে গঙ্গাচরণ বেদান্তবিদ্যাসাগর ভট্টাচার্যের 'হাফ আখড়াই সঙ্গীত সংগ্রামের ইতিহাস' বইটিতে।

---

১ কৃষ্ণকমল গ্রন্থাবলী, ১৩৩৫, দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত পৃ ৫৬–৫৭।

২ সাহিত্যসাধকচরিতমালা (৬ষ্ঠ খণ্ড), 'অমৃতলাল বসু', পৃ ৬২–৬৩।

কবি

কবিবর ৺ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের

জীবন বৃত্তান্ত

সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

কর্তৃক সংগৃহীত ও বিরচিত হইল।

কলিকাতা।

প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

১ আষাঢ় ১২৬২ সাল।

এই পুস্তকের মূল্য ১ এক আনামাত্র।

কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন-বৃত্তান্ত*

কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন-বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত বিদ্যোৎসাহি মনুষ্য মাত্রেই বিষমতর ব্যগ্র হইয়া থাকেন, কারণ ইনি সর্ব্বাংশেই প্রধান ছিলেন; ইঁহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব বিষয়ের গুণের ব্যাখ্যা করিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। বঙ্গভাষার কবিতা পাঠে এই মহাশয়কে অদ্বিতীয় কবি বলিয়াই মান্য করিতে হইবে। ভারতের বিরচিত কাব্য এপর্য্যন্ত পুরাতন হইল না, চিরকাল নূতন রহিল,--সকল সময়েই নূতন বোধ হয়, প্রত্যেক্ বিষয়েই মনকে মোহিত করে। কোকিল বসন্ত আগমনে—মধুকর প্রফুল্ল পঙ্কজ মধু পানে—চাতক নবনীল নীরদ নির্গত নীর পানে—চকোর পরিপূর্ণ শরদিন্দু সুধাপানে—ভুজঙ্গ সুশীতল মৃদুল দক্ষিণ সমীরণ সেবনে—সাধ্বী স্ত্রী পতিসুখ সম্ভোগে—রসিকজন রসালাপ আস্বাদনে—এবং দরিদ্র-ব্যক্তি প্রচুর ধন প্রলাভে যে প্রকার সুখানুভব না করে, ভাব- [২] গ্রাহি অনুরতজনেরা ভারতচন্দ্রের প্রণীত রসভেদের কবিতা পাঠে ততোধিক সুখাস্বাদন গ্রহণ করিয়া থাকেন। সুতরাং এমত মহাপুরুষের "জীবনচরিত" অপ্রকাশ থাকাতে অনেকেই ক্ষুব্ধ হইতে পারেন। এ বিষয়ে যত দূর যত্ন করিতে হয়, আমরা তাহার অন্যথা করি নাই, বহু কাল পর্য্যন্ত সংকল্প করিয়া ক্রমশই যথা বিহিত পরিশ্রম এবং অনুসন্ধান করিয়াছি, কত স্থানে ভ্রমণ করিয়া কত লোকের নিকট কত প্রকারে কাতরতা প্রকাশ করিয়াছি। অধুনা দশ বৎসরের পর বাঞ্ছিত বিষয়ে একপ্রকার কৃতকার্য্য হইলাম, জগদীশ্বর অনুকূল হইয়া বুঝি এতদিনের পর আমারদিগের মনোরথ পরিপূর্ণ করিলেন। এই মহাত্মা যে যে সময়ে যে যে স্থানে যে যে ভাবে "জীবনযাত্রা" নির্ব্বাহ করিয়াছেন, আমরা তদ্বিশেষ সংগ্রহ করত মহানন্দে প্রকটন করিতেছি, সকলে দৃষ্টি বৃষ্টির সৃষ্টি করিয়া মানস-ক্ষেত্রে তুষ্টির বীজ বপন করুন।

৺নরেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় জিলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি "ভুরসুট" পরগণার মধ্যস্থিত "পেঁড়ো" নামক স্থানে বাস করিতেন। তিনি অতি সুবিখ্যাত সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী ছিলেন, সর্ব্ব সাধারণে তাঁহারদিগ্যে সম্মান পূর্ব্বক "রাজা"

* ১২৬২ সাল ইংরেজি ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থ।—স.

বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইনি "ভরদ্বাজ গোত্রে" মুখোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ করেন, বিষয় বিভবের প্রাধান্য জন্য "রায়" এবং "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার বাটীর চতুর্দ্দিগে গড়- [৩] বন্দি ছিল, একারণ সেই স্থান "পেঁড়োর গড়" নামে আখ্যাত হইয়াছিল।

নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের চারি পুত্র, জ্যেষ্ঠ "চতুর্ভুজ রায়" মধ্যম "অর্জ্জুন রায়" তৃতীয় "দয়ারাম রায়" এবং সর্ব্ব কনিষ্ঠ "ভারতচন্দ্র রায়"। এই বিশ্ব বিখ্যাত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর মহাশয় ১৬৩৪ শকে শুভক্ষণে অবনী মণ্ডলে অবতীর্ণ হয়েন।

এমত জনরব, যে, অধিকারভুক্ত ভূমি সংক্রান্ত সীমা সম্বন্ধীয় কোন এক বিবাদ সূত্রে নরেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র রায় বাহাদুরের জননী শ্রীমতী মহারাণী বিষ্ণুকুমারীকে কটুবাক্য প্রয়োগ করেন, ঐ সময়ে মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র অতিশয় শিশু ছিলেন, তাঁহার মাতা মহারাণী সেই দুর্ব্বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত কোপান্বিতা হইয়া "আলমচন্দ্র" ও "ক্ষেমচন্দ্র" নামক আপনার দুইজন রাজপুত সেনাপতিকে কহিলেন "হয় তোমরা এই ক্রোড়স্থ দুগ্ধপোষ্য শিশুটিকে এখনি বিনাশ কর, নয়, এই রাত্রির মধ্যেই "ভুরস্থট" অধিকার করিয়া আমার হস্তে প্রদান কর, ইহা না হইলে আমি কোনমতেই জল গ্রহণ করিব না, প্রাণ পরিত্যাগ করিব" এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করত উক্ত সেনাপতিদ্বয় দশ সহস্র সৈন্য লইয়া সেই রজনীতেই "ভবানীপুরের গড়" এবং "পেঁড়োর গড়" বল দ্বারা অধিকার করিয়া লইল। পর দিবস প্রাতে রাণী বিষ্ণুকুমারী পেঁড়োর গড়ে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ভূপতি নরেন্দ্র রায় ও তাঁহার পুত্রগণ [৪] এবং কর্ম্মচারি পুরুষমাত্রে কেহই নাই, সকলেই পলায়ন করিয়াছেন, কেবল কতকগুলীন স্ত্রীলোকমাত্র অতিশয় ভীতা ও কাতরা হইয়া হা! হা! শব্দে রোদন করিতেছেন। মহারাণী সেই কুলাঙ্গনাগণকে অভয় বাক্যে প্রবোধ দিয়া সান্ত্বনা করত কহিলেন "তোমারদিগের কোন ভয় নাই, স্থির হও, স্থির হও, কল্য একাদশী গিয়াছে, আমি উপবাস করিয়া রহিয়াছি, আমাকে শালগ্রামের চরণামৃত আনিয়া দেহ, তবে আমি জল গ্রহণ করিতে পারি" এই বাক্যে পূজক ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ অমনি তাঁহার সম্মুখে "লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা" আনয়ন পূর্ব্বক স্নান করাইয়া চরণামৃত প্রদান করিলেন, রাণী অগ্রে তাহা গ্রহণ করিয়া পরে জলপান করিলেন। অনন্তর শালগ্রাম এবং অন্যান্য ঠাকুরের সেবার নিমিত্ত কিয়দংশ ভূমি দান করিলেন, আর

ভবানীপুরের কালীর ভোগ-রাগের জন্য প্রতিদিন এক টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন, কিন্তু যে সকল অর্থ ও দ্রব্যাদি লইয়াছিলেন তাহার কিছুই পরিত্যাগ করিলেন না, শুদ্ধ গড়, গৃহ, পুষ্করিণী ও উদ্যানাদি পুনঃ প্রদান পূর্ব্বক বর্দ্ধমানে পুনর্গমন করিলেন।

এতদ্দঘটনায় নরেন্দ্ররায় এককালেই নিঃস্ব হইলেন, সর্ব্বস্বই গেল, কোনরূপে কায়ক্লেশে দিনপাত করিতে লাগিলেন।—এই সময়ে কবিবর ভারতচন্দ্র পলায়ন করত মণ্ডলঘাট পরগণার অধীন গাজীপুরের সান্নিধ্য "নওয়াপাড়া" নামক গ্রামে আপনার মাতুলালয়ে [৫] বাস করত তাজপুর গ্রামে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ ও অভিধান পাঠ করিতে লাগিলেন, চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে এই উভয় গ্রন্থে বিলক্ষণ নৈপুণ্য লাভ করিয়া নিজালয়ে প্রত্যাগত হইয়া ঐ মণ্ডলঘাট পরগণার তাজপুরের সান্নিধ্য সারদা নামক গ্রামের কেশরকুনি আচার্য্যদিগের একটি কন্যাকে বিবাহ করিলেন, সেই বিবাহের পর তাঁহার অগ্রজ সহোদরেরা অতিশয় ভৎর্সনা পূর্ব্বক কহিলেন "ভারত! তুমি আমারদের সকলের কনিষ্ঠ হইয়া এমন অনিষ্টকর কার্য্য কেন করিলে? সংস্কৃত পড়াতে কি ফলোদয় হইবে? তোমার এ বিদ্যার গৌরব কে করিবে? শিষ্য নাই, ও যজমান নাই, যে, তাহারদিগের দ্বারা সমাদৃত হইবে ও প্রতিপালিত হইবে" জগদীশ্বরেচ্ছায় এই তিরস্কার তাঁহার পক্ষে পুরস্কার অপেক্ষাও অধিক কল্যাণকর হইল, কারণ তিনি তচ্ছ্রবণে অতিশয় অভিমানপরবশ হইয়া জিলা হুগলির অন্তঃপাতি বাঁশ বেড়িয়ার পশ্চিম দেবানন্দপুর গ্রাম নিবাসি কায়স্থকুলোদ্ভব মান্যবর ৺ রামচন্দ্র মুন্সী মহাশয়ের ভবনে আগমন পূর্ব্বক পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন, মুন্সীবাবুরা তাঁহার প্রতি বিশেষ স্নেহ পূর্ব্বক বাসা দিয়া, সিধা দিয়া সুনিয়মে সদুপদেশ করিতে লাগিলেন। এই কালে ভারতচন্দ্র সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় কবিতা রচনা করিতে পারেন কিন্তু তাহা কাহারো নিকট প্রকাশ করেন না এবং রীতিমত কোন বিষয়েরি বর্ণনা করেন না।—সময় বিশেষে কেবল মনে [৬] মনে তাহার আন্দোলন মাত্র করিয়া থাকেন।—নচেৎ প্রতি নিয়তই শুদ্ধ বিদ্যাভ্যাসে পরিশ্রম করেন, অপর কোন ব্যাপারের আমোদ প্রমোদে কালক্ষয় করেন না। দিবসে একবার মাত্র রন্ধন করিয়া সেই অন্ন দুই বেলা আহার করেন। প্রায় কোন দিবস ব্যঞ্জন পাক করেন নাই। একটা বেগুন পোড়ার অর্দ্ধভাগ এ বেলা এবং অর্দ্ধভাগ ও বেলা আহার করিয়া তাহাতেই তৃপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত মুন্সি বাবুদিগের বাটীতে একদিবস সত্যনারায়ণের পূজার, সিণি, এবং কথা হইবে তাহার সমুদয় অনুষ্ঠান ও আয়োজন হইয়াছে।—কর্ত্তাটি কহিলেন "ভারত, তোমার সংস্কৃত বোধ আছে, বাক্‌পটুতা উত্তম।—অতএব তোমাকেই সত্যনারায়ণের পুঁতি পাঠ করিতে হইবেক,—গুণাকর ইহাতে সম্মত হইলে মুন্সী পুঁতি আনয়নের নিমিত্ত এক জনের প্রতি আদেশ করিলেন, তচ্ছ্রবণে রায় কহিলেন, "মহাশয়!—পুঁতি আনাইবার আবশ্যক করে না।—আমার নিকটেই পুস্তক আছে, পূজা আরম্ভ হউক, আমি বাসা হইতে পুঁতি আনিয়া এখনই পাঠ করিব।"—এই বলিয়া বাসায় গিয়া তদ্দণ্ডেই অতি সরল সাধুভাষায় উৎকৃষ্ট কবিতার পুঁতি রচিয়া শীঘ্রই সভাস্থ হইয়া সকলের নিকট তাহা পাঠ করিলেন, যাঁহারা সেই কবিতা শ্রবণ করিলেন, তাঁহারা তাবতেই মোহিত হইয়া সাধু সাধু ও ধন্য ধন্য ধ্বনি করিতে লাগিলেন। গ্রন্থের সর্ব্বশেষে ভারতের নামের "ভণিতা" এবং [৭] সবিশেষ পরিচয় বর্ণিত হওয়াতে সকলে আরো অধিক আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন।—সকলেই মুক্ত-কণ্ঠে কহিলেন।—ভারত।—তুমিই সাধু।—সরস্বতী তোমার মুখাগ্রে নৃত্য করিতেছেন।—তুমি সামান্য মনুষ্য নহ।—তোমার অসাধারণ ক্ষমতা ও অলৌকিক সাধ্য দৃষ্টে আমরা চমৎকৃত হইয়াছি।—

হে পাঠকগণ! দৃষ্টি করুন, আমরা আপনারদিগের বিদিতার্থে সেই রচনা অবিকল নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।

যথা।

ত্রিপদী।

গণেশাদি রূপ ধর, বন্দ প্রভু স্মরহর,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষদাতা।
কলিযুগে অবতরী, সত্যপীর নাম ধরি,
প্রণমহ বিধির বিধাতা॥
দ্বিজ, ক্ষত্রি, বৈশ্য, শূদ্র, কলিযুগে ক্রমে ক্ষুদ্র,
যবনে করিতে বলবান।
ফকীর শরীর ধরি, হরি হৈলা অবতরি,
এক বৃক্ষতলে কৈলা স্থান॥
নম্রমাণ্ দাড়ি গোঁপ, গায় কাঁথা, শিরে টোপ,
হাতে আসা, কাঁধে ঝোলে ঝুলি

তেজঃপুঞ্জ যেন রবি, মুখে বাক্য পীর নবি,
নমাজে দর্গার চুমে ধূলি ॥
জাহির কিরূপে হব, কারে বা কিরূপে কব,
ভাবেন বৃক্ষের তলে বসি।
ঈশ্বর ইচ্ছায় ক্ষিপ্র, বিষ্ণু নামে এক বিপ্র,
সেইখানে উত্তরিল আসি ॥
দীন দেখে দ্বিজবরে, সত্যপীর কন তারে,
প্রকাশ করিতে অবতার।
যে সত্য জনারগির, সিণি বেদে দরপীর,*
পুলকে প্রসাদ খাও তার ॥
দ্বিজ বলে হরি বিনে, পুজি নাই অন্য জনে,
কি বলে ফকির দুরাচারী।
ফকিরের অঙ্গে চায়, অদ্ভুত দেখিতে পায়,
শঙ্খচক্র গদা পদ্মধারী ॥
সম্ভ্রমে প্রণতি করি উঠে দেখে নাহি হরি,
শূন্যে শুনে সিণি ইতিহাস।
ক্ষীর, চিনি, আটা, কলা, পান, গুয়া, পুষ্পমালা,
মোকাম পিঠের পরে বাস ॥
[৮] দ্বিজ আসি নিজালয়, আনি দ্রব্য সমুদয়,
নিবেদন কৈল সত্য নামে।
পূজার প্রসাদ গুণে, ধন্য হৈল ত্রিভুবনে,
অন্তে গেলা শ্রীনিবাস ধামে ॥
দ্বিজ স্থানে ভেদ পেয়ে, সাতজন কাটুরিয়ে,
সিণি দিয়ে পূজে সত্যপীর।
দুঃখ তিমিরের রবি, সকল বিদ্যায় কবি,
অন্তে পেলে অনন্ত শরীর ॥
সদানন্দ নামে বেণে, সত্যপীরে সিণি মেনে,
কন্যা হেতু করিল কামনা।

---

*এই বঙ্গভাষা মিশ্রিত পারস্য ভাষা ভূষিত পদের মর্ম মর্মজ্ঞ জনেরা গ্রহণ করিবেন।

ঈশ্বর ইচ্ছায় সার, জন্মিল দুহিতা তার,
চন্দ্রমুখী চঞ্চল নয়না ॥
কাদম্ব কোদর স্থূলা, কাদম্বিনী সুকোমলা,
চন্দ্রমুখী চন্দ্রকলা নাম।
হাসে হেরে যার পানে, ধৈরজ কি তার প্রাণে
কামিনী কামনা করে কাম
কন্যা দেখি রূপযুত, আনিয়া বণিক সুত,
বিবাহ দিলেক সদাগর।
দম্পতির মনোমত, কে জানে কৌতুক কত,
এক তনু নাগরী নাগর ॥
সদাগর মত্ত ধনে, সির্ণি নাহি পড়ে মনে,
সজামাতা সাজিল পাটন।
বাজে কাড়া দামা শিঙ্গা, বাতগামি সাত ডিঙ্গা,
দুর্গদেশে দিল দরশন ॥
সত্যপীর ক্রোধ মন, রাজভাণ্ডারের ধন,
সাধুর নৌকায় থরে থরে।
দৈবে দেখে রাজবলে, কোটাল প্রভাতে চলে,
লোত্ পেয়ে বাঁধে সদাগরে
মৃত্যু হৈতে আয়ু রাখে, বেড়ি পায় বন্দি থাকে,
মেগে খায় লায়ের নফর।
যৌবনে প্রবাসে পতি, কাল নিত্য চাহে রতি,
সাধু কন্যা হইল ফাঁপর।
ভেদ পেয়ে দ্বিজ স্থানে, সত্যপীরে সির্ণিমানে,
চন্দ্রকলা কান্তের কামনা
প্রত্যুষে ফকির রূপ, স্বপনে দেখিয়া ভূপ,
ছেড়ে দিলা সাধু দুই জনা ॥
সাত গুণ ধন লয়ে, সাধু চলে নৌকা বেয়ে,
প্রভু পথে হইলা ফকির।
তথাপি নির্ব্বোধ সাধু, চিনিতে না পারে বিধু,
ক্রোধে ধন হৈল সব নীর

বিস্তর করিয়া স্তুতি, পুন পেলে অব্যাহতি,
নৌকায় পূরিল গিয়া ধন।
অব্যাহতি পেয়ে তনু, ডিঙ্গা বেয়ে যায় পুনু,
নিজদেশে দিল দরশন।
নিজদেশে উত্তরিল, সাধু কন্যা বার্ত্তা পেল,
স্বামিরে দেখিতে বেগে ধায়
প্রসাদ সিরুণী হাতে, ফেলে যায় পথে পথে,
লাফানে, তা পানে নাহি চায়
সত্যপীর ক্রোধভরে, সাধুর জামাতা মরে,
ক্রোন্দন করয়ে চন্দ্রকলা।
ওরে বিধি, হায় হায়!— এ যৌবন বৃথা যায়,
যেন রতি কামের অবলা॥
[৯] ডুবিয়া মরিব জলে, থাকিব স্বামির কোলে,
হেন কালে হৈল দৈববাণী।
সির্ণি ফেলাইয়া আলি, পুন গিয়া খাও তুলি,
পাবে পতি না কাঁদিও ধনী
উপদেশ পেয়ে ধেয়ে, সির্ণি কুড়াইয়ে খেয়ে,
মৃত পতি বাঁচাইলে প্রাণে।
জামাতার মুখ দেখি, সদাগর হৈল সুখী,
সিরিণী করিল সাবধানে॥
এ তিন জনার কথা পাচালী প্রবন্ধে গাঁথা
বুদ্ধি রূপ কৈলা নানা জনা
দেবানন্দপুর গ্রাম, দেবের আনন্দ ধাম,
হীরারাম রায়ের বাসনা॥
ভারত ব্রাহ্মণ কয়, দয়া কর মহাশয়,
নায়কেরে গোষ্টির সহিত॥
ব্রত কথা সাঙ্গ হলো, সবে হরি হরি বলো
দোষ ক্ষম যতেক পণ্ডিত॥

এই কবিতা যৎকালে রচনা করেন তৎকালে ভারতের বয়স পঞ্চদশ বৎসরের অধিক হয় নাই। যদিও এতন্মধ্যে কোন কোন স্থানে মিলের কিঞ্চিৎ

দোষ আছে, কিন্তু গুণাকরের এদোষ দোষের মধ্যেই ধর্ত্তব্য হইতে পারে না,—কারণ একে বয়সের স্বল্পতা এবং সময়ের স্বল্পতা, তাহাতে আবার এই রচনা প্রথম রচনা—ইনি সর্ব্বশেষে যে সকল গ্রন্থ বিরচন করেন তাহার তুলনা প্রায় দেখিতে পাই না।

উল্লেখিত ব্রত কথা ব্যতিরেকে চৌপদীচ্ছন্দে আর একটি কথা, রচনা করেন।—লেখকের লেখার দোষে তাহার স্থানে স্থানে অতিশয় প্রমাদ ঘটিয়াছে। কতক পারস্য, কতক বাঙ্গালা ও কতক সংস্কৃত "সাত নকলে আসল খাস্ত" তাহাই হইয়াছে। কোন কোন পদের চারি পাঁচটা কথাই নাই, সুতরাং অর্থ সংগ্রহ করা অতিশয় কঠিন হইয়াছে।—কি করি, উপায় নাই, আর একখানা হাতের লেখা পাইলে ঐক্য করিয়া দেখা যাইত।—যাহা হউক, বহুকষ্টে যাহা সংগ্রহ করিয়াছি তাহাই নিম্নভাগে প্রক [১০] টন করিলাম, সকলে অভিনিবেশ পূর্ব্বক অবলোকন করুন।

যথা।

চৌপদী।

শুন সবে এক চিত, সত্যপীর গুণ গীত,
দুই লোকে পাবে প্রীত, সিদ্ধ মনস্কামনা।
গণেশাদি দেবগণ, বন্দ সত্য নারায়ণ,
সিদ্ধ দেহ অনুক্ষণ, যার যেই ভাবনা॥
কলির প্রথমে হরি, ফকির শরীর ধরি,
অবনীতে অবতরি, হরিবারে যন্ত্রণা।
দ্বিতীয়েতে বিষ্ণু নামে, দরিদ্র দ্বিজের ধামে,
ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, কামে, দানে কৈল মন্ত্রণা॥
ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় যায়, প্রভু দেখা দিলা তায়,
হইয়া ফকির কায়, মুখে দিব্য দাড়ি রে।
গায়ে কাঁথা শিরে টোপ, গলে ছেলি, মুখে গোঁপ,
ঝুলিতে ঝুলিছে খোপ, হাতে আশাবাড়ি রে॥
সেলাম্ হামারা পাড়ে, ধুপ্‌মে তোম্ কাহে খাড়ে,
পেরেসান্ দেখে বড়ে, মেরে বাৎ ধরতো।
সির্ণি বেদে পির বা, সভি হাম্‌ছো মিরবা,
মোকামে জাহির বা, দরব্ হস্ত তপতো॥

বিষ্ণু মূর্ত্তি দেখি দ্বিজ, নিবাসে আসিয়া নিজ,
পূজিল গরুড়ধ্বজ, সিণি দিয়া বিহিতে।
দেখিয়া বিপ্রের ধন, ঘরে ঘরে সর্ব্বজন,
পূজে সত্যনারায়ণ, খ্যাতি হৈল ক্ষিতিতে ॥
চতুর্থে উৎকট কষ্ট, কাটুরের হৈল নষ্ট,
[১১] জগতে হইল শ্রেষ্ঠ, সৃষ্টি কৈল পালনা।
সত্যপীর গুণ গেয়ে, মন মত ধন পেয়ে,
সিরণি প্রসাদ খেয়ে, সিদ্ধি করে বাসনা ॥
সদানন্দ নামে বেণে, সত্যপীরে সিণি মেনে,
পঞ্চমে পাইল কন্যা, চন্দ্রকলা নামেতে।
কি কব তাহার ছাঁদ, কাম ধরিবার ফাঁদ,
মুখখানি পূর্ণ চাঁদ, জিত রতি কামেতে ॥
বর আনি নীলাম্বর, রূপে গুণে মনোহর,
সদানন্দ সদাগর কন্যা দিল দানেতে।
চন্দ্রকলা নিকেতনে, সত্যদেবে পূজা মানে,
সত্যদেব ভাবি মনে, সদা থাকে ধ্যানেতে ॥
কন্যার বিবাহ দিয়ে, জামাতারে সঙ্গে নিয়ে,
সিরিণি বিস্মৃত হোয়ে, পাটনেতে চলিল।
পীর ক্রোধ করে তায়, ধরাপড়ে চোর দায়,
গলে ডোর বেড়ি পায়, কারাগারে রহিল ॥
এ সব প্রকার ষষ্ঠে, সদাগর মুক্ত কষ্টে,
সপ্তমে সাধুরে দৃষ্টে, পথে কৈল ছলনা।
অষ্টমেতে ঘরে এলো, চন্দ্রকলা বার্ত্তা পেলো,
প্রসাদ খাইতেছিল, ফেলে করে হেলনা ॥
জলে ডুবে মরে পতি, উভরায় কাঁদে সতী,
কি হবে আমার গতি প্রভু কোথা গেলে হে।
এ নব যৌবন নিশি, হোয়ে তার পূর্ণ শশি,
কোথা আছ অহর্নিশি, প্রেমাধীনী ফেলে হে ॥
যৌবনে প্রভুর কাল, মদন দাহন জাল,
কোকিল কোকিলা কাল, রাখ পদতলে হে।

যৌবন প্রফুল্ল ফুল, কেবল দুঃখের মূল,
[১২] খেদে হয় প্রাণাকুল, ঝাঁপ দিই জলে হে ॥
স্তবে তুষ্ট জগৎকর্ত্তা, বাঁচাইল তার ভর্ত্তা,
সদানন্দ পেয়ে বার্ত্তা, পূজারম্ভ করিল।
ভাঙ্গাইয়া কড়ি টাকা, সির্ণি কৈল কাঁচা পাকা,
যেন শশধর রাকা, দুই লোকে তরিল ॥
ভরদ্বাজ অবতংস, ভূপতি রায়ের বংশ,
সদাভাবে হত কংস, ভুরস্থটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের স্থত, ভারত ভারতী যুত,
ফুলের মুকুটি খ্যাত, দ্বিজ পদে স্থমতি ॥
দেবের আনন্দ ধাম, দেবানন্দপুর নাম,
তাহে অধিকারী রাম, রামচন্দ্র মুনসী।
ভারতে নরেন্দ্র রায়, দেশে যার যশ গায়,
হোয়ে মোরে কৃপাদায়, পড়াইল পারসী।
সবে কৈল অনুমতি, সংক্ষেপে করিতে পুঁতি,
তেমতি করিয়া গতি, না করিও দূষণা।
গোষ্ঠির সহিত তাঁয়, হরি হোন্ বরদায়,
ব্রতকথা সাঙ্গ পায়, সনে রুদ্র চৌগুণা ॥”

এই উভয় গ্রন্থের মধ্যে তিনি কোন্খানি প্রথম বিরচনা করেন তাহা নিশ্চিতরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারিলাম না,—কিন্তু অনুমানে এরূপ স্থির হইতেছে যে, ত্রিপদীটিই সর্ব্বাগ্রে রচনা করিয়াছিলেন।—যেহেতু চৌপদীটি ইহার অপেক্ষা অল্পাংশেই উত্তম হইয়াছে। সময়াভাব বশতঃ প্রথমবারের কথা অতি সংক্ষেপেই বর্ণনা করিয়াছেন।—ফলে তিনি দুই জন নায়কের [১৩] আদেশক্রমে দুইখানি পুঁতি দুইবার প্রস্তুত করত পাঠ করিয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।—বিশেষতঃ চৌপদীচ্ছন্দের গ্রন্থখানির সর্ব্বশেষে ভণিতা স্থলে যেরূপ বর্ষের নির্দ্দেশ হইয়াছে তাহাতে সেই খানিকেই অনুজ বলিয়া ধার্য্য করিতে হইবে।—যথা “সনে রুদ্র চৌগুণা।” এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে ১১৩৪ সালে এই কবিতা রচিত হয়।—সুতরাং তৎকালে ভারতের বয়স ১৫ বৎসর উত্তীর্ণ হয় নাই, কারণ শকের সহিত সালের গণনা করাতেই নির্দ্দিষ্ট হইল তিনি বাঙ্গালা ১১১৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এতদ্রূপ তরুণ বয়সে যে

প্রকার চমৎকার কবিতা শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, এবং সংস্কৃত, পারস্য হিন্দি এবং বঙ্গভাষার যদ্রূপ সংস্কার দর্শাইয়াছেন, ইহাতে তাঁহাকে যথেষ্টই প্রশংসা করিতে হইবে।—জগদীশ্বরের বিশেষ অনুকম্পা ব্যতীত কোন ক্রমেই এরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই।

ভারতচন্দ্র রায় পারস্য ভাষায় বিশেষরূপ কৃতবিদ্য হইয়া অনুমান বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে বাটী আসিয়া পিতা মাতা ও ভ্রাতা প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তাঁহার অগ্রজগণ দেখিলেন, তিনি সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়াছেন, তাঁহারা কেহই তাঁহার ন্যায় সদ্বিদ্বান্‌ ও কীর্ত্তিকুশল হইতে পারেন নাই, অনুজের এতদ্রূপ বিদ্যা ও বিজ্ঞতার পরিচয় প্রাপ্তে তাঁহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন "ভাই হে! সংপ্রতি পিতাঠাকুর বৰ্দ্ধমানেশ্বরের নিকট হইতে [১৪] কিঞ্চিৎ ভূমি ইজারা লইয়াছেন, জগদীশ্বরের কৃপায় এবং কর্ত্তার আশীর্ব্বাদে তুমি সর্ব্বতোভাবে যোগ্য এবং কৃতী হইয়াছ, অতএব এই সময়ে তুমি আমারদিগের এই বিষয়ের "মোক্তার" স্বরূপ হইয়া বৰ্দ্ধমানে গমন কর, রাজাকে রাজস্ব দিতে যেন বিলম্ব না হয়, এবং রাজদ্বারে যেন কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত না হয়, তুমি উপস্থিত মতে যখন যেরূপ পত্র লিখিবে, আমরা তদনুরূপ কার্য্য করিব।—ভাই! তাহা হইলেই আমারদিগের অন্ন বস্ত্রের আর কোনরূপ ক্লেশ থাকিবে না" সেই আজ্ঞানুসারে ভারতচন্দ্র বৰ্দ্ধমানে গমন করত কিছুদিন অবস্থান পূর্ব্বক কার্য্য পরিচালন করেন, এমত সময়ে তাঁহার সহোদরেরা যথা নিয়মে নির্দ্দিষ্ট কালে কর প্রেরণে অক্ষম হইলেন, ইহাতে রাজদরবারে বিবিধ প্রকার গোলযোগ হওয়াতে বৰ্দ্ধমানাধিপতি সেই ইজারাটী খাসভুক্ত করিয়া লইলেন, এবং ভারত তদ্বিষয়ে আপত্তি উপস্থিত করাতে দুর্ভাগ্য বশতঃ রাজকর্ম্মচারিগণের চক্রান্তরে পড়িয়া কারারুদ্ধ* হইলেন। কিন্তু কারাগারের কঠোর ক্লেশ তাঁহাকে অধিককাল ভোগ করিতে হয় নাই। কারারক্ষকের সহিত তাঁহার কিঞ্চিৎ প্রণয় ছিল, অতিশয় [১৫] কাতর হইয়া বিনয় বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন "ও মহাশয়! অমুক অমুক স্থানে খাজানা বাকী আছে, আপনারা লোক পাঠাইয়া আদায় করিয়া লহ, আমাকে এ রূপে বদ্ধ রাখিয়া ব্রহ্মহত্যা করিলে কি ফলোদয় হইবে? এতদ্রূপ

*বোধ হয় তৎকালের বৰ্দ্ধমানাধিপতি পণ্ডিত ও কবিদিগের বিশেষ গৌরব ও সমাদর করিতেন না, অথবা ভারতের যথার্থ কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রাপ্ত হয়েন নাই, ইহা না হইলে এমত মহাত্মা ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করত এতদ্রূপ ক্লেশ প্রদান কেন করিবেন।

বিনয় বচনে প্রসন্ন হইয়া কারাধ্যক্ষ কহিলেন "আমি এই দণ্ডেই তোমাকে গোপনে গোপনে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারি, কিন্তু তুমি কোন্ ভাবে কোন্ স্থানে প্রস্থান করিয়া নিস্তার পাইবে, সে বিষয়ের কিছু উপায় স্থির করিয়াছ? এই রাজার অধিকার অনেক দূর পর্য্যন্ত, ইহার মধ্যে তুমি যেথানে থাকিবে সেইখানেই বিপদ ঘটিতে পারে; রাজা ও রাজকর্ম্মচারিরা জানিতে পারিলে ভবিষ্যতে বিস্তর দুরবস্থা করিবেন" ভারত উত্তর করিলেন "আমাকে এই যাতনাযুক্ত কারাভুক্ত দায় হইতে মুক্ত করিলে আমি আর ক্ষণকালের জন্য এ অধিকারের ত্রিসীমানায় বাস করিব না। জলেশ্বর পার হইয়া "মারহাট্টার" অধিকারে গিয়া নিশ্বাস ফেলিব।" কারাপালক অতিশয় দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া রাত্রি কালে অতি প্রচ্ছন্নভাবে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিলেন।

ভারতচন্দ্র "রঘুনাথ" নামক একটি নাপিত ভৃত্য সঙ্গে লইয়া মহারাষ্ট্রীয় অধিকারের প্রধান রাজধানী কটকে আসিয়া "শিবভট্ট" নামক দয়াশীল সুবাদারের আশ্রয় লইলেন, এবং আপনার সমুদয় অবস্থা নিবেদন করিয়া শ্রীশ্রী৺পুরুষোত্তমধামে কিছুদিন বাস করণের প্রার্থনা করিলেন।—সুবেদার তাঁহার প্রতি প্রীতচি[১৬]ত্তে অনুকূল হইয়া কর্ম্মচারি, মঠধারি, ও পাণ্ডা-দিগের উপর এমত আজ্ঞা ঘোষণা করিলেন, যে "ভারতচন্দ্র রায় ও তাহার ভৃত্য যেপর্য্যন্ত শ্রীক্ষেত্রে অধিবাস করিবেন সেপর্য্যন্ত যেন কেহ ইহার নিকট কোনরূপ কর গ্রহণ না করে, ইনি বিনাকরে তীর্থবাসী হইবেন, যখন যে মঠে থাকিতে ইচ্ছা করিবেন, তখন সেই মঠে মান পূর্ব্বক স্থান পাইবেন, এবং ইহারদিগের আহারের নিমিত্ত প্রতিদিন এক একটি "বলরামী আটকে" প্রদান করিবে, আর বিশেষরূপে সম্মান করিবে।"

ভারত পুরুষোত্তমে গিয়া রাজপ্রসাদে প্রসাদ ভোগ ভোগ করত শ্রীশ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মঠে বাস পূর্ব্বক শ্রীভাগবত এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়দিগের গ্রন্থ সকল পাঠ করেন, সর্ব্বদাই বৈষ্ণবদিগের সহিত আলাপ করিয়া সুখী হয়েন। বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া উদাসীনের ন্যায় গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করিলেন, তাঁহার ভৃত্যটিও সেই প্রকার আকার প্রকার ও ভাব ভঙ্গি ধারণ করিয়া চেলা সাজিল, প্রভুটি "মুনি গোঁসাই" হইলেন, দাসটি "বাসুদেব" হইল।

এক দিবস বৈষ্ণবেরা বৃন্দাবনধাম দর্শনের প্রার্থনা করিয়া ভারতের নিকট অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে ভারত তাহাতে সম্মত হইয়া তাঁহারদিগের সমভিব্যাহারী হইতে অত্যন্ত ইচ্ছাকুল হইলেন। পরে সকলে একত্র হইয়া

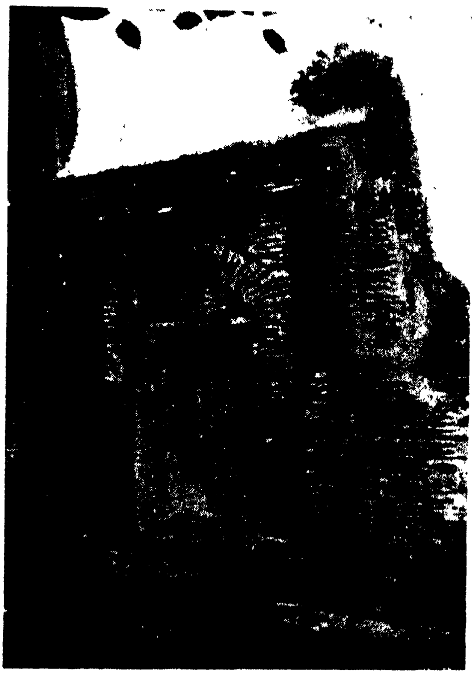
শ্রীক্ষেত্র হইতে যাত্রা করত পদব্রজে জিলা হুগলির অন্তঃপাতি খানাকুল, কৃষ্ণনগরে আসিয়া উপস্থিত হই-[১৭] লেন, তথাকার শ্রীশ্রী৺গোপীনাথজীর শ্রীমন্দিরে দর্শনার্থ গমন করিয়া দেখিলেন, কীর্ত্তনকারি গায়কেরা "মনোহরসায়ি" কীর্ত্তন করণের অনুষ্ঠান করিতেছেন। সেই দেবমন্দিরে বৈষ্ণবদিগের সহিত একত্রে প্রসাদ পাইয়া কীর্ত্তন শুনিতে বসিলেন। কৃষ্ণ লীলারসামৃত পান পূর্ব্বক তৎকালে গুণাকর কবিবর অতিশয় মুগ্ধ ও আর্দ্র হইয়া প্রেমাশ্রু পাতন করিতে লাগিলেন।

ঐ খানাকুল গ্রামে তাঁহার শালীপতি ভ্রাতার বাটী, রঘুনাথ ভৃত্য তাহা জ্ঞাত ছিল, এখানে ইনি মোহিত হইয়া সংকীর্ত্তন শুনিতেছেন, ও দিগে রঘুনাথ গোপনে গোপনে গ্রামের ভিতর প্রবেশ পূর্ব্বক ভট্টাচার্য্যের ভবনে গিয়া তাঁহার শালী এবং ভায়রাভাইকে বিস্তারিতরূপে সমুদয় বিবরণ অবগত করিল। তচ্ছ্রবণে ভট্টাচার্য্যেরা অনেকেই একত্রে দেবালয়ে আগত হইয়া গান সমাপ্তির পর বিস্তর প্রবোধ দিয়া ভারতচন্দ্রকে আপনারদিগের বাটীতে আনয়ন করত তৎক্ষণাৎ নাপিত ডাকাইয়া দাড়ি গোঁপ ফেলিয়া দিলেন এবং গেরুয়া বস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়া উত্তমরূপ ধৌত বস্ত্র পরাইলেন, আর নানা প্রকার অনুরোধ ও উপরোধ দ্বারা তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্তন করত পুনর্ব্বার সংসার ধর্ম্মে আসক্ত করিলেন, কিন্তু কোনক্রমেই তাঁহার পিতা ও ভ্রাতাদিগের নিকট লইয়া যাইতে পারিলেন না। রায় সেই প্রস্তাবে উত্তর করিলেন "আমি আপনারদিগের বিশেষ অনুরোধক্রমে তীর্থ ভ্রমণ, যোগ [১৮] সাধন প্রভৃতি ধর্ম্মাচরণ পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু যে পর্য্যন্ত বিষয়কর্ম্ম দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে না পারিব সে পর্য্যন্ত কোনক্রমেই গৃহে গমন করিব না।

কয়েক দিবস পরে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভায়রাভাই ভারতকে সঙ্গে লইয়া তাজপুরের পার্শ্বস্থ সারদা গ্রামে স্বীয় শ্বশুর নরোত্তম আচার্য্যের ভবনে গমন করিলেন, আচার্য্য বহুকালের পর "হারানিধি" জামাতাকে প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইলেন, মহা সমাদর পূর্ব্বক স্নেহের ভাণ্ডার মুক্ত করিলেন। অন্তঃপুরে আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল, প্রতিবাসি ও প্রতিবাসিনী সকলে আহ্লাদচিত্তে দেখিতে আইলেন।—ভারতচন্দ্র বিবাহ বাসর ব্যতীত অপর কোন দিবস আপনার প্রণয়িনী সহধর্ম্মিনীর সহিত আর সাক্ষাৎ করেন নাই, ইহাতে সেই রজনীর সাক্ষাতে পরস্পর উভয়ের মনে যে প্রকার সন্তোষ, প্রেম, ভাব ও আর আর ব্যাপারের উদয় হইল, তাহা কি বাক্যে প্রকাশ করিব স্থির

করিতে পারিলাম না। কয়েক দিবস শ্বশুর সদনে অশেষবিধ আমোদ প্রমোদ করত আপনার স্ত্রীকে কহিলেন "যদি আমার বাবা কিম্বা দাদারা তোমাকে নিতে আসেন, তবে তুমি কোনমতেই সেখানে যেওনা।" এবং শ্বশুরকে কহিলেন "মহাশয়! আপনার কন্যাকে আমারদিগের বাটীতে কখনই পাঠাইয়া দিবেন না, যদবধি আমি অর্থ আনিয়া স্বতন্ত্ররূপে স্বতন্ত্র-স্থানে একখানি বাড়ী প্রস্তুত করিতে না পারি, তদবধি এইখানেই রাখিবেন" এই [১৯] কথা বলিয়া বিদায় লইয়া তিনি তৎস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর, তিনি ফরাসডাঙ্গায় আসিয়া ফরাসি গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান বিখ্যাত ধনাঢ্য ও মান্যবর শ্রোত্রিয় পালধি বংশ্য ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (যাঁহার প্রতিষ্ঠিত ইষ্টক-নির্ম্মিত ঘাট অদ্যাবধি ফরাসডাঙ্গার গঙ্গাতীরে শোভা করিতেছে,) তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক অতিশয় কাতরতা সহকারে নিবেদন করিলেন "মহাশয়! আমি আপনার আশ্রয় লইলাম, শরণাগত হইলাম, যে প্রকারে হউক, সদয় হইয়া আশ্রয় দিয়া আমাকে প্রতিপালন করিতে হইবেক" দেওয়ানজী ভারতের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া ও পুরাতন ও বর্ত্তমান অবস্থা সকল জানিতে পারিয়া এবং স্তবে অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া আশ্বাস বাক্যে সাহস প্রদান পুরঃসর কহিলেন "তুমি অতি যোগ্য ও প্রধান বংশের মনুষ্য, তোমার উপকার করা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। ভাল, তুমি এখানে থাকিয়া কিছুদিন অপেক্ষা কর, আমি বিহিত চেষ্টায় রহিলাম, সুযোগ-যুক্ত সময় পাইলে ও কোন বিষয় উপস্থিত হইলে তোমার মঙ্গল সাধনে কখনই সাধ্যের ত্রুটি করিব না" এতদ্রূপ করুণাকর অনুকূল বচনে ভারতচন্দ্রের "মানস মুকুল" আনন্দ মকরন্দভরে প্রফুল্ল হইল। তৎকালে উক্ত চৌধুরী মহাশয়ের জাতি সম্বন্ধীয় কোনরূপ অপবাদ থাকাতে তিনি তাঁহার বাসায় অবস্থান না করিয়া ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের দেও [২০] য়ান গোন্দলপাড়া নিবাসি ৺রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের ভবনে থাকিয়া আহারাদি করিতে লাগিলেন, প্রতি দিবস প্রাতে ও সন্ধ্যার সময়ে চৌধুরীবাবুর নিকট আসিয়া "উমেদারি" অর্থাৎ উপাসনা করেন। এই উপাসনা এবং সদ্গুণ জন্য উক্ত আশ্রিত জনের প্রতি আশ্রয়দাতার ক্রমশই স্নেহের আধিক্য হইতে লাগিল। কোন এক সময় বিশেষে কথোপকথন করিতে করিতে চৌধুরী কহিলেন "ভারত! আমি তোমাকে ফরাসির ঘরে এখনি একটা কর্ম্ম করিয়া দিতে পারি, কিন্তু তাহাতে তোমার কিছুমাত্র সুখোদয় হইবে না, কারণ গুণের গৌরব গোপন থাকিবে।



চন্দননগরে দেওয়ান রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী

শ্রীহরিহর শেঠের সৌজন্যে

আমি তোমার নিমিত্ত একটা প্রধান উপায় স্থির করিয়াছি, নবদ্বীপের অধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব আছে, তিনি দুই চারি লক্ষ টাকা কর্জ্জ করিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে আমার নিকট আসিয়া থাকেন, তিনি এবারে যখন আসিবেন, তখন আমি তোমাকে তাহার নিকট সমর্পণ করিয়া দিব, তুমি যেমন গুণি ব্যক্তি, তিনি সেইরূপ গুণগ্রাহক, সেই স্থান তোমার পক্ষে যথার্থরূপ উপযুক্ত স্থান বটে, এই বচনে ভারতচন্দ্র বারিদ-বদন-বিনির্গত-বারিবিন্দু পতন-প্রত্যাশী চাতকের ন্যায় মহারাজের আগমনের প্রতি প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এক দিবস প্রাতে তিনি চৌধুরীর সভায় বসিয়া আছেন, এমত কালে দৈবাৎ পাতঃস্মরণীয় [প্রাতঃস্মরণীয়] মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় তথায় শুভাগমন করিলেন। চৌধুরী মহাশয় গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথাযোগ্য [২১] সম্মান সহযোগে রাজাকে আসনারূঢ় করত অশেষ প্রকার সদালাপ সমাপনানন্তর কহিলেন "মহারাজ! আমার একটি নিবেদন আছে, এই ভারতচন্দ্র আমার অতি আত্মীয় ব্যক্তি, ইনি অমুক অমুকের সন্তান, সংস্কৃত জানেন, পারস্য জানেন, কবিতাশক্তি ভাল আছে, অধুনা দীনাবস্থায় অতিশয় ক্লেশ পাইতেছেন, যাহাতে প্রতিপালিত হয়েন এমত অনুগ্রহ বিতরণ করিতে আজ্ঞা হউক"—মহারাজ তাহাতে অঙ্গীকৃত হইয়া কহিলেন "আমি এইক্ষণে কলিকাতায় চলিলাম, কালী দর্শন করিয়া কালীঘাট হইতে কৃষ্ণনগর রাজ-ধানীতে প্রত্যাগত হইলে ইনি যেন তথায় গিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন।"

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কলিকাতা হইতে কৃষ্ণনগরে গমন করিলে পর ভারতচন্দ্র তথায় গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজা তাঁহাকে পাইয়া পরিতুষ্ট হইয়া ৪০ টাকা মাসিক বেতন নির্দ্দিষ্ট করত বাসা প্রদান করিলেন এবং কহিলেন "তুমি প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যার পর আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবা"—তিনি তদনুসারে তন্নগরে থাকিয়া প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে রাজসভায় উপস্থিত হন, এবং মধ্যে মধ্যে দুই একটি কবিতা রচনা করিয়া রাজাকে দেখান, নবদ্বীপাধিপতি প্রফুল্লিত হইয়া কবি-শ্রেষ্ঠ ভারতচন্দ্রকে "গুণাকর" উপাধি প্রদান করত আজ্ঞা করিলেন "ভারত! তোমার প্রণীত কবিতায় আমার মনে অত্যন্ত প্রীতি জন্মিয়াছে, কিন্তু আমি [২২] এবম্প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্য শুনিতে ইচ্ছা করি না" ভারত বলিলেন "মহারাজ! কিরূপ রচনা করিতে অনুমতি করেন" রাজা কহিলেন "মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী (যিনি কবিকঙ্কণ নামে বিখ্যাত ছিলেন,) তিনি যে প্রণালীক্রমে ভাষা কবিতায় "চণ্ডী"

রচিয়াছিলেন, তুমি সেই পদ্ধতিক্রমে "অন্নদামঙ্গল" পুস্তক প্রস্তুত কর" সেই আজ্ঞা পালন পূর্ব্বক কবিকেশরী অন্নদামঙ্গল বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। একজন ব্রাহ্মণ লেখকরূপে নিযুক্ত হইয়া তৎসমুদয় লিখিতে লাগিলেন, এবং নীলমণি সমাদার নামক একজন গায়ক সেই সকল "পালা" ভুক্ত গীতের সুর রাগ এবং পাঁচালী শিক্ষা করিয়া প্রতিদিন গান করিতে লাগিলেন। রচনা সমাধার পূর্ব্বে রাজা তদ্দৃষ্টে অনির্ব্বচনীয় সন্তোষ-পরবশ হইয়া কহিলেন "বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান সংক্ষেপে বর্ণনা করত ইহার সহিত সংযোগ করিতে হইবে" পরে তিনি অতি কৌশলে বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়া রাজাকে দেখাইলেন। নৃপতি তদ্দর্শনে আহ্লাদ রাখিবার স্থান প্রাপ্ত হইলেন না। ঐ অন্নদামঙ্গল এবং বিদ্যাসুন্দরের গুণের ব্যাখ্যা আমি কি করিব? তাহার উপমার স্থল নাই বলিলেই হয়, এই ভারতে ভারতের ভারতীর ন্যায় ভারতের ভারতী সমাদৃত ও প্রচলিত হইয়াছে। —এই চারু গ্রন্থের পর "রসমঞ্জরী" রচনা করেন, তাহাও সর্ব্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে। অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, ও ভবানন্দ মজুমদারের পালা এ তিন একি পুস্তক, কেবল রসমঞ্জরী খানি স্বতন্ত্র।

[২৩] পাণ্ডিত্য এবং কবিত্ব গুণে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র নৃপেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের অতিশয় প্রিয় সভাসদ রূপে গণ্য হইলেন। এই ভাবে কিছুদিন গত হইতে হইতে রাজা এক দিবস জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এখানে রহিয়াছ, তোমার পরিবার কোথায়? তুমি বাটীর তত্ত্বাবধারণ কর কি না?" ভারত কহিলেন "আমার স্ত্রী আমার শ্বশুরালয়ে আছেন, ভ্রাতাদিগের সহিত আমার তাদৃশ সদ্ভাব নাই, এজন্য বাটী যাইবার অভিলাষ নাই, গঙ্গা তীরে কিঞ্চিৎ স্থান পাইলে স্বতন্ত্র একখানি বাড়ী প্রস্তুত করিয়া তথায় পরিবার লইয়া স্বচ্ছন্দে বাস ও সংসারধর্ম্ম করিতে পারি।" রাজা কহিলেন "নবদ্বীপ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত আমার অধিকার মধ্যে কোন্ স্থানে তোমার বাস করিতে ইচ্ছা হয়?" কবি কহিলেন "ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের কৃপায় আমি কল্পতরুর আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব তাঁহার বাটীর নিকটে হইলেই ভাল হয়, যেহেতু তাঁহার সহিত সর্ব্বদাই সাক্ষাৎ করিতে পারি।" রাজা কহিলেন "তবে তুমি "মূলাযোড়ে" গিয়া বসতি কর।" ভারত কহিলেন "যে আজ্ঞা মহারাজ, ঐ স্থানটিই আমার অত্যন্ত মনোনীত হইয়াছে।" পরে উল্লেখিত পণ্ডিত ও কবিপ্রতিপালক বিদ্যানুরাগি নরবর নৃপবর ভারতকে বাটীর নিমিত্ত

১০০ এক শত টাকা এবং ৬০০ টাকা বার্ষিক রাজস্ব নির্দ্দেশ পূর্ব্বক মূলাযোড়-খানি ইজারা দিলেন।

ভারত সেই টাকা এবং ইজারার সনন্দ লইয়া শ্বশু[২৪] রালয়ে গিয়া ভার্য্যাকে মূলাযোড়ে আনয়ন করত প্রথমে তথাকার ঘোষাল মহাশয়দিগের ভবনে একটি ঘর লইয়া কিছুদিন তাহারি মধ্যে বাস করিলেন, পরে নূতন নিকেতন নির্ম্মাণ পূর্ব্বক যথারীতিক্রমে অনুষ্ঠান করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।—তাঁহার পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া পুত্রগণকে কহিলেন "ভারত মূলাযোড়ে গঙ্গাতীরে বাড়ী করিয়াছে, আমার প্রাচীন শরীর, এই বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গাহীন দেশে বাস করা কর্ত্তব্য হয় না" এই বলিয়া তিনি মূলাযোড়ে আগমন করিলেন, এবং এখানে অল্পকাল বাস করিয়াই তিনি লোকান্তরিত হইলেন। পিতার আদ্য শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইলে রায় গুণাকর পুনর্ব্বার কৃষ্ণনগরে গিয়া কিয়ৎকাল বাস করত নিম্ন প্রকাশিত বসন্ত ও বর্ষা বর্ণনা এবং আর আর কবিতা রচনা করেন। এই সকল পদ্য অদ্য পর্য্যন্ত মুদ্রিত ও প্রচারিত হয় নাই।

যথা।

বসন্তবর্ণনা।

চৌপদী।

ভাল ছিল শীতকাল, সেতো কামানল জ্বাল,
হৃদয় সহিত শাল, এবে হোলো দুরন্ত।
না ছিল কোকিল শব্দ, ভ্রমর আছিল জব্দ,
উত্তরে বাতাসে স্তব্ধ, বৃক্ষ ছিল জীবন্ত॥
এবে বায়ু সাপেখেকো, ভুবন করিল ভেকো,
কেবল কামের ডেকো, সঙ্গে লোয়ে সামন্ত।
[২৫] অনঙ্গেরে অঙ্গ দিলি, শুষ্ক কাষ্ঠ মুঞ্জরিলি,
ভারতেরে ভুলাইলি আ, আরে বসন্ত॥

বর্ষাবর্ণনা।

চৌপদী।

প্রথমেতে জ্যৈষ্ঠ মাস, নিদাঘের পরকাশ,
কৃষ্ণনগরেতে বাস, গেল এক বর্ষা।

শরদে অম্বিকা পূজা, রাজঘরে দশভূজা,
দেখিনু মৈনাকানুজা, জগতের হর্ষা ॥
হিম শীত তার পর, শীর্ণ করে কলেবর,
পুণ্যাবাদে যাব ঘর, সেই ছিল ভর্সা।
বসন্ত নিদাঘ শেষ, পুন তোর পরবেশ,
ভারত না গেল দেশ, আ, আরে বর্ষা ॥ ১

ভুবনে করিল তূর্ণ, নদ নদী পরিপূর্ণ,
বিরহিনী বেশ চূর্ণ, ভাবিয়া অভর্সা।
বিদ্যুতের চক্‌মকি, ডাহুকের মক্‌মকি,
কামানল ধক্‌ধকি, বড় হৈল কর্ষা ॥
ময়ূর ময়ূরী নাচে, চাতকিনী পিউ যাচে,
আর কি বিরহী বাঁচে, বুঝিনু নিষ্কর্ষা।
ভারতের দুঃখমূল, কেবল হৃদয়ে শূল,
ফুটালি কদম্বফুল, আ, আরে বর্ষা ॥ ২

পরন্তু কৃষ্ণ রাধিকার প্রণয় ঘটিত ব্যঙ্গছলে রাজসভাসদ কোন ব্যক্তির উপর কটাক্ষ করিয়া উক্তিভেদের [২৬] যে দুইটি কবিতা প্রকাশ করেন তাহা পত্রস্থ করিলাম সকলে দর্শন করুন।

যথা।

কৃষ্ণের উক্তি।

চৌপদী।

বয়স আমার অল্প, নাহি জানি রস কল্প,
তুমি দেখাইয়া তল্প, জাগাইলা যামী।
ননী ছানা খাওয়াইয়া, রসরঙ্গ শিখাইয়া,
অঙ্গ ভঙ্গ দেখাইয়া, তুমি কৈলা কামী ॥
তুমি বৃষভানু সুতা, অশেষ চাতুরী যুতা,
তোমার ননদীপুতা, সব জানি আমি।
আগে হানি নেত্র বাণ, কাড়িয়া লইলে প্রাণ,
এখন্ কর অভিমান, আ, আরে মামী ॥

রাধিকার উক্তি উত্তর।

চৌপদী।

চূড়াটি বাঁধিয়া চুলে, মালা পর বনফুলে,
দান মাগো তরুমূলে, আমি তেমন্ মাগিনে।
মোরে দেখিবার লেগে, অনুরাগ রাগে রেগে,
রাত্রি দিন থাক জেগে, আমি তেমন্ জাগিনে॥
বুক বাড়ায়েছে নন্দ, যার তার সনে দ্বন্দ,
কোন্ দিন হবে মন্দ, আমি তোমায় লাগিনে।
গুণ্ডার বিষম কায, সে ভয়ে পড়ুক্ বাজ,
মামী বোলে নাহি লাজ, আ, আরে ভাগিনে॥

[২৭] হাওয়া বর্ণন।

চৌপদী।

চন্দনের দণ্ড ধোরে, ফণি ফণা ছত্র কোরে,
মলয় রাজত্ব হোরে, আরো রাজ্য চাওয়া।
বসন্ত সামন্ত সঙ্গে, শৈত্য গন্ধ মান্দ্য অঙ্গে,
কাবেরি ভরিয়া রঙ্গে, হিমালয় ধাওয়া॥
বিয়োগিরে কাঁদাইয়ে, সংযোগিরে ফাঁদাইয়ে,
যোগি যোগ ভাঙ্গাইয়ে, কাম গুণ গাওয়া।
নর্ম্মিরে প্রকাশিয়ে, গর্ম্মিরে বিনাশিয়ে,
শীতল করিলি হিয়ে, বাহবারে হাওয়া॥১

কখনো দারুণ ঝড়, শাখি উড়ে পাখি জড়,
ঘর ভাঙ্গে উড়ে খড়, নাহি যায় চাওয়া।
বেগ কে সহিতে পারে, মেঘ স্থির হোতে নারে,
হুলুস্থূল পারাবারে, প্রলয়ের দাওয়া॥
কভু থাক কোন্ গাড়ে, তাপে প্রাণি প্রাণ ছাড়ে,
বৃক্ষ নাহি পাতা নাড়ে, আনন্দের পাওয়া।

কখনো মধুর মন্দ, সুগন্ধ আনন্দ কন্দ,
শীতল পরমানন্দ, বাহ্‌বারে হাওয়া ॥২

ধূম বড়া ধূম কিয়া, খানে শোনে নাহি দিয়া,
চঁহুয়ার ঘের লিয়া, ফৌজ্ কিসি কাওয়া।
বালাখানা কোট্ কিয়া, কাণাৎ সে ঘের লিয়া,
উঁহুয়ান্ দাগা দিয়া, আগ্ কিসি তাওয়া ॥
দেখ্‌নে মে হুয়া চুর, ছোড়্ লিয়া মেরি পুর,
তোঁহারি বালাই দূর, আও মেরে বাওয়া।
[২৮] তুজ্ লিয়া নরম্ সটি, উজ্ লিয়া গরম্ সটি,
চিরণ্ জিউ ধরম্ সটি, বাহ্‌বারে হাওয়া ॥ ৩

বাসনা বর্ণনা।

চৌপদী।

বাসনা করয়ে মন, পাই কুবেরের ধন,
সদা করি বিতরণ, তুষি যত আশনা।
আশ্ নাই, আরো চাই, ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য পাই,
ক্ষুধামাত্র সুধা খাই, যমে করি ফাঁসনা ॥
ফাঁসনা কেবল রৈল, বাসনা পূরণ নৈল,
লাভে হোতে লাভ হৈল, লোকে মিথ্যা ভাসনা।
ভাস্‌নাই কারে বলে, ভারত সন্তাপে জ্বলে,
কলার বাসনা হোলে, আ, আরে বাসনা ॥ ১

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র একটা খেড়ে পুষিয়াছিলেন ভারতচন্দ্র তাহা দৃষ্টি করিয়া রাজার সাক্ষাতেই খেড়ে ও ভেড়ের সমানরূপ বর্ণনা করেন।

চৌপদী।

খেড়েকুলে জন্ম পেয়ে, বিলে খালে খেয়ে খেয়ে,
বেড়াইতে ঘুষ্ খেয়ে, লোকে দিত তেড়ে।
তেড়ে না পাইতে মাচ্, বেড়াইতে পাছ্ পাছ্,
এখন্ বাছের বাছ্, দিতে লও কেড়ে ॥

কেড়ে লোতে কেহ যায়, কৌতুক না বুঝে তায়,
ক্রোধে ফোলো বাঘ প্রায়, ফোঁস ফোঁস ছেড়ে।
[২৯] ছেড়ে গেড়ে ডোবা জল, রাজপুরে পেয়ে স্থল,
তোলা-জলে কুতূহল, সাবাস্ রে ধেড়ে॥
ধেড়ে বড় দাগাবাজ, জলে পেয়ে স্ত্রী সমাজ,
ব্যস্ত কোরে দেয় লাজ, কূলে ডুব্ পেড়ে।
পেড়ে রাঙ্গা যত শাড়ী, ধোরে করে কাড়াকাড়ি,
কেহ দিলে তাড়াতাড়ি, প্রবেশয়ে গেড়ে॥
গেড়ে হোতে পুন আসি, ভুস্ কোরে উঠে ভাসি,
সবে দেখে বলে হাসি, বড় দুষ্ট ধেড়ে।
ধেড়ে ভেড়ে এক সম, ঝক্* মারিবার যম,
কেহ কারে নহে কম, ফেরে যেন দেঁড়ে॥
দেঁড়ে মারে দাঁড় খোঁটা, মাগুর খাইয়া মোটা,
না ছাড়ে কড়ির পোটা পোচা বোঁচা দেড়ে।
দেড়ে দাবাড়িয়া ধরে, কান্তার উপরে চরে,
সেগুণ শালের ডরে, ফেরে অঙ্গ ঝেড়ে॥
ঝেড়ে শরীরের ধূলা, দিয়ে বুলে গোঁপ ফুলা,
ভাল বিধি কল্লে ভুলা, ধেড়ে আর ভেড়ে।
ভেড়ের ভাঁড়ামি মুখে, ধেড়ের বিক্রম বুকে,
ভেড়ে ধেড়ে ফেরে সুখে, স্থল জল নেড়ে॥

করদ্রাফ্‌থ বর্ণন।

করদ্রাফ্‌থ।—এই শব্দটি পারস্য শব্দ, ইহার অর্থ কাহার দ্বারা একর্ম্ম হইয়াছে এবং কে একর্ম্ম করিয়া প্রস্থান করিল।

[৩০] পঞ্চপদী।

কামিনী যামিনী মুখে, নিদ্রাগতা শুয়ে সুখে,
ধীর শঠ তার মুখে, চুম্বিতে চুম্বন সুখে,
ধীরে ধীরে কর্দ্দোরফ্‌থ্।

---

*ঝক্—ঝঞ্ঝা

নিদ্রা হতে উঠে নারী, অলসে অবশ ভারি,
আরসিতে মুখ হেরি, চুম্ব চিহ্ন দৃষ্টি করি,
ভাবে ভাল্ কার্দ্দোরফ্‌থ্ ॥

এই কবিতায় যে আশ্চর্য্য কৌশল ও বিদ্যা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা রসজ্ঞ জনেরাই জানিতে পারিবেন।

হিন্দি ভাষার কবিতা।

এক সম বৃকভানু কুমারী।
মাত পিত সন, বৈঠ নেহারী।
হয়ে লগ্ আউসর, দূতী জো আয়ি।
ভেট্ চল, নন্দলাল, বোলায়ি ॥
দেখ্ নাহি আঁখ্, শুন্ নাহি কাণ্।
কা কুছ্ আয়ি হো, আওল খায়ি ॥
কাঁহাকে কানায়া লাল্ কাঁহা সো পছান্ জান্
কাঁহা সো তু, আয়ি হ্যায়, খাক্‌পর্ তেরে ব্রজ্‌কি বস্‌নে ॥
পাণি মে আগ্, লাগাওনে আয়ি।
কুছ্ বাৎ এতোৎ কো, কুছ্ বাৎ ও তোৎ কো, বাতোন্ শুন্
বাৎ, হামারি সাৎ, লাগায়ি হ্যায় ॥

---

[৩১] রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রথমবার প্রশ্ন দিলেন।

"পায় পায় পায় না।"

ভারতচন্দ্র পূরণ করিলেন।

বলিরাজার উক্তি।

চৌপদী।

চিনিতে নারিনু আমি, আইল জগৎ স্বামী,
মাগিল ত্রিপদ ভূমি, আর কিছু চায়না।
খর্ব্ব দেখি উপহাস, শেষে একি সর্ব্বনাশ,
স্বর্গ মর্ত্ত্য দিব আশ, তাহে মন ধায় না ॥
গেল সকল সম্পদ, এক্ষণে পরম পদ,
বাকী আছে একপদ, ঋণ শোধ যায় না।

হাদে শুন হৃদিপ্রিয়ে, বৃন্দাদেবি দেখসিয়ে,
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দিয়ে, পায় পায় পায় না ॥১॥

রাজা দ্বিতীয় প্রশ্ন দিলেন।

"পায় পায় পায়।"

ভারত পূরণ করিলেন।

বৃন্দাবলীর উক্তি।

চৌপদী।

কেঁদে কহে বৃন্দাবলী, বলিরাজ শুন বলি,
ছলিবারে বনমালি, হলেন উদয়।
হেন ভাগ্য কবে হবে, যার বস্তু সেই লবে,
জগতে ঘোষণা রবে, বলি জয় জয় ॥
এক পদ আছে বক্রী, প্রকাশ করিলে চক্রী,
[৩২] এ দেহ করিয়া বিক্রী, ধরহ মাথায়।
তুমি আমি দুজনের, ঘুচিল কর্ম্মের ফের,
মিলাইল বামনের, পায় পায় পায় ॥*

আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! যথার্থরূপ গুণের দ্বারাই ভারত ভারত বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

সংস্কৃত, বাঙ্গালা, পারস্য এবং হিন্দি এই কয়েক ভাষা মিশ্রিত কবিতা।

এক প্রকার চৌপদীচ্ছন্দঃ।

শ্যাম হিত প্রাণেশ্বর, বায়দকে গোয়দ্ ক্ববর,
কাতর দেখে আদর কর, কাহে মর, রো রোয়্কে।
বক্ত্রং বেদং চন্দ্রমা, ছুঁ, লালা, চে রেমা,
ক্রোধিত পর দেও ক্ষমা, মেট্টিমে কাহে শোয়্ কে॥

---

*কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে পাদপূরণ দু'টি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর নামেও প্রচলিত আছে। দ্রষ্টব্য শ্যামাধব রায় প্রণীত রসসাগর কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর জীবনচরিত (১৩০৫), পৃ ১৭-১৮।—স.

যদি কিঞ্চিৎ ত্বং বদসি, দর্ জানে মন্ আয়ৎ খোসি,
আমার হৃদয়ে বসি, প্রেম্ কর খোস্ হোয় কে ॥
ভূয়ো ভূয়ো রোরুদসি, ইয়াদৎ নমুদা যাঁ কোসি,
আজ্ঞা কর মিলে বসি, ভারত ফকিরি খোয়্‌কে ॥

এই সময়ে ভারত কখনো কৃষ্ণনগরে থাকেন, কখনো বাটী আসেন এবং কখনো কখনো ফরাসডাঙ্গায় গিয়া ইন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তির সহিত সাক্ষাৎ করত তথায় দুই চারি দিবস বাস করেন। এমত কালে রাঢ় দেশে "বর্গির" হেঙ্গামা অতিশয় প্রবল হওয়াতে বর্দ্ধমানের অধীশ্বর মহারাজ তিলকচন্দ্র রায় বাহাদুরের গর্ভধারিণী পুত্র লইয়া বর্দ্ধমান হইতে পলায়ন পূর্ব্বক মূলাযোড়ের পূর্ব্ব দক্ষিণ [৩৩] "কাউগাছী" নামক স্থানে আসিয়া দোহারা গড়বন্দী বাটী নির্ম্মাণ করত তন্মধ্যে বাস করিলেন।—সেই বাটী এক্ষণে ভঙ্গ হইয়াছে, কেবল কতকগুলীন ইষ্টক ও দুই একটা স্তম্ভ মাত্র চিহ্ন স্বরূপ রহিয়াছে। গড় অদ্যাপি আছে, তাহার ভিতর অনেক বন্য পশু বাস করিয়া থাকে। কয়েক বৎসর হইল সেই গড় হইতে একটা বন্য-শূকর এবং ব্যাঘ্র বহির্গত হইয়া অত্যাচার করাতে গ্রামস্থ লোকেরা অস্ত্রাঘাতে তাহারদিগ্যে বিনষ্ট করিল।

ঐ কাউগাছীর রাজভবনে মহারাজা তিলকচন্দ্র রায় বাহাদুরের শুভ বিবাহ কার্য্য অতি সমারোহ পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হয়। ফ্রেঞ্চ গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় সেই মাঙ্গলিক কর্ম্মের অধ্যক্ষ হইয়া বিশেষরূপে নৃত্যগীতের সভার শোভা-বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুরোধে ফরাসডাঙ্গা হইতে ৫০০ সৈন্য আসিয়া কয়েক দিবস রাজপুর ও দুর্গ রক্ষা করিয়াছিল।

মহারাজ্ঞী দেখিলেন, ভারতচন্দ্র রায় মূলাযোড় ইজারা লইয়াছেন, ইনি ব্রাহ্মণ, আমার হস্তী, গো, অশ্ব প্রভৃতি পশ্বাদি গ্রামের ভিতর গিয়া বৃক্ষাদি নষ্ট করিলে ব্রহ্মস্ব হরণ করা হইবেক, অতএব মূলাযোড় গ্রাম খানি আমার পত্তনি লওয়াই কর্ত্তব্য হইতেছে, এরূপ ধার্য্য করিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে পত্র লিখিলেন। নবদ্বীপনাথ তৎপ্রদানে স্বীকৃত হইলে রাণী আপন কর্ম্মচারি রামদেব নাগের নামে পত্তনি লইলেন।

ভারতচন্দ্র এই পত্তনির ব্যাপার অবগত হইয়া কৃষ্ণ [৩৪] নগর-রাজের নিকট অনেক আপত্তি উপস্থিত করিলেন, রাজা কহিলেন "বর্দ্ধমানেশ্বর যখন আমার অধিকারে বাস করিলেন, তখন আমার কত আহ্লাদ বিবেচনা কর,

এবং পত্তনির নিমিত্ত যখন রাণী স্বয়ং পত্র লিখিয়াছেন তখন তাঁহার সম্মান ও অনুরোধ রক্ষা করা অগ্রেই উচিত হইতেছে” ভারত বলিলেন “এরূপ হইলে আমার এ গ্রামে বাস করা কর্ত্তব্য হয় না” রাজা তাঁহাকে কহিলেন “যদি মূলোযোড়ে থাকিতে নিতান্তই ইচ্ছা না হয়, তবে আনরপুরের অন্তঃপাতি “গুস্তে” নামক গ্রামে গিয়া বসতি কর।” এই বলিয়া তাঁহার সন্তোষের নিমিত্ত আনরপুরের গুস্তে বাসি মুখোপাধ্যায়দিগের বাটীর নিকট ১০৫৴ বিঘা এবং মূলাযোড়ে ১৬৴ বিঘা ভূমি এককালে স্বত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মত্ররূপে প্রদান করিলেন।

রায় গুণাকর এই নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হইয়া মূলাযোড় পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুস্তে গ্রামে গমন করণের উদ্যোগ করিলে গ্রামস্থ সমস্ত লোক বিস্তর অনুরোধ করিয়া কহিলেন “মহাশয়, কোনমতেই আমারদিগ্যে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবেন না, আপনি গমন করিলে মূলাযোড় অন্ধকার হইবে।” এই অনুরোধে বাধ্য হইয়া তিনি আনরপুরে গমন করিলেন না, মূলাযোড়েই বাস করিয়া রহিলেন।

রামদেব নাগ পত্তনিদার হইয়া ভারতচন্দ্রের প্রতি ও আর আর লোকের উপর দৌরাত্ম্য করাতে রায় কবিবর ক্রোধাধীন হইয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক কৌতুকচ্ছলে সংস্কৃত কবিতায় “নাগাষ্টক” রচনা করত [৩৫] পত্রযোগে কৃষ্ণনগরে প্রেরণ করেন, মহারাজ সেই পত্র এবং নাগাষ্টক পাঠ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং ভারতের রচনা-কৌশলের প্রতি অনুরাগ পূর্ব্বক অনেক গুণ ব্যাখ্যা করিলেন, আর অনুরোধ দ্বারা নাগের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিয়া দিলেন। ঐ পত্রখানি ও নাগাষ্টক আমরা নিম্নভাগে অবিকল প্রকাশ করিলাম, সকলে ইহার ভাব, রস ও মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিয়া সুখি হউন।

অথ পত্রং

অবশ্যপ্রতিপাল্যস্য শ্রীভারতচন্দ্র শর্ম্মণঃ।
নমস্কৃতীনামানন্ত্যং সবিশেষ নিবেদনং ॥১॥
মহারাজ রাজাধিরাজ প্রতাপ, স্ফুরদ্বীর্য্য সূর্য্যোল্লসৎ কীর্ত্তিপদ্মে।
স্থিরা রাজপদ্মালয়া স্তাংচিরস্থা, যতোঽস্মাকমাস্তে সমস্তং পুরস্তাৎ
যদবধি তব মুখচন্দ্র বিলোকন বিরহিত নয়নচকোরৌ।
তদবধি নিরবধি দুঃখহুতাশন প্রসরণ বাসরঘোরৌ ॥৩॥

আয়াতো মলয়ানিলো মুকুলিতাঃ চূতদ্রুমাঃ কোকিলাঃ
কান্তালাপকুতূহলা মধুকরাঃ কান্তানুরাগোৎকরাঃ।
নার্য্যঃ পান্থপতিপ্রসঙ্গবিকলাঃ পান্থাঃ কৃতান্তপ্রিয়া
নোজানে ভবিতা বিচার ইহ কঃ শ্রীমদ্বসন্তে নৃপে ॥৪॥
হোলীয়ং সমুপাগতা গতবতী ক্রীড়াকথা মাদৃশাং
দূরে ভূপতিরুন্মনাঃ পুরজনো দুর্গায়না গায়নাঃ।
বেশ্যা বাদ্যকরা মুখার্পিতকরা নিষ্ফলগুরাঃ ফাল্গুনো
নোজানে ভবিতা কিমত্র নগরে ভণ্ডোঽপি ভণ্ডায়তে ॥৫॥

---

[৩৬] অথ নাগাষ্টকং।

গতে রাজ্যে কার্য্যে কুলবিহিতবীর্য্যে পরিচিতে, ভবেদ্দেশে শেষে সুরপুর-বিশেষে কথমপি। স্থিতং মূলাযোড়ে ভবদনুবলাৎ কালহরণং, সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥১॥

বয়শ্চত্বারিংশত্তব সদসি নীতং নৃপ ময়া, কৃতা সেবা দেবাদধিক মিতি মত্বাপ্যহরহঃ। কৃতা বাটী গঙ্গাভজন পরিপাটী পুটকিতা, সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥২॥

পিতা বৃদ্ধঃ পুত্রঃ শিশুরহহ নারী বিরহিণী, হতাশা দাশাদ্যাশ্চকিত মনসা বান্ধবগণাঃ। যশঃ শাস্ত্রং শস্ত্রং ধনমপিচ বস্ত্রং চিরচিতং, সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥৩॥

সমানীতা দেশাদিহ দশভুজা ধাতুরচিতা, শিবাঃ শালগ্রামা হরি হরিবধূ মূর্ত্তিরতুলা। দ্বিজাস্তৎ সেবার্থং নিয়ম বিনিযুক্তা অতিথয়ঃ, সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥৪॥

মহারাজ ক্ষৌণীতিলককমলার্কক্ষিতিমণে, দয়ালো ভূপাল দ্বিজ কুমুদজাল দ্বিজপতে। কৃপাপারাবার প্রচুরগুণসার শ্রুতিধর, সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥৫॥

অয়ে কৃষ্ণ স্বামিন্ স্মরসি নহি কিং কালিয়হ্রদং, পুরা নাগগ্রস্তং স্থিতমপি সমস্তং জনপদং। যদীদানীং তৎ ত্বং নৃপ ন কুরুষে নাগ দমনং, সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥৬॥

স্তুতং বাক্যং যেন প্রচুরবসুনা কান্তিরতুলা, বহুত্তগোঽহমহং তব সদসি

গঙ্গাম্বুনিকটে। ত্বদীয়ো গণ্ডূষীকৃতমন্থুক্রমণ্ডুক নিকরঃ, সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥৭॥

জগৎপ্রাণগ্রাসী বিরলবিলবাসী নতমুখঃ, কুবর্ণো গোকর্ণঃ সবিষবদনো বক্রগমনঃ। তদাস্তে কিং রাজন্ ক্ষিপসি নিজপোষ্য দ্বিজমিতঃ, সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥৮॥

[৩৭] শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রনৃপপারিসদঃ সুকর্ম্মা, নাগাষ্টকং ভণতি ভারতচন্দ্র শর্ম্মা। এভির্জনো ভবতি যো মণিমন্ত্রবর্ম্মা, তত্তারয়েৎ সপদি নাগভয়াৎ সুধর্ম্মা ॥

আহা! আহা!—কি সুমধুর!—কি আশ্চর্য্য! –কি চমৎকার কৌশলে, কি সুললিত সুধাময় শব্দে এই পত্র এবং নাগাষ্টক বিরচিত হইয়াছে! ঐ কবিতার প্রসাদ গুণ, ছন্দের পারিপাট্য, বাক্যের মাধুর্য্য এবং ভাব ও রসের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে আমরা সংপূর্ণরূপেই অক্ষম হইলাম। জগদীশ্বর প্রসন্ন হইয়া যাঁহারদিগ্যে কবিত্ব, পাণ্ডিত্য এবং সর্ব্ব বিষয়ের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার স্বরূপ গুণ গ্রহণ করিয়া পরিতোষিত হইবেন। আমরা এইমাত্র বলিতে পারি, এই বঙ্গদেশে বাঙ্গালি শ্রেণীতে বাঙ্গালা ভাষার কবিতা-রচকের মধ্যে তাঁহার ন্যায় উচ্চ ব্যক্তি প্রায় কেহই জন্ম গ্রহণ করেন নাই। অপিচ তিনি যে সকল সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহাও অতি উত্তম, বিশেষ ব্যাখ্যার যোগ্য বটে, তদ্ভিন্ন তেঁহ পারস্য ভাষায় কবিতা প্রস্তুত করিতে পারিতেন, "ব্রজবুলী" হিন্দি ও যাবনিক শব্দে ভিন্ন ভিন্নরূপে এবং সংস্কৃত, ব্রজবুলী, হিন্দি ও যাবনিক ইত্যাদি মিশ্রিত শব্দে যে সমস্ত কবিতা রচিয়াছেন, তাহাও অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে।—একাধারে এত অধিক গুণ প্রায় দৃষ্ট হয় না, অতএব ইনি সর্ব্ব প্রকারে সর্ব্ব লোকের নিকট যশের ব্যাপারে অগ্রগণ্য হইবেন, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

এই মহোদয় যদ্যপিও অদ্যাপি এই পৃথ্বী সমাজে [৩৮] কীর্ত্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। কবিতার প্রতি যখন কটাক্ষ করিতেছি, তখনি তাঁহাকে দেখিতেছি। অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহের পালা, ভবানন্দ মজুমদারের উপাখ্যান, সত্যনারায়ণের ব্রত কথা, নাগাষ্টক, চণ্ডীনাটকের কিয়দংশ, এবং আর আর কবিতা সকল তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইয়াছে। তথাপি এই মহাপুরুষের জীবিতাবস্থায় যদিস্যাৎ আমরা মানবরূপে মহীমণ্ডলে প্রসূত হইতে পারিতাম, তবে কি এক অদ্বিতীয় উল্লাসের বিষয় হইত? কাব্য-তরুর

আশ্রিত হইয়া ছায়ায় বিশ্রাম করিতাম—শাখায় দুলিতাম—ফুলের সৌরভে আমোদিত হইতাম—এবং ফলের আস্বাদনে প্রচুর পরিতোষ প্রাপ্ত হইতাম—আপনি ধন্য হইতাম—ইন্দ্রিয়গণকে চরিতার্থ করিতাম—এবং জন্ম সফল করিতাম।

আহা! কি সুখের সময় সকল গত হইয়াছে!—অধুনা সেই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নাই, সেই সমুদয় উৎসাহদাতা ভাগ্যধর পুরুষ নাই, সেই ভারতচন্দ্র নাই, সেই রামপ্রসাদ সেন নাই, আর সেই কিছুই নাই। এই কাল মিথ্যা কাল। এইক্ষণে যাঁহারা কবি আছেন, কেহই তাঁহারদের সাহস দেন না, আদর করেন না, সুতরাং হৃদয়পদ্ম প্রফুল্লকর—রবি বিরহে আধুনিক কবি সকল মনের দুঃখে কেবল মলিন হইতেছেন।

কাব্যকর্ত্তা কবিকেশরী ভারতচন্দ্র এইরূপ অমোদ আহ্লাদ, হাস্য কৌতুকে কয়েক বৎসর কাল হরণ করত ১৬৮২ শকে ৪৮ বৎসর বয়সে বহুমূত্র-রোগে মানবলীলা [৩৯] সম্বরণ পূর্ব্বক যোগ্যধামে যাত্রা করিলেন। প্রদীপ্ত প্রদীপ এককালেই নির্ব্বাণ হইল।—সকলে হাহাকার করিতে লাগিলেন।

কেহ কেহ কহেন, তাঁহার প্রথম রোগের সূত্র বহুমূত্র, কিন্তু তৎপরে ভস্মক রোগ জন্মিয়াছিল।

ইনি ১৬৩৪ শকে, বাঙ্গালা ১১১৯ সালে মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৬৮২ শকে বাঙ্গালা ১১৬৭ সালে ইহলোক হইতে অবসৃত হয়েন। বর্ত্তমান ১২৬২ সাল পর্য্যন্ত তাঁহার জন্মের বৎসর গণনা করিলে ১৪৩ বৎসর, এবং মৃত্যুর বৎসর গণনা করিলে ৯৫ বৎসর হইবেক। আহা! কি পরিতাপ! এমত গুণশালী মহাত্মা মহোদয় ৪৮ বৎসরের অধিক কাল এই বিশ্ববাসে বিরাজ করিতে পারেন নাই। এই ৪৮ বৎসরের মধ্যে বিংশতি বৎসর বাল্যলীলা এবং বিদ্যাভ্যাসে গত হয়, তাহার পর দুই তিন বৎসর বর্দ্ধমানে বিষয়কর্ম্ম ও কারাভোগ করিয়া অনুমান ১৫।১৬ বৎসর উদাসীনের বেশে নীলাচলে দেব দর্শন ও শাস্ত্রালোচনায় গত হইল,—তৎপরে এক বৎসর কাল শালীপতি ভ্রাতার বাটীতে ও শ্বশুরালয়ে এবং ফরাসডাঙ্গায় ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরির নিকটে ক্ষয় করত ৪০ বৎসর বয়সের সময়ে নবদ্বীপেশ্বরের অধীন হইলেন, এবং সেই বর্ষেই "অন্নদামঙ্গল" এবং "বিদ্যাসুন্দর" রচনা করিলেন। উক্ত সংযুক্ত গ্রন্থের বয়স ১০৩ বৎসর হইল, কারণ তিনি ১৬৭৪ শকে, বাঙ্গালা ১১৫৯ সালে রচনা করেন, অন্নদামঙ্গলে তাহার বিশেষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

[৪০] যথা।

"বেদ লয়ে ঋষি রসে, ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত, ভারত রচিলা।"

এই প্রধান গ্রন্থের পরেই "রসমঞ্জরী" রচনা করেন, তাহাতেও অত্যাশ্চর্য্য কবিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, ইনি আর কিছুকাল জীবিত থাকিলে কি সুখের ব্যাপার হইত! তাঁহার মানস-সমুদ্রে প্রতিনিয়ত যে সকল ভাবের তরঙ্গ প্রবাহিত হইত, তিনি সাধারণকে তাহার লহরী-লীলা দেখাইতে পারেন নাই, বহু দুঃখ ও বহু কষ্ট ভোগ করিয়া সর্ব্বশেষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহতাশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মনোনীত স্থানে বাটী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, রাজ কৃপায় তিনি মাসিক বৃত্তি ও ভূমি সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন, নিশ্চিন্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে গ্রন্থ দ্বারা আপনার বিচিত্র ক্ষমতা এবং অদ্ভুত ভাব ঘটিত কবিতা-শক্তি প্রকটন করিবেন, এমত সময়েই বিষমতর বিড়ম্বনা হইল। আহা! দুঃখের কথা লিখিতে হইলে চক্ষের জলে ভাষিতে হয়। জগদীশ্বর কবিদিগ্যে অরোগি ও দীর্ঘজীবি করেন না! আয়ুর কথা উল্লেখ করাই বৃথা, যাঁহারা কবি, তাঁহারা যতদিন জীবিত থাকেন, ততদিন সুস্থ থাকিতে পারিলেও সুখের পরিসীমা থাকে না। এ জগতে সুস্থতার অপেক্ষা মহামঙ্গলময় ব্যাপার আর কিছুই নাই। সুখ বল, সন্তোষ বল, আনন্দ বল, বিদ্যা বল, শক্তি বল, উৎসাহ বল, অনুরাগ বল, চেষ্টা বল, যত্ন বল, ভজনা বল, সাধনা বল, যে কিছু বল, এই সুস্থতাই [৪১] সেই সকল বিষয়ের মূল-ভাণ্ডার হইয়াছে। দেহ রোগাক্রান্ত হইলে ইহার কিছুই হয় না, কিছুই হয় না, মনের মধ্যে কিছু ভাল লাগে না। কিছুতেই প্রবৃত্তি জন্মে না, কিছুতেই সুখের উদয় হয় না, বল, বিক্রম, বিদ্যা, বুদ্ধি, বিষয়, বিভব, সকলি মিথ্যা হয়, পরমেশ্বরের প্রতি যথার্থ রূপ ভক্তির স্থিরতা পর্য্যন্ত হইতে পারে না।—হে রোগ! কবি-কদম্বের কোমল কলেবর ভোগ করিয়া পবিত্র মনে বেদনা দিতে তোমার মনে কি কিঞ্চিন্মাত্র দয়ার উদ্রেক্ হয় না?—হে কৃতান্ত! তুমি নিষ্ঠুরাচরণে নিতান্তই কি ক্ষান্ত হইবে না? কবিকে অকালে দন্তশ্রেণীর অন্তর্গত করণের নিমিত্তই কি বিশ্বকান্ত অনন্তদেব তোমাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন?

মরণের কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতচন্দ্র সংস্কৃত নাটকের পদ্ধতিক্রমে মহিষাসুরের যুদ্ধ বর্ণনা ছলে সংস্কৃত ও হিন্দি মিশ্রিত বঙ্গভাষায় "চণ্ডীনাটক" নামে এক গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন, তাহার ভূমিকা ও যুদ্ধের আড়ম্বর মাত্র প্রেরচনা

করিয়াই মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইলেন। আমরা অনেক যত্ন, অনেক পরিশ্রম এবং অনেক উপাসনা করত সেই কয়েক পাত পুঁতি সংগ্রহ পূর্ব্বক মহানন্দে নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম, কবিতা কুসুমের মধুপ স্বরূপ পাঠকবৃন্দ মকরন্দ পানে আনন্দ করিতে থাকুন।

[৪২] যথা।

চণ্ডীনাটক।

সূত্রধার এবং নটীর রাজসভায় প্রবেশ।

নটীর প্রতি।

সূত্রধারের উক্তি।

সংগায়ন্ যদশেষকৌতুককথাঃ পঞ্চাননঃ
পঞ্চভির্বক্ত্রৈর্বাদ্যবিশালকৈ র্ডমরুকোথানৈশ্চ
সংনৃত্যতি। যা তস্মিন্ দশবাহুভি র্দশভুজা তালং
বিধাতুং গতা সা দুর্গা দশদিক্ষু বঃ কলয়তু-
শ্রেয়াংসি নঃ শ্রেয়সে ॥১॥

নটীর উক্তি।

শুন শুন ঠাকুর, নৃত্য বিশারদ চতুর সভাসদ সারি।
নূতন নাটক, নূতন কবি কৃত, হাঁম তোঁহি, নূতন নারী ॥
ক্যায় সে বাতায়ব, ভাব ভবানী কো, ভীতি ভৈঁ মুঝে ভারি।
দানব দলনে, ধরণীমণ্ডলে, তারিণী সে অবতারী ॥
গুরু সম ধীর, বীর সম শুনহ, সম সগুণ মুরারি ॥
কৃষ্ণচন্দ্র নৃপ, রাজ শিরোমণি, ভারতচন্দ্র বিচারি ॥

সূত্রধারের উক্তি।

রাজ্ঞোঽস্য প্রপিতামহো নরপতী রুদ্রোঽভবদ্রাঘব।
তৎপুত্রঃ কিল রামজীবন ইতি খ্যাতঃ ক্ষিতীশো মহান্ ॥
তৎপুত্রো রঘুরামরায়নৃপতিঃ শাণ্ডিল্যগোত্রাগ্রণী।
তৎপুত্রোয়মশেষধীরতিলকঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রোনৃপঃ ॥

[৪৩] ভূপস্তাস্ত সভাসদো বিমলধীঃ শ্রীভারতো ব্রাহ্মণঃ।
ভূরিশ্রেষ্ঠপুরে পুরন্দর সমো যস্তত্তি আসীন্নৃপঃ॥
রাজ্যাদ্‌ভ্রষ্ট ইহাগতস্ত নৃপতেঃ পার্শ্বে বভূবাশ্রিতঃ।
মূলাযোড়পুরং দদৌ স নৃপতির্বাসায় গঙ্গাতটে॥
তস্মৈ ভারতচন্দ্র রায় কবয়ে কাব্যাম্বু রাশীন্দবে।
ভাষা শ্লোক কবিত্ব গীত মিলিতং যত্নেন সম্বর্পিতং॥

চণ্ডী এবং মহিষাসুরের আগমন।

খট্ মট্ খট্ মট্ খুরোত্থ ধ্বনিকৃত জগতী কর্ণপূরাবরোধঃ।
ফোঁ ফোঁ ফোঁ ফেঁতি নাশা নিলচলদচলাত্যস্ত বিভ্রান্ত লোকঃ॥
সপ্‌ সপ্‌ সপ্‌ পুচ্ছ ঘাতোচ্ছলদুদধি জলপ্লাবিত স্বর্গ মর্ত্যে।
ঘর্ ঘর্ ঘর্ ঘোর নাদৈঃ প্রবিশতি মহিষঃ কামরূপো বিরূপঃ।১
ধো ধো ধো ধো নাগারা গড় গড় গড়গড়্‌ চৌঘড়ী ঘোরঘর্ষৈ—
ভোঁ ভোঁ ভোরঙ্গ শব্দে ঘন ঘন ঘন বাজেচ মন্দীর নাদৈঃ।
ভেরী তূরী দামামা দগড় দড়মসা শব্দনিস্তব্ধ দেবৈঃ।
দৈত্যোঽসৌ ঘোরদৈত্যৈঃ প্রবেশতি মহিষঃ সার্ব্বভৌমো বভূব॥১

মহিষাসুরের উক্তি।

ভাগেগা দেবদেবী, পাখড় পাখড়, ইন্দ্রকো বাঁধ আগে।
নৈঋতকো, রীত দেনা, যমঘর যমকো, আগকো আগলাগে॥
বায়োঁকো রোধ করকে, করত বরণ কো যব ভু মেঁ আব মাগে।
ব্রহ্মা সোঁ, বাসুকি সোঁ, কভি নাহি ঝগড়ো, জোঁউ কুবেরা নভাগে॥

প্রজার প্রতি মহিষাসুরের উক্তি।

শোন্‌রে গোঁয়ার্‌ লোগ্‌, ছোড়্‌ দে উপাস্‌ রোগ্‌,
মান্‌ হুঁ আনন্দ ভোগ্‌, ভৈঁষরাজ্‌ যোগ্‌মে।
[৪৪] আগ্‌মে লাগাও ঘীউ কাহে কো জলাও জীউ,
এক রোজ প্যার পিউ, ভোগ্‌ এহি লোগ্‌মে॥
আপ্‌কো লাগাও ভোগ, কায়কো জাগাও যোগ,
ছোড়্‌ দেও বোল্ল ভোগ, মোক্ষ এহি লোগ্‌মে।

ক্যা এগান্, ক্যা বেগান্;　　অর্থ নাব আব জান্,
এহি ধ্যান, এহি জ্ঞান,　　আর সর্ব্ব যোগ্ মে ॥

এই বাক্যে ভগবতীর ক্রোধ।

প্রথমে হাস্ত করিলেন।

কমঠ করটট, ফণি ফণা ফলটট, দিগ্ গজ উলটট,
ঝপ্ টট ভ্যায়্ রে।
বসুমতী কম্পত, গিরিগণ নম্রত, জলনিধি ঝম্পত,
বাড়বময় রে ॥
ত্রিভুবন ঘুঁটত, রবি রথ টুটত, ঘন ঘন ছুটত,
ধোঁও পরলয় রে।
বিজলী চট চট, ঘর ঘর ঘট ঘট, অট্ট অট অট অট্ট,
আ, ক্যায়া হায়্ রে ॥

এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই প্রচুর পীড়ায় অশক্ত হইলেন, অচিরাৎ লিখিয়া শেষ করিবেন মানস করিয়াছিলেন, তাহা না করিয়া জীবনযাত্রাই শেষ করিয়া বসিলেন, এই নাটকখানি সংপূর্ণ হইলে কি এক অদ্বিতীয় কীর্ত্তি হইত তাহা অনির্ব্বচনীয়। ইহা সম্পন্ন করণে অসমর্থ হওয়াতে তিনি যদ্রূপ দুঃখ পাইয়াছিলেন, অধুনা আমরা তাহার অপেক্ষা সহস্র গুণ দুঃখ ভোগ করিতেছি।

ভারতচন্দ্র রায়ের তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ পরীক্ষিত রায়, [৪৫] মধ্যম রামতনু রায় এবং কনিষ্ঠ ভগবান রায়, এইক্ষণে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের বংশ নাই, মধ্যম রামতনু রায়ের পুত্র পূজ্যবর শ্রীযুত তারকনাথ রায় মহাশয় মূলাযোড়ে বাস করিতেছেন, ইনি অতি বিজ্ঞ, ধার্ম্মিক, সদ্বিদ্বান্, এবং সুরসিক, অতিশয় প্রাচীন হইয়াছেন, উত্থানশক্তি নাই বলিলেই হয়, বয়স প্রায় ৮১ বৎসর গত হইয়াছে। এই মহাশয়ের অপার কৃপায় তাঁহার পিতামহ রায় গুণাকরের "জীবন-বৃত্তান্ত" এবং এই সকল অপ্রকাশিত কবিতার অধিকাংশই প্রাপ্ত হইয়াছি, তিনি এতদ্রূপ অনুগ্রহ প্রকাশ না করিলে এতৎ প্রাপণের কোন সম্ভাবনাই ছিল না, অতএব এজন্য যাবজ্জীবন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাঋণে বদ্ধ রহিব, উক্ত তারকনাথ রায় মহাশয়ের একমাত্র পুত্র, বাবু অমর নাথ রায়, তিনি কলিকাতা নগরে থাকিয়া বিষয় কর্ম্ম করেন, ইহার দুইটি সন্তান

জন্মিয়াছে, তাহারা উভয়েই অতি শিশু, অধুনা কবিবর ভারতের একটি পৌত্র, একটি প্রপৌত্র এবং দুইটি বৃদ্ধ প্রপৌত্র মাত্র আছেন, যদিও তাঁহারদিগের অবস্থা তাদৃশ উন্নত নহে, কিন্তু পরমেশ্বরের ইচ্ছায় অন্নবস্ত্রের বিশেষ ক্লেশ নাই।

অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দরের যে যে স্থানে ভারতচন্দ্র কবিতায় প্রকৃষ্টরূপ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, যাহার ভাবার্থ সাধারণে সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না, এবং যাহার মর্ম্ম ব্যক্ত করিতে কোন কোন পণ্ডিতের দেহ হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হয়, আমরা যথা [৪৬] যোগ্য পরিশ্রম পূর্ব্বক যথা সাধ্যক্রমে মর্ম্মার্থ ব্যাখ্যা পূর্ব্বক টীকা ও প্রমাণ সহিত সেই সকল কবিতা নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম, বোধ করি এতদ্দৃষ্টে অনেকের অন্তঃকরণে সন্তোষের সঞ্চার হইতে পারিবেক, "রসমঞ্জরী" "রসমঞ্জরী" নামক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র, সুতরাং তাহার টীকাকরণের প্রয়োজন করে না, ভূমিকা দেখিলেই বিশেষ জানিতে পারিবেন, ফলে এই অনুবাদে অতিশয় পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছে।

অন্নদামঙ্গল। দক্ষযজ্ঞ।

দক্ষ কর্তৃক শিবনিন্দা।

সভাজন শুন, জামাতার গুণ, বয়েসে বাপেরো বড়।
কোন গুণ নাই, যথা তথা ঠাঁই, সিদ্ধিতে নিপুণ দড়।
মান অপমান, সুস্থান কুস্থান, অজ্ঞান জ্ঞান সমান॥
নাহি জানে ধর্ম্ম, নাহি মানে কর্ম্ম, চন্দনে ভস্ম জ্ঞেয়ান॥
যবনে ব্রাহ্মণে, কুকুরে আপনে, শ্মশানে স্বর্গেতে সম।
গরল খাইল, তবু না মরিল, ভাঙ্গড়েরে নাহি যম॥
সুখে দুঃখ জানে, দুঃখে সুখ মানে, পরলোকে নাহি ভয়।
কি জাতি কে জানে, কারে নাহি মানে, সদা কদাচারময়॥
কহিতে ব্রাহ্মণ, কি আছে লক্ষণ, বেদাচার বহিষ্কৃত।
ক্ষত্রিয় কখন, না হয় ঘটন, জটা ভস্ম আদি ধৃত॥
যদি বৈশ্য হয়, চাসি কেন নয়, নাহি কোন ব্যবসায়।
[৪৭] শূদ্র বলে কেবা, দ্বিজে দেয় সেবা, সর্পের পৈতা গলায়॥

গৃহী বলা দায়, ভিক্ষা মেগে খায়, না করে অতিথি সেবা।
সতী ঝি আমার, গৃহিণী তাহার, সন্ন্যাসী বলিবে কেবা॥
বনস্থ বলিতে, নাহি লয় চিতে, কৈলাস নামেতে ঘর।
ডাকিনী বিহারী, নহে ব্রহ্মচারী, ইকি মহা-পাপ হর॥

[ইহার টীকা]

দক্ষপ্রজাপতি শিবনিন্দা করিতেছেন, এস্থলে গ্রন্থকর্ত্তা মহাকবি ভারতচন্দ্র রায়ের বর্ণনার পারিপাট্য এমন, যে, এই সকল নিন্দাগর্ভ বাক্যকেও স্তুতিপক্ষে ব্যাখ্যা করা যায়। যথা—"বয়সে বাপের বড়" নিন্দাপক্ষে—আমার পিতা যে ব্রহ্মা, তাহা হইতেও বৃদ্ধ, অর্থাৎ যাহা হইতে আর বৃদ্ধ নাই, অতিশয় বৃদ্ধতম। স্তুতিপক্ষে—ব্রহ্মা হইতেও বয়োধিক, অর্থাৎ তাঁহারো পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহাতে ছলে পরমেশ্বর বলা হইল। "কোন গুণ নাই"—নি*—মূর্থঃ। স্তু†—নির্গুণ ব্রহ্ম।

"যথা তথা ঠাঁই" নি—সর্ব্বদ্বারি ভিক্ষুক। স্তু—সর্ব্বব্যাপক। "সিদ্ধি" নি—ভাঙ। স্তু—যোগসিদ্ধি।

"মান অপমান ইত্যাদি" নি—নির্ব্বোধ। স্তু—নির্ব্বিকার ও ভেদ রহিত।

"নাহি জানে ধর্ম্ম" নি—অজ্ঞ। স্তু—যিনি পরব্রহ্ম, তাঁহার ধর্ম্ম জানিবার প্রয়োজন কি? জীবের ন্যায় তাঁহার তো যাজন করিতে হইবে না, এই হেতু ধর্ম্ম না জানার ন্যায় ব্যবহার করেন। [৪৮] "নাহি মানে কর্ম্ম" নি—নাস্তিক। স্তু—ব্রহ্মকে কর্ম্ম স্পর্শ করে না, অতএব তাঁহার স্ববিষয়ে তাহা মানিবার প্রয়োজন নাই, এই হেতু শাস্ত্রে কহে যে পরমেশ্বর কর্ম্মের বক্তা, কিন্তু আচরণ কর্ত্তা নন।

"চন্দনে ভস্ম জ্ঞেয়ান ইত্যাদি" নি—হেয় উপাদেয় বোধ রহিত। স্তু—স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদরহিত, সর্ব্বত্র সমভাব ব্রহ্ম।

"গরল খাইল ইত্যাদি" নি—দুরাচার ব্যক্তির কোন প্রকারেই মৃত্যু হয় না ও যমও নাই, এইরূপ আক্ষেপ বাক্য। স্তু—ফলতঃ মৃত্যুঞ্জয় বলা হইল, যম নাই, কি না যম তাঁহার সংহারক নহেন।

"সুখে দুঃখে ইত্যাদি" নি—জড়স্বভাব। স্তু—গুণাতীত, অতএব সুখ দুঃখ সমজ্ঞান।

---

* নি—নিন্দা। † স্তু—স্তুতি।

"পরলোকে নাহি ভয়" নি—নিরঙ্কুশ, অর্থাৎ বেদনিষিদ্ধ কার্য্যের আচরণ কর্ত্তা। স্ত—নিত্য মুক্তস্বভাব, নিজ-ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ, অতএব ইহার পরলোকে নরকপাতকাদি জন্য যে ভয় তাহা নাই, এই হেতু নিষিদ্ধাচরণেও দোষ নাই।

"কি জাতি কে জানে" নি—জাতির স্থির নাই। স্ত—যিনি সর্ব্বশরীরে জীব ও অন্তর্যামিরূপে বর্ত্তমান, তিনি যে কোন্ জাতি তাহা নিশ্চয় করিয়া কে কহিতে পারে?

"কারে নাহি মানে" নি—উৎশৃঙ্খল। স্ত—তাঁহা হইতে অন্য মান্যব্যক্তি কেহ নাই, অতএব তিনি কাহাকে মানিবেন? অথবা কাহারে না মানে, অর্থাৎ সকলকেই মানেন, হীনব্যক্তি দেখিলেও তাহাকে হেয়বুদ্ধি করেন না।

"সদাকদাচারময়" নি—সর্ব্বদা কুৎসিত আচার যে শ্মশান বাস ও ভূত প্রমথগণে আবৃত, চিতাভস্ম লেপন, ইহাতে যুক্ত। স্ত—সদাকদাচার যে ভূত প্রমথগণ তাহাদের সহিত সমভাব [৪৯] প্রাপ্ত, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে সকল বস্তু সকলের হেয় শ্রীমহাদেব তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা না করিলে সে সকল ভূত পিশাচাদির সঙ্গতি কি প্রকারে হইবে? ইহাতে কেবল অতিশয় দয়ালুতা প্রকাশ পাইয়াছে। "কহিতে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি" নি—যথাশ্রুতার্থ ই প্রকাশ আছে। স্ত—বর্ণাতীত ও আশ্রমাতীত পরমেশ্বর বলা হইল।

"মহাপাপ হর" নি—হর মহাপাপ। স্ত—মহাপাপ-হরণ-কর্ত্তা।

বিদ্যাসুন্দর।

সুন্দরের প্রতি বিদ্যার উক্তি।

বিদ্যা বলে প্রাণনাথ, বুঝিনু আভাস।
মালিনীর বাড়ী বুঝি, দিনে হয় রাস॥
অনুকূল পতি যদি, হয় প্রতিকূল।
ধৃষ্ট, শঠ দক্ষিণ, তাহার সমতুল॥

[ইহার টীকা]

পূর্ব্বে সুন্দর কর্ত্তৃক দিবা বিহারে অপমানিতা বিদ্যা তাহার প্রতিফল দিবার আশায়, সুড়ঙ্গপথ দিয়া গমন করিয়া নিদ্রিত সুন্দরের কপালে সিন্দুর চন্দন ও চক্ষুতে পানের পিক প্রদান করিয়া আপন গৃহে আসিয়া দর্পণে মুখ দর্শন

করিতেছেন, এখানে সুন্দর স্ত্রী-স্পর্শে উন্মনা হইয়া বিষ্ঠার নিকটে আগমন করিবাতে বিদ্যা অগ্রে অনেক তিরস্কার করিয়া কহিতেছেন। "মালিনীর বাড়ী ইত্যাদি" এখানে ব্যঙ্গার্থ এই যে, হে প্রাণনাথ! তোমার এই রাসলীলা শ্রীকৃষ্ণের প্রসিদ্ধ রাসলীলা হই-[৫০] তেও আশ্চর্য্য, কেননা দেখ শ্রীকৃষ্ণ লোকলজ্জা ভয়ে গভীর রাত্রিকালে নিবিড় বন মধ্যে গোপীগণের সহিত রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন, তুমি কোলাহলময় নিয়ত জনপূরিত মালিনী-মন্দিরে দিবসে বহু নায়িকার সহিত রাস করিয়া থাক, অতএব সাবাস সাবাস, তোমার লম্পটতা ভাবে আমি বলিহারি যাই।

"অনুকূল ইত্যাদি" প্রথমতঃ পতি সর্ব্বদা অনুকূল থাকিয়া পশ্চাৎ যদি প্রতিকূল হয়েন তবে তাহাকে ধৃষ্ট শঠ ও দক্ষিণ এই ত্রিবিধ নিকৃষ্ট নায়কের সহিত তুল্যরূপে নির্দ্দেশ করা যায়।

ধৃষ্ট। যথা।

কৃতাগা অপি নিঃশঙ্ক স্তর্জ্জিতোঽপি ন লজ্জিতঃ।
দৃষ্ট দোষেঽপি মিথ্যাবাক্ কথিতো ধৃষ্ট নায়কঃ॥

অর্থাৎ অপরাধী হইয়াও শঙ্কারহিত, তিরস্কৃত হইলেও লজ্জাহীন এবং দোষ দর্শন করাইলেও মিথ্যা কথন, অর্থাৎ যে বলে এ কার্য্য আমি করি নাই, তাহারি নাম ধৃষ্ট নায়ক। এস্থলে অন্য নারী সম্ভোগ জন্য অপরাধী হইয়াছ, তথাপি কিঞ্চিৎ শঙ্কা দেখিতে পাই না, এই কারণে তুমি ধৃষ্ট-লক্ষণাক্রান্ত হইলে ইতি ব্যঙ্গোক্তি।

শঠ। যথা।

একস্যামপি নায়িকায়াং বদ্ধভাবোঽপ্যন্যস্যাং গূঢ়ং বিপ্রিয় মাচরতি স শঠঃ।
অর্থাৎ এক নারীতে যাহার অতিশয় বদ্ধপ্রেম, আর অন্য নারীতে গোপনে প্রতিকূলাচরণ, তাহার নাম শঠ নায়ক। এস্থলে তোমার এপ্রকার শাঠ্য ব্যবহার দ্বারাই জানা গিয়াছে তুমি শঠ।

[৫১] দক্ষিণ। যথা।

বহুনাং নায়িকানাস্তু নায়কো দক্ষিণো মতঃ।
অর্থাৎ বহু নায়িকার একজন যে নায়ক, তাহার নাম দক্ষিণ। এ নায়কের

এক স্থানে প্রেমের স্থিরতা থাকে না, এই হেতু তুমিও প্রতিকূল নায়ক। মালিনীর বাটীতে রাসক্রীড়া করণ দ্বারাই তুমি যে দক্ষিণ নায়ক হইয়াছ তাহার সন্দেহ নাই, যেহেতু বহু নায়িকা ব্যতিরেকে কদাচ রাসক্রীড়া সম্পন্ন হয় না।

বিদ্যার প্রতি সুন্দরের উক্তি।

আপন চিহ্নেতে কেন, হইলা খণ্ডিতা।
লাভে হৈতে হৈলা দেখি কলহান্তরিতা ॥১॥
ভেবে দেখ নিত্য নিত্য, বাসসজ্জা হও।
উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, একদিন নও ॥২॥
কখনো না হইল, করিতে অভিসার।
স্বাধীন-ভর্তৃকা কেবা সমান তোমার ॥৩॥
প্রোষিত-ভর্তৃকা হোতে, বুঝি সাধ যায়।
নৈলে কেন বিনা দোষে খেদাও আমায় ॥৪॥

[ইহার টীকা।]

"আপন চিহ্নেতে ইত্যাদি"

পার্শ্বমেতি প্রিয়ো যস্যা অন্য সম্ভোগ চিহ্নিতাঃ।
সা খণ্ডিতেতি কথিতা ধীরৈরীর্ষা কষায়িতা ॥

[৫২] অন্য নারীর সম্ভোগ চিহ্নযুক্ত হইয়া পতি নিকটে আগমন করিলে যে নারী তদ্দৃষ্টে ঈর্ষাবশতঃ ক্রোধযুক্ত হয় সেই নারীই খণ্ডিতা, পণ্ডিতেরা এইরূপ কহেন। এই লক্ষণে অন্য সম্ভোগ চিহ্নিত এই শব্দ ব্যক্ত আছে, তথাপি তুমি পণ্ডিতা হইয়া এবং তাহার লক্ষণ জানিয়াও আপনার দন্তচিহ্ন দর্শন করিয়া কেন খণ্ডিতা হইতেছ ? তোমার এরূপ অনুচিত অবস্থা কেবল আমার দুরবস্থার কারণ অদৃষ্ট দুর্ভাগ্য হেতু ঘটিয়াছে।

ইতি ধ্বনিঃ। কেবল আমার দুরবস্থার কারণ, তোমারো এরূপ হইবে, এ কথা কহিতেছেন।

"লাভে হৈতে ইত্যাদি"

বোধ হয় তোমাকে ইহার পর কলহান্তরিতা অবস্থার যে যাতনা তাহাও ভোগ করিতে হইবে।

তথাহি।

চাটুকারমপি প্রাণনাথং দোষাদপাস্য যা।
পশ্চাত্তাপমবাপ্নোতি কলহান্তরিতাতু সা॥

ক্রোধ শান্তির কারণ যে পতি নানাবিধ প্রিয়, অথচ ছল বচন রচনা করিতেছেন, তাঁহাকে আরোপিত দোষ দ্বারা দূরীকরণ করিয়া পশ্চাৎ তাপযুক্তা অর্থাৎ কেন তাহাকে তিরস্কার করিলাম, কেনই বা স্থানান্তর গমন করিতে বলিলাম, যে নারী এই প্রকার আপনার দোষকীর্ত্তন পূর্ব্বক পশ্চাৎ তাপযুক্তা হয়, সেই নারীর নাম কলহান্তরিতা॥১॥

অপর প্রত্যহ তুমি বাসসজ্জা হইয়া থাক, কিন্তু তাহার পর আমার অনাগমন কারণ উৎকণ্ঠিতা ও বিপ্রলব্ধা এই দুই কষ্ট- [৫৩] দায়িকা অবস্থা ভোগ তোমাকে করিতে হয় না, যেহেতু আমি তৎকালীন নিকটবর্ত্তী হই।

"বাসসজ্জা"

ভবেদ্বাসকসজ্জাসৌ সজ্জিতাঙ্গরতালয়া।
নিশ্চিত্যাগমনং ভর্ত্তু র্দ্বারেক্ষণপরায়ণা॥

স্বামির আগমন নিশ্চয় করিয়া যে নারী আপনার অঙ্গ ও রতিগৃহ সুসজ্জ করি [য়া] দ্বার অবলোকন করিয়া থাকে তাহার নাম বাসসজ্জা।

"উৎকণ্ঠিতা"

সাস্যাদুৎকণ্ঠিতা যস্যা বাসং নৈতি দ্রুতং প্রিয়ঃ।
তস্যানাগমনে হেতুং চিন্তয়ন্তী শুচাভৃশং॥

শীঘ্র যাহার বাসস্থানে স্বামী আগমন না করেন, ফলতঃ যে সময়ে প্রত্যহ আগমন হয় তাহার অতিক্রম যদি হয়, পরে তাহার আগমন কেন হইল না, ইহার কারণ চিন্তা করত যে নারী অতিশয় শোকযুক্তা হয় তাহার নাম উৎকণ্ঠিতা।

"বিপ্রলব্ধা"

যস্যা দূতীং স্বয়ং প্রেষ্য সময়ে নাগতঃ প্রিয়ঃ।
শোচন্তী তং বিনা দুঃস্থা বিপ্রলব্ধাতু সা স্মৃতা॥

দূতী প্রেরণ করিলেও সময়ে যদি প্রিয় আগমন না করেন, তবে বিরহেতে যে নারী শোক করত দুঃখযুক্তা হয় তাহার নাম বিপ্রলব্ধা ॥ ২ ॥

অপরঞ্চ, তোমাকে কখনো অভিসার করিতে হয় নাই।

[৫৪] "অভিসারিকা"

কান্তার্থিনীতু যা যাতি সঙ্কেতং সাভিসারিকা।

কান্তার্থিনী হইয়া যে নারী গৃহ হইতে সঙ্কেত স্থানে গমন করে তাহার নাম অভিসারিকা, ঐ অভিসারিকার যে কার্য্য, অর্থাৎ বেশভূষা করিয়া গৃহ হইতে স্বামির নিকট গমন করা, তাহা তোমাকে কোন দিন করিতে হয় নাই, যেহেতু আমিই প্রত্যহ আগমন করি, অতএব তোমার তুল্যা স্বাধীনভর্ত্তৃকা নারী আর কে আছে?

"স্বাধীনভর্ত্তৃকা"

যস্যাঃ প্রেমগুণাকৃষ্টঃ প্রিয়ঃ পার্শ্বং ন মুঞ্চতি।
বিচিত্র বিভ্রমাসক্তা সা স্যাৎ স্বাধীনভর্ত্তৃকা ॥

যাহার প্রেমগুণেতে আকর্ষিত হইয়া স্বামী নিকট ত্যাগ করে না, এবং বিচিত্র শৃঙ্গার চেষ্টাতে আসক্তা যে নারী তাহার নাম স্বাধীনভর্ত্তৃকা ॥৩॥

কিন্তু ইহাতে আমার এক বোধ হইতেছে যে এক রস সর্ব্বদা ভাল লাগে না, এই হেতু নিরবধি মধুর রস পানানন্তর কাঞ্জিক রসাস্বাদনের ন্যায় প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা রসাস্বাদন করিতে বুঝি অভিলাষ হইয়া থাকিবে, নতুবা বিনা দোষে আমাকে দূর করিবার আর কোন প্রয়োজন দেখি না। ইতি ভাবঃ।

"প্রোষিতভর্ত্তৃকা"

কুতশ্চিৎ কারণাদ্‌যস্যা বিদূরস্থো ভবেৎ পতিঃ।
তদনঙ্গ দুঃখার্ত্তা ভবেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা ॥

[৫৫] কোন কারণ বশতঃ যাহার স্বামী দূর দেশস্থ হয় তাহার অনঙ্গ জন্য দুঃখেতে কাতরা যে নারী তাহার নাম প্রোষিতভর্ত্তৃকা।

রসমঞ্জরী গ্রন্থের ভূমিকা।

"রসমঞ্জরী" গ্রন্থারম্ভ।

ত্রিপদী।

জয় জয় রাধা শ্যাম, নিত্য নব রসধাম,
নিরুপম নায়িকা নায়ক।
সর্ব্ব সুলক্ষণধারী, সর্ব্ব রস বশকারী,
সর্ব্ব প্রতি প্রণয়কারক॥
বীণা বেণু যন্ত্র গানে, রাগ রাগিনীর তানে,
বৃন্দাবনে নাটিকা নাটক।
গোপ গোপীগণ সঙ্গে, সদা রাস রসরঙ্গে,
ভারতের ভক্তি প্রদায়ক॥
রাঢ়ীয় কেশরী গ্রামী, গোষ্ঠীপতি দ্বিজ স্বামী,
তপস্বী শাণ্ডিল্য শুদ্ধাচার।
রাজঋষি গুণযুত, রাজা রঘুরাম সুত,
কলিকালে কৃষ্ণ অবতার॥
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ, সুরেন্দ্র ধরণী মাঝ,
কৃষ্ণনগরেতে রাজধানী।
সিন্ধু অগ্নি রাহু মুখে, শশী ঝাঁপ দেয় দুখে,
যার যশে হোয়ে অভিমানী॥
তার পরিজন নিজ, ফুলের মুখটি দ্বিজ,
ভরদ্বাজ ভারত ব্রাহ্মণ।
ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যবাসী, নানা কাব্য অভিলাষী,
যে বংশে প্রতাপনারায়ণ॥
রাজবল্লভের কার্য্য, কীর্ত্তিচন্দ্র নিল রাজ্য,
মহারাজা রাখিলা স্থাপিয়া।
রসমঞ্জরীর রস, ভাষায় করিতে বশ,
আজ্ঞা দিলা রসে মিশাইয়া॥

সেই আজ্ঞা অনুসরি, গ্রন্থারম্ভে ভয় করি,
ছল ধরে পাছে খলজন।
রসিক পণ্ডিত যত, যদি দেখ দুষ্টমত,
সারি দিবা এই নিবেদন॥"

আমরা এইস্থলে ভারতচন্দ্রের গুণ বর্ণনা আর কত করিব? কোনমতেই লিখিয়া শেষ করিতে পারি না, যত লিখি ততই লেখনী নৃত্য করিতে থাকে, অত্র যাহা প্রকাশ করিলাম, ইহা কেবল আদর্শ মাত্র। উক্ত গুণা [৫৬] করের প্রণীত সমুদয় কবিতার টীকা করিয়া একত্রে এক পুস্তকে প্রকাশ করণের মানস করিয়াছি; কিন্তু এতদ্দেশীয় কাব্যপ্রিয় মহাশয়েরা যদিস্যাৎ আমারদিগের পরিশ্রমের তুল্য মূল্য বিবেচনা করিয়া যথাযোগ্য আনুকূল্য করেন, তবেই আমরা শ্রম সাকল্য সাফল্য জ্ঞানে এই বৃহদ্ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে পারি, নচেৎ কোন মতেই সাহস ও উৎসাহ জন্মিতে পারে না। আমরা নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করিয়া দেখিলাম, যে ৪ চারি টাকা মূল্য নির্দ্দিষ্ট না করিলে শ্রমের সার্থকতা ও ব্যয়ের সাহায্য হওনের সম্ভাবনাভাব। অতএব এতদ্বিষয়ে সর্ব্ব সাধারণের অভিপ্রায় জানিতে পারিলে শীঘ্রই কর্ম্মারম্ভ করিতে পারি, এবং এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে ভবিষ্যতে আর আর গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করণে সাহসী হইতে পারিব।

এই মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় বিরচিত অন্নদামঙ্গল গ্রন্থে যেরূপ ছন্দ প্রবন্ধের বাহুল্য দেখা যায়, অন্যান্য ভাষা রচিত পুস্তকে প্রায় তাদৃশ দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তাহার মধ্যে ভাষানুযায়ি পয়ার, মালঝাঁপ, বক্র-পয়ার, লঘুতোটক, দীর্ঘত্রিপদী, লঘুত্রিপদী, ভঙ্গ চৌপদী, বক্র দীর্ঘ ও লঘুত্রিপদী অথবা পঞ্চপদী ও চৌপদী প্রভৃতি ছন্দে যাহা রচনা হইয়াছে তাহা অতিশয় মনোহারি, তাহাতে কোন দোষস্পর্শ হয় নাই।

সংস্কৃতানুযায়ি বর্ণবৃত্তি মধ্যে গণিত ভুজঙ্গপ্রয়াত, তূণক, তোটক, পঞ্চচামর এবং মাত্রাবৃত্তি মধ্যে গণিত [৫৭] পজ্ঝটিকা ও চৌপাইয়া প্রভৃতি ছন্দের মধ্যে যাহাতে সংস্কৃত রচনা হইয়াছে তাহা অত্যুত্তম, কিন্তু ঐ ছন্দে যে ভাষা রচনা হইয়াছে তাহার স্থানে স্থানে গুরু লঘুর ব্যত্যয় দেখা যায়, ইহাতে আমরা গ্রন্থকর্ত্তার প্রতি তাদৃশ দোষোল্লেখ করিতে পারি না, কারণ যেপর্য্যন্ত সাধ্য তাহাতে তিনি যত্নের ঘাটি করেন নাই; তিনি কি করিবেন, সংস্কৃতছন্দে

প্রায় ভাষা রচনা তাদৃশরূপ উত্তম হয় না, তথাপি ভারত অন্য অপেক্ষায় উৎকৃষ্ট করিয়াছেন ইহা সহজেই স্বীকার করিতে হইবে।

এই পুস্তকে বর্ণে বর্ণে সমরূপ মিলনের যাদৃশ পারিপাট্য আছে পুস্তকান্তরে প্রায় তাদৃশ দৃশ্য হয় না, তবে বৃহদ্‌গ্রন্থ রচনা করিতে গেলেই দুই এক স্থানে তাহার যৎকিঞ্চিৎ ব্যভিচার ঘটেই ঘটে, ইহা দোষের মধ্যে গণিত নহে এবং গ্রন্থকর্তার অভিপ্রায়ানভিজ্ঞ ইদানীন্তন ব্যক্তি কৃত গ্রন্থের স্থানে স্থানে যে পাঠের দোষ দেখা যাইতেছে তাহা দর্শন করিয়া গ্রন্থকর্তার প্রতি দোষারোপ করা কেবল আপনার অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করা সারমাত্র।

এই পুস্তকে তত্তৎ প্রসঙ্গানুসারে প্রায় নবরস বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে শুদ্ধ শৃঙ্গার রসের প্রাবল্যরূপেই বর্ণনা হইয়াছে, এবং বীররসেরো কিঞ্চিৎ প্রাবল্যমাত্র। অপর করুণা, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও শান্তি এই সপ্ত রসের স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বর্ণনা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা প্রধানরূপে গণ্য হইতে [৫৮] পারে না। এই স্থলে অন্য রসের কথাই নাই, সমস্ত গ্রন্থখানি অন্বেষণ করিয়া দুই এক স্থানে যৎকিঞ্চিৎ করুণা রস যাহা দৃষ্ট হয়, তাহাও শৃঙ্গার রসের প্রসঙ্গাধীনেই লিখিত হইয়াছে, শান্তিরস নাই বলিলেই হয়।

অপিচ নায়িকা বিশেষের অবস্থা বিশেষ, ও নায়ক প্রভেদ ও উদ্দীপন, আলম্বন, বিভাবন ও কোন কোন স্থানে ধ্বনি ও ব্যঙ্গ ইত্যাদিও সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সকল বিশেষ কারণ বশতঃ এই সকল বিষয়ে মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর বিরচিত অন্নদামঙ্গল গ্রন্থ অন্যান্য ভাষা গ্রন্থ হইতে অনেকাংশে উৎকৃষ্ট অবশ্যই কহিতে হইবে।

এই মহাশয় অন্নদামঙ্গল রচনার পূর্ব্বে কিম্বা পরে যে সকল ভাষা কবিতা রচনা করিয়াছেন, অন্নদামঙ্গলের সহিত তাহার তুলনা কোন ক্রমেই হইতে পারে না, ইহাতে বিশিষ্টরূপেই প্রমাণ হইতেছে, যে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভার আশ্রয় লওয়াতেই নানাকারণে এই অন্নদামঙ্গল অনেক প্রকারে দোষ-শূন্য ও প্রকৃষ্ট হইয়াছে, পরন্তু পদ্যের দ্বারা ইঁহার পাণ্ডিত্য, বিদ্যা, পরিশ্রম, এবং যত্নের ব্যাপার যত প্রকাশ পাইয়াছে, দৈবশক্তির পরিচয় তত প্রকাশ পায় নাই, ফলতঃ যে পর্য্যন্ত ব্যক্ত হইয়াছে তাহাও সাধারণ নহে।

প্রস্তাব সাঙ্গ করণ সময়ে পুনর্ব্বার একবার লেখনী ধারণ করিতে হইল, কারণ ভারতচন্দ্র রায় "সত্যপীরের ব্রতকথা" যাহা চৌপদীছন্দে বর্ণনা

করিয়াছেন, তাহার [৫৯] ভণিতা স্থলে লিখিত আছে "সনে রুদ্র চৌগুণা" ইহার অর্থ দুই প্রকারে নির্দ্দেশ হইতেছে, আমরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা কতিপয় প্রামাণ্য লোকের প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইলাম, যৎকালে ঐ পুস্তক প্ররচিত হয় তৎকালে পুস্তক কারকের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষের অধিক হয় নাই, এজন্ত তাহার জন্মের সাল ধরিয়া সনে রুদ্র চৌগুণার অর্থ প্রথমেই বাঙ্গালা "১১৩৪" সাল নিরূপণ করিয়াছি অর্থাৎ রুদ্র শব্দে ১১ একাদশ, এই একাদশ পূর্ব্বভাগে স্বতন্ত্র রাখিয়া তৎপরে "অঙ্কস্য বামাগতিঃ" ক্রমে চৌ, গুণার, অর্থ "৩৪" নির্ণয় করিয়াছি। এরূপ না করিলে তিনি ১৫ বৎসর বয়সের কালে গ্রন্থ রচিয়াছিলেন, তাহা কোনমতেই প্রামাণ্য হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ "সনে রুদ্র চৌগুণা" রুদ্র শব্দে একাদশ, সুতরাং শুভঙ্করের গণনাক্রমে এগারোকে চারিগুণ করিলে "চারি এগারং ৪৪" নিরূপিত হইতেছে, যুক্তি ও বিবেচনা মতে যদি ইহার অর্থ এরূপ অবধারিত হয়, তবে "৪৪" সনে ঐ পুস্তকের জন্ম হইয়াছে, সহজেই স্বীকার করিতে হইবেক, কিন্তু "১১৪৪" কি "১৬৪৪" তাহার কিছুই নির্দ্দিষ্ট হইল না, যদি বাঙ্গালা সন ধরিয়া "১১৪৪" নির্ণয় করা যায়, তাহা হইলে তৎকালে গ্রন্থ কর্ত্তার বয়স ১৫ বৎসরের পরিবর্ত্তে ২৫ বৎসর নির্দ্দেশ করিতে হইবে, আর কহিতে হইবে, তিনি ঐ সময়েই পারস্য ভাষার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া ৩০ বৎসর বয়সে পাঠ সাঙ্গ করিয়া বাটী আগমন পূর্ব্বক [৬০] বর্দ্ধমানে গিয়া মোক্তারি পদে অভিষিক্ত হয়েন। অপিচ তথায় কিছুদিন বিষয় কর্ম্ম ও কারাভোগ করণান্তর ৭।৮ সাত, আট, বৎসর উদাসীনের বেশে শ্রীক্ষেত্রে বাস করিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক "৪০" বৎসর বয়সে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরির কৃপায় কৃষ্ণনগরাধীপের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এবং এই বর্ষেই রাজাজ্ঞায় অন্নদামঙ্গল রচনা করেন। এমত কিম্বদন্তী যে, রাজা এবং রাজ-পণ্ডিতেরা এই রচনায় অনেক আনুকূল্য করিয়াছিলেন। ফলে ইহা সর্ব্বতোভাবেই বিশ্বাসের যোগ্য বটে। কারণ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় অন্নদামঙ্গলকে নির্দ্দোষ না করিয়া আর প্রকাশ করিতে দেন নাই।

অপিচ।—এই মহাব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া যতদূর করিতে হয় আমরা সাধ্যমতে তাহার ত্রুটি করি নাই। যেপর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া অত্র প্রকটন করিলাম, ইহার অতীত যদি আর কোন বিষয় কাহারো নিকট থাকে তবে তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা প্রেরণ করিলে পরম উপকার স্বীকার করিব।

যেমন সমুদ্র সম্বন্ধে গোষ্পদ, পর্ব্বত সম্বন্ধে রেণু, মহাকাশ সম্বন্ধে ঘটাকাশ, সূর্য্য সম্বন্ধে খদ্যোত, হস্তী সম্বন্ধে মশক।—এবং সিংহ সম্বন্ধে শৃগাল, সেইরূপ ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে আমি। অতএব এই মহাপুরুষের "জীবন চরিত" রচনা সূত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য, কবিত্ব, বিদ্যা ও গুণাকরের আর আর গুণের বিষয়ে আমি যে অভিপ্রায় [৬১] ব্যক্ত করিলাম, অনবধানতা, অজ্ঞানতা এবং ভ্রান্তি বশতঃ যদি তাহাতে কোনরূপ দোষ হইয়া থাকে তবে গুণাকর পাঠক মহাশয়েরা এই দোষাকর প্রভাকর প্রকাশকের প্রতি ক্রোধাকর না হইয়া ক্ষমাকর ও কৃপাকর হইবেন।

পরন্তু যে যে স্থানে অশুদ্ধ অর্থাৎ শব্দ ও বর্ণের দোষ হইয়াছে, অনুকম্পা পূর্ব্বক তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

কবিরঞ্জন ৺রামপ্রসাদ সেন।*

[১] আমরা আশ্বিন মাসের প্রথম দিবসীয় প্রভাকর পত্রে মহাত্মা ৺রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন প্রণীত কয়েকটী গীত প্রকটন করিয়াছিলাম† তৎপাঠে পাঠক মাত্রেই প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছেন, যেহেতু ইহার তুল্য বঙ্গভাষা-ভাষিত অমূল্য গীত রত্ন এ পর্য্যন্ত কোন কবি কর্ত্তৃক প্রচারিত হয় নাই। বঙ্গদেশের মধ্যে যত মহাশয় কবিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যে রামপ্রসাদ সেনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে, কারণ তিনি সকল রসের রসিক, প্রেমিক, ভাবুক, ও ভক্ত এবং জ্ঞানি ছিলেন, ইনি কতকালের পুরাতন মনুষ্য, ও কতকাল মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন তথাচ ইহার কৃত একটীও পদ অদ্যাপি পুরাতন হইল না, নিয়তই নূতন ভাবে পরিচিত হইতেছে, যখনি যাহা শুনা যায় তখনি তাহা নূতন বোধ হয়, গায়কেরা যখন গান করেন তখন শ্রোতৃবর্গের কর্ণে বর্ণে বর্ণে সুধা প্রবেশ করিতে থাকে। কোন সুগায়ক ব্যক্তি অপর কোন কবি রচিত গীত অতি সুস্বরে গান না করিলে শ্রুতি-সুখকর হয় না, তাহাতে বাদ্য ও অন্যান্য যন্ত্রের আবশ্যক করে, রামপ্রসাদিপদে ইহার কোন বিষয়েরি প্রয়োজন করে না, কাকের ন্যায় অতি নিরস কর্কস-কণ্ঠ কোন মানুষ (যাহার তাল, মান, রাগ, সুর কিছুই বোধ নাই) তাহার কণ্ঠ হইতে রামপ্রসাদি পদ নির্গত হইলে বোধ হইবে যেন কোথা হইতে অকস্মাৎ অমৃত বৃষ্টি হইতেছে। এই গানে যন্ত্র না হইলে যন্ত্রণার বিষয় কি। যিনি মানুষ হইবেন শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহার মন অমনি মুগ্ধ হইবেক, ভাবার্থ গ্রহণ করণের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রেমাহ্লাদে পরিপূর্ণ হইতে থাকিবেন। পৃথিবীতে যত প্রিয়পদার্থ আছে তৎকালে তাঁহার চিত্ত এতদপেক্ষা পরম প্রিয় বলিয়া আর কাহাকেই গ্রাহ্য করিবে না। কোন কোন রামপ্রসাদি পদের কোন কোন চরণের কোন কোন শব্দ ও কোন কোন ভাব এরূপ রমণীয় ও এরূপ অত্যাশ্চর্য্য কৌশল-পরিপূরিত যাহার স্বরূপার্থ প্রকাশ হইলে বহু শাস্ত্রের মর্ম্ম অনায়াসেই গ্রহণ করা [২] যাইতে পারে এবং তদ্দ্বারা সিদ্ধান্ত সূর্য্যের সন্দীপনে সমুদয় সংশয় ধ্বান্ত অন্ত

---

*সংবাদপ্রভাকর, শুক্রবার ১ পৌষ ১২৬০ সাল। ইংরেজি ১৫ ডিসেম্বর ১৮৫৩।—স.

†পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।—স.

হইলে হৃদয়ারবিন্দ আনন্দ মকরন্দ-ভরে প্রফুল্ল হইয়া কি এক অভাবনীয় অদ্ভুত ব্যাপারে অভিভূত করিতে থাকে।

কবিতা বিষয়ে রামপ্রসাদ সেনের অলৌকিক শক্তি ও অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, ইনি চক্ষে যখন যাহা দেখিতেন এবং ইহার অন্তঃকরণে যখন যাহা উদয় হইত তৎক্ষণাৎ তাহাই রচনা করিতেন কস্মিন্ কালে দৎ কলম লইয়া বসেন নাই। মুখ হইতে যে সমস্ত বাক্য নির্গত হইত তাহাই কবিতা হইত। তিনি পরমার্থ পথের একজন প্রধান পথিক ছিলেন, অতি সামান্য সকল বিষয় লইয়া ঈশ্বর প্রসঙ্গে তাহারি বর্ণনা করিতেন, এই মহাশয় সদানন্দ পুরুষ ছিলেন, ব্রহ্মচিন্তা ব্যতীত তাঁহার অন্তঃকরণে অন্য চিন্তা বা অন্য চিন্তা মাত্রই ছিলনা, বিষয়-বিশিষ্ট সাংসারিক সুখকে অত্যন্ত হেয় জ্ঞান করিতেন, পরিচ্ছদের পারিপাট্য ও আহারের উত্তমতা বিষয়ে দৃষ্টি ছিল না, অতি জঘন্য দ্রব্য আহার করিয়া ও অতি মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট থাকিতেন। অবস্থার উন্নতি করে মনোযোগ না থাকাতে সৌভাগ্য সঞ্চয় করিতে পারেন নাই, তিনি যদ্রূপ অদ্বিতীয় কবি ছিলেন ও তাঁহার জীবিত সময়ে কবিতার যদ্রূপ সমাদর ছিল এবং তৎকালে এই দেশ যদ্রূপ ধনিলোকে মণ্ডিত ছিল, ইহাতে বিষয় বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র বাসনা-বিশিষ্ট হইলে অক্লেশে বিপুল বিত্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক পুত্র পৌত্রাদিকে সমূহ সুখে সুখি করিয়া যাইতে পারিতেন। তিনি যে এক উচ্চ বিষয়ের বিষয়ী ছিলেন তাহাতে সহজেই সমস্ত বিষয়কে তুচ্ছ বোধ হইত, কেননা সমুদয় অসার ভাবিয়া কেবল কালীনাম সার করিয়াছিলেন, সুতরাং যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে পরম প্রকৃতির উপাসনা করে অতি কুৎসিৎ যৎসামান্য রূপা সোণার উপাসনা তাঁহার মনে কি প্রকারে ভাল লাগিতে পারে?

রামপ্রসাদের পদী রামপ্রসাদের পদ হইয়াছিল, তিনি পদের বলেই পদে ছিলেন, ইহাতে সামান্য পদের প্রয়োজন কি? পদ পাইয়াই পদ পাইয়াছিলেন, সেন সদাত্মার যে-পদ, তাহাই বিপদ, অথচ বিপদ নহে, বিপদ-নাশক বিপদ। যিনি যথার্থ দ্বিপদ, তিনিই এই পদ ও বিপদের মর্ম্মগ্রাহী হইবেন, নচেৎ অপর কেহই তাহার যোগ্য হইতে পারিবেন না।

রামপ্রসাদ সেন প্রথমাবস্থায় কলিকাতায় বা তন্নিকটস্থ কোন বিখ্যাত ধনির গৃহে ধনরক্ষকের অধীনে এক মুহুরির কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু বিষয়-বাসনা-বিহীনতা জন্য তৎকর্ম্মে তাঁহার মনের অভিনিবেশ মাত্র ছিল না, একারণ তিনি তহবিলদারের প্রিয় হইতে পারেন নাই, সর্ব্বদাই উভয়ের মধ্যে

বাক্‌কলহ ও বিবাদ হইত, সেন কবির চাকরি করা কিছু উদ্দেশ্য ও অভিপ্রেত ছিল না, তিনি মানসিক সংকল্প পূর্ব্বক যে পরম প্রভুর দাসত্ব স্বীকার করিয়াছলেন শুদ্ধ তাঁহারি কার্য্য করিতেন, মানব প্রভু বিরক্ত হইলে উপস্থিত পদে বপদ হইবে সে দিগে দৃক্‌পাতো করিতেন না, প্রতি দিবস নিয়মিত কালে কার্য্যের আসনে উপবিষ্ট হইয়া খাতার পাতা খুলিয়া আগাগোড়া শুদ্ধ "শ্রীদুর্গা" "শ্রীদুর্গা" এই নাম লিখিতেন, এই প্রকারে যখন খাতার সমুদয় পাতা কেবল "দুর্গা নামে" পরিপূর্ণ হইল, তখন সর্ব্বশেষে এই একটী গান লিখিয়া বসিলেন।

যথা।

"আমায় দেও মা তবিল্ দারী।
আমি নিমক্ হারাম্ নাই শঙ্করী॥
পদরত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার্ জিম্মা আছে যার, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।
শিব আশুতোষ্ স্বভাবদাতা, তবু জিম্মা রাখো তাঁরি॥১
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়্গির, তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা মাইনায়্ চাকর কেবল্ চরণ ধূলার অধিকারী॥২
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে তো মা পেতে পারি॥৩
প্রসাদ বলে এমন্ পদের বালাই লোয়ে আমি মরি।
ও পদের মত, পদ পাইতো, সে-পদ্ লোয়ে বিপদ সারি॥৪"

খাতার শেষ পত্রে এই কবিতা লিখিত হইলে তহবিলদার সেই খাতা দৃষ্টি করত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও ব্যাগ্র হইয়া আপনার প্রভুর নিকট কহিলেন "মহাশয় একটা পাগল ও মাতালকে বিশ্বাস পূর্ব্বক কর্ম্ম দিয়া কি সর্ব্বনাশ করিয়াছেন! দেখুন এমন সুন্দর পাকা খাতা খানা একেবারে নষ্ট করিয়াছে, ইহাতে অঙ্কপাত মাত্র নাই, কেবল পাগ্‌লামি করিয়াছে ইত্যাদি" উক্ত প্রভু তচ্ছ্রবণে খাতার আগাগোড়া সকল পাতা বিলক্ষণ রূপে বিলকোন [বিলোকন] ও "আমায় দেওমা তবিল্‌দারি" এই পদটী সমুদয় তিন চারিবার পাঠ করত অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া প্রেমাশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং খাজাঞ্চিকে কহিলেন "তুমি পাগল না মাতাল বলিয়া কাহার উপর অভিযোগ করিতেছ? এ

ব্যক্তি তো কাঁচা কর্ম্ম করিয়া পাকা খাতা নষ্ট করে নাই, পাকা খাতায় পাকা কর্ম্মই করিয়াছে, তুমি কথার ইঙ্গিতে ও ভাবের ভঙ্গিতে এই সঙ্গীতের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পার নাই, আর তুমি বিষয়-মদে মত্ততা জন্য ইহাকে চিনিতে পার নাই, রামপ্রসাদ সেন সামান্য মনুষ্য নহেন, [৩] সাক্ষাৎ দেবীপুত্র, অতি সাধুব্যক্তি” পরে অতি প্রিয়বাক্যে সম্বোধন পূর্ব্বক কবিরঞ্জনকে কহিলেন “রামপ্রসাদ! তুমি যে পদে পদার্পণ করিয়াছ তাহাতে এপদে বদ্ধ রাখায় কেবল তোমারি বিপদ করা হইতেছে, তুমি যাবজ্জীবন এই সংসার কাননে বিচরণ করিবে আমি তাবৎকাল তোমাকে ৩০ ত্রিশ মুদ্রা মাসিক বৃত্তি প্রদান করিব* তোমার আর ক্ষণ কাল এখানে থাকিবার আবশ্যক করে না, যাও তুমি এখনি আপনার গৃহে গিয়া স্বকার্য্য সাধন কর।”

রামপ্রসাদ সেন ৩০ ত্রিশ টাকা মাসিক বৃত্তির উপর নির্ভর করত বাটীতে আসিয়া সানন্দ-চিত্তে কাল যাপন করিতে লাগিলেন, কিন্তু পরিবার অধিক হওয়াতে ঐ স্বল্প বৃত্তি দ্বারা কোন প্রকারেই সুপ্রতুল-রূপে সংসার নির্ব্বাহ হইত না, একারণ স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পরিজনেরা সর্ব্বদাই উপার্জ্জনের নিমিত্ত উত্তেজনা করিত, কিন্তু সে পক্ষে তিনি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না, শুদ্ধ শক্তি ভক্তি সার করিয়া সঙ্গীতানন্দার্ণবে নিমগ্ন হইতেন। ফলে তাঁহার পরিবারে কোন দ্রব্যেরি অপ্রতুল ছিল না, নানা স্থান হইতে নানা ব্যক্তি যাহারা সংকীর্ত্তনাদি নানা বিষয়ক গীত লইতে আসিত তাহারা কালীর ও কবির প্রণামি স্বরূপ অনেক অর্থ ও বহু প্রকার দ্রব্যাদি অর্পণ করিত, তিনি নিজে অতিশয় দাতা এবং দয়ালু ছিলেন, স্নেহপাত্র, অনুগত এবং দীন দরিদ্র যাহাকে সম্মুখে দেখিতেন তাহাকেই তৎক্ষণাৎ তৎ সমুদয় দান করিয়া বসিতেন, এ দিগে আপনার ঘরে হাঁড়ি চড়ে না, আহার অভাবে পরিবারগণ হাহাকার করিতেছে, তিনি প্রকৃত মুক্ত-হস্ত-পুরুষ ছিলেন, এজন্যই তাঁহার দীনতার ক্ষীণতা হইত না। কন্যা পুত্র, স্ত্রী কিম্বা অপর কেহ নিতান্ত বিরক্ত করিলে জগদীশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক মনের ভাবে এক এক বার এক একটা গান করিতেন।

---

* এই স্থলে দুই প্রকার প্রবাদ আছে, কেহ কেহ কহেন রামপ্রসাদ খিদিরপুরস্থ ৺দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের নিকট, কেহ কেহ কহেন কলিকাতায় নবরঙ্গ কুলপতি ৺দুর্গাচরণ মিত্রের নিকট মুহুরিগিরি কর্ম্ম করিতেন।

যথা।

"তুমি এ ভাল কোরেছ মা,
আমারে বিষয় দিলে না।
এমন ঐহিক সম্পদ কিছু,
আমারে দিলে না॥

কিছু দিলেনা, পেলেনা, দিবেনা, পাবে না, তায় বা ক্ষতি কি মোর্।
হোক্ দিলে দিলে বাজী, তাতেও আছি রাজি, এবার এ বাজী ভোর্ গো॥১
এমা দিতিস্ দিতাম্, নিতাম্, খেতাম্, মজুরি করিয়া তোর্।
এবার মজুরি হোলোনা, মজুরা চাব কি, কি জোরে করিব জোর্ গো॥২
আছ তুমি কোথা, আমি কোথা, মিছামিছি করি শোর্।
শুধু শোর্ করা সারা, তোর্ যে কুধারা, মোর্ যে বিপদ ঘোর্ গো॥৩
এমা ঘোর মহানিশি, মন-যোগে জাগে, কি কায তার কঠোর্।
আমার একুল ওকুল, দুকুল মজিল, সুধা না পেলে চকোর্ গো॥৪
এমা আমি টানি কোলে, মনে টানে পিছে, দারুণ করম ডোর্।
রামপ্রসাদ কহিছে পোড়ে দুটানায়, মরে মন ভুঁড়াচোর গো॥৫"

এই গীত যখন রচনা করেন তখন তাঁহার মনের ভাব কি চমৎকার হইয়াছিল তাহা ভাবজ্ঞ জনেরা বিবেচনা করিবেন। ইহার গূঢ়ার্থ যিনি গ্রহণ করিবেন তিনিই সুখী হইবেন। কারণ কোন বিষয়ের অভাব কালে স্বভাবকে স্বভাবে রাখিয়া সেই অভাবের অভাব করা অথবা সেই অভাবকে অভাবে রাখিয়া স্বভাবে রাখা বড় সহজ ব্যাপার নহে। যে কেহ হউন, এই সহজ তখন তাঁহার পক্ষে অতি সহজ হইবে যখন তিনি সহজে সহজকে* জানিতে পারিবেন।

এই স্থলে আর কয়েকটী গীত প্রকাশ করিলাম এতৎপাঠে কবির মানসিক ভাবের যথার্থ পরীক্ষা হইবেক।

যথা।

আমি তাই অভিমান করি।
আমায় করেছ সংসারী॥
অর্থ বিনা, ব্যর্থ যে, এ সংসারে সবারি।
ওমা তুমিও কন্দোল করেছ বোলে শিব ভিখারী।১

* সহজ, পরমাত্মা অর্থাৎ জীবের সহজ

জ্ঞান ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দান ধর্ম্মোপরি।
ওমা বিনা দানে মথুরাপারে যান্নি ব্রজেশ্বরী ॥২
নাতোয়ানী কাচ্ কাচো মা, অঙ্গে ভস্ম ভূষণ্ ধরি।
ওমা কোথায়্ লুকাবে তোমার কুবের ভাণ্ডারী ॥৩
প্রসাদে প্রসাদ দিতে মা, এত কেন হোলে ভারি।
যদি রাখ পদে, থেকে পদে, পদে পদে বিপদ সারি ॥৪

তথা।

তারানামে সকলি ঘুচায়।
কেবল রহে মাত্র ঝুলি কাঁথা,
সেটাও নিত্য নয় ॥
যেমন্ স্বর্ণকারে স্বর্ণ হরে স্বর্ণ খাদি উড়ায়।
ওমা তোর নামেতে তেম্‌নি ধারা, তেমনি তো দেখায় ॥১
যেজন গৃহস্থলে, দুর্গাবলে, পেয়ে নানা ভয়।
এমা তুমিতো অন্তরে জাগো, সময় বুঝ্‌তে হয় ॥২
যার পিতা মাত ভস্ম মাখে, তরুতলে রয়।
ওমা তার তনয়ের ভিটেয়, টাঁ্যাকা এ বড় সংশয় ॥৩
প্রসাদে ঘেরেছে তারা প্রসাদ পাওয়া দায়।
ওরে ভাই বন্ধু থেকোনা, রামপ্রসাদের আশায় ॥৪

কোন আত্মীয় ব্যক্তি এক দিবস কথায় কথায় রামপ্রসাদ সেনকে কহিয়া ছিলেন "সেনজ এতদিন দুঃখে গেল, এইক্ষণে কিঞ্চিৎ সুখভোগ কর" এই [৪] কথার তিনি অপর কোন উত্তর না করিয়া তৎক্ষণাৎ একটী গান করিলেন, ঐ গীত তাহার প্রকৃত উত্তর হইল।

যথা।

"মন্ কোরনা সুখের আশা।
যদি অভয় পদে লবে বাসা ॥
হোয়ে দেবের দেব্ সদ্বিবেচক, তৈঁইতো শিবের দৈন্ত-দশা ॥
সে যে দুঃখিদাসে দয়া বাসে, সুখের আশে বড় কসা।
হোয়ে ধর্ম্মতনয়, তেজে আলয়, বনে গমন হেরে পাশা ॥১
হরিষে বিষাদ আছে মন, কোরনা এ কথায় গোঁসা।
ওরে সুখেই দুখ, দুখেই সুখ, ডাকের কথা আছে ভাষা ॥২

মন ভেবেছ কপট্ ভক্তি, কোরে পূরাইবে আশা।
লবে কড়ার কড়া, তস্য কড়া, এড়াবেনা রতি মাসা॥৩
প্রসাদের মন্ হও যদি মন্, কর্ম্মে কেন হওরে চাসা।
ওরে মতন্ মতন্, কর যতন্, রতন্ পাবে অতি খাসা॥৪"

এই প্রকার কত চমৎকার চমৎকার বিষয় আছে যাহার বর্ণনা করিতে হইলে অত্যন্ত বাহুল্য হইয়া উঠে। এক দিবস দিবাভাগে কবিরঞ্জন কুলক্রিয়া সমাধা করত কুমারহট্টের বলরাম তর্কভূষণ নামক বিখ্যাত তার্কিক পণ্ডিতের টোলের সম্মুখ দিয়া গমন করিতেছিলেন, উক্ত অভিমানি পণ্ডিত তাঁহাকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিয়াছিলেন "দেখ দেখ মাতালব্যাটা যাইতেছে" তৎকালে তৎস্থানে অনেক সম্রান্ত বিদ্বান্ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা তটস্থ হইয়া দশনাগ্রে রসনা বিস্তার পূর্ব্বক বলিলেন "ভট্টাচার্য মহাশয় কি করিলেন! রামপ্রসাদ সেন অতি সাধু ব্যক্তি, তাহাকে মাতাল বলিয়া উপহাস করিলেন?" এই কথা কহিতে না কহিতেই রামপ্রসাদ সেন হাস্যবদনে ও তার্কিক ভট্টাচার্য! কি বলিতেছ? এই বলিয়াই গান ধরিলেন।

যথা।

"রসনে কালী রটরে।
মৃত্যুরূপা নিতান্ত ধরেছে জটরে॥
কালী যার হৃদে জাগে, তর্ক তার কোথা লাগে, কেবল বাদার্থ মাত্র, ঘট পটরে।১
রসনারে কর বশ, শ্যামানামামৃত রস, গান কর, পান কর, পাত্র বটরে॥২
সুধাময় কালী নাম কেবল কৈবল্য ধাম, করে জপনা কালীর নাম,
কি উৎকটরে।৩
শ্রুতি রাখ সত্ব গুণে, অন্য নাম নাহি শুনে, প্রসাদ বলে দোহাই দিয়া,
শিবে কঠোরে॥৪"

তথা।

"সুরা পান করিনেরে।
সুধা খাই কুতূহলে॥
আমার মন্ মাতালে মেতেছে আজ, মদ্ মাতালে মাতাল বলে।"

আহা এইস্থলে রামপ্রসাদ সেন কি বিচিত্র কবিত্ব, পাণ্ডিত্য, ও পরমার্থ রসের রসিকতা প্রকাশ করিয়াছেন! বোধ করি জগদীশ্বর এবম্ভূত অদ্ভুত ক্ষমতা অপর কাহাকেই প্রদান করেন নাই, প্রসাদ কেবল একাই তাঁহার

যথার্থ প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দৈবশক্তি দেবী অনবরতই ইহার কণ্ঠে জাগ্রতাবস্থায় বিহার পূর্ব্বক নৃত্য করিতেন, ক্ষণমাত্র নিদ্রিতা ছিলেন না, নচেৎ এবম্প্রকার অসাধারণ ব্যাপার ঘটনার সম্ভাবনা কি প্রকারে হইতে পারে।

রামপ্রসাদ সেন চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিবস কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে চড়ক দেখিতে গিয়াছিলেন, যখন চড়কী দেপাক্, দেপাক্, বলিয়া চড়ক গাছে ঘুরিতেছে, তখন কেহ কেহ কহিলেন "সেন মহাশয় দেখ কেমন সুন্দর ঘুরিতেছে" প্রসাদ তাহাতে হাস্য পূর্ব্বক উত্তর করিলেন "ভাই। এ কি এক সামান্য চড়ক্ দেখাইতেছ, আমি দিবা নিশি যে চড়কে ঘুরিতেছি তাহার নিকট এ চড়ক কোথায় লাগে!" তাঁহারা কহিলেন সে কিরূপ চড়ক ভাই, তচ্ছ্রবণে তৎক্ষণাৎ সহস্র ব্যক্তির সাক্ষাতে মুক্তকণ্ঠে এই গান ধরিলেন।

যথা।

"ওরে মন্ চড়কী, ভ্রমণ কর, এ ঘোর সংসারে।
মহা যোগেন্দ্র কৌতুকে হাসে, না চিন তাহারে॥
যুগল স্বয়ম্ভু শম্ভু, যুবতীর উরে। মনরে,
ওরে কর পঞ্চ বিল্বদলে, পূজিছ তাহারে।১
ঘরেতে যুবতীর বাক্, গাজনে বাজিছে ঢাক্। মনরে,
ওরে, বৃন্দাবলী, খ্যাম্‌টা চালী, বাজায় নানা সুরে॥২॥
কাম দীর্ঘ তাড়ায় চোড়ে, ভাংলে পাঁজর পাটে পোড়ে। মনরে,
ওরে যাতনা কোরেছ তুচ্ছ, ধন্যরে তোমারে॥৩॥
দীর্ঘ আশা চড়ক্ গাছ, বেছে নিলে বাছের বাছ। মনরে,
ওরে মায়া-ডোরে বড়্শী গাঁথা, স্নেহ বল যারে॥৪॥
প্রসাদ বলে বারবার, অসারে জন্মিবে সার। মনরে,
ওরে শিঙে ফুকে শিঙে পাবি, ডাকো কেলে মারে॥৫॥"

এই প্রেমভক্তি পরিপূরিত পীযূষময় সাধু সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া তৎকালে সকলেই সাধু সাধু সাধু শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক মোহিত হইলেন। আহা! এই স্থলে তাঁহারদিগেরই সাধু সাধু সাধু বলিয়াই সাধুবাদ প্রদান করিব যাঁহারা সাধু সাধক সেনের সুধাধার বদন বিনির্গত সঙ্গীত সুধা পান করত তৃপ্তচিত্ত হইয়াছিলেন। অপিচ কি পরিতাপ! আমরা ঐ সুখময় অদ্ভুত ভূতকালে ভূতরূপে উক্ত মহাত্মার অলৌকিক কার্য্য সকল সাক্ষাতে দর্শন করিতে পারি নাই। সেই কাল প্রকৃত সত্যকালের ন্যায় কাল ছিল; যদিও এই কাল সেই

কালি বটে, তথাচ এ কালের সহিত সে কালের তুলনা কোনমতেই হইতে পারে না, কারণ এ কাল কি কাল এবং কোন্ কালে কোন্ কালের [৫] সঙ্গে এই কালের উপমা হইবে তাহারো নিশ্চয়তা করা দুঃসাধ্য হইতেছে। আমরা যে কালে মনুষ্য রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি সে কাল আমারদিগের পক্ষে কাল স্বরূপ হইয়াছে। এই কাল রাজার পক্ষে পক্ষ হইয়া কালোর দেশের আলো নির্ব্বাণ করিয়াছে। সে স্বাধীনতা কোথা? সে সুখ কোথা? সে ধর্ম্ম কোথা? সে কর্ম্ম কোথা? সে বিদ্যা কোথা? সে চালনা কোথা? সে পাণ্ডিত্য কোথা? সে কবিত্ব কোথা? সে সমাদর কোথা? সে সম্মান কোথা? এবং সে উৎসাহ ও অনুরাগই বা কোথা? স্বাধীনতা সংহারের সঙ্গে সঙ্গেই কাল সমস্ত উদরস্থ করিয়াছেন। আমরা অধুনা রঘুকুলতিলক ভগবান্ রামচন্দ্রের কথা উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না। দ্বারকাধিপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং হস্তিনাধিপতি পাণ্ডুকুল প্রদীপ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রসঙ্গ করিতে চাহি না। নবরত্ন সভার অধীশ্বর মহারত্ন বিক্রমাদিত্যের নাম উচ্চারণ করিব না, কেবল নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়কেই স্মরণ করিতেছি। ঐ সময়ে যে যে ব্যাপার হইয়াছিল বর্ত্তমান কালে তাহার শতাংশের একাংশ থাকিলেও কত সুখের ব্যাপার হইত। উক্ত মহারাজ নানা শাস্ত্রালঙ্কৃত পণ্ডিত ও সজ্জনের হৃদয়পদ্ম-প্রকাশকারি রবি স্বরূপ কবিগণকে সাতিশয় সমাদর করিতেন, গৌরব পূর্ব্বক গুণের পরীক্ষা করিয়া উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ সর্ব্বদাই পারিতোষিক ও বৃত্তি প্রদান করিতেন। তৎসমকালে এই বঙ্গদেশে যে সকল ধনাঢ্য ভূম্যধিকারি মহাশয়েরা সজীব ছিলেন তাঁহারাও তাঁহার দৃষ্টান্তানুসারে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিতেন, অর্থাৎ তাবতেই পণ্ডিত ও কবিদিগ্যে যথাসাধ্য সম্ভব মত সাহায্য করত সম্যক্ প্রকারেই অনুরাগের পথ পরিষ্কৃত করিতেন। এই কালে সেই কালের চিহ্ন কিছুই নাই। এইক্ষণেও অনেক সুপণ্ডিত ও সুকবি হইতেছেন, কিন্তু কি আক্ষেপ! কেহই তাঁহারদিগ্যে আদর করেন না, উৎসাহ দেন না, গুণের পুরস্কার করা দূরে থাকুক্, একবার আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসাও করেন না। অধ্যাপক পণ্ডিতেরা কোনরূপ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিলে এবং কোন কবি কবিত্ব দর্শাইলে যত্ন পূর্ব্বক তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করা চুলায় পড়ুক, বরং বিপরীত ভাবে হাস্য পরিহাস করিয়া সেই সকল প্রকৃষ্ট পদার্থকে রসাতলে নিক্ষেপ করেন। সংপ্রতি দেশ কাল পাত্র সকলি সমান হইয়াছে, সুতরাং যথার্থরূপে গুণের সৌরভ ও গুণির গৌরব প্রকাশ হইতে

পারে না। জগদীশ্বর যাঁহারদিগ্যে ধনি করিয়াছেন তাঁহারদিগের মধ্যে অত্যল্প মহাশয় ব্যতীত প্রায় তাবতেরি ধনি বলিয়া কেবল এক ধ্বনি মাত্র রহিয়াছে, ধনির কার্য্য প্রায় কাহারো নাই, শুদ্ধ ধনীর কর্ম্মই দেখিতে পাই। শাস্ত্রালাপ একেবারে লোপ হইয়া গেল, অধিকাংশ মহাশয় শুদ্ধ অলীকামোদে কাল হরণ করিতেছেন। প্রাচীন বা আধুনিক সুকাব্য লইয়া আমোদ করা অভ্যাস নাই, যেহেতু তাহার বিন্দুমাত্র বুঝিতে পারেন না, মনে বড় উল্লাস হইলে এক রাত্রি বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া যাত্রা দিয়া বসিলেন, যাত্রাওয়ালা "ফেলুয়া, ভুলুয়া" সং আনিয়া উপস্থিত করিল, তাহারা বহুবিধ অঙ্গ ভঙ্গি ও রঙ্গ ভঙ্গ করিয়া গীত ধরিল।

"কেন নবীব ডাক্‌ছ আমারে।
আমি হাজির আছি হুজুরে॥
কাঁহে বোলাতো হোঁ। কেঁই কেঁই কেঁই। এং এং এং॥"

বাবুরা এই প্রকার সং, ঢং, রং দেখিয়া ও টং শুনিয়া আহ্লাদে আপনারাই জং বাহাদুর সাজিয়া বসেন।

পরে মালিনী আসিয়া গান ধরিল।

"ব্যাটা বল কেটা তোর মাসি।
মাসী মাসী বোলে আমার গলায় দিলি ফাঁসি॥"

তথা।

"শাক্ দিয়ে মাচ্ ঢাকো তুমি, সে সব
কথা জানি আমি, ওলো মালিনী।"

এইরূপ গীতে আহ্লাদিত হইয়া পেলা দিবার কত ধূম পড়িয়া যায়।

কোন ক্ষমতাবান পুরুষ অনেক সম্ভাবিত সৎকর্ম্মে বঞ্চিত হইয়া গঙ্গা যাত্রার সময়ে এক সখের যাত্রা করিলেন।

যথা।

"ধোবানীকে এক্‌লা, রেখে যেতে পারিনে"

যেমন দেবতা তেমনি নৈবেদ্য, অধুনা যেমন সময় তেমনি রসিক ও তেমনি গীত হইয়াছে।

তথা।

"প্রাণনাথ এসেছ ক্ষণিক বসো চেঁক্লে।
আমি প্রাণ যোড়া আছি হ্যাক্লেলে।"

মনেতে করেছ বঁধু কেলে পালাব, পায়ে শিকলি লাগাব, আঁকা বাঁকা কোরে পানের খিলি বানাব, প্রাণনাথকে খাওয়াব, আর তোমায় আমায় কর্ব্ব মজা নিজপতি ঘুম্-গেলে ॥"

কি করা যায়? সকলি কালের ধর্ম্ম, সকলি কালের কর্ম্ম, এই কালের মর্ম্ম বুঝিয়া যিনি শর্ম্ম-গ্রাহী হইতে পারিলেন এই জগতে তিনিই ধন্য হইলেন। সংপ্রতি সর্ব্বত্রই শুদ্ধ ছলের বাজার ও খলের বাজার বসিয়াছে, কোন খানেই একখানা ফলের দোকান দেখিতে পাই না। যেখানে সেখানে কেবল দলের আঁটাআঁটি, বলের আঁটাআঁটি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া এবং হতাদর হইয়া পণ্ডিত ও গুণিলোকেরা আপনারাই অভিমানে মনে মনে ম্লান হইতেছেন। যে দেশের লো-[৬]কেরা বস্ত্র পরিধান করে না সে দেশে রজকের অন্ন কখনই হইতে পারে না, গুণগ্রাহি না থাকিলে গুণের বিচার কে করে? যদি ভাগ্যধরেরা এ পক্ষে কিঞ্চিৎ অনুরাগি ও মনোযোগি হয়েন তবে এ পরাধীন অবস্থাতেও দেশের এত দুরবস্থা হয় না; অনায়াসেই সর্ব্বতোভাবে সুখ সৌভাগ্যের আধিক্য হইতে পারে। কর্ত্তারা তাহা না করিয়া "মোসাহেব" নামধারি কতকগুলীন চমৎকারচিত্ত অবতারদিগ্যে আদর পূর্ব্বক পূজা করিয়া থাকেন, সেই মা-লক্ষ্মীর বরযাত্র মহাপাত্র মহাশয়দিগের মহিমার কথা বর্ণনা করিতে হইলে লেখনীর মুখ আড়ষ্ট হইয়া যায়। তাঁহারা না পারেন ও না করেন এমন কর্ম্মই নাই। আহা! যখন আমরা কোন ধনির সভায় গমন করিয়া তাঁহার সভাসদ ও পারিষদ সকলকে বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা, শীলতা, সৌজন্য প্রভৃতি সমুদয় গুণসম্পন্ন দেখিতে পাই তখন আমারদিগের অন্তঃকরণ কত আহ্লাদে স্ফীত হইতে থাকে, আমরা কত সুখি হইয়া সৌভাগ্য স্বীকার করিতে থাকি। যদি প্রত্যেক্ স্থানেই এইরূপ দেখিতে পাই তবে আর সুখের পরিসীমা থাকে না, এককালেই দুঃখের অবসান হইয়া যায়। কিন্তু আমারদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্গদেশে এরূপ সুখের স্থল অতি বিরল। দুই এক স্থানে এতদ্রূপ সংকর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত প্রায় সর্ব্বত্রই কেবল সংকার্য্যের সংকার্য্যই দেখিতে পাই। যাহা-হউক, এই স্থলে এ বিষয়ে আর প্রস্তাব বাহুল্য করণের প্রয়োজন করে না, যে এক সদ্বিষয়ে লেখনী ধারণ করিয়াছি তাহারি আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইলাম, সকলে নয়নান্তপাত করুন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের সভায় যদিও সর্ব্ব শাস্ত্রজ্ঞ বুধ গণ ও ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর প্রভৃতি কবি ও অন্যান্য বিষয়ের অনেক গুণিলোক

নিয়তই অবস্থান করিতেন ; যদিও ইঁহারা নিজ নিজ গুণাংশে স্ব স্ব প্রধান ছিলেন, তথাচ তিনি কুমারহট্ট নিবাসি বৈদ্যকুলোদ্ভব এই রামপ্রসাদ সেনের প্রণীত পদ, কালীকীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন এবং বিদ্যাসুন্দরের কবিতা সকল লোক-মুখে শ্রবণ করত অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন, এবং ইঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য করিতেন। "বলা ফেণ-চাটা" নামক একজন কীর্ত্তনওয়ালা রামপ্রসাদি কালীকীর্ত্তন গান করিত, ঐ ফেণ-চাটা এক দিবস কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে গিয়া কালীকীর্ত্তন গান করিয়া মধু-বর্ষণ করত সকলের চিত্ত হরণ করিল, রাজা সেই গানে পুলকিত হইয়া কীর্ত্তনকারিকে কহিলেন, "বলরাম! এত দিন তোমার নাম ফেণ-চাটা ছিল, এইক্ষণে আমি তোমার নাম মধু-চাটা রাখিলাম।" এতদ্রূপ রাজপ্রসাদে প্রফুল্ল হইয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক বলরাম কহিল "মহারাজ! আমি কৃতার্থ হইলাম, ফলে আক্ষেপ এই যে আপনি রাজা হইয়া আমার ফেণ ঘুচাইয়া দিলেন, চাটাটুকু ঘুচাইতে পারিলেন না।" রাজা গায়কের এই উক্তিতে প্রসন্ন হইয়া তখনি তাহাকে উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান করিলেন। পরন্তু নবদ্বীপাধিপতির মনে এরূপ ইচ্ছা হইল যে, রামপ্রসাদ তাঁহার অধীন হইয়া নিরন্তর নিকটে থাকেন, কিন্তু সে মনোরথ পূর্ণ করিতে পারেন নাই, কারণ তৎকালে রামপ্রসাদের মন অধীনতা ও বিষয়-বাসনা হইতে এককালেই বিরত হইয়াছিল। ঐ সময়ে রামপ্রসাদ সেনের প্রতি ও তাঁহার কবিতার প্রতি মহারাজের এতদ্রূপ প্রীতি জন্মিল যে তিনি মধ্যে মধ্যে হালিশহরে স্বয়ং আসিয়া নিজস্থাপিত কাছারী বাটীতে কিছুদিন প্রবাস করত রামপ্রসাদ সেনকে আহ্বান করিয়া প্রচুরতর প্রযত্ন পুরঃসর তাঁহার কবিতা সকল শ্রবণ করিতেন এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কবিরঞ্জন অভিধান দান করিয়াছিলেন। কবিরঞ্জন রাজ-কৃপায় কবিরঞ্জন উপাধি পাইয়া নিজ বিরচিত বিদ্যাসুন্দরের নাম "কবিরঞ্জন" রাখিলেন। ইহাতেই স্পষ্টরূপে প্রমাণ হইতেছে মহারাজ রামপ্রসাদি বিদ্যাসুন্দর দৃষ্টি করিয়া ভারতচন্দ্রের প্রতি বিদ্যাসুন্দর রচনার আদেশ করিয়াছিলেন, রাজাজ্ঞায় ভারতচন্দ্র যে বিদ্যাসুন্দর প্ররচনা করেন, তাহা সমুদয় রাজ পণ্ডিত কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়াছিল, একারণ তাহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়াছে। রামপ্রসাদ সেন দুঃখী ছিলেন এবং রচনাকালে কোন ব্যক্তির আনুকূল্য প্রাপ্ত হয়েন নাই, আপনার মনে যেমন উদয় হইয়াছিল, তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন, সুতরাং ভারতচন্দ্রি বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় তাঁহার বিদ্যাসুন্দর সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর না হইতে পারে, ফলে তিনি কবিরঞ্জনের এক

এক স্থলে এমত সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন যাহা ভারতচন্দ্রী রচনার অপেক্ষা অনেক অংশেই উৎকৃষ্ট, বিশেষতঃ যেখানে পরমার্থ প্রসঙ্গ এবং কালী নামের গন্ধ পাইয়াছিলেন সেই সেই স্থানে রচনার শেষ করিয়া ভুলিয়াছিলেন। এই মহাশয় যে কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন রচনা করিয়াছেন তাহা বিদ্যাসুন্দরের অপেক্ষা অনেক উত্তম, ফলে তাঁহার পদ সর্ব্বাপেক্ষাই উৎকৃষ্ট, উৎকৃষ্টের উপর উৎকৃষ্ট, তেমন উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। পূর্ব্বে রামপ্রসাদি পদ সম্বল করত ব্যবসায় দ্বারা কত লোক কত সৌভাগ্য সঞ্চয় করিয়াছে এবং এই ক্ষণেও কত মনুষ্য এই উপলক্ষে ভিক্ষা করিয়া সমূহ সুখে দিনপাত [৭] করিতেছে তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। বোধ করি রামপ্রসাদি পদ অদ্যাপি লক্ষ লোকের উপজীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, গায়কের অভাবে ইদানীং কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহার রাগ সুরের উপদেশ করে এইক্ষণে এমন লোক কেহই নাই, যদি কোন গুণিব্যক্তি আপনি রাগ সুর প্রস্তুত করিয়া গান করাইতে পারেন তবে একটা উত্তম কীর্ত্তি স্থাপন করা হয়।

পূর্ব্বঅঞ্চলে রামপ্রসাদি কবিতা অনেক প্রচারিত আছে, সে সকল পদ্য এখানে প্রচার নাই। ঢাকা, সেরাজগঞ্জ, ও পাবনা প্রদেশের নাবিকেরা সর্ব্বদাই তাহা গান করিয়া থাকে, সে বিষয়ে তাহারদিগের এত ভক্তি যে যখন অস্নাত থাকে তখন মুখাগ্রে উচ্চারণ করে না। কহে "বাসিকাপড়ে রামপ্রসাদের গান গাহিলে নরকে যাইতে হইবেক।"

বাঙ্গালা ১১৬৫ সালে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় ১৪/ চৌদ্দ বিঘা ভূমি রামপ্রসাদ সেনকে নিষ্করৰূপে প্রদান করেন, তাহার সনন্দপত্রে লিখিত আছে "গরআবাদী জঙ্গল ভূমি আবাদ করিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে থাক।" পরন্তু তাহাতে রাজার মোহর ও নাম স্বাক্ষরিত আছে, ঐ ভূমি কুমারহট্টের অতি নিকটেই।

রাজা যখন কুমারহট্টে আসিতেন তখন রামপ্রসাদ সেন এবং অজু গোঁসাইকে একত্র করিয়া উভয়ের সঙ্গীত যুদ্ধের কৌতুক দেখিতেন। রামপ্রসাদ সেন কবীন্দ্র ছিলেন, অজু গোঁসাই আদ্‌-পাগ্‌লা ছিলেন, কিন্তু মুখে মুখে রহস্য কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। রামপ্রসাদ সেন জ্ঞানভক্তি বিষয়ে পদ বিন্যাস করিতেন, ইনি তখনি রহস্য ছলে তাহারি উত্তর করিতেন।

এক দিবস রাজ সমীপে রামপ্রসাদ গান করিলেন।

"এই সংসার ধোঁকার টাটি।
ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি॥
ওরে ক্ষিতি বহ্নি বায়ু জল, শূন্যে এত পরিপাটি।
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা, অহঙ্কারে লক্ষ কোটি॥
যেমন্ শরাব্ জলে সূর্য্য ছায়া, অভাবেতে স্বভাব যিটি॥১
গর্ভে যখন্ যোগ তখন্, ভূমে পোড়ে খেলেম্ মাটি।
ওরে, ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, দড়ির্ বেড়ি কিসে কাটি॥২
রমণী বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটী।
আগে ইচ্ছা সুখে পান্ কোরে, বিষের জ্বালায় ছট্‌ফটি॥৩
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে আদি পুরুষের আদি মেয়েটী।
ওমা, যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, মা তুমি পাষাণের বেটী॥৪"

অজু গোঁসাই শ্রুতমাত্রেই ইহার উত্তর করিলেন।

"এই সংসার রসের কুটি।
খাইদাই বাজক্ষে বোসে মজা লুটি॥
ওহে সেন্ নাহি জ্ঞান, বুঝ তুমি মোটামুটি।
ওরে ভাই বন্ধু দারা সুত, পিঁড়ি-পেতে দেয় দুধের বাটী॥"

কবিরঞ্জন গান করিলেন।

"আয় মন্ বেড়াতে যাবি।
কালীকল্পতরু তলেরে মন চারি ফল কুড়ায়ে খাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক্ নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র, তত্ত্ব কথা তায় সুধাবি॥১
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর পিতা মাতায় তাড়্য়ে দিবি॥
যদি মোহ গর্ত্তে টেনে লয়, ধৈর্য্য খোঁটা ধোরে রবি।২
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ হাড়ে বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ তবে, জ্ঞান-খড়্গে বলি দিবি॥৩
প্রথম ভার্য্যের সন্তানেরে দূরে হোতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞান-সিন্ধু মাঝে ডুবাইবি॥
প্রসাদ বলে এমন হোলে, কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর মনের মত মন হবি॥৪"

গোঁসাইজী ইহার উত্তর করিলেন।

"বোলেছে রামপ্রসাদ কবি।
আয় মন্ বেড়াতে যাবি॥
তার কথায় কোথাও যেওনারে।
সাধকের মনের ভাব সে কি জানেরে॥"

রামপ্রসাদ সেন কালীকীর্ত্তনে একাম্রকাননে ভগবতীর গোচারণ প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন।

"গিরিশ-গৃহিণী গৌরী, গোপ-বধূ বেশ।
কষিত কাঞ্চন কান্তি, প্রথম বয়েস॥
সুরভীর পরিবার, সহস্রেক ধেনু।
পাতাল হইতে উঠে, শুনে মার বেণু॥
জগদম্বারে, যব পূরে বেণু। যব পূরে বেণু,
ধায় বৎস ধেনু। উড়ে পদ রেণু। রেণু
ঢাকে ভানু। ভাবে ভোর তনু।" ইত্যাদি।

গোস্বামী ইহার উত্তর দিলেন।

"না জানে পরম তত্ত্ব, কাঁটালের আমসত্ত্ব,
মেয়ে হোয়ে ধেনু কি চরায় রে।
তা যদি হইত, যশোদা যাইত,
গোপালে কি পাঠায় রে॥"

রামপ্রসাদ সেন কহিলেন।

"কর্ম্মের ঘাট্, তেলের কাট্, আর পাগলের ছাট্, যোলেও যায় না।"

অজু গোঁসাই তখনি উত্তর দিলেন।

"কর্ম্ম ডোর, স্বভাব চোর, আর মদের ঘোর মোলেও যায় না।"

রামপ্রসাদ কহিলেন।

"শ্যামাভাবসাগরে ডোবোরে মন, কেন আর বেড়াও ভেসে।"

গোঁসাই উত্তর দিলেন।

"একে তোমার কোপো নাড়ী।
ডুব্ দিওনা বাড়াবাড়ী॥
হোলে পরে জর জাড়ি।
যেতে হবে যমের বাড়ী॥"

[৮] এই সমস্ত কবিতা পাঠে পাঠকগণ সেনজী ও গোঁসাইজীর বিদ্যা ও গুণের তারতম্য বিবেচনা করিবেন।

মহারাজ রামপ্রসাদকে ভূমি দান করিয়া কিছুদিন পরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন সেনজী, সে ভূমি ভালরূপে আবাদ করিয়াছ কি না?"

প্রসাদ তাহার উত্তর ছলে এই গান গাহিলেন।

যথা।

"তারার জমী আমার দেহ, ইথে কি আর আপদ্ আছে।
ওযে, দেবের দেব, সুকৃষাণ হোয়ে, মহা মন্ত্রে বীজ্ বুনেছে॥
ধৈর্য্য খোঁটা ধর্ম্ম বেড়া, এ দেহের চৌদিক্ ঘেরেছে।
এখন কাল চোরে কি কর্ত্তে পারে, মহাকাল রক্ষক্ রোয়েছে॥ ১
দেখে শুনে ছটা বলদ্ ঘরে হোতে বার হোয়েছে।
কালীনাম্ অস্ত্রের তীক্ষ্ণ ধারে, পাপ তৃণ সব কেটেছে॥ ২
প্রেমভক্তি সুবৃষ্টি তায় অহর্নিশি বর্ষিতেছে।
কালীকল্পতরু বরে, রে ভাই, চতুবর্গ ফল ধোরেছে॥৩"

রামপ্রসাদ সেনের অবস্থা ভেদের পদ্য সকল অতি চমৎকার, ইনি ক্রিয়া কাণ্ড কিছুই মান্য করিতেন না, ইঁহার সকল অবস্থার কবিতার দ্বারাই তাহার বিশিষ্টরূপ প্রমাণ হইয়াছে। ইনি তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ ছিলেন, ফলভোগ বিরাগী হইয়া সুপবিত্র প্রীতিচিত্তে গীত ছলে পরম পূজ্য পরমেশ্বরের পূজা করিতেন। রামপ্রসাদি পদের অধিকাংশই জ্ঞানযুক্ত প্রেমভক্তি-রসে পরিপূরিত। নিরাকার-বাদিরা "ব্রহ্ম" শব্দ উল্লেখ পূর্ব্বক যাঁহার উপাসনা করেন ইনি কালী নাম উচ্চারণ করত তাঁহারি আরাধনা ও উপাসনা করিতেন, ইহাতে পুরুষ আর প্রকৃতি অথবা পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরী এই নামান্তর জন্য ভাব, রস, ভক্তি, প্রেম এবং জ্ঞানগত বৈলক্ষণ্য কিছুই হইতে পারে না, কারণ উভয় পক্ষেরি উদ্দেশ্য এক এবং যথার্থ পক্ষে উভয়েরি মর্ম্ম ও অভিপ্রায় এক হইতেছে।

রামপ্রসাদ সেনের শক্তি ভক্তি বিষয়ক উক্তি সকল শুনিয়া সকলেই তাঁহাকে কালীর বরপুত্র বলিয়া বাচ্য করিতেন, এবং তৎকালে তাবতেই বলিতেন "অন্নপূর্ণা" প্রতি দিবসই কাশী হইতে আসিয়া তাঁহার শিয়রে বসিয়া কথা কহিতেন, স্বপ্ন দিতেন আর কন্যার বেশ ধরিয়া গান শুনিতেন, রন্ধন করিয়া দিতেন, এ বিষয়ে অপর একটা অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক কথা রাষ্ট্র আছে। যথা,

"এক দিবস রামপ্রসাদ সেন বাটীর বেড়া বন্ধনের জন্য দড়ি, বাঁশ, বাঁকারি

প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ঘরামীর অন্বেষণে গমন করিয়াছিলেন, ক্ষণকালের পরেই ঘরামী লইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দেখিলেন, বাঁশ, বাঁকারি, দড়ি প্রভৃতি আপনারাই যথা স্থানে সংলগ্ন হইয়া বেড়া বদ্ধ করিয়াছে। ইহাতে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাসি ও গ্রামবাসিগণের মধ্যে কোলাহল শব্দ ঘোষণা হইয়া উঠিল "যে, কাশীপুরেশ্বরী অন্নদা স্বয়ং আসিয়া রামপ্রসাদ সেনের বেড়া বাঁধিয়া দিয়াছেন।" এই প্রকার চমৎকার চমৎকার ব্যাপার ঘটিত জনরব কত আছে যাহার বর্ণনা করিতে হইলে একখানা পুস্তক ভিন্ন কোন মতেই নিষ্পন্ন হইতে পারে না। এই সকল ঘোষণা প্রসাদ স্বয়ং কখনই করেন নাই, কেননা তাহা হইলে তাঁহার অসীম রচনার কোন স্থানে না কোন স্থানে অবশ্যই ইহার কোন কথা উল্লেখ থাকিত।

অপিচ এমত জনরব যে কবিরঞ্জন একলক্ষ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এ বিষয়ে অপর কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই, কেবল তাঁহার প্রণীত একটী পদ সাক্ষি স্বরূপ হইয়া সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

যথা।

"জানিলাম বিষম বড়, শ্যামা মায়েরি দরবার রে।
ফুকারে ফরেদি দাদী, না হয় সঞ্চার রে॥
আরজ্‌বেগী যার শিবে, সে দরবারের ভাস্ত কিবে, মাগো।
ওমা, দেওয়ান্ দেওনা নিজে, আস্তা কি কথার রে।১
লাক্ উকীল করেছি খাড়া, সাধ্য কি মা ইহার বাড়া, মাগো।
তোমায় তারা ডাকে আমি ডাকি, কাণ নাই বুঝি মার রে॥২
গালাগালি দিয়ে বলি, কাণ খেয়ে হোয়েছ কালী, মাগো।
রামপ্রসাদ্ বলে প্রাণকালী, করিলে আমার রে॥৩"

রামপ্রসাদ সেন লক্ষ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন ইহা নিতান্ত অসম্ভব নহে, অনেকাংশে সম্ভাবনার যোগ্য বটে, কারণ বাল্যকাল হইতে মৃত্যুর দিবস পর্য্যন্ত পদ বিন্যাসে বিরত হয়েন নাই। মনে যাহা উদয় হইয়াছে তাহারি কবিতা করিয়াছেন। কবিরঞ্জন, কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, এই তিনখানি গ্রন্থ কেবল লিখিত হইয়াছিল, আর কিছুই লিপিবদ্ধ ছিল না। পূর্ব্বে দুই একটা করিয়া অভ্যাস করত সংগ্রহ পূর্ব্বক যিনি যাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহারি নিকট তাহাই ছিল, এইক্ষণে তাহাও প্রায় লোপ হইয়া গিয়াছে, কারণ পূর্ব্বকালের লোকেরা ইষ্ট মন্ত্রের ন্যায় গোপন করিয়া যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিতেন,

প্রাণান্ত হইলেও কাহাকে দেখিতে দিতেন না, আহ্নিক পূজা করণ কালে সেই পুঁতির উপর ফুল চন্দন প্রদান করিতেন, অধুনাও দুই এক মহাশয় ঐ প্রকার করিয়া থাকেন, আমরা সর্ব্বস্ব স্বীকার করিয়াও তাঁহারদিগের নিকট হইতে সেই পদাবলী প্রাপ্ত হইতে পারি নাই। এইরূপ গোপনেই সর্ব্ব-[৯] নাশ ঘটিয়াছে। কীটের আঘাতে ও ভূতের দৌরাত্ম্যে সমুদয় বিনষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ পোকায় কাটিয়াছে, জলে ও সর্দ্দিতে পচিয়াছে এবং আগুনে পুড়িয়াছে, যেমন ক্লীব ব্যক্তি স্বরূপসী কামিনী ক্রোড়ে পাইলে না আপনিই ভোগ করিতে পারে, না প্রাণ থাকিতে অন্যকেই দিতে পারে, এ বিষয়ের গোপনকারি মহাশয়েরা অবিকল তদনুরূপ করিয়া রামপ্রসাদি কীর্ত্তিকে এককালে উচ্ছন্ন দিলেন।

পঞ্চবিংশতি বৎসর অতীত হইল আমরা রামপ্রসাদি পদ্য সংগ্রহ করণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, একালপর্য্যন্ত প্রাণপণ করিয়াও তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই, যেখানে যাহা প্রাপ্ত হই তাহাতেই এক একখানা বিড়ম্বনা দেখিতে পাই। হয় মাঝে মাঝে পোকায় কাটিয়াছে, নয় লেখকেরা লেখার দোষে প্রমাদ করিয়াছেন, ইহাতেই ভাবার্থ স্থাপন করণে ঘোরতর বিপদ ঘটিতেছে। এই স্থলে বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করি, সংপ্রতি যে যে মহাশয়ের নিকট এই মহাবস্তু আছে তাঁহারা যেন আর যক্ষের ন্যায় বক্ষে করিয়া রক্ষে না করেন, অবিলম্বেই অস্মদাদির যন্ত্রালয়ে প্রেরণ করিবেন, আমরা সানন্দে সাদরে তাহা মুদ্রাঙ্কন করত সর্ব্বত্র ব্যক্ত করিব, তদ্দ্বারা এই দেশের কত উপকার হইবেক তাহা অনির্ব্বচনীয়, যদিও আমরা অনেক কষ্টে অনেক হস্তগত করিয়াছি তথাচ আর দুই এক খানা প্রাপ্ত হইলে পরস্পর ঐক্য করত মনের সংশয় ছেদন করিতে পারি।

৬০ বৎসর বয়সের কিঞ্চিৎ পরেই রামপ্রসাদ সেন মায়িক সংসার পরিহার পূর্ব্বক নিত্যধামে যাত্রা করেন। তাঁহার মৃত্যুর দিন গণনা করিলে ৭২ বৎসরের অধিক হইবেক না। প্রাচীন লোকেরা কহেন "তিনি শ্যামা প্রতিমা বিসর্জ্জন সময়ে পরিজন স্বজন বান্ধব সকলকে কহিলেন, অদ্য মায়ের বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই আমার বিসর্জ্জন হইবে, অতএব তোমরা সকলে প্রতিমা লইয়া আমার সঙ্গে আইস, আমি পদব্রজে চলিলাম। এই বলিয়া বহুলোক সমভিব্যাহারে জাহ্নবী-তটে গান করিতে করিতে আইলেন" ত্রিদশতরঙ্গিণীতীরে যতক্ষণ জীবিত ছিলেন ততক্ষণ অতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ভক্তিরসের বিদায়ি পদ অনেক

গুলীন রচনা করিয়াছিলেন, গঙ্গাযাত্রার সময়ে পথিমধ্যে যে কয়েকটা গান করেন তাহার একটা গান এই।

যথা।

কালীগুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে,
এ তনু তরণি ত্বরা করি চল বেয়ে।
ভবের ভাবনা কিবা মনকে কর নেয়ে॥
দক্ষিণ বাতাস মূল, পৃষ্ঠ দেশে অনুকূল,
অনায়াসে পাবে কূল, কাল রবে চেয়ে॥১
শিব নহে মিথ্যাবাদী, আজ্ঞাকারি অনিমাদি,
প্রসাদ বলে প্রতিবাদী, পলাইবে ধেয়ে॥২

তথা।

বল্ দেখি ভাই কি হয় মোলে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে॥

কেউ বলে ভূত প্রেত হবি, কেউ বলে তুই স্বর্গে যাবি, কেউ বলে সালোক্য পাবি, কেউ বলে সাযুজ্য মেলে॥১

বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে।
ওরে শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য, মান্য কোরে সব্ খোয়ালে॥২
প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই, তাই হবিরে নিদান কালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, লয় হোয়ে সে মিশায় জলে॥৩

তীরে নীরে শরীর স্থাপন করত এই গান করিলেন।

যথা।

নিতান্ত যাবে দীন, এ দিন যাবে, কেবল ঘোষণা রবে গো।
তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো॥
এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট কোরে বোসেছি ঘাটে,
ওমা শ্রীসূর্য্য বসিল পাটে,নেয়ে লবে গো॥১

দশের ভরা ভোরে লায় দুঃখি জনে ফেলে যায়, ওমা তার ঠাঁই যে কড়ি চায়, সে কোথা পাবে গো॥২

প্রসাদ বলে পাষাণ্ মেয়ে, আসান্ দে মা ফিরে চেয়ে আমি ভাসান্ দিলাম গুণ গেয়ে, ভবার্ণবে গো॥৩

এরূপ প্রবাদ আছে যে নিম্নলিখিত গান করিয়াই তাঁহার মৃত্যু হইল।

যথা।

তারা, তোমার আর কি মনে আছে।
ওমা, এখন্ যেমন্ রাখ্‌লে সুখে, তেম্‌নি সুখ্ কি পাছে ॥
শিব যদি হন্ সত্যবাদী, তবে কি তোমায় সাধি, মাগো।
ওমা, ফাকির উপরে ফাকি, ডান্ চক্ষুঃ নাচে ॥১
আর যদি থাকিত ঠাঁই, তোমারে সাধিতাম নাই, মাগো।
ওমা, দিয়ে আশা, কাট্‌লে পাশা, তুলে দিয়ে গাছে ॥২
প্রসাদ্ বলে মন্ দড়, দক্ষিণার জোর বড়, মাগো।
ওমা, আমার দফা, হলো রফা, দক্ষিণা হয়েছে ॥৩

"দক্ষিণা হয়েছে" এই উক্তি করিবা মাত্রই প্রাণের দক্ষিণা হইল, অর্থাৎ প্রপঞ্চ-শরীর পরিহার করিলেন। প্রাচীন লোকের মধ্যে অনেকেই কহেন তাঁহার মরণ সময়ে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হইয়াছিল। এ বিষয়ের সত্য মিথ্যা আমরা কিছুই বলিতে পারি না।

রামপ্রসাদ সেনের জীবন বৃত্তান্ত বাহুল্যরূপে বর্ণনা করণের মানস ছিল, কিন্তু স্বাবকাশাভাব ও স্থানের স্বল্পতা এই উভয় প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত অদ্য তদ্বিষয়ে অক্ষম হইলাম, সময়ক্রমে বিস্তারিত লিখিতে ত্রুটি করিব না। আমারদিগের এই বর্ত্ত-[১০] মান লেখাতে যদি কোন ভ্রম হইয়া থাকে তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক কেহ তাহা শোধন করিলে আমরা আনন্দচিত্তে সেই বিষয় প্রভাকরে প্রকটন করিব।

রামপ্রসাদ সেন যখন কলিকাতায় আসিতেন তখন যোড়াসাঁকোর দোয়েহাটায় তাঁহার মাতুল বাটীতে বাস করিতেন। ৺চূড়ামণি দত্তের সহিত অত্যন্ত প্রণয় ছিল, সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট গিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেন, তিনি অতি সুবক্তা ও প্রিয়ভাষী ছিলেন।

কবিরঞ্জনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন গীত অনেকের শ্রুতিপথে প্রবেশ করে নাই, এজন্য আমরা অবস্থা ভেদের পদ সকল উদ্ধৃত করিয়া স্থানে স্থানে প্রকটন করিলাম এ সমস্ত গানের অধিকাংশই এপর্য্যন্ত অপ্রকাশিত ছিল, ভিখারি ও গানওয়ালারা না পাওয়াতে বাজারে ব্যক্ত হয় নাই। এই মহাশয় "আগমনী" "সপ্তমী" বিজয়া" রামলীলা" কৃষ্ণলীলা" শিবলীলা" যাহা রচনা করিয়াছেন তাহাই অতি সুন্দর হইয়াছে, বিশেষতঃ

বীররসের কবিতা অর্থাৎ ভগবতীর রণবর্ণনা ঘটিত পদাবলীর তুলনা দিবার স্থান দেখিতে পাই না, একারণ তাহাই সর্ব্বাগ্রে উদ্দিত করিলাম, সুধীজনেরা কবিরঞ্জন কবিরঞ্জনের পদরঞ্জনকে নয়নাঞ্জন করিয়া মনের আক্ষেপ ভঞ্জন করুন।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল রূপক।

মা কত নাচ গো রণে।

নিরুপম বেশ, বিগলিত কেশ,বিবসনা হোয়ে হর-হৃদে। কত নাচ গো রণে॥

তরুণ অরুণ শশী ঘনচয় প্রকাশে চারু চরণে।

সদ্যোহতদিতি-তনয়মস্তকহারলম্বিতসুজঘনে কত রাজিত কটিতটে নিকর নরকর, কুণপ শিশু শ্রবণে।১

অধর সুললিত, বিম্ব লজ্জিত, কুন্দ বিকশিত, সুদশনে।

শ্রীমুখমণ্ডল, কমল নিরমল, সাট্টহাস সঘনে॥ ২ ॥

সজল জলধর, কান্তিসুন্দর, রুধির কিবা শোভা ও বরণে।

শ্রীরামপ্রসাদ ভণে, মম মানস নৃত্যতি, রূপ কি ধরে নয়নে ॥৩॥

রাগিণী বিভাষ। তাল তিওট্।

এলো চিকুর ভার, এ বামা মার মার, মার রবে ধায়।

রূপে আলো করে ক্ষিতি, গজপতি রূপবতী, গতি রতিপতি মতি মোহেরে॥

অপযশ কুলে কালী, কুলনাশ করে কালী, নিশুম্ভ নিপাত কালী, সব সেরে যায়।

সকল সেরে যায়, একি ঠেকিলাম্ দায়, এ জন্মের মত বিদায়॥

কাল বলে এতকাল, এড়ালাম্ যে জঞ্জাল, সেই কাল চরণে লুটায়। টেনে ফেল রম্ভা ফল, গঙ্গাজল বিল্বদল, শিব পূজার এই ফল অশিব ঘটায়॥ অশিব ঘটায়, এই দনুজ ভটায়, কি কুরব রটায়। ১।

ভব দৈবরূপ শব, মুখে মাত্র নাহি রব কার ভরসায় রব হায়। চিনিলাম ব্রহ্মময়ী, হই বা না হই জয়ী, নিতান্ত করুণাময়ী, স্থান দিবে পায়॥ স্থান দিবে পায়, নিতান্ত মন তায়, এ জন্ম কর্ম্ম সায় ।২।

প্রসাদ বলে ভাল বটে, এ বুদ্ধি ঘোটেছে ঘটে, এ শঙ্কটে প্রাণ বাঁচা দায়। মরণে কি আছে ভয়, জন্মের দক্ষিণা হয়, দক্ষিণাতে মন লয়, কর দৈত্যরায়॥ ওহে দৈত্যরায়, এই ভক্ত দক্ষিণায়, আর কি কাজ আশায়। ৩।

রাগিণী ঝিঁজিট। তাল জলদ তেতালা।

আরে, ঐ আইল কেরে, ঘনবরণী।

কেরে নবীনা নগনা লাজ রহিতা, ভুবন মোহিতা, একি অনুচিতা, কুলের কামিনী॥

কুঞ্জরবরগতি আসবে আবেশ, লোলিত রসনা গলিত কেশ, সুর নরে শঙ্কা করয়ে হেরি বেশ, হুঙ্কার রবেরে দনুজদলনী॥

কেরে নব নীলকমলকলিকাদল বলিয়া দংশন করিছে অলি।

নখচন্দ্রে চকোরগণ, অধর অর্পণ, করত পূর্ণ শশধর বলি॥

ভ্রমর চকোরেতে লাগিল বিবাদ, এ কহে নীলকমল ও কহে চাঁদ, দোঁহে করত হি নাদ, চিচিকি গুণ গুণ করয়ে ধ্বনি। ১।

জঘন সুচারু কদলীতরু নিন্দিত রুধির অধীর বহিছে।

তদূর্দ্ধে কটিবেড়া, নরকর ছড়া, কিঙ্কিনী সহ শোভা করিছে॥

করতল স্থলনলদল অতিশয়, বামে অসি মুণ্ড, দক্ষিণে বরাভয়, খণ্ড খণ্ড করে রথ গজ হয়, জয় জয় ডাকিছে সঙ্গে সঙ্গিনী॥২॥

উর্দ্ধতর ভূধর হেরি হেরি করিকুম্ভ ভয়ে বিদরে।

অপরূপ কি এ আর, চণ্ড মুণ্ডহার সুন্দরী সুন্দর পরে॥

প্রফুল্ল বদনে রদন ঝলকে, মৃদুহাস্য প্রকাশ্য দামিনী ঝলকে, রবি অনল শশি ত্রিনয়ন পলকে, দম্ভে কম্পে সঘনে ধরণী॥৩॥

প্রসাদ কথয়তি, শুন দনুজপতি, কায ন্নাহি সমরে। যেইরূপ ভাব সেই দেবেশ ঐ দেখ শ্রীচরণবরে॥

গরল চিহ্ন গাল ললাটে অনল, শিরোপরি গঙ্গা তরত টল টল, অকূল অনাদি পুরুষ মহাকাল, কালভয় জিনিবারে আপনি॥ ৪॥

রাগিণী ললিত। তাল তিওট।

শঙ্কর পদতলে, মগনা রিপুদলে, বিগলিত কুন্তল-জাল।
বিমল বিধুবর বদন তনুরুচি বিজিত তরুণ তমাল ॥
যোগিনীগণ সকল ভৈরব, সমর করে ধরে তাল। ক্রুদ্ধ মানস উর্দ্ধে শোণিত পিবতি নয়নবিশাল ॥ ১ ॥
নিগম সারিগম গণ গণ গণ মবরব যন্ত্র মণ্ডল ভাল। তাতা থেই থেই দ্রিমিকি দ্রিমিকি ধৃ ধৃ ডম্ফ বাদ্য রসাল ॥ ২ ॥
প্রসাদ কথয়তি শ্যামা সুন্দরি রক্ষ মম পরকাল।
দীন জন প্রতি কুরুকৃপালেশ বারয় কাল করাল ॥ ৩ ॥

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কুলবালা উলঙ্গ ত্রিভঙ্গ কি রঙ্গ তরঙ্গ বয়েস্।
দনুজদলনা ললনা সমরে শবে বিগলিত কেশ ॥
[১১] ঘন-ঘোর-নিনাদিনী, সমর-বিবাদিনী, মদনোন্মাদিনী বেশ। ১।
ভূত পিশাচ প্রমথ সঙ্গে, ভৈরবগণ নাচত রঙ্গে, রঙ্গিনীবর সঙ্গিনী নগনা সমান বেশ ॥ ২ ॥
গজ রথ রথি করত গ্রাস, সুরাসুর নর হৃদয় ত্রাস, দ্রুত চলত ঢলত রসে গর গর, নরকর কটিদেশ। ৩।
কহিছে প্রসাদ ভুবনপালিকে, করুণাঙ্কুর জননি কালিকে, ভব পারাবার তরাবার ভার, হরবধূ হর ক্লেশ ॥ ৪ ॥

রাগিণী বিভাষ। তাল ঢিমে তেতালা।

শ্যামা বামা কে বিরাজে ভবে।
বিপরীত ক্রীড়া ব্রীড়াগতাসবে ॥
গদগদ রসে ভাসে, বদন ঢুলায়ে হাসে, অতনু সতনু তনু অনুভবে। ১।
রবি-সুতা মন্দাকিনী, মধ্যে সরস্বতী মানি, ত্রিবেণী মজয়ে মহাপুণ্য লভে ॥ ২ ॥

অরুণ শশাঙ্ক মিলে, ইন্দীবর চাঁদ গিলে, অনলে অনল মিলে অনল নিভে। ৩।

কলয়তি প্রসাদ কবি, ব্রহ্ম ব্রহ্মময়ী ছবি, নিরখিলে পাপ তাপ, কোথা রবে ॥ ৪ ॥

রাগিণী ঝিঁজিট। তাল আড়া।

শ্যামা বামা কে।

তনু দলিতাঞ্জন শারদ-সুধাকর মণ্ডল বদনী। কুন্তল বিগলিত শোণিত শোভিত তড়িত জড়িত নবঘন ঝলকে ॥

বিপরীত একি কায লাজ ছেড়েছে দূরে। ঐ রথ রথি গজ বাজি বয়ানে পুরে।

যমদল প্রবল সকল কৃত হতবল চঞ্চল বিকল হৃদয় চমকে ।১।

প্রচণ্ড প্রতাপ রাশি মৃত্যুরূপিনী। ঐ কাম রিপু পদে এ কেমন কামিনী।

লজ্যে গগন ধরণীধর সাগর ঐ যুবতী চকিত নয়ন পলকে ॥ ২ ॥

ভীম ভবার্ণব তারণ হেতু। ঐ যুগল চরণ তব করিয়াছি সেতু। কলয়তি কবি রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন কুরু কৃপালেশ জননি কালিকে। ৩।

রাগিণী বেহাগ। তাল তিওট।

শ্যামা বামা গুণধামা কামান্তক উরসী।
বিহরে বামা স্মরহরে।
সুরী কি অসুরী কি নাগী কি পন্নগী কি মানুষী ॥

নাসে মুকুতা ফল বিলোর, পূর্ণ চন্দ্র কোলে চকোর, সতত দোলত থোর থোর, মন্দ মন্দ হাসি ।১।

একি করে করি করে ধরে রণে পশি।
তনু-ক্ষীণা স্তনবীনা বস্ত্রহীনা এ ষোড়শী।

নীলকমলদল জিতাস্য, তড়িত জড়িত মধুরহাস্য, লজ্জিত কুচ অপ্রকাশ্য, ভালে শিশু শশী ॥২॥

কত ছলা, কত কলা, এ প্রবলা চিত্তে বাসি।
রামা নব্যা ভব্যা অব্যাহতগামিনী রূপসী ॥
দিতিসুত-চয় সমরচণ্ড সলিলে প্রবেশি।
এটা কেটা চিত্তে যেটা হয়ে সেটা দুঃখরাশি ॥
মম সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব করে একি সর্ব্বনাশী।

কলয়তি রামপ্রসাদ দাস, ঘোর তিমির পুঞ্জ নাশ, হৃদয় কমলে সতত বাস, শ্যামা দীর্ঘকেশী।

ইহকালে পরকালে জয়ী কালে তুচ্ছবাসি। কথা নিতান্ত কৃতান্ত শান্ত শ্রীকান্ত প্রবেশি ॥৩॥

রাগিণী ছায়ানাট। তাল খয়রা।

সমরে কেরে কাল কামিনী।

কাদম্বিনী বিড়ম্বিনী অপরা কুসুমাপরাজিতা-বরণী ; কে রণে রমণী ॥

সুধাংশু সুধা কি শ্রমজবিন্দু, শ্রীমুখ একি শরদ ইন্দু, কমলবন্ধু বহ্নি সিন্ধু তনয় এ তিন নয়নী।

আ মরি আ মরি, মন্দ মন্দ হাস, লোক প্রকাশ, আশুতোষ-বাসিনী ॥

ফণি ফণাভরণ জিনি, গণি দন্ত কুন্দশ্রেণী, কেশাগ্র ধরণীপর বিরাজ, অপরূপ শব শ্রবণ সাজ, না করে লাজ, কেমন কায, মম সমাজ তরুণী ।১।

আ মরি আ মরি, চণ্ডমুণ্ড মাল, করে কপাল, একি বিশাল, ভাল ভাল, কাল-দণ্ডধারিণী।

ক্ষীণ কটিপর কর নিকর আবৃত কত কিঙ্কিণী ॥

সর্ব্বাঙ্গ শোভিত শোণিতবসন্তে, কিংশুক ইব ঋতু বসন্তে, চরণোপান্তে, মন দুরন্তে, রাখ কৃতান্তদমনি। ২।

আ মরি আ মরি, সঙ্গিনী সকল, ভাবে ঢল ঢল, হাসে খল খল, টল টল ধরণী।

ভয়ঙ্কর কিবা, ডাকিতেছে শিবা, শিব উরে শিবা আপনি ॥

প্রলয়কারিণী করে প্রমাদ, পরিহর ভূপ বৃথা বিবাদ, কহিছে প্রসাদ, দেহ মা প্রসাদ, প্রসাদ বিষাদনাশিনি ॥ ৩ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল একতালা।

কে মোহিনী, ভালে ভাল শশী, পরম রূপসী, বিহরে সমরে বামা বিগলিত কেশী।

তনু অম্বু [?] অমানিশা, দিগম্বরী বালা কৃশা, সব্যে বরাভয়, বাম করে মুণ্ড অসি॥

মরি কিবা অপরূপ, নিরখি দনুজ ভূপ, সুরী কি অসুরী কি পন্নগী কি মানুষী।

জয়ী হব যার বলে, সেই প্রভু শব ছলে, পদে মহাকাল, কালরূপ হেন বাসি॥ ১

নানারূপ মায়া ধরে, কটাক্ষে মানস হরে, ক্ষণে বপু বিরাট, বিকট মুখে হাসি।

ক্ষণে ধরাতলে ছুটে, ক্ষণেকে আকাশে উঠে, গিলে রথ রথি গজ, বাজি রাশি রাশি॥ ২

ভণে রামপ্রসাদ সার, না জান মহিমা মার, চৈতন্য রূপিণী নিত্য ব্রহ্মমহিষী।

যেই শ্যাম সেই শ্যামা, আকার আকারে বামা, আকার করিয়া লোপ, অসি ভাব বাঁশি॥ ৩

কালীকীর্ত্তনের গোষ্ঠলীলার একস্থানে রামপ্রসাদ সেন বর্ণনা করিয়াছেন।

আকার তোমার নাই, অক্ষর আকার।
গুণভেদে গুণময়ী, হোয়েছ সাকার॥
পঞ্চাশৎ বর্ণ বটে, বেদাগম সার।
যোগির কঠিন ভাবা, রূপ নিরাকার॥
বেদবাক্যে নিরাকার, ভজনে কৈবল্য।
সে কথা না ভাল শুনি, বুদ্ধির তারল্য॥
প্রসাদের কালো রূপে সদা মন ধায়।
যথা রুচি তাই কর, নির্ব্বাণ কে চায়॥

কবিরঞ্জন কালীকীর্ত্তনের রাসলীলার স্থলে ভগবতীর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

জগদম্বা কুঞ্জবনে, মোহিনী গোপিনী।
ঝলমল তনু রুচি, স্থির সৌদামিনী॥
শ্রমবারি বিন্দু বিন্দু, ঝরে মুখ চাঁদে।
সশঙ্ক শশাঙ্ক কেশ রাহু, ভ্রমে কাঁদে॥

সিন্দুর অরুণ আভা, বিষম মানসী।
উভয় গ্রহণে যেব পূর্ণিমার নিশি॥
বিনতা-নন্দন চঞ্চু, সুনাসিকা ভান।
ভুরু ভুজঙ্গম, শ্রুতি বিবরে পয়ান॥
[১২] ওরূপ লাবণ্য, জলনিধি, স্থির জলে।
নয়ন সফরী মীন খেলে কুতূহলে॥
কনক মুকুরে কি, মাণিক্য রাগ্ প্রভা।
তার মাঝে মুক্তাবলী, ওষ্ঠ দন্ত শোভা॥
শ্রীগণ্ডে কুণ্ডল, প্রতিবিম্ব শ্রীবদন।
চারু চক্র রথে চড়ি, এসেছে মদন্॥
নাসাগ্রে তিলক চারু, ধরে অচলজা।
মীন নিকেতনে কি, উড়িছে মীনধ্বজা॥
করিবর ভুজঙ্গ মণাল হেমলতা।
কোন্ তুচ্ছ কমনীয়, বাহুর তুল্যতা॥
ভুজদণ্ড উপমার, একমাত্র স্থান।
সুরতরুবর শাখা, এই সে প্রমাণ॥
হরি গঙ্গা প্রবাহ, যমুনা লোমশ্রেণী।
নাভিকুণ্ডে গুপ্তা সরস্বতী অনুমানি॥
মহাতীর্থ বেণী তীরে, স্বয়ম্ভুযুগল।
স্নান কর মনরে, অনন্ত জন্ম-কল॥
উত্তর বাহিনী গঙ্গা, মুক্তাহার বটে।
সুচারু ত্রিবলী, বিরাজিত তার তটে॥
কবি করে বিবেচনা, যে ঘটে যে জ্ঞান।
মণিকর্ণিকার ঘাটে, সুচারু সোপান॥
রসময় বিধাতার, কিবা কব কাণ্ড।
রূপসিন্ধু মন্থিবার, মধ্যদেশ দণ্ড॥
কাঞ্চিদাম রজ্জু তার, বুঝহ প্রবাণ।
ঘর্ষণে ঘর্ষণে কটি, ক্ষীণতর ক্ষীণ॥
মধ্যদেশ ক্ষীণ যদি, সন্দেহ কি তার।
সহজে জঘনে ধরে, গুরুতর ভার॥

ভব স্থানে মনোভব, পরাভব হোয়ে।
তূণ বাণ দ্বিগুণ, এসেছে বুঝি লোয়ে॥
জঙ্ঘাতূণ, পদাঙ্গুলি, নখফলী শরে।
রতিকান্ত নিতান্ত, জিতিবে বুঝি হরে॥

রামপ্রসাদের কৃষ্ণ কীর্ত্তনের এক স্থান হইতে কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

"প্রথম বয়স রাই রস রঙ্গিণী।
ঝলমল তনুরুচি স্থির সৌদামিনী॥
রাই বদন্ চেয়ে ললিতা বলে, রাই আমার মোহনমোহিনী।
রাই যে পথে প্রয়াণ করে, মদন পলায় ডরে, কুটিল কটাক্ষ শরে, জিনিল কুসুম শরে।
কিবা চাঁচর সুন্দর কেশ।
সখী বকুলে বানাইল বেশ॥
তার গন্ধে অলিকুল, হইয়া আকুল, কেশে করিছে প্রবেশ॥
নব ভানু ভালেতে নিবাস।
মুখপদ্ম কোরেছে প্রকাশ॥
উরে কলিকা যে আছে, কি জানি ফুটে পাছে, সখীর হৃদয় তরাস।
ভাবে পূর্ণচন্দ্র কোলে তার।
অপরূপ শোভা হোলো আর॥
একি শ্রীবদন ছবি, উপরেতে চাঁদ রবি, সদন মদন রাজার।
অলকা কোলে মতি-হার, কিবা বিচিত্র ভাব বিধাতার॥
যেন রাহুর মুখ মাঝে, বদন রাজি রাজে, চাঁদেরে করেছে আহার॥
আঁখি লোল অনুমানি এই।
চাঁদে হরিণ শিশু আছে যেই॥
তনু সুধায় লুকায়েছে, ব্যাধে বধে পাছে, দিগ নিহারই সেই।
চারু অপাঙ্গ কাম কামান।
নাসা তিলক শর খরসান॥
সেই শ্যামসুন্দর, মানস মৃগবর, ভাবে বুঝি করিছে সন্ধান।"

রামপ্রসাদ সেনের আগমনী।

রাগিণী মালশ্রী।

ওগো রাণী নগরে কোলাহল, উঠ চল চল
নন্দিনী নিকটে তোমার গো।
চল বরণ করিয়া, গৃহে আনি গিয়া,
এসোনা সঙ্গে আমার গো ॥১
জয়া কি কথা কহিলি, আমারে কিনিলি,
কি দিলি শুভ সমাচার।
তোমায় অদেয় কি আছে, এসো দেখি কাছে,
প্রাণ দিয়া শুধি ধার গো ॥২
রাণী ভাসে প্রেম জলে, দ্রুতগতি চলে,
খসিল কুন্তল ভার।
নিকটে দেখে যারে, সুধাইছে তারে,
গৌরী কত দূরে আর গো ॥৩
যেতে যেতে পথ, উপনীত রথ,
নিরখি বদন উমার।
বলে মা এলে, মা এলে, মা কি মা ভুলে ছিলে,
মা বলে একি কথা মার গো ॥৪
রথে হোতে নাবিয়া শঙ্করী, মায়ে প্রণাম করি,
সান্ত্বনা করে বার বার।
দাস শ্রীকবিরঞ্জনে, সকরুণে ভণে,
এমন শুভ দিন আর কার গো ॥৫

বিজয়া।

রাগিণী ললিত।

ওহে প্রাণনাথ।
গিরি বরহে, ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার!
কি শুনি দারুণ কথা, দিবসে আঁধার ॥

বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বোসে মহাকাল
বেরোও গণেশ মাতা, ডাকে বার বার ।১
তব দেহ হে পাষাণ, এ দেহে পাষাণ প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ, না হোলো বিদায় ।২
তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার ।৩
প্রসাদের এই বাণী, হিমগিরি রাজরাণী,
প্রভাতে চকোরী যেমন্, নিরাশা সুধার ।৪

ষট্‌চক্র ভেদের গীত ।

কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী, তারা তুমি,
আছ গো অন্তরে । মা আছ গো অন্তরে ॥
এক স্থান মূলাধার, আর স্থান সহস্রার ,
আর স্থান চিন্তামণিপুরে ।১
শিব শক্তি সব্যবামে, জাহ্নবী যমুনা নামে,
সরস্বতী মধ্যে শোভা করে ॥২
ভুজঙ্গরূপা লোহিতা, স্বয়ম্ভুতে সুনিদ্রিতা,
এই ধ্যান করে ধন্য নরে ।৩
মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর নাভি স্থান,
অনাহত বিশুদ্ধাখ্য বরে ॥৪
বর্ণরূপা তুমি বট, ব, স, ব, ল, ড, ক, ক, ঠ,
ষোল স্বর, কণ্ঠায় বিহরে ।৫
হ, ক্ষ, আশ্রয় ভুরু, নিতান্ত কহিলা গুরু,
চিন্তা এই শরীর ভিতরে ॥৬
ব্রহ্মা আদি পাঁচব্যক্তি, ডাকিন্যাদি ছয় শক্তি,
ক্রমে বাস পদ্মের উপরে ।৭
গজেন্দ্র মকর আর, মেষবর কৃষ্ণসার,
আরোহণ দ্বিতীয় কুঞ্জরে ॥৮
অজপা হইলে রোধ, তবে জন্মে তব বোধ,
গুঞ্জে মত্ত মধুব্রত স্বরে ।৯

ধরা জল বহ্নি বাৎ, লয় হয় অচিরাৎ,
যং রং লং বং হং হোং স্বরে ॥১০
ফিরে কর কৃপাদৃষ্টি, পুনর্ব্বার হয় সৃষ্টি,
চরণ যুগলে সুধা ক্ষরে।১১
তুমি নাদ তুমি বিন্দু, সুধাধার যেন ইন্দু,
এক আত্মা ভেদ কেবা করে ॥১২
উপাসনা ভেদ ভেদ, ইথে কোন নাহি খেদ,
মহাকালী কালপদ ভরে।১৩
নিদ্রা ভাঙ্গে যার ঠাঁই, তার আর নিদ্রা নাই,
থাকে জীব শিব কর তারে ॥১৪
মুক্তি-কন্যা তারে ভজে, সে কি এ বিষয়ে মজে,
পুনরপি আসিয়া সংসারে।১৫
আজ্ঞাচক্র করি ভেদ, ঘুচাও ভক্তের খেদ,
হংসী রূপে মিল হংসবরে ॥১৬
চারি ছয় দশ বারো, ষোড়শ দ্বিদল আরো,
দশ শতদল শিরোপরে।১৭
শ্রীনাথ বসতি তথা, শুনি প্রসাদের কথা,
যোগী ভাসে আনন্দ সাগরে ॥১৮

যিনি আন্তরিক তান্ত্রিক অর্থাৎ [১৩] অন্তর্যাগ বিষয়ে যাঁহার গাঢ় সংস্কার আছে, তিনিই এই গীতামৃতের যথার্থ রসাস্বাদন প্রাপ্ত হইবেন, নচেৎ অন্যের সাধ্য নহে। এ বিষয় অত্যন্ত কঠিন, বিশেষ বিশেষ রামপ্রসাদি পদের নিগূঢ়াভিপ্রায় ও তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া ভাব ব্যাখ্যা করেন ইদানীং ইহলোক হইতে তদ্রূপ মনুষ্য প্রায় তাবতেই অবসৃত হইয়াছেন, কেবল দুই এক মহাত্মা আছেন।

রামপ্রসাদের প্রাচীন অবস্থার এই গানটী অতি মনোহর।

যথা।

কায্ হারালেম্ কালের বশে।
মন মজিল রতিরঙ্গ রসে ॥
যখন ধন উপার্জ্জন, কয়েছিলাম্ দেশ্ বিদেশে।
তখন্ ভাই বন্ধু দারা সুত, সবাই ছিল আমার বশে ॥১॥

এখন্ ধন উপার্জ্জন না হইল দশার শেষে।
সেই ভাই বন্ধু, দারা সুত, নির্ধ্নে বোলে সবাই রোষে ॥২॥
যমদূত আসি, শিয়রেতে বসি, ধর্ব্বে যখন অগ্রকেশে।
তখন্ সাজ্য়ে মাচা কলসী কাচা, বিদায় দেবে দণ্ডিবেশে ॥৩॥
হরি হরি বলি শ্মশানেতে ফেলি, যে যার যাবে আপন বাসে।
রামপ্রসাদ মলো, কান্না গেল, অন্ন খাব অনায়াসে ॥৪॥

বৈরাগ্য ও বিবেক যখন তাঁহার অন্তঃকরণকে বিশেষরূপে অধিকার করিয়াছিল বোধ করি তৎকালীন মনের স্বরূপানুরাগেই ঐ গানটী কণ্ঠ হইতে নির্গত করিয়াছিলেন। এই পুরুষের অন্তঃকরণে কাপট্য মাত্র ছিল না, অন্তর বাহির একরূপ ছিল, মুখে যাহা বলিতেন কার্য্যে তাহাই করিতেন, তাঁহার উক্তি দ্বারা ও প্রবাদ দ্বারা ইহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যে ব্যক্তি অকপটে সত্য পালন পূর্ব্বক ঈশ্বর সাধনায় কালক্ষয় করিয়াছেন, আহা! তিনি কি মহাপুরুষ ছিলেন।

শক্তি ভক্তিসূচক উক্তি দ্বারা যুক্তিমতে সকলে রামপ্রসাদ সেনকে শাক্তই বলিতে পারেন, ফলে তিনি শাক্ত ছিলেন বটে, ভাক্ত ছিলেন না, যথার্থই ভক্ত ছিলেন, কারণ উপাসনা কল্পে তাঁহার মনে দ্বেষ মাত্রই ছিল না। নিম্নস্থ পদটিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হইতেছে।

যথা।

মা আমার অন্তরে আছ।
তোমায় কে, বলে অন্তরে শ্যামা,
মা আমার অন্তরে আছ।
তুমি পাষাণ্ মেয়ে, বিষম্ মায়া, কত কাচ্ কাচাও কাচ ॥
উপাসনা ভেদে তুমি, প্রধান মূর্ত্তি ধর পাঁচ।
যে পাঁচেরে এক্ কোরে ভাবে, তার হাতে কোথা বাঁচ ॥১॥
বুঝে ভার দেয় যে জন, তার ভার নিতে হাঁচ।
যে কাঞ্চনের মূল্য জানে, সে কি ভুলে পেয়ে কাঁচ ॥২॥
প্রসাদ্ বলে আমার হৃদয়, অমল কমল সাঁচ।
তুমি সেই সাঁচে নির্ম্মিতা হোয়ে, মনোময়ী হোয়ে নাচ ॥৩॥

রামপ্রসাদ সেনের চিত্তের একাগ্রতা, বিশ্বাসের স্থিরতা ও ভক্তি এবং প্রেমের প্রগাঢ়তা কিপর্য্যন্ত ছিল এই পদের দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে। অদ্য এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই প্রস্তাব সাঙ্গ করিলাম।

রামপ্রসাদ সেনের জীবন-বৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম, তথাচ অন্ত্যতন পত্রের নিয়মিত স্থানে তাহা সম্পন্ন হইল না, এজন্য এক খণ্ড অধিক প্রকাশ করিতে হইল, ইহাতে আমারদিগের অতিরেক ব্যয় অনেক হইয়াছে, কারণ অত্যন্ত ক্ষুদ্র অক্ষরে চারিফার্ম্মা কাগজ প্রকাশ করিতে হইল, তথাচ এবিষয়ে মনের আক্ষেপ কিছুমাত্র নিবারণ হয় নাই, যেহেতু বিস্তার করিয়া বাহুল্য রূপে লিখিতে পারিলাম না। অতি অল্পেই শেষ করিতে হইল, এদেশের প্রাচীন যে যে মহাশয় বঙ্গভাষায় কবিতা-রচনা করত বিখ্যাত হইয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহারদিগের তাবতেরি জীবন-চরিত লিপিবদ্ধ করণের মানস করিয়াছি, কিন্তু ইহা সুসিদ্ধ করা সুকঠিন হইয়াছে, কারণ সমুদয় ব্যাপার সংগ্রহ করা বড় সহজ নহে। প্রাচীন লোক কেহই জীবিত নাই, এবং যাঁহারা এইক্ষণকার বৃদ্ধ তাঁহারা অনেকেই তদ্বিশেষ অবগত নহেন, যদিও কোন কোন মহাশয় কিছু কিছু জানিতে পারেন কিন্তু আক্ষেপ এই যে তাঁহার-দিগের সহিত আবার আমারদিগের এপর্য্যন্তই সাক্ষাৎ নাই। যাহাহউক, "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এইরূপ করিয়া দেখিতে হইবেক। চেষ্টা ও যত্ন দ্বারা যত দূর পর্য্যন্ত করিয়া তুলিতে পারি তাহার ক্রটি কখনই করিব না, ইহাতে শারীরিক শ্রমের তো কথাই নাই, যদি অর্থব্যয়ের আবশ্যক করে তাহাতেও সম্ভব মত বিত্ত ব্যয় অবশ্যই করিব। এই সঙ্কল্পিত কল্পে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে একটা প্রধান কর্ম্মই করা হয়, অতএব সর্ব্ব সাধারণকে বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি, যদি কেহ এ বিষয়ে অস্মদাদিগকে যথাযোগ্য সাহায্য করিতে সমর্থ হয়েন তবে যেন তাহাতে সম্ভাবিত কৃপাবিতরণে কৃপণতা না করেন। তাঁহারদিগের নিকট এতদ্রূপ আনুকূল্য প্রাপ্ত হইলে আমরা শ্রম সাকল্য সাফল্য জ্ঞানে যাবজ্জীবন মহোপকার স্বীকার পূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা-ঋণে বদ্ধ রহিব, ইহাতে শুদ্ধ আমরাই উপকৃত হইব, এমত নহে, দেশ শুদ্ধ সমস্ত লোকেই তাহার সমান অংশ প্রাপ্ত হইবেন, সুতরাং এই স্থলে অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র, এই দেশহিতকর কর্ত্তব্য [১৪] কার্য্য সাধনে সাধ্য সত্বে কেহ যেন আলস্য-পরবশ না হয়েন, ইহাতে আমারদিগের উপকার করিতে ইচ্ছা না হয় আপনারা স্বতন্ত্ররূপে করুন, তাহাতে হানি কি। যেরূপে হউক কার্য্যসিদ্ধ হইলেই চরিতার্থ হইব।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন*

[দুই]

[৭] মহাত্মাবর কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের জীবন বিবরণ আমরা গত মাসের প্রথম দিবসীয় পত্রে যাহা লিখিয়াছিলাম তৎপাঠে অনেকেই আমারদিগের নিকট সন্তোষ সূচক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। সেন কবি মহাশয় অদ্বিতীয় মনুষ্য ছিলেন, বহুকাল গত হইয়াছেন এবং এদেশ মধ্যে মহল্লোকদিগের জীবন বৃত্তান্ত লিখিবার নিয়ম না থাকাতে আমরা তাঁহার বিষয় অনেক জানিতে পারি নাই, একারণ আমরা দেশ বিদেশীয় পাঠক মহাশয়দিগের সমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলাম যে সেন কবি মহাশয়ের গীতাবলী যদ্যপি কাহার নিকট লিখিত থাকে এবং কেহ যদ্যপি তাঁহার জীবনের অন্য কোন ঘটনা জ্ঞাত থাকেন অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমারদিগের যন্ত্রালয়ে প্রেরণ করিলে আমরা অতিশয় সন্তোষ চিত্তে তাহা প্রকাশ করিব। আমারদিগের ঐ প্রার্থনানুসারে কোন আত্মীয় বন্ধু যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহা সাদরে নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

"মহাত্মা রামপ্রসাদ সেনের জীবন বৃত্তান্ত উল্লেখে আপনি যাহা যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া আপনার পৌষমাসিক প্রথম দিবসীয় অতিরেক পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন তৎপাঠে অস্মদগণেরা কি গাঢ় পুলক প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা লিখনে লেখনী অসমর্থা, কেননা প্রকাশ্য পত্রে ঐ কবির গুণাবলী এরূপ আন্দোলন ও আলোচনা না হইলে কালে তাঁহার প্রকৃত গুণ ও অসাধারণ ক্ষমতা লোপ হইবার সম্ভাবনা। ইদানীন্তন ঐ মহাপুরুষ কেবল কতিপয় প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞ ও মর্ম্মগ্রাহি মনুষ্যের নিকট পরিচিত ছিলেন মাত্র, নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি অপরিচিত ছিলেন যদিও ঐ দলাক্রান্ত ব্যক্তিরদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার দুই একটি গান জানিতেন, কিন্তু তাহার ভাব ও প্রকৃতার্থ বিষয়ে অনভিজ্ঞ প্রযুক্ত তাহার সমাদর করিতেন না, যাহা হউক আপনি যে পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়া যে মহতি বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহাতে আপনার সমীপে আমরা চিরবাধিত হইলাম এবং ইহাও এক প্রকার আপনার কীর্ত্তি, যেহেতুক আপনি সেন কবির গ্রন্থচয়ে পুনর্জীবন প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। অপর কবিরঞ্জনের

---

*সংবাদপ্রভাকর, শুক্রবার ১ মাঘ ১২৬০ সাল। ইং ১৩ জানুআরি ১৮৫৪ সাল।—স.

দৈবশক্তি ও পাণ্ডিত্য ও তত্ত্বরসের ব্যাপার যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা উৎকট বর্ণনা হয় নাই, স্বরূপাখ্যান হইয়াছে, কারণ রামপ্রসাদ সেন অস্মদ গ্রামস্থ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার বিষয়ে আমরা অনেক জ্ঞাত আছি। অপিচ তাহার মাহাত্ম্যবিষয়ক আপনার রচনা গ্রামস্থ বিজ্ঞ ও বহুদর্শী ও অনুসন্ধানকারী এবং বৃদ্ধ মনুষ্যেরদের সমক্ষে পাঠ করিলে তাঁহারা অম্লান বদনে ব্যক্ত করিলেন যে এরূপ লেখা পরম্পরা শ্রুতিবাক্যানুযায়ী বটে, পরন্তু তিনি যে ঐশিক শক্তি প্রভাবে গীতাবলী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ বিরহ, শাস্ত্রাধ্যয়ন না করিয়া সর্ব্ব শাস্ত্রের শাসন দর্শন ও মর্ম্ম প্রকাশ করা কি সামান্য ক্ষমতার কর্ম্ম? শ্রুত আছি যে কবিবরের মিষ্টস্বর ছিল না তথাচ তিনি যখন গান করিতেন শ্রোতৃগণের শ্রবণে সেই স্বর মধুর স্বর বোধ হইত এবং যতক্ষণ গান করিতেন ততক্ষণ তাঁহারা চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় স্তব্ধ থাকিতেন, ঐশ্বরিক অনুকম্পা ব্যতীত এ বিষয়ে আর কি অনুমান করা যাইতে পারে? একদা নবদ্বীপাধিপতি মহামতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর সেন কবি সমভিব্যাহারে নৌকারোহণে মুরশিদাবাদে গমন করিয়াছিলেন, তথায় যে কয়েক দিবস রাজা অবস্থিতি করিয়াছিলেন সে কয়েকদিন তাঁহার বাস নৌকাতেই ছিল এবং রামপ্রসাদ সর্ব্বদাই ঈশ্বরের মহিমাসূচক গান করিতেন। এক দিবস সায়ংকালে নবাব সেরাজেরদৌল্লা বায়ু সেবনার্থ তরি আরূঢ় হইয়া গমন করিতে করিতে রাজার নৌকার মধ্যে সেনের গানের ধ্বনি শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে এ নৌকা কাহার ও এ গায়ক বা কে? পরে পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া সেনকে স্বযানে আহ্বান করিয়া গান করিতে অনুজ্ঞা দিলেন, কবিরঞ্জন নবাবের মনোরঞ্জনার্থে একটি খেয়াল ও একটি গজল গাইলেন, কিন্তু নবাব তাহাতে বৈরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন যে আমি তোমার খেয়ালাদি গীত শুনিতে ইচ্ছা করিনা, কালী কালী শব্দে যে গীত আরম্ভ করিয়াছিলা, ঐ গীত আরব্ধ করহ। নবাবের আজ্ঞানুসারে রামপ্রসাদ স্বীয় রচিত ভক্তি পূরিত একটি শ্যামা বিষয় গান আরম্ভ করিলে পাষাণবৎ কঠোর হৃদয় যে সেরাজেরদৌল্লা তিনিও নয়ন নীর নিবারণে অক্ষম হইলেন, পরে গান [৮] ভঙ্গ হইলে নবাব তাঁহাকে সাধুবাদ দিয়া কহিলেন যে রামপ্রসাদ তুমি প্রকৃত ঈশ্বরানুপ্রীত ব্যক্তি তুমি আমার অধীনে থাক, আমি তোমাকে উচ্চপদস্থ করিব, কিন্তু রামপ্রসাদ বিষয়াকাঙ্ক্ষী নহেন এরূপ নবাবের গোচর হইলে তেঁহ তাঁহাকে আরো অধিক সাধুবাদ প্রদান করিলেন, একণে পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা

করুণ যে রামপ্রসাদ কিরূপ মানুষ ছিলেন, সেরাজেরদৌল্লা কিরূপ দুর্দান্ত ও পাষণ্ড ছিলেন তাহা কাহার অবিদিত এবং তিনিও যে প্রকার গুণগ্রাহী তাহাও বা কোন্ জনের অগোচর আছে, অতএব তাঁহাকে বঙ্গীয়ভাষা গানে বিমোহিত করা ও তাঁহার রসনা হইতে যশো ঘোষণা করান দৈববল ভিন্ন অন্য কি শক্তি দ্বারা হইতে পারে। সেন কবির বিষয়ে এবম্প্রকার কত শত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য প্রবাদ আছে তাহা সমুদয় প্রকাশ করিলে একখানি পুস্তক হয়, এতাবতা এ স্থলে তাহা লেখা অনাবশ্যক। পরন্তু যদিও রামপ্রসাদ সেন প্রতি গানেই কালী, দুর্গা, তারা, শিবে ইত্যাদি দেবীর নামোল্লেখ করিয়াছেন এবং ঐ ঐ নাম বদনে অহর্নিশি উচ্চারণ করিতেন, ফলতঃ তিনি এক ঈশ্বরবাদী ছিলেন; পরব্রহ্মের কাল্পনিক মূর্ত্তি ও রূপাদি মনে মনে ঘৃণা করিতেন, তবে দেশ কাল পাত্র বিবেচনানুসারে বাহ্যে কালী কালী শব্দ করিতেন, তেঁহ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়ে ছিলেন এবং তাঁহার অধিকারে বাস করিতেন, সুতরাং ভীত হইয়া প্রচলিত ধর্ম্মানুযায়ি প্রকাশ্য উপাসনাদি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এতন্নিমিত্ত তিনি জগদীশ্বরের নিকটে দোষী হইতে পারেন নাই, কারণ জগদন্তরাত্মা তাঁহার আন্তরিক ভাব জানিতেন, লোকে দুর্গাই বলুক বা ঈশ্বরই বলুক বা খোদাই বলুক অথবা গডই বলুক, সকলিই তাঁহারই উদ্দেশে বলিয়া থাকে, ইহাতে প্রকৃত কর্ম্মের হানি হয় না। যথা গোলাব পুষ্পকে যে নামে উল্লেখ করা যাউক না কেন তাহার সৌরভের লাঘব হয় না। অপর সেন কবির কালী নামাদি উচ্চারণ যে মৌখিক মাত্র তাহা তাঁহার পশ্চাল্লিখিত গানে প্রামাণ্য হইতেছে।

"মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে।
ওরে উন্মত্ত আঁধার ঘরে॥

সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধর্ত্তে পারে।
অগ্রে কর শশি বশি, ভূতরে তোর শক্তিসারে॥
আছে কোঠার ভিতর চোর-কুঠারী, ভোর হোলে সে লুকাবেরে।
ষড় দর্শন পেলেনা আগম, নিগম শাস্ত্র ধরে॥
সে যে ভক্তিরসের রসিক সদা নন্দপুরে বিরাজ করে।
সে ভাব লক্ষে পরম যোগী যোগ করে যুগযুগান্তরে॥
হলে ভাবের উদয়, সে মন লোহাকে চুম্বুকে ধরে।
প্রসাদ বলে আমি মাতৃ্রি ভাবে তত্ত্ব করি যাঁরে, সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি বুঝরে মন ঠারে ঠোরে॥"

কবিরঞ্জন ৺রামপ্রসাদ সেন*

[তিন]

[৮] । ১২৬০ সালের প্রথম দিবসীয় আশ্বিনের প্রভাকরে আমরা মহাকবি মহাত্মা ৺রামপ্রসাদ সেন প্রণীত কয়েকটি পরমতত্ত্ব পীযূষ পূরিত কবিতা প্রকাশ করি, এবং ঐ বর্ষের ১ পৌষের পত্রে উক্ত মহাশয়ের জীবন চরিত সম্বলিত অবস্থা ভেদের কতকগুলীন গীত ও কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তনের কিয়দংশ প্রকটিত হওয়াতে তৎপাঠে পাঠক মাত্রেই প্রেমানন্দ সাগরে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, আর মধ্যে মধ্যে মাসিক পত্রে কিছু কিছু রামপ্রসাদী পদ উদিত হয়, অনেকেই এমত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন, আমরা আর আর প্রাচীন কবিকদম্বের প্রাচীন কবিতা ও জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করণার্থ বিষমতর ব্যস্ত থাকাতে এপর্য্যন্ত তাঁহারদিগের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই, অদ্য অবস্থা বিশেষের নানা রসবর্ণিত কালীগীত, ব্রহ্মগীত, রামগীত ও শিব সংগীত প্রভৃতি কতিপয় গীত ও পদ সঙ্কলন পূর্ব্বক পত্রস্থ করিলাম, অভিনিবেশ পূর্ব্বক দৃষ্টি করত সকলে প্রসাদের কবিতার প্রসাদগুণ ও আর আর গুণের পরীক্ষা করুন।

সীতার বিলাপোক্তি সংগীত।

মোরে বিধি বাম, গুণনিধি রাম, কি দোষে গেলে ছাড়িয়ে হে।

জনক দুহিতে কাঁদিতে কাঁদিতে, লবকুশ দোঁহে লইয়ে সহিতে, আইল জীবন নাথেরে দেখিতে, শিরে কর হানি পড়িয়ে মহীতে, হাহাকার রব করিয়ে হে। ১

সীতার লোচনে সলিল্ পড়িছে ঝরিয়া রামের দুখানি চরণ ধরিয়া, কাঁদেন জননী করুণা করিয়া, কোথাকারে প্রভু গেলেহে চলিয়া, কোন্ অপরাধ পাইয়ে হে। ২

অভাগিনী ডাকে উঠনা ত্বরিতো, শুনিয়া না শুনো একোন উচিতো, কমল নয়নে চাহনা চকিতো, বিদরে পরাণো করুণা স্মরিতো, প্রবোধ দেহনা উঠিয়েহে। ৩

---

*সংবাদপ্রভাকর, মঙ্গলবার, ১ চৈত্র, ১২৬১ সাল। ইং ১৩ই মার্চ্চ, ১৮৫৫ সাল।—স,

ধূলায় ধূর্ষর এ হেন শরীর, ছকূল আকুল হোয়েছে কটির। ললাট ফলকে পড়িছে রুধির, দিবসে সকলি দেখিহে তিমির, আলোকর প্রভু জাগিয়ে হে ॥৪

করে হোতে ধনু পড়েছে খসিয়া, কে হানিল বাণ বিষম কসিয়া, নাশিল জীবন হৃদয়ে পশিয়া, কেমনে এমন দেখিব বসিয়া, পরাণ যাইছে ফাটিয়ে হে।৫

যখন ছিলাম জনক বাসেতে, আমারে দেখিয়া কহিত লোকেতে, বিধবা চিহ্ণ নাহিকো তোমাতে, এবে এই ছিল মোর কপালেতে, সখা কোথা গেলে চলিয়ে হে ॥ ৬

ললাট লিখন ঘুচাতে নারে, আপনি উদরে ধরেছি যারে, তনয় হইয়া বধিল পিতারে, আহা নাথ্ নাথ্ কি হোলো আমারে, উপায় না দেখি ভাবিয়ে হে।৭

ধিক্ ধিক্ তোরে বলি রে তনয়, বুঝিলাম তোরা আমারত নয়, এমন করিতে উচিত নয়, প্রভুরে লইলি যমের আলয়, ইহা দেখি আমি বসিয়ে হে ॥৮

এ ছার জীবন কেমনে রাখিব, তোমার নিকটে এখনি মরিব, জ্বালি চিতা আমি তাহাতে পশিব, নহে হলাহল অশন করিব, কি কায এ দেহ রাখিয়ে হে। ৯

রামপ্রসাদ কহিছে শুন, মা, জানকী, রামের মহিমা তুমি না জান কি, প্রবোধ মান মা কমল কানকী, এখনি উঠিবেন রাঘব ধানকি, দেখিবে নয়ন ভরিয়ে গো। ১০

আহা কি চমৎকার! কি চমৎকার! এতদ্রূপ করুণা পূরিত বিলাপ বর্ণনা প্রায় দেখা যায় না, পাঠ করিতে করিতে অমনি অশ্রু পতন হইতে থাকে। হে পাঠকগণ! শ্রুতি পথে এই সুধার আস্বাদন গ্রহণ কর।

শিবসংগীত।

হর ফিরে মাতিয়া। শঙ্কর ফিরে মাতিয়া। শিঙ্গা করিছে ভভ ভম ভম, ভোঁভোঁ ভোঁ, ভমম ভমম ববম ববম ববম, বব বব বম বব বম গাল বাজিয়া।

মগন হইয়া প্রমথ নাথ, ঘটক ডমরু লইয়া হাত, কোটি কোটি কোটি দানব সাত, শ্মশানে ফিরিছে গাইয়া। ১

কটিতটে কিবা বাঘের ছাল, গলায় ছুলিছে হাড়ের মাল, নাগ যজ্ঞোপবীত ভাল, গরজে গরব মানিয়া। ২

শশধর কলা ভালে শোভে, নয়ন চকোর অমিয় লোভে, স্থির গতি অতি মনের ক্ষোভে, কেমনে পাইব ভাবিয়া।৩

আধচাদ কিবা করে চিকিমিকি, নয়নে অনল ধিকি ধিকি ধিকি, প্রজ্বলিত হয় থাকি থাকি থাকি, দেখি রিপু যায় ভাগিয়া। ৪

বিভূতি ভূষণ মোহন বেশ, তরুণ অরুণ অধর দেশ, শব অভরণ গলায় শেষ, দেবের দেব যোগিয়া।৫

বৃষভ চালিছে খিমিকি খিমিকি, বাজয়ে ডমরু ডিমিকি ডিমিকি, ধরত তাল ত্রিমিকি ত্রিমিকি, হরি গুণে হর নাচিয়া।৬

বদন ইন্দু ঢল ঢল ঢল, শিরে দ্রবময়ী করে টল টল, লহরী উঠিছে কল কল কল, জটাজুট মাঝে থাকিয়া।৭

প্রসাদ কহিছে এভব ঘোর, শিয়রে শমন করিছে জোর, কাটিতে নারিনু করম ডোর, নিজগুণে লহ তারিয়া।৮

কি আশ্চর্য্য কবিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, ধন্য ধন্য।

শব-সাধন বিষয়ক সংগীত।

জগদম্বার কোটাল।
বড় ঘোর্ নিশায় বেরুলো।
জগদম্বার কোটাল॥

জয় জয় ডাকে কালী, ঘন ঘন করতালি,
বম্ বম্ বাজাইয়া গাল।
ভক্তে ভয় দর্শাবারে, চতুষ্পথ শূন্যাগারে,
ভ্রমে ভূত ভৈরব বেতাল॥
অর্দ্ধ চন্দ্র শিরে ধরে, ভীষণ ত্রিশূল করে,
আপাদ লম্বিত জটাজাল।
শমন সমান দর্প, প্রথমেতে চলে সর্প,
পরে ব্যাঘ্র ভল্লুক বিশাল॥
ভয় পায় ভূতে মারে, আসনে তিষ্ঠিতে নারে,
সম্মুখে ঘুরায় চক্ষু লাল।
যেজন সাধক্ বটে, তারে কি আপদ ঘটে,
তুষ্ট হোয়ে বলে ভাল ভাল।

মন্ত্র সিদ্ধ বটে তোর, করাল বদনী জোর,
তুই জয়ী ইহ পরকাল।
[১] রাম প্রসাদ দাসে, আনন্দ সাগরে ভাসে,
সাধকের কি আছে জঞ্জাল ॥
[বিভীষি]কা *সেকি মানে, বোসে থাকে বীরাসনে,
কালীর চরণ করে ঢাল।

যাঁহারা এতদ্রূপ সাধনা রসের রসিক, তাঁহারা এই কবিতা পাঠ করিয়া পুলকে পরিপূর্ণ হইবেন।

নৌকাখণ্ডের সংগীত।

ওহে নূতন নেয়ে।
ভাঙ্গা নৌকা চল বেয়ে ॥
দুকূল রৈল দূর।
ঘন ঘন হানিছে চিকুর ॥
কেমন্ কেমন্ কর হে দেয়া।
মাজ্ যমুনায় ভাসে খেয়া ॥
[শু]ন ওহে গুণনিধি, নট হোক্ ছানাদধি,
কিন্তু মনে করি এই খেদ।
কাণ্ডারী যাহার হরি, যদি ডুবে সেই তরি,
মিছা তবে হইবেহে বেদ ॥
[যমু]না গভীরা ভাঙ্গা তরি, অবলা বালা কৃ-
[শো]দরী, প্রাণ রক্ষার তুমি মাত্র মূল।
[অবস]ান হোলো বেলা, একি পাতিয়াছ খেলা,
[ঝ]টি [২] পারে চল, প্রাণ নিতান্ত আকুল ॥
[কহি]ছে প্রসাদ দাস, রসরায় কিবা হাস,
কুলবধূর মনে বড় ভয়।

---

* সংবাদপ্রভাকরে যে যে শব্দগুলির পাঠোদ্ধার করা যায় নি, সেই শব্দগুলি তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় সাহিত্যনিধি সম্পাদিত 'রামপ্রসাদের গ্রন্থাবলী' (বসুমতী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ) থেকে পূরণ করে দিলাম। এই পাঠ বন্ধনী-চিহ্নের মধ্যে দেওয়া হল।—স.

[এক] অঙ্গ আধা আধা, তোমারি অধীনী রাধা,
তাহে এত বাদসাধা উচিত কি হয় ॥
[ও] নৌকা বাওহে ত্বরাতরি, নূতন কাণ্ডারী,
রঙ্গে ব্রজবধূর সঙ্গে।
[আতপ]র লাঘব হেতু, তরণি তর তরুণী চাল
মনের রঙ্গে ॥
[আ]পন কর হে পণ, চাও হে যৌবনধন,
হাস ভাস প্রেম তরঙ্গে।
[আ]গ চরাইতে ধেনু, বাজায়ে মোহন বেণু,
বেড়াইতে রাখালের সঙ্গে ॥
[এখন] হোয়েছ নেয়ে, কোন্ বা বিষয় পেয়ে,
ধেয়ে হাত দিতে এসো অঙ্গে।
[ভণে] দাস রামপ্রসাদ, হায় একি পরমাদ,
কায্ কি হে কথার প্রসঙ্গে ॥
[সময়] উচিত কও, কোনরূপে পার হও,
াম [? দোষ] আছে পাছে মন ভাঙ্গে।

এই দুই গীতে কি আশ্চর্য্য রস···র্য্য প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রথমাবস্থার গীত।

[(]মারে তরা বোলে, কেন না ডাকিলাম্।
এ তনু তরণি ভব সাগরে ডুবালাম্ ॥
এ ভব তরঙ্গে তরি, বাণিজ্যে আনিলাম্।
তেজিয়া অমূল্য নিধি, পাপে পুরাইলাম্ ॥১
বিষম তরঙ্গ মাঝে, চেয়ে না দেখিলাম্।
মন ডোরে ও চরণে হেলে না বাঁধিলাম্ ॥২
প্রসাদ বলে মাগো আমি, কি কায্ করিলাম্।
তুফানে ডুবিল তরি, আপনি মজিলাম্ ॥৩

এই গানের ব্যাখ্যা কি করিব ?

পতিত পাবনি তারা।
কেবল তোমার নাম সারা॥

তরাসে আকাশে বাস, বুঝেছি মা কাযের ধারা।

বশিষ্ঠ চিনিয়াছিলো, হাড়ভেঙ্গে শাঁপ দিলো, তদবধি হোয়ে আছো, ফণী যেন মণি হারা॥১

ঠেকেছিলে মুনির ঠাঁই, কার্য করণ তোমায় নাই, ঙয়ায় সয়, তয় রয়* সেইরূপ বর্ণপারা।২

দশের পথ বটে সোজা, দশের লাঠি একের বোঝা, লেগেছে দশের ভার, মনে শুধু চক্ষু ঠারা॥৩

পাগল ব্যাটার কথায় মোজে, এতকাল মলেম্ ভোজে, দিয়েছি গোলামি খৎ, এখন্ কি আর্ আছে চারা।৪

আমি দিলাম্ নাকে খৎ, তুমি দেও ফারখৎ, কালায় কালায় দাওয়া ঝুঁটা, সাক্ষি তোমার ব্যাটা যারা॥৫

বসতি ষোড়শ দলে, ব্যক্ত হোয়ে ভূমণ্ডলে, প্রসাদ বলে, কুতূহলে, তারায় লুকায় তারা।৬

সাধকেরা এই গানের রসগ্রাহি হইবেন।

নটবর বেশ বৃন্দাবনে, কালি হোলে রাসবিহারী।
পৃথক্ প্রণব, নানা লীলা তব, কে বুঝ এ কথা, বিষম ভারি॥
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ, আপনি নারী।
ছিল বিবসন কটি, এবে পীত ধটি, এলো চুল, চূড়া বংশীধারী॥১
আগেতে কুটিল নয়ন অপাঙ্গে, মোহিত করেছ দেব ত্রিপুরারি।
এবে নিজে কালো, তনু রেখা ভালো, ভুলালে নাগরী, নয়ন ঠারি॥২
ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন ত্রাস, এবে মৃদু হাস, ভুলে ব্রজকুমারী।
পূর্ব্বে শোণিত সাগরে নেচেছিলে শ্যামা, এবে প্রিয় তব যমুনা বারি॥৩
প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাষিছে, বুঝেছি জননি মনে বিচারি।
মহাকাল কালী, শ্যাম শ্যামতনু, একই সকলি বুঝিতে নারি॥৪
অভেদবাদি উপাসকেরা এই গীতের মর্ম্মজ্ঞ হইবেন।

---

* ঙ. য. ত. র. অর্থাৎ এক।

মা আমি পাপের আসামী।
এই লোক্‌সানি মহল লোয়ে বেড়াই আমি॥
পতিতের মধ্যে লেখা যায় এই জমী।
তাই বারে বারে নালিস্ করি, দিতে হবে কমা॥১
আমি মোলে, এই তরফে আর নাই হামি।
এখন্ ভাল না রাখতো, থাকুক্ রামরামি॥২
গঙ্গা যদি গর্ভে টেনে, লইল এ ভূমি।
কেবল কথা রবে, কোথা রব, কোথা পাবে তুমি॥৩

আমি ক্ষেমার খাস্ তালুকের প্রজা।
ক্ষেমঙ্করী আমার রাজা॥
চেননা আমারে শমন, চিন্‌লে পরে হবে সোজা।
আমি শ্যামা মার দরবারে থাকি, অভয় পদের বইরে বোঝা॥১
ক্ষেমার খাসে, আছি বোসে, নাই মহলে শুকা হাজা।
দেখ বালি চাপা, সিকস্ত নদী, তাতেও মহল আছে তাজা॥২
প্রসাদ বলে শমন তুমি, বোয়ে বেড়াও ভূতের বোঝা।
ওরে যে পদে ও পদ্ পেয়েছ, জাননা সে পদের মজা॥৩

মন্ কেনরে ভাবিস্ এতো।
যেন মাতৃহীন বালকের মত॥
ভবে এসে, ভাব্‌ছো বোসে, কালের ভয়ে হোয়ে ভীতো।
ওরে কালের কাল, মহাকাল, সে কাল মায়ের পদানত॥১
ফণি হোয়ে ভেকে ভয়, এ, যে বড় অদ্ভুতো।
ওরে তুই করিস্ কি কালের ভয়, হোয়ে ব্রহ্মময়ী সুতো॥২
[১০] মিছে কেন ভাব দুখে, দুর্গা দুর্গা বল মুখে, যেমন জাগরণে ভয়ং নাস্তি, হবে তোমার তেম্‌নি মত॥৩

এবার কালী কুলাইবো।
কালী কোবে কালী বুঝে লবো॥

কালী ভেবে, কালী হোয়ে, কালী বোলে, কাল্ কাটাইবো।
আমি কালা কালে, কালের মুখে, কালী দিয়ে চোলে যাবো ॥১
সে যে নৃত্যকালী, কি অস্থিরা, কেমন্ কোরে তায় রাখিবো।
আমার মন যন্ত্রে বাদ্য করি, হৃদিপদ্মে নাচাইবো ॥২
কালী পদের পদ্ধতি যা, মন্ তোরে তা জানাইবো।
আছে আর যে ছটা, বড় ঠেঁটা, সে কটাকে কেটে দিবো ॥৩
প্রসাদ বলে আর কেন মা, আর কত গো প্রকাশিবো।
আমার কিল্ খেয়ে কিল্ চুরি তবু, কালা কালা বাৎ নাছাড়িবো ॥৪

নামমালা ও স্তব।

জননি পদ পঙ্কজ দেহি শরণাগত জনে কৃপাবলোকনে তারিণি।
তপন তনয় ভয় চয় বারিণি ॥ ধুয়া ॥
প্রণব রূপিণী সারা, কৃপানাথ দারা তারা,
ভব পারাবার তরণী।
সগুণা নির্গুণা স্থূলা, সূক্ষ্মা মূলা হীনা মূলা,
মূলাধার অমল কমল বাসিনী ॥১
আগমনিগমাতীতা, খিল মাতা খিল পিতা,
পুরুষ প্রকৃতি রূপিণী।
হংস রূপে সর্ব্ব ভূতে, বিহরসি শৈলসুতে,
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি, ত্রিধাকারিণী ॥২
সুধাময় দুর্গানাম, কেবল কৈবল্য ধাম,
অজ্ঞানে জড়িত যেই প্রাণী।
তাপত্রয়ে সদা ভজে, হলাহল কূপে মজে,
ভণে রামপ্রসাদ তার, বিফল জানি ॥৩

পতিত পাবনী, পাবনী পরা, পরামৃত ফল দায়িনী।
স্বয়ম্ভু শিরসি সদা, সুখ দায়িনী ॥
সুদীনে চরণ ছায়া, বিতর শঙ্কর জায়া,
কৃপাম্বুরু স্বগুণে নিস্তার কারিণী ।১

পাপকৃত ফণিপুণ্য, বিষয় ভজনা শূন্য,
তারা রূপে তারয়, নিখিল জননি ॥২
ত্রাণ হেতু ভবার্ণব, চরণ তরণি তব,
প্রসাদে প্রসন্না ভব, ভব গৃহিণি ॥৩

ও, জননি, অপরা জন্ম জরা হরা, জননী।
অপারে, ভব সংসারে এক তরণি ॥
অজ্ঞানেতে অন্ধ জীব, ভেদ ভাবে শিবা শিব,
উভয়ে অভেদ পরমাত্মা রূপিণী।১
মায়াতীত নিজে মায়া, উপাসনা হেতু কায়া,
দয়াময়ী বাঞ্ছাধিক ফলদায়িনী ॥২
আনন্দ কাননে ধাম, ফল কি তারিণী নাম,
যদি জপে দেহান্তে শিব মানি।৩
কহিছে প্রসাদ দীন, বিষয় সুক্রিয়া হীন,
নিজ গুণে তারয় ত্রিলোক তারিণি ॥৪

মালসী।

আগমনী।

আজ্ শুভ নিশি, পোহাইল, তোমার, এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আনো ঘরে।

মুখ শশি দেখ আসি, দূরে যাবে দুঃখ রাশি, ও চাঁদ মুখের হাসি, সুধা রাশি ক্ষরে ॥

শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলো চুলে ধায় রাণী, বসন না সম্বরে।

গদগদ ভাব ভরে, ঝর ঝর আঁখি ঝরে, পাছে করি গিরি বরে, অমনি কাঁদে গলা ধোরে ॥১

পুন কোলে বসাইয়া, চারু মুখ নিরখিয়া, চুম্বে অরুণ অধরে।

বলে জনক্ তোমার গিরি, পতি জনম ভিখারী, তোমা হেন সুকুমারী, দিলাম দিগম্বরে ॥২

যত সহচরী গণ, হোয়ে আনন্দিত মন, হেসে হেসে ধরে করে।

কহে, বৎসরেক্ ছিলে ভুলে, এত প্রেম্ কোথা থুলে, কথা কহ মুখ তুলে, প্রাণ মরে মরে ॥৩

কবি রাম্‌প্রসাদ্ দাসে, মনে মনে কত হাসে, ভাসে আনন্দ সাগরে।

জননীর আগমনে, উল্লাসিত জগজনে, দিবা নিশি নাহি জানে, আনন্দ পাসরে ॥৪

কি সুমধুর! মধুররস ইহার নিকট কি মধুর।

এই গীত ও আর কয়েকটী গীতের রাগ, সুর ও তাল লিখিতে পারিলাম না, গায়ক মহাশয়েরা তৎসমুদয় প্রস্তত করিয়া গান করিলে পরম সুখলাভ করিবেন।

কালীকীর্ত্তনের গৌরচন্দ্রী।

গিরিবর, আর আমি পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা, কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন পান
নাহি খায় ক্ষীর ননি সরে ॥
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী,
বলে উমা ধোরে দে, উহারে।
আমি পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে ॥১
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন্ ও মুখ দেখি,
মায় ইহা সহিতে কি পারে ॥
আয়্ আয়্, মা, মা, বলি, ধরিয়ে কর অঙ্গুলি,
যেতে চায় না জানি কোথারে ।২
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কিরে ধরা যায়,
ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে ॥
উঠে বোসে গিরিবর, করি বহু সমাদর,
গৌরীরে লইয়া কোলে করে ।৩
সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা, এই লও শশী,
মুকুর লইয়া দিল করে ॥

মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ,
বিনিন্দিত কোটি শশধরে ।৪
শ্রীরাম প্রসাদ কয়, কত পুণ্য পুঞ্জচয়,
জগৎ জননী যার ঘরে ॥
কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিতা জগন্মাতা,
শোয়াইল পালঙ্ক উপরে ।৫

রণ বর্ণনা।

ও, কেরে, মনোমোহিনী। ঐ মনোমোহিনী ॥
ঢল ঢল তড়িৎপুঞ্জ মণিমরকত কান্তি ছটা।
ও, কেরে মনোমোহিনী।
একি চিত্ত চলনা, দৈত্য দলনা, ললনা,
নলিনী বিড়ম্বিনী ॥
সপ্ত পেতি, সপ্ত হেতি, সপ্তবিংশপ্রিয় নয়নী
শশিখণ্ড শিরোসী, মহেশ উরসী, হরের
রূপসী একাকিনী ॥২
ললাট ফলকে, অলকাঝলকে, নাসা নলকে,
বেসরে মণি।
মরিহে কিরূপ, দেখ দেখ ভূপ, সুধারসকূপ,
বদনখানি ॥৩
শ্মশানে বাস, অট্টহাস, কেশপাশ, কাদম্বিনী
বামা সমরে বরদা, অশূরে দরদা, নিকটে
প্রমোদা, প্রমাদ গণি ॥৪
কহিছে প্রসাদ, না কর বিষাদ, পড়িল প্রমাদ
স্বরূপে মানি।
নাহব জয়িরে, ব্রহ্মময়ী, রে, করুণাময়ীরে
বলজননী ॥৫

---

[১১] মধ্যমাবস্থার গীত।

কালো মেঘ উদয় হোলো, অন্তর অম্বরে।
নৃত্যতি মানস শিখী, কৌতুকে বিহরে॥
মা শব্দে ঘন ঘন গর্জ্জে ধারাধরে।
তাহে প্রেমানন্দ মন্দ হাসি তড়িৎ শোভা করে॥১
নিরবধি অবিশ্রান্তে নেত্রে বারি ঝরে।
তাহে প্রাণ চাতকের তৃষা ভয় ঘুচিল সত্বরে॥২
ইহ জন্ম, পর জন্ম বহু জন্ম পরে।
রামপ্রসাদ বলে আর জন্ম, হবেনা জঠরে॥৩

হয়েছি জোর ফরিয়াদী।
এবার বুঝে বিচার কর শ্যামা,
হয়েছি জোর ফরিয়াদী॥
মন করিছে জানিবদারি নেচে উঠে ছটা বাদি॥
অবিদ্যা বিমাতার ব্যাটা, তারা ছটা কাম আদি।
যদি তুমি আমি এক হইতো, পুরে হোতে দূর কোরে দি॥১
বিমাতা মরেন্ শোকে, ছটায় যদি আমল না দি।
সুখে নিত্যানন্দপুরে থাকি, পার হোয়ে যাই আশা-নদী॥২
হজুরে তজ্‌বিজ্‌ কর মা, হাজির ফরিয়াদি দাদি।
এই স্বোপার্জ্জিত ভজন ধন, সাধারণ নয় যে তাদি॥৩
মাতা আদ্যা, মহাবিদ্যা, অদ্বিতীয় বাপ্ অনাদি।
এমা তোমার পুতে, সতিন্ সুতে, জোর্ করে কার কাছে কাঁদি॥৪
প্রসাদ ভণে, ভর্সা মনে, বাপতো নহেন, মিথ্যাবাদী।
ঠেকে বারে বারে, খুব্ চেতেছি, আর কি এবার ফাঁদে পা দি॥৫

কালীপদ মরকত আলানে, মন কুঞ্জরেরে বাঁধ এঁটে।
কালী নাম তীক্ষ্ণ খড়্গে কর্ম্মপাশ ফেল কেটে॥
নিতান্ত বিষয়াসক্ত, মাথায় কর বেসার [বে]টে।
[ওরে একে] পঞ্চভূতের ভার, আবার, ভূতের বে[গার মর] খেটে॥১

সন্তপ্ত ত্রিতাপের তাপে, হৃদয় ভূমি গেল টেটে।
নব কাদম্বিনীর বিড়ম্বনা, পরমায়ু যায় ঘেঁটে ॥২
নানা তীর্থ পর্য্যটন, শ্রম মাত্র, পথ হেঁটে।
পাবে ঘরে বোসে চারি ফল, বুঝনারে দুঃখ চেটে ॥৩
রামপ্রসাদ বলে, কিসে কি হয়, মিছে মলেম্ শাস্ত্র ঘেঁটে।
এখন্ ব্রহ্মময়ীর নাম্ কোরে, ব্রহ্মরন্ধ্র যাক্ ফেটে ॥৪

মন আমার যেতে চায়গো, আনন্দ কাননে।
বট মনোময়ী সান্ত্বনা করনা এই মনে ॥
শিব কৃত বারাণসী, সেই শিব পদবাসী, তবু মন ধায় কাশী, রব কেমন।১
অন্নপূর্ণা রূপ ধর, পঞ্চ ক্রোশী পদে কর, নখজালে গঙ্গা মণিকর্ণিকা সনে ॥২
দ্বিপাশে অলক্ত আভা, অসি বরুণার শোভা, হোক পদারবিন্দে, হেরি নয়নে ॥৩
প্রসাদ আছে খেদযুক্ত, শান্ত কর। উপযুক্ত, কিবা কায অভিমুক্ত, পুরী গমনে ॥৪

কালি ব্রহ্মময়িগো।
বেদাগম পুরাণে, করিলাম কত খোঁজ্ তলাসি।
মহাকালী কৃষ্ণ, শিব রাম, সকল আমার এলোকেশী ॥
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে ধর বাঁশী।
ওমা রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি ॥১
দিগম্বরী দিগম্বর, পীতাম্বর, চিরবিলাসী।
শ্মশান বাসিনী বাসী, অযোধ্যা গোকুল নিবাসী ॥২
যোগিনী ভৈরবী সঙ্গে, শিশু সঙ্গে, এক বয়সী।
এমা অনুজ ধানকি সঙ্গে জানকী পরম রূপসী ॥৩
প্রসাদ বলে; ব্রহ্ম নিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সকল ঘরে, পদে গঙ্গা, গয়া, কাশী ॥৪

আমায় ধন দিবি তোর, কি ধন আছে।
তোমার কৃপাদৃষ্টি পাদপদ্ম, বাঁধা হরের [কাছে]
ও চরণ উদ্ধারের মা, আর কি উপায় আছে।
প্রাণপণে খালাস কর, টাটে ডুবে পাছে ॥১

যদি বল অমূল্য পদ, মূল্য কি তার আছে।
প্রাণ দিয়ে শব হোয়ে, বাঁধা রাখিয়াছে ॥২
বাপের ধনে বেটার স্বত্ব কার কোথা ঘুচেছে।
রামপ্রসাদ বলে কুপুত্রকে নিরংশি কোরেছে ॥৩

আর ভুলালে ভুল্‌বনা গো।
আমি অভয় পদ সার করেছি ভয়ে হেল্‌ব দুল্‌ব না গো ॥
বিষয়ে আসক্ত হোয়ে, বিষের কূপে উল্‌বনা গো।
সুখ দুঃখ ভেবে সমান্, মনের আগুন তুল্‌বনা গো ॥১
ধনলোভে মত্ত হোয়ে, দ্বারে দ্বারে বুল্‌বনা গো।
আশাবায়ুগ্রস্ত হোয়ে, মনের কথা খুল্‌ব না গো ॥২
মায়াপাশে বদ্ধ হোয়ে, প্রেমের গাছে ঝুল্‌ব না গো।
রামপ্রসাদ বলে দুধ্ খেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘুল্‌বনা গো ।৩

শ্যামা মারে ডাকো।
ভক্তি মুক্তি করতলে ভেবে দেখো ॥

পরিহরি ধনমদ, ভজ কোকনদ্ পদ, কালেরে নৈরাশ কর, কথা রাখো ।১
কালী কৃপাময়ী নাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম, অষ্টযামের অর্দ্ধ যাম, সুখে থাকো ॥২
রামপ্রসাদ দাস্ কয়, রিপু ছয় করি জয়, মারো ডঙ্কা, তেজ শঙ্কা দূরে হাঁকো ।৩

এ শরীরে কায্ কিরে ভাই, দক্ষিণে প্রেমে না গলে।
ওরে এ রসনায় ধিক্ ধিক্, কালীনাম নাহি বলে ॥

কালী রূপ যে না হেরে, পাপচক্ষু বলি তারে, ওরে সেই সে দুরন্ত মন, না ডোবে চরণ তলে।

সে কর্ণে পড়ুক বাজ, থেকে তার কিবা কায, ওরে সুধাময় নাম শুনে [চক্ষু না] ভাসালে জলে ॥

[১২] যে করে উদর ভরে, সে করে কি সাধ করে, ওরে না পূরে অঞ্জলি চন্দন জবা বিল্বদলে।

সে চরণে কায্ কিবা, মিছা শ্রম রাত্রি দিবা, ওরে কালীমূর্ত্তি যথা তথা ইচ্ছাসুখে নাহি চলে ॥

ইন্দ্রিয় অবশ যার, দেবতা কি বশ তার, রামপ্রসাদ বলে বাবুই গাছে, আম্র কি কদাচ ফলে ॥

ভাব্‌না কালী, ভাব্‌না কিবা।

অরে মোহময়ী রাত্রি গতা, সংপ্রতি প্রকাশে দিবা।

অরুণ উদয় কাল, ঘুচিল তিমির জাল, ওরে কমলে কমল ভাল্, প্রকাশ করেছে শিবা।১

বেদে দিলে চক্ষে ধূলা, ষড়দর্শনে সেই অন্ধগুলা, ওরে না চিনিলে জ্যেষ্ঠামূলা, খেলা ধূলা কে ভাঙ্গিবা ॥২

যেখানে আনন্দ হাট, গুরু শিষ্য নাস্তি পাট, ওরে যার নেটো, তারি নাট, তত্ত্বে তত্ত্ব কে পাইবা।৩

যে রসিক ভক্ত শূর, সেই প্রবেশে সেই পুর, রামপ্রসাদ বলে ভাঙ্গলো ভূর, আগুন বেধে কে রাখিবা ॥৪

আসার আশা আশা, কেবল আসা মাত্র হোলো।

চিত্রের কমলে যেমন, ভৃঙ্গ ভুলে গেলো ॥

খেল্‌ব বোলে ফাকি দিয়ে, নাবালে ভূতলো, এবার্ যে খেলা খেলালে মাগো, আশা না পূরিলো।১

নিম্ খাওয়ালে চিনি দিবে, কথায় কোরে ছলো,

ওমা মিঠার লোভে, তিক্ত মুখে, সারা দিন্‌টা গেলো ॥২

আছি তেঁই তরু তলে বোসে।

মনের আনন্দে হরিষে ॥

আগে ভাঙ্গবো গাছের পাতা ডাঁটি, ফল্ ধরিব শেষে। রাগ দ্বেষ, আদি দোষ, দেখে দর দেশে।

রব রসাভাসে, হা প্রত্যাশে, ফলিতার্থ বসে ॥১

ফলের ফলে, সুফল লোয়ে, যাইব নিবাসে।

আমার্ বিফল্‌কে ফল্ দিয়া, ফলাফল্ ভাসায়ে নৈরাশ্যে ॥২

মন্ কর কি লওরে সুধা, ভুজনাতে মিশে।

খাবে একই নিশ্বাসে যেন, সূর্য্য সম শোষে ॥৩

রামপ্রসাদ বলে, আমার কোষ্ঠ, শুদ্ধি "তত্ত্বাবেশে।"
মাগী জানেনা, যে, মন্ কপাটে খিল্ দিয়েছি কোশে ॥৪

শেষাবস্থার গীত।

ছি মন্, তুই বিষয় লোভা।
কিছু জাননা, মাননা, শুননা কথা,
ছি মন্, তুই বিষয় লোভা ॥
অশুচি শুচিকে লোয়ে দিব্য ঘরে কর শোভা।
যদি দুই সতিনে পীরিৎ হয়, তবে শ্যামা মারে পাবা ॥১
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থোবা।
ওরে জ্ঞান খড়্গে বলিদান, করিলে কৈবল্য পাবা ॥২
কল্যাণকারিণী বিদ্যা, তার বেটার মত লবা।
ওরে মায়াসূত্র, ভেদ সূত্র, তারে দূরে হাঁক্‌য়ে দেবা ॥৩
আত্মারামের অন্ন ভোগ, দুটো সেই মাকে দেবা।
রামপ্রসাদ্ দাসে, কয় শেষে, ব্রহ্মরসে মিশাইবা ॥৪

মন্ ভেবেছ তীর্থে যাবে।
কালী পাদপদ্ম সুধা তেজি, কূপে পোড়ে আপন্ খাবে ॥

ভব জরা পাপরোগ, লীলাচলে নানা ভোগ, ওরে জরে কাশী, সর্ব্বনাশী, ত্রিবেণী স্নানে রোগ্ বাড়াবে।১

কালীনাম মহৌষধি, ভক্তিভাবে পান বিধি, ওরে গান কর, পান কর, আত্মারামের আত্মা হবে ॥২

মৃত্যুঞ্জয় উপযুক্ত, সেবায় হবে আশু মুক্ত, ওরে সকলি সম্ভবে তাতে, পরমাত্মায় মিশাইবে।৩

প্রসাদ বলে মন্ ভায়া, ছাড় কল্পতরু ছায়া, ওরে কাঁটা বৃক্ষের তলে গিয়ে, মৃত্যুভয়টা কি এড়াবে ॥৪

ছিছি, মন্ ভ্রমরা দিলি বাজি।
কালী পাদপদ্ম সুধা তেজে, বিষয় বিষে হোলি রাজি॥
দশের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ, লোকে তোমায় কয় রাজাজী।
সদা নীচ সঙ্গে থাক তুমি, রাজা বট রীৎ পাজি॥১
অহঙ্কার মদে মত্ত, বেড়াও যেন কাজির তাজি।
তুমি ঠেক্‌বে যখন, জানবে তখন, কর্ম্মে কালে পাপোষবাজী॥২
বাল্য জরা বৃদ্ধদশা, ক্রমে যত হয় গতাজি।
পোড়ে চেরের কোটায়, মন টোটায়, যে ভজে সে মন্দ গাজি॥৩
কুতূহলে, প্রসাদ বলে, জরা এলে আস্‌বে হাজী।
যখন দণ্ড পাণি, লবে টানি, কি করিবে ও বাবাজী॥৪

কোন রাজার সভায় বসিয়া রাজ ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ এই গান রচনা করিয়াছিলেন।

মন্ জাননা শেষে ঘটিবে কি লেঠা।
যখন ঊৰ্দ্ধ বায়ু রুদ্ধ কোরে পথে দেবে কাঁটা॥
আমি দিন্ থাকিতে উপায় বলি, দিনের সুদিন যেটা।
ওরে শ্যামা মার চরণে মনে মনে হওরে আঁটা॥১
পিঞ্জরে পুষেছ পাখি, আটক্ করে কেটা।
ওরে জাননা, যে, তার ভিতরে দুয়ার আছে নটা॥২
পেয়েছ কুসঙ্গি সঙ্গি, ধিঙ্গি ধিঙ্গি ছটা॥
তারা যা বলিছে, তাই করিছে এমনি বুকের পাটা॥৩
প্রসাদ বলে মন্ জানতো, মনে মনে যেটা।
আমি চাতরে কি ভেঙ্গে হাঁড়ি, বুঝাইব সেটা॥৪

তারা আর কি ক্ষতি হবে।
হ্লাদেগো জননি শিবে॥
তুমি লবে লবে, বড়ই লবে, প্রাণকে আমার লবে॥

থাকে থাকে যায় যায়, এ প্রাণ যায় যাবে।
যদি অভয় পদে মন থাকে তো ক্ষায় কি আমার ভবে ॥১
বাড়ায়ে তরঙ্গ রঙ্গ, আর কি দেখাও শিবে।
একি পেয়েছ আনাড়ি দাঁড়ি, তুফানে ডরাবে ॥২
আপ্‌নি যদি, আপন্ তরি, ডুবাও ভবার্ণবে।
আমি ডুব দিয়ে জল খাব তবু, অভয় পদে ডুবে ॥

রামনিধি গুপ্তের জীবন চরিত।*

[৫] বৈদ্যকুলোদ্ভব ৺বাবু রামনিধি গুপ্ত মহাশয়, যিনি নিধু বাবু নামে বিখ্যাত ছিলেন। [?] তিনি বাঙ্গালা ১১৪৮ অব্দে ত্রিবেণীর নিকটস্থ চাঁপ্তা নামক গ্রামে স্বীয় জনকের মাতুল ৺রামজয় কবিরাজের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে বর্গির হেঙ্গামা ও নবাবী দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত রামনিধি বাবুর পিতা ৺হরিনারায়ণ কবিরাজ এবং পিতৃব্য ৺লক্ষ্মীনারায়ণ কবিরাজ এই দুই সহোদর কলিকাতার কুমারটুলির বাটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক উক্ত "চাঁপ্তা" গ্রামে পলায়ন করেন, তাঁহারা কিছুকাল তথায় অবস্থান করত বাঙ্গালা ১১৫৪ সালে কলিকাতায় পুনরাগমন পূর্ব্বক কুমারটুলির ভবনে পুনরায় অবস্থিতি করিলেন, এই স্থলেই রামনিধি বাবু বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত হইয়া কৃতবিদ্য হইলেন এবং তাঁহার দৈবশক্তির বিলক্ষণ সুলক্ষণ সাধারণ সমাজে দৃষ্ট হইতে লাগিল,— অনেকের নিকটেই তিনি সমাদৃত ও প্রেমাস্পদ হইলেন। নিধুবাবুর দুই কনিষ্ঠা সহোদরা ছিলেন, তাঁহার পিতা প্রথমা কন্যাকে পাতুরিয়াঘাটা নিবাসি ৺শিবচন্দ্র কবিরাজ এবং দ্বিতীয়াকে কাঁচরাপাড়া নিবাসি ৺দাতারাম কবিরাজকে সম্প্রদান করত লোকান্তর গমন করেন।— রামনিধি বাবু ১১৬৮ সালে "সুখচর" নামক গ্রামে প্রথম বিবাহ করেন। ১১৭৫ বর্ষে সেই প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে এক সন্তান প্রসূত হয়, নবকুমারের মুখাবলোকন পূর্ব্বক বাবু বিস্তর উৎসাহ প্রকাশ করেন।

অনন্তর যে সময়ে এই বঙ্গ দেশে ইংরাজদিগের স্থির প্রভুত্ব হয় এবং যখন সাহেবেরা এই রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশের রাজা ও ভূম্যধিকারিদিগের সহিত বন্দোবস্ত করেন, সেই সময়ে নিধুবাবু নিজ পল্লীস্থ ৺দেওয়ান রামতনু পালিত মহাশয়ের সহিত চিরণছাপরায় কর্ম্ম করিতে গমন করিলেন, তৎকালে জনাঞ্জি গ্রাম-বাসি সুবিখ্যাত ৺জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় ছাপরার কালেক্টর মেং মোণ্টগুমরি সাহেবের কেরাণির পদে অভিষিক্ত ছিলেন। রামতনু পালিত তথায় কিছুদিন দেওয়ানী কর্ম্ম করত বায়ুরোগে আক্রান্ত হইয়া একেকালেই অকর্ম্মণ্য হইলেন, তখন পালিত বাবুর সহিত রামনিধি বাবু ব্যতীত দ্বিতীয় ব্যক্তি এমত আর কেহই ছিলেন না, যিনি ঐ দেওয়ানী পদের যথার্থ উপযুক্ত

* সংবাদপ্রভাকর, শনিবার ১ শ্রাবণ, ১২৬১ সাল। ইং ১৫ জুলাই ১৮৫৪।—স.

পাত্র হয়েন। এই উপস্থিত ঘটনায় জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় উক্ত দেওয়ানী কর্ম্মের নিমিত্ত অত্যন্ত লোলুপ হইলেন, কিন্তু মনে মনে এমত বিবেচনা করিলেন যে নিধুবাবু এখানে বর্ত্তমান থাকাতে এ কর্ম্মটি তিনি কোনমতেই প্রাপ্ত হইতে পারেন না, একারণ শঠতা ও ছলনা পূর্ব্বক এক দিবস বাবুকে কহিলেন "আপনি কি ব্রহ্মহত্যা করিতে এখানে আসিয়াছেন?" ইহাতে বাবু বিস্ময়াপন্ন হইয়া উত্তর করিলেন "সে কি মহাশয়! আমি ব্রহ্মহত্যা করিতে আসিয়াছি, এ কেমন কথা হইল? আমি গো, ব্রাহ্মণের সেবক ও রক্ষক, অতএব আপনি বিজ্ঞ হইয়া আমার প্রতি এমত অন্যায় উক্তি কেন করেন?" তচ্ছ্রবণে মুখোপাধ্যায় কহিলেন "দেওয়ানী কর্ম্ম সাহেব আমাকে দিতে চাহেন, কিন্তু তোমার বিদ্যা, বুদ্ধি ও কর্ম্মদক্ষতা দেখিলে এ কর্ম্ম তোমাকেই দিবেন, আমাকে কখনই দিবেন না।" ব্রাহ্মণের প্রতি গুপ্ত বাবুর স্বভাবতঃ অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল, এজন্য কোনরূপ আপত্তি না করিয়া ঐ পদে মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অভিষিক্ত করণার্থ বিবিধ প্রকার যত্ন ও পোষকতাই করিলেন, এবং তিনি পদস্থ হইয়া যাহাতে কৃতকার্য্য হয়েন তদ্বিষয়ে সদুপদেশ ও সৎপরামর্শ দিয়া বিশেষ সহায়তা করত তাঁহার কেরাণগিরি কর্ম্মে স্বয়ং নিযুক্ত হইয়া কিছুকাল তৎকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিলেন।

ছাপরার কালেক্টরী কেরাণির কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নিধুবাবু তৎকালে তথায় সঙ্গীত বিদ্যায় সুপণ্ডিত জনেক যবন গায়ককে বেতন দিয়া নিযুক্ত করত স্বাবকাশ সময়ে তাহার নিকট সঙ্গীত-শাস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন। গীতবিদ্যা তৎপর যবনেরা প্রায় অত্যন্তই ক্রুর. সহজে কাহাকেই যথার্থরূপ উপদেশ প্রদান করে না। যখন ঐ বিদ্যায় বাবুর কিঞ্চিৎ সংস্কার জন্মিল তখন শিক্ষা দান বিষয়ে শিক্ষকের কার্পণ্য জানিতে পারিয়া মিয়া সাহেবকে সেলাম করিয়া কহিলেন "আমি তোমারদিগের জাতীয় যাবনিক গীত আর গান করিব না, আপনিই বঙ্গভাষায় হিন্দি গীতের অনুবাদ পূর্ব্বক রাগ রাগিনী সংযুক্ত করিয়া গান করিব।" ফলে তাহার অব্যবহিত পরে তাহাই করিলেন, অর্থাৎ উক্ত মুসলমান গায়ককে বিদায় দিয়া আপনিই রাগ রাগিনী, তাল মান, অনুসারে বাঙ্গালা গীত রচনা করণে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই নিধুবাবু ছাপরা জিলার মধ্যস্থিত "রতনপুরা" নামক গ্রামে গিয়া "ভিখনরাম" স্বামিজীউর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন, ঐ মহাশয় অত্যন্ত জ্ঞানী ও সাধু ছিলেন, "জ্ঞানানন্দ" গোস্বামির ন্যায় উক্ত মহাপুরুষের

অনেক অলৌকিক ক্রিয়া মানবমণ্ডলে ব্যক্ত আছে।—"জ্ঞানানন্দ" বামাচারী ছিলেন, "ভিখনরাম" দক্ষিণাচারী, তাঁহাকে সকলেই সিদ্ধপুরুষ কহিত। তিনি নিধুবাবুকে শান্ত, শ্রদ্ধাবান্, বিনয়ী, ভক্ত, সচ্চরিত্র ও দয়ালু দৃষ্টে এই বর প্রদান করিলেন, [৬] যে "তুমি সুখী ও খ্যাত্যাপন্ন হও" কিয়দ্দিন পরেই ঐ মহাপুরুষের এই মহা আশীর্ব্বাদ সত্য ও সফল হইল। হিন্দুস্থানে "সরিমিয়া" নামক ব্যক্তি যেমন অতিশয় বিখ্যাত সুকবি ও সুগায়ক ছিলেন, ইনি অত্যল্প দিবসের মধ্যেই বঙ্গদেশে অবিকল তদনুরূপ হইলেন।

এক দিবস জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আপনার আমলাদিগের প্রতি এতদ্রূপ আদেশ করিলেন যে "তোমরা চাকরি করিতে আসিয়াছ, অতএব উপার্জ্জনের পথ দৃষ্টি কর, এ সময়ে যে জমীদার তোমার দিগ্যে যাহা দিবে তাহাই লইয়া আপনাপন বাটীতে প্রেরণ কর। ইহাতে যদি তোমারদিগের উপর কোনরূপ আপদ বিপদ উপস্থিত হয় তবে আমি তাহা হইতে রক্ষা করিব। ভয় কি, নির্ভয়ে উপার্জ্জন কর ইত্যাদি" এবম্ভূত অপরিমিত অনুমতি শুনিয়া রামনিধিবাবু তৎক্ষণাৎ তৎকর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন।* ইহাতে দেওয়ানজী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন "বাবুজী আপনি যদি নিতান্তই কর্ম্ম না করেন, তবে আপনার প্রাপ্য ১০,০০০ দশ সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করত গৃহে গমন করুন" বাবু তাহাতেই সম্মত হইয়া তখনি তদনুরূপ কার্য্য করিলেন। পরন্তু তাঁহার ছাপরা হইতে কলিকাতায় আগমন কালে দেওয়ানজী এই অনুরোধ করিলেন, যে, "আপনি উত্তম কবি, অতি সুগায়ক, এবং রাগসাগর বিশেষ, অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক যদি প্রতি বৎসর ৺সরস্বতী পূজার দিবসে মৎপ্রণীত বাগ্‌দেবীর বন্দনাটি গান করেন তবে আমি অপরিমিত প্রীতি প্রাপ্ত হই" গুপ্ত মহোদয় তদ্বাক্যে অঙ্গীকৃত হইয়া তদবধি প্রতি-বর্ষেই শ্রীপঞ্চমীর দিবসে সরস্বতীর নিকট অঞ্জলি দিয়া দেওয়ানের কৃত এই গান করিতেন।

যথা।

"জয় জয় বাগ্‌বাণী" ইত্যাদি।

এই গীতের সংপূর্ণাংশ আমরা প্রাপ্ত হই নাই।

নিধুবাবু সহজেই সন্তোষচিত্ত ছিলেন, প্রায় কেহই তাঁহাকে বিষণ্ণ বা বিমর্ষ

* এই স্থলে এমত এক কিম্বদন্তী আছে, যে নিধুবাবু হিসাবের পুস্তকে স্ব রচিত গান লিখিয়াছিলেন, সাহেব তদ্দৃষ্টে বিরক্ত হওয়াতে তিনিও রোষ-পরবশ হইয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিলেন।

অথবা উৎকণ্ঠিত দেখিতে পান নাই, সর্ব্বদাই হাস্য পূর্ব্বক আমোদ প্রমোদে কাল ক্ষয় করিতেন। এমত কালে তাঁহার প্রথম পক্ষের পুত্রটী কৃতান্ত কুটীরে নীত হইল, এবং ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার সেই স্ত্রীও কালের গ্রাসে পতিতা হইলেন। এই স্ত্রী ও পুত্র বিয়োগে তিনি অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছিলেন, ইহাতে বিপুল বিলাপ বিশিষ্ট হইয়া অন্তঃকরণের আক্ষেপ নিবারণার্থ এই গীত রচনা করিয়াছিলেন।

যথা।

রাগিনী কেদারা।

তাল জলদ্ তেতালা।

মনোপুর হোতে আমার হারায়েছে মন।
কাহারে কহিব, কার দোষ দিব, নিলে কোন জন।

না বোলে কেমনে রব, বোলে বল কি করিব, তোমা বিনে আর, সেখানে কাহার গমনাগমন ।১

অন্যের অগমনীয়, জান সে স্থান নিশ্চয়, ইথে অনুমান, এই হয় প্রাণ, তুমি সে কারণ ॥২

যদি তাহে থাকে ফল, লোয়েছ কোরেছ ভাল, নাহি চাহি আমি, যদি প্রাণ তুমি, করহ যতন ॥৩

তদনন্তর ১১৯৭ সালে যোড়াসাঁকো পল্লীতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলেন, সে সংসারো অতি শীঘ্রই গত হইল, ইহাতে পুনঃ পুনঃ বিবাহ করণে নিতান্তই অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন, কিন্তু কি করেন, দৈব নির্ব্বন্ধ, খণ্ডন হইবার নহে। নানা প্রকার অনুরোধ বশতঃ ১২০১ কিম্বা ২ হায়নে "বরিজহাটি, চণ্ডীতলা" গ্রামের হরিনারায়ণ সেন মহাশয়ের তৃতীয় কন্যাকে তৃতীয় পক্ষে উদ্বাহ করিলেন, এই সংসারে তাঁহার তিনটী পুত্র ও কয়েকটী কন্যা জন্মে, তন্মধ্যে প্রথম পুত্র লোকান্তরিত হইয়াছেন, দ্বিতীয় পুত্র বাবু জয়চন্দ্র গুপ্ত এবং তৃতীয় পুত্র বাবু সুখময় গুপ্ত, অধুনা নিধুবাবুর এই দুই বংশধর বংশ রক্ষা করিতেছেন। ইঁহারদিগের উভয়ের অনেকগুলীন পুত্র কন্যা জন্মিয়াছে।

গুরুচরণ কবিরাজ ও গুরুদাস কবিরাজ, নিধুবাবুর এই দুইজন ভাগিনেয় অতিশয় কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন, বাবু তাঁহারদিগ্যে প্রাণাধিক জ্ঞানে যথোচিত স্নেহ করিতেন, ইঁহারা উভয়েই তাঁহার সংসারে প্রতিপালিত হইয়া যৌবনাবস্থায়

মায়িক দেহ পরিহার করাতে তিনি অত্যন্ত কাতর হইলেন এবং তদবধি সাংসারিক সুখ সম্বন্ধে এককালেই আসক্তি-হীন হইলেন, কি ঐশ্বর্য্য, কি পরিজন, কাহারো প্রতি আর কিঞ্চিন্মাত্র যত্ন করিতেন না, গৃহে থাকিয়া উদাসীনের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

ইনি উপকার ধর্ম্মকেই পরমধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া সাধ্যানুসারে পরোপকারে ত্রুটি করিতেন না, দায়গ্রস্ত ব্যক্তি নিকটস্থ হইলেই যথা সম্ভব দান দ্বারা তাহাকে তুষ্ট করিতেন। আপনি সংপূর্ণরূপে সাহায্য করণে অক্ষম হইলে অন্যকে অনুরোধ করিতেন। এইরূপে স্বতঃ পরতঃ যে প্রকারে হউক লোকের উপকার করিতে পারিলেই সুখী হইতেন, একারণ তাঁহার প্রশংসাপুষ্পের সুবাস সর্ব্বত্রই বিস্তৃত হইয়াছিল।

শোভাবাজারস্থ বটতলা নিবাসী ৺বাবু রামচন্দ্র মিত্র, যিনি এমিরিকান কাপ্তেনের মুচ্ছুদ্দি ছিলেন, এবং যাঁহার পুত্র সুবিখ্যাত বাবু জয়চন্দ্র মিত্র, অদ্যাপি বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার বাটীর উত্তরাংশে বড় এক [৭] খানা প্রসিদ্ধ আটচালা ছিল, নিধুবাবু প্রতি দিবস রজনীতে তথায় গিয়া সঙ্গীত বিষয়ের আমোদ করিতেন। ঐ স্থলে এই নগরস্থ প্রায় সমস্ত সৌখিন্ ধনি ও গুণিলোকেরা উপস্থিত হইয়া বাবুর সুধাময় কণ্ঠ বিনির্গত সুমধুর সঙ্গীত স্বরে মুগ্ধ হইতেন।

বাবু নারায়ণ মিশ্র মহাশয় পক্ষির দল করিয়া উক্ত প্রসিদ্ধ আটচালায় সর্বদাই উল্লাস করিতেন। পক্ষির দলের পক্ষি সকলেই ভদ্র সন্তান, ও বাবু এবং সৌখিন্ নামধারি সুখি ছিলেন। পাখির দলেরা নিধুবাবুকে কর্ত্তা বলিয়া অত্যন্ত মান্য করিত। পক্ষিগণ গাঞ্জার গুণানুসারে নাম পাইতেন। তাবতেই বাসা বাঁধিতেন, কুটা বহিতেন, ডিম পাড়িতেন, আধার খাইতেন ও বুলি ঝাড়িতেন।

যথা। পক্ষির বুলি।

"ভিবিণ্, কিটি কিটি, কিস্ কিসিন্"।
"চুহু মুহু চুহু, চুক্ চুহুণ্।"
"কিচি মিচি কিচি, কিচিন্ কিন্।"
"কুহু, রামলালিকে, কু, কু, গঞ্জা বিসং।"

"ছোট বিলের পাখি মোরা, বড় বিলের কে।
উড়িতে না পেরে পাখি পোষ মেনেছে ॥"
"কুকু, গাং সালিকে, কু, গঙ্গা বিসং" ইত্যাদি।

এই সমস্ত দ্বিপদ পক্ষির আকাশ-ভেদি বুলি সকল দ্বিপদ পক্ষিরাই বুঝিতে পারিতেন, অন্যের বুঝিবার সাধ্য কি? এমত জনরব যে এক ব্যক্তি পক্ষিদলে ভুক্ত হওনের অভিপ্রায়ে আসিয়া একাসনে বসিয়া একেবারে উপরি উপরি ১০০ এক শত ছিলিম্ গাঁজা খাইলেন, এই মাত্র অপরাধ ও বীরত্বের হানি হইল যে শেষ ছিলিমটি টানিবার সময়ে একবার একটুখানি খুক্ খুক্ করিয়া কাসিয়াছিলেন, এই লঘু দোষে পক্ষিরাজ তাঁহার গুরুদণ্ড করিলেন, অর্থাৎ তাঁহার নাম "ছাতারে পাখী" রাখিলেন। ইহাতে সে ব্যক্তি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রোদন বদনে বিস্তর বিনয় করিয়া কহিলেন "ধর্ম্মাবতার! এই যৎকিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র দোষেই কি আমাকে এত অপমান করা কর্ত্তব্য হয়।" এতদ্বাক্যে খগেশ্বর কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হইয়া উত্তর করিলেন "ওরে মূর্খ! জানিস্ তো, এখন আমি আর কি করিতে পারি? হাকিম্ ফেরেতো হুকুম ফেরে না। ভাল তোর স্তবে আমি তুষ্ট হইলাম, কিন্তু "ছাতারে" নাম একেবারে রহিত করিতে পারিব না, অতএব তোর নাম "স্বর্ণ ছাতারে" রাখিলাম।"

পাখির দলের আর আর বিস্তর রহস্যজনক ইতিহাস আছে, তাহা এস্থলে উল্লেখ করণের প্রয়োজন করে না।

পরন্তু নিধুবাবুর সংগীত বিদ্যার অনুরাগ ও নাম সম্ভ্রম সুন্দররূপে প্রকাশ হইলে বঙ্গদেশের নানা স্থান হইতে প্রধান প্রধান লোকেরা কলিকাতায় আগমন করত তাঁহার গান শুনিয়া সমূহ সন্তোষ লাভ করিতেন। ইঁহারা তাবতেই বাবুর নিকট আসিতেন, কিন্তু বাবু প্রায় কখনই কাহারো নিকট গমন করিতেন না, কারণ তিনি স্বাধীনতা সম্মানের উপর নিয়তই দৃষ্টি রাখিতেন, তোষামদাদি উপাসনাকে অত্যন্ত হেয় জ্ঞান করিতেন। কোন কোন প্রাচীন ব্যক্তি কহেন "বর্দ্ধমানাধিপতি মৃত মহাত্মা ৺তেজশ্চন্দ্র রায় বাহাদুর এতন্নগরে শুভাগমনানন্তর কোন রূপ কৌশলক্রমে তাঁহার গান শুনিয়াছিলেন।"

মুরশিদাবাদস্থ মৃত মহারাজ মহানন্দ রায় বাহাদুর এখানে আসিয়া বহুদিন অবস্থান পূর্ব্বক প্রতি দিবস এক নিয়মে বাবুর সহিত একত্র হইয়া মনের আনন্দে আমোদ প্রমোদ করিতেন। উক্ত মহারাজের শ্রীমতী নাম্নী এক রূপবতী গুণবতী বুদ্ধিশালিনী বারাঙ্গনা ছিল, ঐ বার-বিলাসিনী রামনিধি

বাবুকে অন্তঃকরণের সহিত ভালবাসিত ও অতিশয় স্নেহ করিত এবং বাবুও তাহার বিস্তর গৌরব ও সম্মান করিতেন। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করিতেন এই শ্রীমতী নিধুবাবুর প্রণয়িণী প্রিয়তমা বেশ্যা। কিন্তু অনেকে এ কথা অগ্রাহ্য করিয়া কহিতেন তিনি লম্পট ছিলেন না, কেবল স্তুতি, বিনয়, স্নেহ এবং নির্ম্মল প্রণয়ের বশ্য ছিলেন। এই প্রযুক্ত তাহাকে অতিশয় স্নেহ করিয়া প্রায় প্রতি রজনীতেই তাহার গৃহে গমন করিতেন, এবং কিয়ৎক্ষণ হাস্য পরিহাস, কাব্য আলাপ ও গীত বাদ্য করিয়া আসিতেন, আর সেখানে বসিয়া মনের মধ্যে যখন যেরূপ ভাবের উদয় হইত তৎক্ষণাৎ রাগ সুর বদ্ধ করিয়া তাহারি এক এক টপ্পা রচনা করিতেন।

১২১০ সালের পূর্ব্বে মৃত মহামতি মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের সময়ে বাঙ্গালি মহাশয়দিগের মধ্যে আকড়াই গাহনার অত্যন্ত আমোদ ছিল। তখন উক্ত মহারাজের নিকট কুলুইচন্দ্র সেন নামক একজন বৈদ্য আখ্‌ড়াই বিষয়ে অতিশয় প্রতিপন্ন ছিলেন। ঐ মহাশয় সংগীত শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পারদর্শী ছিলেন, তাঁহাকে আখ্‌ড়াই গাহনার একজন জন্মদাতা বলাই কর্ত্তব্য হয়। যদিও তাঁহার পূর্ব্বে ও তৎসমকালে উক্ত বিদ্যায় বিশেষ নিপুণ আর কয়েক ব্যক্তি এতন্নগরে ও চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থানে সজীব ছিলেন, তথাচ এই মহাশয়কে তাঁহারদিগের সকলের অপেক্ষা প্রধান কহিতে হইবেক, যেহেতু ইনি আপন ক্ষমতা ও শক্তি দ্বারা পুরাতন বিষয়ের কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তন করত অনেক নূতন সৃষ্টি করেন। সুর ও গীতকে নানা প্রকার রাগ রাগিনীতে যুক্ত করত নূতন নূতন বাদ্যের সূচনা করিয়াছিলেন। ঐ কুলুইচন্দ্র সেন ৺রামনিধি গুপ্তের অতি নিকট সম্বন্ধীয় মাতুল ছিলেন। আখ্‌ড়াই [৮] গীতের ইনি যে সকল নূতন প্রণালী করেন সেই প্রণালীই অদ্যাবধি প্রচলিত রহিয়াছে।

১২১০ সালে যখন মহামান্য মহারাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুর আখ্‌ড়ায়ী আমোদে আমোদী হইলেন তখন শ্রীদাম দাস রাম ঠাকুর ও নসিরাম সেক্‌রা প্রভৃতি কয়েকজন সর্ব্বদাই আখ্‌ড়াই সংগীতের সংগ্রাম করিত, ইহারা তাবতেই এ বিষয়ে বিশেষ পণ্ডিত ছিল, কিন্তু সৌখিন্ ছিল না, পেসাদারি করিয়া টাকা লইত।

১২১১ অব্দে নিধুবাবুর উদ্যোগে এতন্নগরে দুইটী সংশোধিত সখের আখ্‌ড়াইদলের সৃষ্টি হইল। তাহার এক পক্ষে বাগবাজার ও শোভাবাজারস্থ সমুদয় ভদ্র সন্তান এবং আর এক পক্ষে মনসাতলা অথবা পাতুরেঘাটা নিবাসি

৺নীলমণি মল্লিক মহাশয় ও তাঁহার বন্ধুবর্গ ব্রতি হইলেন। আখ্ড়াই যুদ্ধের স্থিরতায় নাম "বদী" ও পক্ষ প্রতিপক্ষের নাম "বাদী" এই উভয় দলে "বদী" হইলে নিধুবাবু বাগবাজারের পক্ষ হইয়া গীত ও স্থর প্রদান করিলেন, এবং মল্লিকবাবুর পক্ষে শ্রীদাম দাস প্রভৃতি কয়েকজনে গীত ও স্থর প্রস্তুত করণার্থ প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সংগীত সংগ্রাম শ্রবণ দর্শন করত নগরস্থ সমস্ত বিশিষ্ট লোক অপর্য্যাপ্ত আনন্দসাগরে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে সখের আখ্ড়াই স্থাপিত হইলে ব্যবসায়িদিগের আখ্ড়ায়ের দল একেবারে উঠিয়া গেল।

সখের আখ্ড়ায়ের এতদ্রূপ সূত্র সঞ্চার হইলে কিছুদিন পরে অনেকেই তদ্বিষয়ে অনুরাগি হইলেন। পাতুরেঘাটাস্থ মহামান্য ঠাকুরবাবুরা, যোড়াসাঁকো পল্লীস্থ সুবিখ্যাত সিংহবাবুরা, গরাণহাটা নিবাসী সম্ভ্রান্ত ৺বাবু কৃষ্ণমোহন বসাখ, শোভাবাজারস্থ খ্যাত্যাপন্ন ৺কালীশঙ্কর ঘোষ মহাশয়ের পুত্রগণ এবং শ্যামপুকুর পল্লীবাসি ৺দিগম্বর মিত্র ও হলধর ঘোষ প্রভৃতি কতিপয় বন্ধু, ইহাঁরা প্রত্যেকেই আপনাপন পল্লীতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে এক একটা দল করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারদিগের সকলেরি সহিত বাগবাজারের দলের দুই একবার করিয়া যুদ্ধ হইয়াছিল। এমত শুনিতে পাই, সেই সমস্ত সময়ে বাগবাজারের পক্ষেই অধিক সংখ্যায় জয়লাভ হইয়াছে, কারণ এ পক্ষে স্থর ও গীত বিষয়ে ৺রামনিধি গুপ্ত এবং গাহনা পক্ষে অদ্বিতীয় স্বরসিদ্ধ সুরজ্ঞ কোকিলকণ্ঠ বাবু মোহনচাঁদ বসু প্রভৃতি গায়ক, সুতরাং দুই দিক্ উত্তম হওয়াতেই বাগবাজারের জয়ের সম্ভাবনাই অধিক ছিল। কিন্তু ইহাঁরা নিতান্তই পরাজয় হয়েন নাই, এমত নহে, গাহনা বাজনার জয় পরাজয় "হাওয়ার" উপরেই নির্ভর করে। গীত, স্থর ও গায়ক, এই তিন সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইলেও এক এক দিন "হাওয়ার" দোষে জমাট্ হয় না, ফাকে ফাকে উড়িয়া যায়। যাঁহারা সকল বিষয়েই অপকৃষ্ট, দৈববশতঃ "হাওয়ার" গুণে তাঁহারা এমত "লগ্ন" করেন যে তচ্ছ্রবণে শ্রোতৃমাত্রেই সীমাশূন্য সন্তোষ-সাগরে মগ্ন হইতে থাকেন, বিশেষতঃ রাগ রাগিনীর খেলা, ছেলে খেলা নহে, অতিশয় কঠিন। যে সময়ের যে রাগ, সেই সময়টী না হইলে সে রাগের রাগ থাকে না, ইহাতে সময়ের বৈলক্ষণ্য জন্য রাগের অনুরাগ না হইয়া সহজেই বিরাগ হইতে পারে। যাহা হউক, সকল পক্ষই পরস্পর জয়ি ও যশস্বি হইবার জন্য যথাযোগ্য যত্নের ত্রুটি করেন নাই, সাধ্যমত সাধন করিয়াছেন, ইহাতে কোন কোন-বার বাগবাজারের দল পরাভব হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কোনবারে সর্ব্বতোভাবেই পরাভব হয়েন নাই।

বাগবাজার বাসী সর্ব্বত্র বিখ্যাত শ্রীমান্ বাবু মোহনচাঁদ বসু প্রথমেই আখ্‌ড়াই গাহনার প্রধান গায়কের পদে ব্রতী হয়েন নাই, যখন তিনি বালক ছিলেন, তখন জীল দিতেন। তাহার কতিপয় বৎসর পরেই তিনি প্রধানের পদ প্রাপ্ত হইলেন। বাঙ্গালির মধ্যে এই বঙ্গদেশে তাঁহার ন্যায় বাঙ্গালা গাহনা বিষয়ে ইদানীং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগ্য ব্যক্তি দ্বিতীয় আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই, নিধুবাবু ইঁহাকে প্রাণাপেক্ষা স্নেহ করিতেন, যেহেতু তাঁহার কৃত কি "আখ্‌ড়াই" কি "টপ্পা" ইনি যখন যাহা গাহিতেন, তখন তাহাতেই মধুবৃষ্টি করিতেন। মোহন চাঁদের স্বর শ্রবণে আহা, আহা শব্দে অশ্রুপাত না করিয়াছেন এমত ব্যক্তি কেহই নাই। এই মহাশয় স্বয়ং হাফ আখড়ায়ের সৃষ্টি করত বঙ্গদেশস্থ সমস্ত লোককে মুগ্ধ করিয়াছেন, এবং দাঁড়া কবির যে সকল সুর ও রথ, দোল এবং সংকীর্ত্তন প্রভৃতির যে যে সুর করিয়াছেন তাহাই পীযষ [পীযূষ] পরিপূর্ণ। যদি বীণা যন্ত্রের বাদ্য শ্রবণে লোকের অরুচি হয়—যদি কোকিল কুলের সুমধুর কুহু ধ্বনি শ্রবণে বিরক্তি জন্মে—যদি মধুকরের মধু মিশ্রিত ঝঙ্কার রব বিষ বোধ হয়, তথাচ মোহনচাঁদবাবুর সুর ও স্বর শুনিতে মুহূর্ত্তকালের জন্য কাহারো মনে বিরক্তি জন্মে নাই, বরং ক্রমে লালসার বৃদ্ধিই হইয়াছে। কি কলিকাতা, কি তন্নিকটস্থ সমস্ত গ্রাম, কি দিল্লী, কি লাহোর ইত্যাদি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের যে যে স্থানে বাঙ্গালি বাবুরা বিরাজ করিতেছেন, সেই সেই স্থানেই বসুবাবুর গুণ ব্যাখ্যা হইতেছে ও নাম জাগরূক রহিয়াছে, যেহেতু তাঁহারা তাঁহার প্রণীত সুর গাহিয়া সর্ব্বদাই আমোদ করিতেছেন। এই মহাশয় কন্দর্পের ন্যায় অতি সুপুরুষ ছিলেন, ইহা লেখা বাহুল্য মাত্র, কারণ পাঠকগণের মধ্যে [৯] অনেকেই পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখিয়াছেন এবং এইক্ষণেও দেখিতেছেন। হায় কি দৈব-বিড়ম্বনা! রসের দোষে অধুনা তাঁহার সে দেহ নাই, সে রূপ নাই, সে ভাবভঙ্গি কিছুই নাই, যেন সে তিনি আর তিনিই নহেন। চারি পাঁচ বৎসর হইল জগদীশ্বর তাঁহার প্রতি প্রতিকূল হইয়া কখনো শয্যাগত, কখনো কিঞ্চিৎ সুস্থ করিতেছেন। এই মৃতবৎ অবস্থাতেও যিনি তাঁহার মুখে গান শুনিবেন তিনিই চমৎকৃত হইয়া সাধুবাদ প্রদান করিবেন। অত্যন্ত কাতর হইয়া প্রার্থনা করি করুণাময় পরমেশ্বর তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া শীঘ্রই পূর্ব্ববৎ আরোগ্য প্রদান করুন।

যদিও দৈবশক্তি দেবীর অনুগ্রহেই মোহনচাঁদ বাবুর এতদ্রূপ নাম সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি হইয়াছে, তথাচ ৺রামনিধি গুপ্ত মহাশয়কেই তাঁহার সর্ব্ব বিষয়েরি

মূলাধার কহিতে হইবেক, কেননা তাঁহারি দ্বারা শিক্ষা ও তাঁহারি দ্বারাই সংস্কার। লোকে অদ্যাবধি মোহনচাঁদ বাবুকে নিধুবাবুর "খাসভাণ্ডার" কহিয়া থাকে।

এই স্থলে কেহ এমত আপত্তি তুলিতে পারেন যে মোহনচাঁদ বাবুর পূর্ব্বে যোড়াসাঁকোস্থ বাবু রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় এবং পাতুরেঘাটার বাবু রামলোচন বসাখ প্রভৃতি কয়েকবার "হাফ আখ্ড়াই" করিয়াছিলেন। কিন্তু এ কথা কথাই নহে, তাহাকে কখনই হাফ আখ্ড়াই বলা যাইতে পারে না, কেননা তাঁহারা "পেসাদারি দাঁড়া কবির সুরে" গান করিয়া কেবল বসিয়া গাহিতেন। মোহনচাঁদ আখ্ড়াই ভাঙ্গিয়া হাফ আখ্ড়ায়ের নূতন ধরণের সুর করিয়া যৎকালে বড়বাজারস্থ শ্রীযুত বাবু রামসেবক মল্লিক মহাশয়ের ভবনে শীতকালে এক শনিবারের রাত্রিতে গাহনা করিলেন, বোধহয় তৎকালে প্রশংসার শব্দে বাটীর থাম পর্যন্ত কাঁপিয়াছিল, সে বারে যোড়াসাঁকো ও পাতুরেঘাটার সংযোজিত মহাশয়েরা সংপূর্ণরূপে পরাজয় হইয়া পরে সেই দৃষ্টান্তানুসারে সুর প্রস্তুত করণে শিক্ষিত হইলেন, তথাচ তাঁহারা অদ্যাবধি তদ্বৎ উৎকৃষ্টরূপে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।

আখ্ড়াই গীতের উত্তর প্রত্যুত্তর নাই, যাঁহারদিগের সুর ও গাহনা ভাল হইত, তাঁহারাই জয়-পতাকা প্রাপ্ত হইয়া ঢোল বাজিয়া আনন্দ পূর্ব্বক গমন করিতেন। উভয় পক্ষেই তিনটি করিয়া গীত গাহিতেন, প্রথমে এক একটী "ভবানী-বিষয়" পরে এক একটি "খেউড়" সর্ব্বশেষে এক একটি "প্রভাতী" সর্ব্বদাই দুই দলে যুদ্ধ হইত, কোন কোন বার তিন দলেও সংগ্রাম চলিয়াছে। ভবানী বিষয়ের মহড়ায় ২৬ টী অক্ষরে একটী ত্রিপদী, চিতেনে ঐ রূপ একটী ত্রিপদী এবং পাড়েনে দুইটি ত্রিপদী। ইহাতেই কেবল সুর ও রাগ রাগিনীর পাণ্ডিত্য এবং বাদ্যের পারিপাট্য। সঙ্গতের বাদ্য "পিড়েবন্দি" "দোলন" দৌড়" সব-দৌড়" এবং গান সমাপন সময়ে যে বাদ্য তাহার নাম "মোড়" কি মহড়া" কি "চিতেন" ও কি "পাড়ন" সকল গাহনার বাদ্য প্রায় একরূপ, কিঞ্চিৎ প্রভেদ মাত্র, ত্রিপদীর একটী পদ যথা।

"নিশ্চিত ত্বং নিরাকারা"।

এই কএকটী কথা গাহিতে গাহিতে যেমন রাগ রাগিনীর পরিবর্ত্তন অমনি তৎসঙ্গে সঙ্গেই বাদ্যের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। সঙ্গত, যথা প্রথমে

পিড়েবন্দি, পরে দোলন, তৎপরে দৌড় সর্ব্বশেষে সব-দৌড়। প্রথমে মহড়া গাহিয়া গায়কেরা একবার বিশ্রাম করেন, ঐ সময়ে সাজ বাজিয়া থাকে, সেই সাজ সাঙ্গ হইলে আবার চিতেন ধরেন, চিতেন সাঙ্গ হইলে আবার সাজ বাজে, তৎপরে পাড়ন গাহিয়া গান সমাপন করেন।

ঠাকুরাণী বিষয়ে গাহনার নিয়ম ও সঙ্গতের নিয়ম যেরূপ, খেউড় ও প্রভাতির নিয়ম অবিকল সেইরূপ।* এই সঙ্গত প্রকৃতই সঙ্গত, ইহাতে অসঙ্গত হওনের বিষয় কি? এই গীত ও বাদ্যের মিছিল অর্থাৎ প্রণালী অতি আশ্চর্য্য, একরূপ অদ্ভুত নূতন সৃষ্টি বলিলেই হয়, ইহাতে এরূপ সুকৌশল আছে যে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় অদ্বিতীয় সংগীত তৎপর গায়ক ও বাদ্যকর মহাশয়েরা কোন ক্রমেই সহজে তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন না, এবং নিয়ত এক বৎসর শিক্ষা না করিলে কখনই সঙ্গত করিতে সমর্থ হইবেন না। অপিচ কোন্ কোন্ তালের সহযোগে আখ্ড়াই তালের রচনা হইয়াছে তাহাও আশু অনুধাবন করিতে পারিবেন না, শ্রবণ মাত্রেই নূতন প্রকার চমৎকার বোধ হইবে।

আখ্ড়াই খেউড় ও প্রভাতী গীতে কি মহড়া, কি চিতেন, কি পাড়ন অর্থাৎ অন্তরা ইহার প্রত্যেকেতেই চতুর্দ্দশটি অক্ষর, অর্থাৎ একটি করিয়া "পয়ার"।

যথা, খেউড়।

মহড়া।

অনেক যতনে প্রেম, তোমার সহিতে।

দেওরা ইত্যাদি।

যথা, প্রভাতী।

মহড়া।

না হোতে সুখের শেষ, প্রভাত হইল।

দেওরা ইত্যাদি।

---

* 'রামনিধি গুপ্ত তথা আখড়া' অধ্যায়ে ঈশ্বর গুপ্ত খেউড় ও প্রভাতী সম্পর্কে নিজের উক্তি সংশোধন করেছেন।—স.

যথা, ভবানী বিষয়।

মহড়া।

নিশ্চিত ত্বং নিরাকারা, অজ্ঞান বোধে, সাকারা, তত্ত্বজ্ঞানে চৈতন্যরূপিনী।
করুণাময়ী ইত্যাদি।

আখ্‌ড়াই তিন গানের ভিন্ন ভিন্ন তিনখানি সাজ, সে সাজের ভিতর যে কত সাজ, তাহার কি ব্যাখ্যা করিব? যখন বাজে তখন বাজে লোকের বুঝিবার সাধ্য কি? ফলে যৎকালে এক পক্ষের সাজ উত্তমরূপে [১০] বাজে, তৎকালে বিপক্ষদিগের হৃদয়ে বাজে ইহাতে সন্দেহ কি?

আখ্‌ড়াই বাজনার প্রধান যন্ত্র, "তানপুরা, বেহালা, মন্দিরে, ঢোল, মোচঙ্গ, খরতাল", সিটি ইত্যাদি, ইহার সঙ্গে, সপ্তসারা, জলতরঙ্গ, বীণা, বেণু, সেতার প্রভৃতি যত যোগ কর, ততই উত্তম, কিন্তু না করিলে কিছুমাত্র হানি হয় না। আখ্‌ড়াই ঢোল বাজানা যে প্রকার নূতন তাহার বেহালার গৎ সকলি সেই প্রকার নূতন, কোন কোন আখ্‌ড়াই সম্প্রদায় ২০।২১ খান পর্যন্ত যন্ত্র একত্র বাজাইয়াছেন।

আখ্‌ড়াই গাহনা সর্ব্বশেষে স্বর্গগত সুবিখ্যাত বহু গুণজ্ঞ ৺রাজা গোপীমোহন বাহাদুরের ভবনে যতবার হইয়াছে, এত অধিক আর কোন খানেই হয় নাই। আমরা কোন প্রামাণ্য প্রাচীন পুরুষের প্রমুখাৎ পরিজ্ঞাত হইয়াছি, সংগীত বিদ্যায় অত্যন্ত নিপুণ কোন ইংরাজ উক্ত রাজ-নিকেতনে একবার সমস্ত রাত্রি জাগরণ পূর্ব্বক আখ্‌ড়াই শুনিয়া কি গাহনা কি বাজানা উভয় বিষয়েই অত্যন্ত মোহিত হইয়াছিলেন এবং গমন কালীন তিনি বিস্তর প্রশংসা করিয়া বিদায় হইলেন।

আখ্‌ড়াই গাহনা যে প্রকার বাহুল্য ব্যাপার তাহাতে কোন মতেই গীতের উত্তর প্রত্যুত্তর হইতে পারে না, কারণ ১০।১২ জন গায়ক একত্র হইয়া ক্রমশঃ এক বৎসরকাল সুর ও তাহার মিছিল সমুদয় অভ্যাস করত গলার মিল করিয়া যখন দুই তিন গোপনীয় সভা করিয়া দেখেন যে সকল দিক্ সমান হইয়াছে, আর কোনরূপ অনৈক্য বা দোষ নাই, তখন পরস্পর সম্মত হইয়া প্রকাশ্য যুদ্ধের দিন স্থির করেন।

আখ্‌ড়াই সাজের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠই ঢোল, তাহার নীচেই বেহালা। পূর্ব্বে

যত ব্যক্তি ঢোল বাজাইয়াছেন তন্মধ্যে বাগবাজার নিবাসি ৺রসিকচাঁদ গোস্বামি মহাশয়ের অপেক্ষা প্রধান আর কেহই হয়েন নাই, এবং উক্ত পল্লীস্থ ৺বাবু রাধানাথ সরকারের অপেক্ষা বেহালা বিদ্যায় কেহই নিপুণ ছিলেন না। গোস্বামির ঢোল ও সরকার বাবুর বেহালা যিনি না শুনিয়াছেন, তাঁহার কর্ণই বৃথা।

গরাণহাটাস্থ বাবু কৃষ্ণমোহন বসাখ অনেকবার দল করিয়াছিলেন, তাঁহার দলে "গোবিন্দ" নামক একজন মালা স্থর করিত, সে ব্যক্তি এ বিষয়ে অত্যন্ত নিপুণ ছিল, এবং রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে ব্রহ্ম সভায় ব্রহ্মসংগীত গান করিত। ঐ গোবিন্দ এইক্ষণে জীবিত নাই।

শোভাবাজারে একবার মাত্র দল হইয়াছিল, সেবারে ৺কালীশঙ্কর ঘোষ মহাশয়ের বাটীতেই বাগবাজারের দলের সহিত সংগ্রাম হয়, তাহাতে সেতার বিদ্যায় অদ্বিতীয় পারদর্শী ৺মাধবচন্দ্র ঘোষ মহাশয় গোবিন্দ মালার সহিত একত্র হইয়া শোভাবাজারের পক্ষে স্থর প্রস্তুত করেন।

শ্যামপুকুরের মহাশয়েরা কেবল একটীবার দল করেন, তাহাতে তৎপক্ষে কাঁচরাপাড়া নিবাসী বৈদ্যবংশ্য শ্রীযুত বাবু রামচাঁদ রায় মহাশয় স্থর ও গীত প্রস্তুত করিয়া দেন, ইনি এ বিষয়ে ও সংগীত বিদ্যায় অতিশয় যোগ্য, কিন্তু ইহাঁর আখ্‌ড়াই স্থরের পদ্ধতি শিক্ষা বাগবাজার হইতেই হইয়াছে। আখ্‌ড়াই সম্পর্কীয় প্রায় তাবতেই গত হইয়াছেন, কেবল ঈশ্বরানুগ্রহে অধুনা এই মহাশয় এবং বাবু মোহনচাঁদ বসু মাত্র জীবিত আছেন।

৩০ বৎসর হইল আখ্‌ড়াই গাহনা রহিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে অনেকে অনেকবার উদ্যোগ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ১২৬০ সালের চরমকালে শ্যামপুকুরে নব্য বাবুরা কয়েক মাস চাগিয়া উঠিয়াছিলেন, শেষ ৬১ সালের পদার্পণেই শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিলেন। অনেকের মনে এমত আশা জন্মিয়াছিল যে বহুকালের পর আখ্‌ড়াই শুনিব। তাহা না হওয়াতে "অজা যুদ্ধে ঋষি শ্রাদ্ধে" ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করিতে হইল।

বাঙ্গালার মধ্যে আখ্‌ড়াই গাহনায় অনেক সভ্যতা ও পাণ্ডিত্য আছে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, এই যে, অতি অল্পকালের মধ্যেই এই ব্যাপার একেবারে লোপ হইয়া গেল, আর তাহার পুনরুত্থানের সম্ভাবনা দেখিতে পাই না। কাল সহকারে মানুষের মনের অবস্থা যত পরিবর্ত্তন হইতেছে, ততই তাহার সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতন আমোদ প্রমোদের উচ্ছেদ হইতেছে।

আখড়ায়ের সৃষ্টি কর্ত্তা কোন্ ব্যক্তি আমরা স্থির রূপে ইহার নিশ্চয় করিতে পারিলাম না। কিন্তু অনেকেই শেষে ৺কুলুইচন্দ্র সেন মহাশয়কে ইহার জন্মদাতারূপে নির্ণয় করিয়াছেন। এ বিষয়ে অপর এক প্রমাণ এই, বহুদিন হইল "কবিওয়ালা ৺ভোলা ময়রা এক লহর গায়" সেই লহরের একস্থানে এরূপ বর্ণনা ছিল "আখড়ায়ের সৃষ্টি কোল্লে কুলুইচন্দ্র সেন"—বঙ্গদেশের অপর স্থানের কথা দূরে থাকুক্ এই কলিকাতার অতি নিকটস্থ অনেকের কর্ণকুহরেই আখড়ায়ের গীত বাদ্য ধ্বনিত হয় নাই।

৺রামনিধি গুপ্ত মহাশয় এই আখড়ায়ের বিস্তর শ্রীবৃদ্ধি করেন তাঁহাতে কোন সন্দেহ নাই, এবং সর্ব্বশেষে তাঁহার প্রণীত সংশোধিত পদ্ধতিই প্রচলিত হইয়াছিল।

কয়েক বৎসর অতীত হইল নিধুবাবু কৃষ্ণমোহন বসাক বাবুর সহিত মাহেশের স্নানযাত্রার মেলা দেখিতে গিয়া অষ্টাহ নৌকার উপরেই বাস [১১] করেন, তাহার মধ্যে এক দিবসও সংগীতের আমোদ হয় নাই। কেবল বাবুর বাক্ কৌশল ও রসিকতাতেই সকলে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ইনি অতিশয় রসিক হইয়াও অত্যন্ত গম্ভীর ছিলেন, তাঁহার মুখের পানে মুখ করিয়া "বাবু একটী গান কর" এমত কথা কহিতে কাহারো সাহস হইত না। ইনি দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে কালযাপন করিয়াছেন।

এই মহাশয়ের মৃত্যুর ২০ কিম্বা ২৫ বৎসর পূর্ব্বে অনেকেই কহিত "তিনি জীবিত নাই" এই সূত্রে পরস্পর কত বাজী রাখারাখি হইয়াছিল। এবং এই উপলক্ষে কেহ কেহ তাঁহারি নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "মহাশয় কি অদ্যাপি সজীব আছেন?"

বটতলার আমোদের স্থান ভঙ্গ হইলে বাগবাজার নিবাসী ৺দেওয়ান শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে ও সাহায্যে ঐ বাগবাজারস্থ ৺রসিকচাঁদ গোস্বামির ভবনে কিছুদিন বাবুর বৈঠক হয়, সেই স্থানে আহ্লাদের ব্যাপার অতি বাহুল্যরূপেই হইয়াছিল, তথায় বসিয়া সময়ে সময়ে যে সকল টপ্পা ও অন্য গীত রচনা করিতেন তাহার ভাব ও রাগ সুর অতি মনোহর হইত। ৺রাজা রাজবল্লভের কালোয়াঁৎ "আবুবরস্ খাঁ" তচ্ছ্রবণে কহিয়াছিল, একাধারে এক ব্যক্তি হইতে এরূপ হওয়া অত্যন্ত অসম্ভব, অতএব দৈবশক্তি ব্যতীত কখনই এমত সম্ভব না।

বাবু শারীরিক নিদান এমত বুঝিতেন, যে সময়ে স্নান, সময়ে ভোজন সময়ে

শয়ন করাতে একাল পর্য্যন্ত কখনো কোনরূপ রোগ ভোগ করেন নাই, তিনি এত যে প্রাচীন হইয়াছিলেন তথাচ চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। এবং বুদ্ধির ভ্রমও হয় নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে কেবল এক বৎসর কাল দুর্ব্বলতা জন্য গতিশক্তির ব্যাঘাত হইয়াছিল, একারণ বাটীর বাহির হইয়া কুত্রাপি গমন করিতে পারেন নাই। এই এক বৎসর যে যে মহাশয় দেখা করিতে আসিতেন তাঁহারদিগের সহিত হাস্য বদনে আলাপাদি করিয়া পরিশিষ্ট সময় "হস্তামল" কুবের ও তুলসীদাস কৃত গ্রন্থ অথবা ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করিতেন। রামনিধিবাবু ৯৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এবম্ভূত সুখ সম্ভোগ করণানন্তর ১২৪৫ সালের ২১ চৈত্র দিবসে পুত্র, কন্যা, পৌত্র দৌহিত্রাদি রাখিয়া জাহ্নবী তীরে নীরে জ্ঞানপূর্ব্বক জগদীশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এতন্মায়াময় সংসার পরিহার করত যোগ্যধামে যাত্রা করিলেন।

ঐ মৃত মহাত্মা মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে স্বরচিত সংগীত সকল মুদ্রিত করত একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন, তাহাতে যে ভূমিকা ও রাগ রাগিণীর বিষয় বিস্তার করিয়া লেখেন আমরা তদবিকল নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম, এতৎপাঠে সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন।

কি সধন কি অধন সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তিই নিধুবাবুকে "বাবু" শব্দে সম্বোধন করিতেন। বাবুর বাটী, বাবুর সুর, বাবুর গীত, বাবু এলেন বাবু গেলেন ইত্যাদি। বাঙ্গালা গীতে রাগ সুরের ব্যাপারে ইনি যদ্রূপ ক্ষমতা প্রকাশ করেন, তাহাতে "সরিমিয়ার" অপেক্ষা ইহাকে কোন অংশেই ন্যূন বলা যাইতে পারে না। ইহার প্রণীত টপ্পাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যেমন হিন্দুস্থানে "সরির টপ্পা" তেমন বঙ্গদেশে "নিধুর টপ্পা" অনেকেই "নিধু" নিধু" কহেন, কিন্তু নিধু, শব্দটি কি, অর্থাৎ এই নিধু, কি গীতের নাম, কি সুরের নাম, কি রাগের নাম, কি মানুষের নাম, কি, কি? তাহা জ্ঞাত নহেন। যাহাহউক, আর বাহুল্য করণের প্রয়োজন করে না। নিধুবাবু যে প্রকার রাগ, সুর, এবং ভাবের প্রতি দৃষ্টি করিতেন, মিলের প্রতি সে প্রকার দৃষ্টি করিতেন না। একারণ তাঁহার কোন কোন গান সুর করিয়া গাহিলে মানুষের মনকে যে প্রকার আর্দ্র করে, মুখে পাঠ করিলে সে প্রকার চিত্তসুখকর হয় না। যথা "মান" দিন" মন" প্রাণ" ছিল" "গেল" ইত্যাদি, ফলে কেবল ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ও কবিরঞ্জন ৺রামপ্রসাদ সেন ব্যতীত পুরাতন প্রায় সমস্ত কবিদিগের প্রণীত কবিতায় এই

প্রকার মিলের দোষ আছে, নিধুবাবুর এক এক খান সুর "খেয়ালের" অপেক্ষাও কৌশল কলাপ পরিপূরিত ও অতি মধুর। ভাবের উদয় মাত্রেই মুখ হইতে স্বভাবতঃ যে সকল কথা নির্গত হইত ইনি তাহাই সুর ও রাগভুক্ত করিয়া গান করিতেন, সেই সময়ে যদিস্যাৎ মিলের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ করিতেন তবে সোণার উপর সোহাগার অপেক্ষাও কতদূর পর্য্যন্ত উত্তম ও আশ্চর্য হইত তাহা কথনীয় নহে। এই বিষয় উল্লেখের আর আবশ্যক করে না, যিনি জগদীশ্বর, এই বিচিত্র বিনোদ বিশ্ব বিরচনা করিয়াছেন, যখন তাঁহার রচনাই সংপূর্ণরূপে দোষ-শূন্য হয় নাই, তখন মানুষের রচনার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবে, ইহা কোনমতেই সম্ভব হইতে পারে না।

যথা।

"গন্ধঃ সুবর্ণে ফলমিক্ষু দণ্ডে,
না কারি পুষ্পং খলু চন্দনেষু।
বিদ্বান্ ধনাঢ্যো নচ দীর্ঘজীবী,
ধাতুঃ পুরেস্মিন্ নচ বুদ্ধিদাতা।"

আহা!—জগদীশ্বর এমত সুবর্ণ সুবর্ণ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে গন্ধ প্রদান করেন নাই।—ইক্ষু, যাহার দণ্ড অতি সুমধুর করিয়াছেন, সেই মধুলতাকে ফল প্রদান করেন নাই।—[১২] চন্দনবৃক্ষ যাহার কাষ্ঠকে অতিশয় সুরভি করিয়াছেন, তাহাকে ফুল প্রদান করেন নাই।—আর বিদ্বান্ ব্যক্তিকে ধনাঢ্য ও দীর্ঘজীবী করেন নাই, অতএব ইহাতে বিধাতার দোষ কি? কারণ তিনি যখন সৃষ্টি করেন তখন বুদ্ধি ও পরামর্শ প্রদান করে এমত ব্যক্তি কেহই তাঁহার নিকট ছিল না।

৺রামনিধি গুপ্ত মহাশয় স্বরচিত সংগীত সকল মুদ্রিত করিয়া যে পুস্তক প্রকটন করেন, তাহার ভূমিকা অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।

"ভূমিকা।"

এই পশ্চাতের লিখিত গীত সকল বহু দিবসাবধি সুন্দর রূপ ব্যক্ত থাকাতে কোনমত প্রকারে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিতে আমার বাসনা ছিল না, এক্ষণে সময় ক্রমে এই কারণ বশতঃ সর্ব্ব সাধারণ গুণগ্রাহিগণের অবগতি জন্য মুদ্রাঙ্কিত করিতে হইল। এই গীত সকলের অল্প অল্প অংশ অশুদ্ধ করিয়া

আমার অজ্ঞাতে প্রচার করিতে লাগিল, কিঞ্চিৎ কাল পরে তাহা হইতেও অধিকাংশ ভূরি ভূরি বর্ণাশুদ্ধি এবং অশুদ্ধ পদে পূর্ণিত করিয়া প্রচার করিল, এই নিমিত্ত বিবেচনা করিলাম, মৎকৃত সঙ্গীত সকল এক্ষণেও যগুপি বাস্তবিক এবং শুদ্ধরূপ প্রকাশিত না হয় তবে হানি আছে। এই আশঙ্কা প্রযুক্ত প্রকাশ করিলাম। এই পুস্তকান্তর্গত গীত সকল আত্মীয় বন্ধুগণের এবং গানে আমোদিত ব্যক্তিদিগের তুষ্টির কারণ রচনা করিয়াছিলাম, এক্ষণে প্রচার করণের সেই আর এক মানসও রহিল। বঙ্গ ভাষায় এতাদৃশ গানের পুস্তক যগুপি সম্পূর্ণরূপে অভিনব নহে, তথাপি এ ভাষায় এমত গ্রন্থ অন্যের পুস্তকের দৃষ্টান্ত মত কহা যাইতে পারে না, এবং এই গীত সকলে আলাপচারি-দ্বারা যে সকল তান্ বসিয়াছে, তাহা কোন হিন্দুস্থানি খ্যাল ও টপ্পার সুরে গীত রচনা করিয়া দেওয়া এমত নহে; অথচ গান করণ মাত্রেই রাগ রাগিনীর রূপ অবিকল বুঝাইতেছে। সঙ্গীত বিগ্যার সমুদয় রাগ ও রাগিনী অতি বিস্তর। কালে কালে তাহার অনেক লোপ হইয়া আসিয়াছে, এক্ষণে যাহা আছে তাহাও অনেকে জ্ঞাত নহে, যাহা হউক, এই পুস্তকে সঙ্গীত শাস্ত্র সম্মত এবং সঙ্গীতে পণ্ডিতগণের কল্পিত নানা প্রকার রাগ রাগিনীতে গান সকল প্রকাশিত হইল, এতদ্ভিন্ন রাগদ্বয়ে এবং রাগিনীদ্বয়ে মিলাইয়া কতক গীত প্রকাশ করিলাম, আর নির্ঘণ্ট পত্রিকাতে ঐ রাগ এবং রাগিনীর সময় নিরূপণ করিয়া অকারাদি রীতি ক্রমে শ্রেণীবদ্ধ করিলাম; অনুমান করি যে ইহাতে পাঠকবর্গের কিঞ্চিৎ উপকার দর্শিতে পারিবেক।"

নির্ঘণ্ট পত্র।

"রাগ প্রকরণ।	সময় নিরূপণ।
আড়ানা বাহার।	দিবা দেড় প্রহরের পর
আড়ানা।	দিবা দেড় প্রহরের পর
আশা ভৈরবী।	বেলা এক প্রহরের পর
ইমন।	সন্ধ্যার পর।
ইমন পূরিয়া।	চারি দণ্ড রাত্রের পর
ইমন কল্যান।	সন্ধ্যার পর।
ইমন ভূপালি।	সন্ধ্যার পর।

[রাগ প্রকরণ।]	[সময় নিরূপণ।]
ইমন ঝিঁজিট।	সন্ধ্যার পর।
এলাইয়া।	প্রাতঃকালে।
এলাইয়া ঝিঁজিট।	প্রাতঃকালে।
কালাংড়া।	উষাকালে।
কালাংড়া খাম্বাজ	দুই প্রহর রাত্রের পর
কাফি ঝিঁজিট	বৈকালে।
কানড়া।	রাত্রি এক প্রহরে।
কামদ।	এক প্রহর রাত্রির পর।
কামদ গোঁড়।	রাত্রি এক প্রহরের পর।
কামদ খাম্বাজ।	রাত্রি এক প্রহরের পর।
কাফি।	বৈকালে।
কাফি কোকব।	প্রাতঃকালে।
কাফি জয় জয়ন্তী।	এক প্রহর রাত্রির পর।
কাফি পলাস।	বেলা তৃতীয় প্রহরের পর।
কেদারা।	রাত্রি দেড় প্রহরের পর
কেদারা কামদ।	রাত্রি দেড় প্রহরের পর
কেদারা খাম্বাজ।	রাত্রি দেড় প্রহরের পর
খট।	প্রভাত সময়।
খাম্বাজ বাহার।	বেলা দেড় প্রহরের পর।
খাম্বাজ।	সন্ধ্যার পর।
গারা ঝিঁজিট।	সন্ধ্যার পর।
গারা কাফি।	সন্ধ্যার পর
গুজরি টোড়ি।	বেলা এক প্রহরের পর
গোঁড়।	দিবা রাত্রি।
গোঁড় মোল্লার।	দিবা রাত্রি।
গৌরী।	সায়ং কাল।
ছায়ানট।	চারি দণ্ড রাত্রের পর
জয় জয়ন্তি।	রাত্রি এক প্রহরের পর
জয়জ ঝিঁজিট।	উষাকাল।

[রাগ প্রকরণ।]	[সময় নিরূপণ।]
যোগিয়া ললিত।	প্রাতঃকালে।
যোগিয়া গান্ধার।	সূর্য্যোদয়ের পর।
ঝিঁজিট।	দিবারাত্রি।
টোড়ি।	বেলা এক প্রহরের পর
দরবারি টোড়ি।	বেলা এক প্রহরের পর
দরবারি কানড়া।	দিবা দেড় প্রহরের পর
দেশকার।	চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে
দেও গিরী	দিবার প্রথম প্রহর।
দেও গান্ধার	সূর্য্যোদয়ের পর।
ধনেশ্রী পূরিয়া।	বেলা আড়াই প্রহরের পর
ললিত।	প্রভাত সময়।
ললিত ভৈরব।	প্রভাত সময়।
ললিত বিভাস।	প্রভাত সময়।
পরজ।	মধ্যরাত্রি।
পরজ কালাংড়া।	রাত্রি এক প্রহরের পর।
পাহাড়ি ঝিঁজিট	দিবারাত্রি।
পূরবি।	দিবার শেষ প্রহর
বিভাস।	প্রভাত সময়।
বিভাস কল্যাণ।	এক প্রহর রাত্রি থাকিতে।
বাগেশ্বরী।	চারি দণ্ড রাত্রের পর
বাগেশ্বরী টোড়ি।	চারি দণ্ড রাত্রের পর
বাগেশ্বরী আড়ানা।	চারি দণ্ড রাত্রের পর
বাগেশ্বরী কানড়া।	চারি দণ্ড রাত্রের পর
বাগেশ্বরী মোলতানী।	বেলা তিন প্রহরের পর
বাগেশ্বরী বাহার	বেলা তিন প্রহরের পর
বেহাগ।	রাত্রি দেড় প্রহরে।
বিহঙ্গ বাহার।	রাত্রি দেড় প্রহরে।
বেহাগ সরফরদা।	চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে।
বাহার।	দিবারাত্রি।

[রাগ প্রকরণ।]	[সময় নিরূপণ।]
বেলওয়াল ঝিঁজিটী।	বেলা এক প্রহরের সময়।
বেহাগ ঝিঁজিট।	রাত্রি দুই প্রহরের পর
বারোঁয়া।	তাবৎ রাত্রি।
ভৈরব রাগ।	চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে
ভেটিয়ারি।	উষাকালে।
ভিমপলাসি বাহার।	বেলা আড়াই প্রহর গতে।
ভূপালি ঝিঁজিট।	রাত্রি এক প্রহরের পর।
ভূপালি কল্যাণ।	সন্ধ্যার পর।
মালকোষ রাগ।	দুই প্রহর রাত্রের পর।
মালকোষ ভৈরব।	তিন প্রহর রাত্রের পর
মালকোষ বসন্ত।	সন্ধ্যার পর।
মালকোষ বাহার।	রাত্রি দেড় প্রহরের পর
মিয়ার কানড়া।	বেলা দেড় প্রহরে
মোলতানি।	বেলা আড়াই প্রহর গতে।
মোলতানি পলাস।	বেলা আড়াই প্রহর গতে।
[১৩] মোলতানি বাহার।	বেলা আড়াই প্রহর গতে।
রামকেলি ললিত	দিবা চারি দণ্ড মধ্যে।

রাগ সাগর।

লুম।	বেলা দুই প্রহরের পর।
লুম কাফি।	বেলা দুই প্রহর গতে
শঙ্করাভরণ	রাত্রি দেড় প্রহর গতে
শুরট।	রাত্রি দুই প্রহর গতে।
শোহিনী।	রাত্রি দুই প্রহর গতে।
শোহিনী কানড়া।	রাত্রি এক প্রহর গতে।
শ্যাম পূরবি।	সন্ধ্যার পর
শ্যাম।	রাত্রি এক প্রহর গতে
শোহিনী মালকোষ।	বসন্ত ঋতুর রাত্রি এক প্রহর গতে

[রাগ প্রকরণ।]	[সময় নিরূপণ।]
শোহ্‌রাই বাহার।	দিবা এক প্রহর গতে।
সিন্ধু।	রাত্রি দেড় প্রহর গতে
সিন্ধু খাম্বাজ।	রাত্রি দেড় প্রহর গতে
সাহানা আড়ানা।	রাত্রি দেড় প্রহর গতে
সিন্ধু কাফী।	রাত্রি এক প্রহর গতে
সরফরদা কালাংড়া।	উষাকালে।
সরফরদা।	সূর্য্যোদয়ের পর।
হিন্দোল রাগ।	রাত্রি এক প্রহর গতে।
হিন্দোল বেহাগ।	বসন্ত ঋতুর দিবা ও রাত্রি।
হামির।	রাত্রি চারি দণ্ড গতে
হামির খাম্বাজ।	রাত্রি চারি দণ্ড গতে”

৺রামনিধি গুপ্তের বিরচিত সংগীত।

আড়ানা।

তাল জলদ্ তেতালা।

মেঘান্তে শশধর, মানান্তে তোমার বদন।
মেঘাচ্ছন্ন নিশাকর, হেরিলে চকোর,
কাতর যেমন সে, তব বিরসে মম মন॥
তব অমিয় বচন, শুনিলে সুখি শ্রবণ,
পুলকিত প্রাণ।
মানেতে মৌন তুমি, থাকলো যখন, যেরূপ
জলয়ে প্রাণ, জানে প্রাণ, সেই প্রাণ॥ ১॥

ভূপালিকল্যাণ।

তাল জলদ্ তেতালা।

মনে করি বারে বারে, নাহিক হেরিব তারে,
তার সনে আলাপের নাহি কোন গুণ।

হেরিলে সে ভাব আর, না থাকে অন্তরে মোর,
পুলক নয়ন। রসনা কহিতে চায়, শুনিতে শ্রবণ॥
মম হৃদি কম্প হয়, মনেতে কত উদয়, না যায় কহনে;
যদি কোন কথা কয়, উত্তর না করি তায়, উপজয়ে মান।
নয়ন অন্তর হয় করিতে রোদন॥ ১॥

গৌড় মোল্লার।

তাল জলদ্ তেতালা।

কি সুখ দেখনা ঘন গরজে বরষে।
শরীর উল্লাস মোর পরশে পরশে॥
ভেকে বাজাইছে ভেরী সমীরণ বীণধারী,
চাতকী আলাপে পিউ, মনের হরিষে॥ ১॥

গৌড়।

তাল জলদ্ তেতালা।

আমারে কি হোলো সই, ওলো ধর ধর।
বিরহ বাতাসে, সঘনে হুতাসে, অঙ্গ কাঁপে থর থর॥
পীরিতে মিলন সুখ, বিচ্ছেদে তেমনি দুখ,
সুখ আশ করি, এখন যে মরি, তনু হোলো জর জর॥ ১॥

মোলতানী।

তাল জলদ্ তেতালা।

নয়ন নীরে কি নিবে মনের অনল।
সাগরে প্রবেশি যদি, না হয় শীতল॥
তৃষায় চাতকী মরে, অন্য বারি নাহি হেরে,
ধারা জল বিনে তার সকলি বিফল। ১।
যবে তারে হেরি সখি, হরিষে বরিষে আঁখি,
সেই নীরে নিবে জানি, অনল প্রবল॥ ১॥

রাগিনী ঐ। তাল ঐ।

তাহার কারণে কেন, দহে মোর মন।
যেরূপ তাহারে আমি, করি লো যতন,
সতত চাতুরি সখি, করে সেই জন॥
সে বরণ [বরং ?] ছিল ভাল, না ছিল মিলন,
মিলনে এই সে হোলো, সদা জ্বলাতন॥ ১

হামির
তাল হরি।

তাহারে কি ভুলিতে পারি, যাহারে আমি সঁপিলাম মন।
দেখিতে যার বদন, অতি কাতর নয়ন,
শুনিতে বচন সুধা, শ্রবণ তেমন॥
দেখিলাম কতমত, নাহি দেখি তার মত, সেজন এমন।
যদি তার বিরহেতে, সতত হয় জ্বলিতে,
জ্বলিতে জ্বলিতে হবে নির্ব্বাণ কখন॥ ১॥

পরজ।
তাল জলদ্ তেতালা।

কেন লো প্রাণ, নয়নে, অরুণ উদয়।
তপন সবারে দহে, না দহে কমলে,
তব আঁখি রবি, হৃদি কমলে জ্বলায়॥
তব কেশ ঘন ঘন, শীতল করিতে মন, এখন তা নয়।
আজি ফণিময় হেরি, কাতর পরাণ।
নিকট না হোতে পারি, দংশে পাছে ভয়॥ ১॥

ভৈরব রাগ।
তাল জলদ্ তেতালা।

বিনয়ের বশ যদি, হইত যামিনী।
প্রভাত প্রমাদ তবে, সহে কি কামিনী॥

পরশে প্রাতঃ সমীর, চঞ্চল অন্তর মোর,
কেমনে রাখিব আর, শুন গুণমণি ॥১॥

কালাংড়া।
তাল জলদ্ তেতালা।

মুকুরে আপন মুখ, সতত দেখনা ধনি।
আপনার রূপ, দেখি অপরূপ, অধীনে ভুল কি জানি ॥
দেখ আপনার ধন, সতত দেখে যে জন,
করিতে যে ব্যয়, তার হয় দায়, সকলের মুখে শুনি ॥১॥

রাগিনী ঐ। তাল ঐ।

মুকুরে আপন মুখ, হেরিলে যে হই সুখী।
নয়নে আমার, বাস হে তোমার, এই সে কারণে দেখি।
আদর্শে দর্শন মুখ, সৌন্দর্য্য হয় অধিক,
রূপের যতন, তোমার কারণ, জানে হে তোমার আঁখি ॥১॥

ভৈরবী।
তাল জলদ্ তেতালা।

যুগল খঞ্জল [খঞ্জন ?] হেরি, বদন কমলে। প্রাণ।
ভূপতি না হোয়ে প্রাণ যাইছে বিফলে ॥
সবে ধন মন ছিল, হেরিয়া তা হারাইল,
লাভতো হইল ভাল, গেল বিনি মূলে ॥১॥

রাগিনী ঐ। তাল ঐ।

তোমার সাধনা করি, সাধ না পূরিল।
মনের যে সাধ, তাহা মনেতে রহিল ॥
তোমা বিনা কোন জন, তুষিবে আমার মন,
জানিয়া না কর তুমি, বিষম হইল ॥১॥

[১৪] রাগিনী ঐ। তাল ঐ।

নয়ন কাতর কেন, তাহারে না দেখিলে।
চতুর্ভুজ হই বুঝি সে মুখ হেরিলে ॥

নয়ন আপন মতে, মনেরে আনিলে।
বিনা দরশনে দুখ, যায় কি করিলে ॥১॥
কেমন নয়ন মোর, না ভুলে ভুলালে।
কহে আর সুখ কিবা, সে নিধি নহিলে ॥২॥

রাগিনী ঐ। তাল ঐ।

তুমি হোলে রাজেন্দ্র, আমি তব দাসী।
তোমার অধীন হোয়ে থাকি, ভালবাসি ॥
করি অনেক সাধন, এমন হোয়েছে মন,
ইহাতে সদয় থাক, সুখী দিবা নিশি ॥১॥

রাগিনী ঐ। তাল ঐ।

তুমি মোর সুখের কারণ, প্রেয়সি।
সদা উল্লসিত চিত হেরি মুখ শশী ॥
রাজেন্দ্র যদিলো আমি, রাজেন্দ্রাণী হোলে তুমি,
উভয় পীরিতে হয়, দাস কেহ দাসী ॥১॥

রাগিনী ঐ। তাল ঐ।

কাজল নয়নে আর, দিও না কখন।
শরে কেবা নাহি মরে, বিষযোগ তাহে কেন ॥
তোমার কটাক্ষে কেহ, না বাঁচিত প্রাণ।
বাঁচিবার এক হেতু, আছে তাহে শুন ॥
সুধা হলাহল সুরা, নয়নের তিন গুণ ॥১॥

কালাংড়া।
তাল জলদ্ তেতালা।

বদন শরদ শশী, পাষাণ হৃদয়।
অমিয় সমান ভাষি, মৃদু হাসি তায় ॥

লইয়ে কুন্তল ফাঁসি, আঁখি চোর আছে বসি,
মনের গলেতে দিয়া প্রাণ হরে লয় ।১॥

রাগিনী ঐ। তাল ঐ।

সরোজ উপরে দেখ, শোভে কুমুদিনী।
তার পর মধুকর, মোহিত অমনি ॥
দিবাকর নিশাকর, তার মধ্যে শোভাকর,
অরুণ অধতে শশী, নিরখ অমনি ॥১॥

এলাইয়া।
তাল জলদ্ তেতালা।

নিশি পোহাইয়ে, প্রাণনাথ, প্রভাতে আইলে। হে।
আমার আশার সুখ, কারে বিলাইলে ॥
যে রূপে যামিনী গত, সে দুখ কহিব কত,
জানিলাম প্রাণনাথ, কি হবে কহিলে ॥১॥
কামিনী সহিত তুমি, রতি পতি সহ আমি,
ইহা বুঝি অনুমানি, মনে না করিলে ॥২॥

৺রামনিধি গুপ্ত*

তথা আখড়া।

[৭] আমরা গত ১ শ্রাবণ দিবসীয় প্রভাকর পত্রে ৺রামনিধি গুপ্ত অর্থাৎ নিধুবাবুর জীবনবৃত্তান্ত উপলক্ষে আখ্‌ড়াই সংগীতের বিষয় যাহা লিখিয়াছিলাম, পাঠকগণ তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিবেন। এবারে তদতিরিক্ত কয়েকটি বিষয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তদ্বিবরণ নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম, সকলে অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে সন্তুষ্ট হইবেন।

সর্ব্বাগ্রে শান্তিপুরস্থ ভদ্র-সন্তানেরা আখ্‌ড়াই গাহনার সৃষ্টি করেন, ইহা প্রায় ১৫০ দেড়শত বৎসরের ন্যূন নহে, কিন্তু তাঁহারা "ভবানী বিষয়" গাহিতেন না, কেবল "খেউড় ও প্রভাতী" গাহিতেন, সেই সকল গীতে "ননদী, এবং দেওরা" এই শব্দ উল্লেখ থাকিত, এবং রচকেরা অতিশয় অশ্রাব্য কদর্য্য বাক্যে গীত সমুদয় রচনা করিতেন, তৎকালে তাহাতেই অত্যন্ত আমোদ হইত। তচ্ছ্রবণে শান্তিপুরের স্ত্রী পুরুষ মাত্রেই অশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন। এই মহাশয়দের সময়ে যন্ত্রের বিশেষ বাহুল্য এবং সুরের তাদৃশ পারিপাট্য ও আধিক্য ছিল না, সামান্য টপ্পার ন্যায় সুরে গান করিয়া তাহাকেই "আখ্‌ড়াই" নামে বিখ্যাত করিয়াছিলেন।

শান্তিপুরের আখ্‌ড়াই গাহনার দৃষ্টান্ত ক্রমে চুঁচুড়া ও কলিকাতাস্থ সংগীত বিদ্যোৎসাহি জনেরা সুর ও বাদ্যের বিশেষ সুশৃঙ্খলা করত অনেকাংশ পরিবর্ত্তন করিয়া আখ্‌ড়ায়ের আমোদে আমোদি হইলেন। ইঁহারা প্রথমে "ভবানী বিষয়" পরে "খেউড়" তৎপরে "প্রভাতী" এই তিন সংগীতের সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং ইতর শব্দ পরিহার পূর্ব্বক অতি সরল সাধু ভাষায় গান সকল রচনা করিতে লাগিলেন। এই সমুদয় গীত ও সুর এবং বাদ্য শুনিয়া বিশিষ্ট লোক মাত্রেই সন্তুষ্ট ও সুখি হইতেন।

চুঁচুড়ার দলেরা বৎসরে দুই একবার কলিকাতায় আসিয়া যুদ্ধ করিতেন, ইহাঁরা হাঁড়ী, কলসী প্রভৃতি ২২ খানা যন্ত্র বাজাইতেন, ইহাতে তাবতেই চুঁচুড়ার দলকে "বাইসেরা" বলিতেন। ঐ সময়ে সখের আখ্‌ড়াই লড়াই কলিকাতাস্থ বড় বাজার নিবাসী ৺কাশীনাথ বাবুর ফুল-বাগানেই হইত, অন্যত্র

---

* সংবাদ প্রভাকর, বুধবার ১ ভাদ্র ১২৬১ সাল। ইং ১৬ আগষ্ট, ১৮৫৪।—স

হইত না। তৎকালে কেবল আড়া তালে বাদ্য হইত, অপর তাল ব্যবহৃত ছিল না।

ঐ সময়ের কিছু পরে পেসাদারদিগের যে কয়েকটা দল স্থাপিত হয়, তাহারদিগের সেই সকল দলের গীতযুদ্ধ এতন্নগরস্থ হালসীর বাগানে নিয়মিতরূপে সর্ব্বদাই হইত। ধনি ও সৌখিন বাবুলোকেরা ইহারদিগের এক এক পক্ষের পক্ষ হইয়া [৮] অর্থ দান প্রভৃতি নানা প্রকারেই সাহায্য করিতেন। উক্ত মহাশয়গণের মধ্যে গোঁড়ামি সূত্রে পক্ষ প্রতিপক্ষে নিয়ত কথায় কথায় কতরূপ বিবাদ কলহ হইত।

পেসাদার দলের মধ্যে "বৈষ্ণব দাস" নামক এক ব্যক্তি অত্যন্ত গুণী ছিলেন, তিনি আড়াতাল হইতে এক অত্যাশ্চর্য্য নূতনরূপ করত দৌড়, সবদৌড়, দোলন, পিড়েবন্দি, ও মোড় প্রভৃতি অতি সুশ্রাব্য মনোহর মধুর বাদ্য সকল প্রস্তুত করিয়া সকলকেই মোহিত করিলেন। সেই বাদ্য যিনি শ্রবণ করিলেন, তাঁহারি শ্রুতিপথে সুধাবৃষ্টি হইতে লাগিল! এ বিষয়ে বৈষ্ণব দাসকে কত প্রশংসা করিতে হয় তাহা বাক্য দ্বারা বিস্তারিতরূপ ব্যক্ত করণে অক্ষম হইলাম।

অনন্তর "রামজয় সেন" নামক একজন বৈদ্য বৈষ্ণবদাসের সৃজিত সেই সমস্ত বাদ্য এবং তালকে সংশোধন পূর্ব্বক আরো অধিক উত্তম করিয়া লইলেন। ইঁহারি নিকট ৺রসিকচাঁদ গোস্বামী মহাশয় বাদ্য শিক্ষা করত অত্যন্ত বিখ্যাত এবং যশস্বী হইয়াছিলেন।

এই সময়ে যোড়াসাঁকোস্থ "ন্যাটা বলাই" নামক একজন সুবর্ণবণিক আখ্ড়াই বাদ্যে অত্যন্ত নিপুণ হইয়াছিলেন, "নবু আঢ্য, রাজু আঢ্য এবং রূপচাঁদ" এই তিনজন স্বর্ণবণিক ইঁহার নিকট বাদ্য শিক্ষা করিয়া বিশেষ পারদর্শি হইলেন।

যোড়াসাঁকোতে যে আখ্ড়াই দল হয়, ৺দুর্গাপ্রসাদ বসু মহাশয় তাহার সুর ও গীত রচনা করিতেন, ইনি এ বিষয়ে অত্যন্ত যোগ্য ছিলেন। এই দলে ন্যাটা বলাই ঢোল এবং হোগলকুঁড়ে নিবাসী ৺পার্ব্বতীচরণ বসু মহাশয় বেহালা বাজাইতেন। পার্ব্বতীবাবুর বেহালা শুনিয়া তাবতেই মুগ্ধ হইয়াছেন, ইনি বাগবাজারস্থ ৺রাধানাথ সুরকারের তুল্য প্রতিযোগী ছিলেন।

এই সময়ের পূর্ব্বে নিমতলার দত্তবাবু এবং রামবাগানের দত্ত বাবুদিগের আখ্ড়ায়ের দুই দল ছিল, ও আর আর অনেক মহাশয়েরা দল করিয়া সর্ব্বদাই আমোদ করিতেন।

বৈদ্যকুলোদ্ভব ৺কুলুইচন্দ্র সেন স্বরের যে নূতন প্রণালী বদ্ধ করিয়াছিলেন, ৺নিধুবাবু তাহা হইতে বিস্তর বাহুল্য করেন, এবং তাহা অতি উৎকৃষ্ট ও সুমিষ্ট হয়। সেই প্রণালীই অদ্যাবধি প্রচলিত রহিয়াছে।

মৃত গোলাম আব্বস, যিনি অদ্বিতীয় বাদ্যকর ছিলেন, তিনি আখ্‌ড়াই বাদ্য শুনিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইতেন, এবং কহিতেন "এ, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার। আমি কিছুই বুঝিতে ও শিখিতে পারি না।"

আমরা গত মাসে লিখিয়াছিলাম "শ্যামপুকুরে একবার মাত্র আখ্‌ড়াই দল হইয়াছিল" অধুনা নিশ্চিত অবগত হইলাম, শ্যামপুকুরস্থ বাবুরা দুইবার দল করিয়াছিলেন।

আমরা গত মাসিক পত্রে আখ্‌ড়াই গীতের আদর্শ মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলাম, এবং "খেউড় ও প্রভাতী" গীতের কথা যাহা উল্লেখ করি, তাহাতে ভ্রম হইয়াছিল, এবারে সেই ভ্রম সংশোধন পূর্ব্বক নিধুবাবুর প্রণীত তিনটী গান অবিকল নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম, সকলে দৃষ্টি করুন।

যথা। ভবানী বিষয়।

ত্বমেকা ভুবনেশ্বরি, সদাশিবে শুভকরি,
নিরানন্দে আনন্দ দায়িনী।১
নিশ্চিত ত্বং নিরাকারা, অজ্ঞান বোধে সাকারা,
তত্ত্বজ্ঞানে চৈতন্য রূপিনী॥২
প্রণতে প্রসন্নাভাব, ভীমতর ভবার্ণব,
ভয়ে ভীত ভবামি ভবানী।৩
কৃপাবলোকন করি, তরিবারে ভব বারি,
পদতরি দেহি গো তারিণী॥৪

যথা। খেউড়।

সাধের পীরিতি সুখে, দুখ পাছে হয়।১
তুমি হে চঞ্চল অতি, সদা এই ভয়॥২
গোপনে যতেক সুখ, প্রকাশে তত অসুখ,
ননদী দেখিলে পরে প্রণয় কি রয়।৩

তথা। প্রভাতী।

যামিনী কামিনী বশ হয় কি কখন।১
হলে কিও, বিধুমুখ, হেরি হে মলিন॥২
নলিনী হাসিবে কেন, কুমুদী বিরসানন,
এ সুখে অসুখ তবে, করে কি অরুণ।৩

গাহনা ও বাজনার পদ্ধতি এবং আর আর ব্যাপার গত ১ শ্রাবণের পত্রে যাহা লিখিয়াছি তাহাই নিশ্চিত জানিবেন, যে কয়েকটি মূল বিষয় আমরা পূর্ব্বে জ্ঞাত হইতে পারি নাই, এবারে বহু যত্নে, বহু শ্রমে ও বহু কষ্টে তাহাই সংগ্রহ করিয়া পত্রস্থ করিলাম, গত বারের সহিত সংযোগ করিয়া পাঠ করিলে সবিশেষ যথার্থ ব্যাপার জানিতে পারিবেন।

গত মাসের পত্রে "পাখির দলের" কথা যাহা লিখিয়াছিলাম, নীমতলা নিবাসী সুবিখ্যাত ৺রামনারায়ণ মিশ্র মহাশয় সেই দলের কর্ত্তা হইয়া সকল ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। নিধুবাবু রাজার উপর রাজা মহারাজা ছিলেন, এক দিবস প্রসিদ্ধ পাঁচালীওয়ালা ৺"গঙ্গানারায়ণ নস্কর" পক্ষির দল দেখিবার অভিপ্রায়ে তাহারদিগের "আটচালা" নামক বাসার দ্বারে উপস্থিত হইলে দ্বারপাল পক্ষী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে? কি জন্য আসিয়াছ?" নস্কর কহিলেন আমার নাম "গঙ্গানারায়ণ নস্কর, আমি তোমাদের রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি" পাখি বলিল "আচ্ছা এই খানে বৈস, আমি সংবাদ করি, রাজার আজ্ঞা হইলে যাইতে পারিবে" এই বলিয়া গিয়া সংবাদ দিল "মহারাজ! এক জন নস্কর আসিয়াছে" রাজা কহিলেন "সে কি? এক জন্মে নস্কর। সে জন্তু না মানুষ। উত্তর। [৯] মানুষ। প্রশ্ন। হিন্দু, না, মুসলমান। উত্তর, হিন্দু, গলায় পৈতে আছে" রাজা কহিলেন "একজনে, নস্কর, সে আবার হিন্দু, সূত্র ধর, এ কেমন হইল" এতচ্ছ্রবণে একটা প্রধান পাখি কহিল "দ্বিজরাজ। আমি এখনি কয়েকটা অক্ষরের কোটা অনুসন্ধান পূর্ব্বক নির্ণয় করিতেছি" এই বলিয়াই কুলজী পাঠ করিতে লাগিল।

যথা।

কস্কর, খস্কর, গস্কর, ঘস্কর, ঙস্কর।
মহারাজ। কয়ের কোটায় পাওয়া গেল না।
চস্কর, ছস্কর, জস্কর, ঝস্কর, ঞস্কর।
চয়ের কোটায় পাওয়া গেল না।

টক্কর, ঠক্কর, ডক্কর, ঢক্কর, পক্কর।
টয়ের কোটায় পাওয়া গেল না।
তক্কর, থক্কর, দক্কর, ধক্কর, নক্কর।
মহারাজ! পাওয়া গিয়াছে।
পাওয়া গিয়াছে॥ কোথায় যাবে?
পাওয়া গিয়াছে।
"তস্করের ঘরে নস্করের বাস।"

গঙ্গানারায়ণ নস্কর এই বাক্য শুনিয়া অম্বল চাকা ভোম্বলদাসের ন্যায় ফ্যা ফ্যা করিতে করিতে অমনি উঠে ছুটে প্রস্থান করিলেন। পাখির দল দৃষ্টি করা তাঁহার মাথার উপরে রহিল।

স্বর্গগত ৺মহারাজ গোপীমোহন দেব বাহাদুর পক্ষির দলের কৌতুক দেখিবার মানসে বিস্তর যত্ন করাতে পক্ষিগণ কহিল "আচ্ছা আমরা যাইব, রাজা খাঁচা পাঠাইয়া দিন" রাজা "পাল্কী" নামক খাঁচা পাঠাইয়া দিলেন, পাখিরা তাহাতে আরোহণ করত রাজভবনে উপস্থিত হইল, বিহঙ্গ ব্যূহের অন্তঃকরণে স্থিরতা ছিল যে অগ্রে নৃত্যগীত করিয়া পরে "আধার" লইবে। রাজা বাহাদুর তাহারদিগের মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া অগ্রেই আহার প্রস্তুত করিয়া দিলেন, ইহাতে সকলেই আহার করত ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ শব্দ করিয়া একে একে খাঁচা অর্থাৎ পাল্কির মধ্যে প্রবেশ করিল। রাজা কহিলেন "কি গো, তোমারদিগের আমোদ প্রমোদ ও নৃত্য গীত দেখিতে ও শুনিতে আমার এত যত্ন, তাহাতো কিছুই হইল না।" পাখি সকল উত্তর করিল "আমরা আধার পাইলে আর কি থাকিতে পারি? অমনি হজম করিতে হইবে, আপনি যদি আগে আধার না দিতেন, তবে সকল প্রকার রঙ্গ ভঙ্গ দেখিতে পাইতেন।" এই বাক্য শুনিয়া রাজা অবাক্ হইয়া রহিলেন, পাখিরা ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

কবিওয়ালা

রাসু নৃসিংহ*

[৫] রাসু নৃসিংহ নামক দুই সহোদর ফরাসডাঙ্গার নিকট এক গ্রামে বাস করিতেন, ইহারা কায়স্থ কুলোদ্ভব, পূর্ব্বতন কবিওয়ালাদিগের মধ্যে অতিশয় বিখ্যাত ছিলেন। ইহাঁরদিগের বিরচিত সুর ও গীত শ্রবণে প্রধান প্রধান পণ্ডিত ও বিশিষ্ট সন্তান মাত্রেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও সুখি হইতেন। রাসু নৃসিংহের দল হরু ঠাকুরের দলের বরং কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে হইবে, কিন্তু শেষে কখনই নহে। উক্ত উভয় সহোদরের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি গীত ও সুর রচনায় নিপুণ ছিলেন তদ্বিশেষ আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই, কারণ তৎকালের মনুষ্য অদ্যাপি প্রায় কেহই জীবিত নাই। অতি প্রাচীন যে দুই এক মহাশয় সজীব আছেন তাঁহারা কেহই নির্দ্দিষ্ট করিয়া কহিতে পারিলেন না। যাহাহউক, যিনিই হউন, রাসুই হউন আর নৃসিংহই হউন, দুই জনের ভিতর এক ব্যক্তি সুকবি ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সর্ব্বসাধারণে "রাসু নরসিংহ, রাসু নরসিংহ" এই নাম উল্লেখ করিত, এবং এই নামেই দল বিখ্যাত ছিল। ইহারা সখীসংবাদ ও বিরহ গান যাহা যাহা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাই অতি উৎকৃষ্ট। অতিশয় শ্রুতি সুখকর, ও সর্ব্ব বিষয়েই যশের যোগ্য।

প্রায় ৫০ বৎসর হইল ইহারা ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন। এই সময়ের পূর্ব্বেই ইহারদিগের সুখ্যাতি সৌরভে এদেশ আমোদিত হইয়াছিল। অনেকেই তত্তৎ সংগীত সুধাশ্রবণে শ্রবণের ক্ষুধা নিবারণ করিতেন। আমরা কত কষ্টে, কত ক্লেশে, কত যত্নে, কত চেষ্টায় ও কত শ্রমে কত স্থানে ভ্রমণ ও কত লোকের উপাসনা করত এত দিনের পর তাহার কয়েকটি কবিতা সংগ্রহ পূর্ব্বক সংকল্পের সার্থকতা করিয়াছি, প্রতিজ্ঞাকে চরিতার্থ করিয়াছি। এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইব এমত সম্ভাবনাই ছিল না, কেবল জগদীশ্বরের অনুকম্পায় মনোরথ পরিপূর্ণ হইয়াছে। যদিও অত্যল্প মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, অধিকাংশ সংগ্রহ করিতে পারি নাই, তথাচ অস্মৎ পক্ষে ইহাতেই আশার অতীত ফল লাভ হইয়াছে, কারণ অপ্রত্যাশিত ব্যাপারের যৎকিঞ্চিৎ যাহা হস্তগত হইল তাহাই যথেষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক।

* সংবাদপ্রভাকর, শনিবার, ১ মাঘ, ১২৬১ সাল। ইং ১৩ জানুআরি ১৮৫৫।—স.

পাঠক মহাশয়দিগের বিদিতার্থ ঐ কয়েকটি কবিতা অতি সমাদর পূর্ব্বক নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম, সকলে অভিনিবেশ পূর্ব্বক এতৎ প্রতি নয়নাস্তপাত করিলে যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সুখি লইতে পারিবেন।

মহড়া।

ইহাই ভাবিহে গোবিন্দ সঘনে।
আঁখি হাসে পরাণো পোড়ে আগুনে॥
কি দোষ বুঝিলে, রাধারে তেজিলে, কুঁজিরে পূজিলে কি গুণে॥

চিতেন।

জগতো সংসারো, ভুলাইতে পারো, তোমারো বঙ্কিম নয়নে।
ওহে কুঁজী অবহেলে,বসিয়ে বিরলে, তোমারে ভুলালে কি গুণে॥

অন্তরা।

শ্যাম রূপে গুণে পূর্ণ, সকলি সুধন্য, অতুল্য লাবণ্য রাধারো।
ইহাই ভেবে মরি, কুবুজা বিহারি, কি সুখে হোয়েছ নাগরো॥

চিতেন।

শ্যাম্, রূপেরো বিচারো, যদি মনে কর, মজেছো যাহারো কারণে।
ওহে লক্ষ কুবুজারো, রূপেরো ভাণ্ডারো শ্রীমতী রাধারো চরণে॥

অন্তরা।

শ্যাম, গুণেরো গরিমে, কি কহিব সীমে, আগমে যাহারো প্রমাণো।
যার গুণো গেয়ে, মুরলী বাজায়ে, নাম ধর বংশীবদনো॥

চিতেন।

শ্যাম, যার গুণাগুণো, করিতে সাধনো, সনাতনো গেল কাননে।
ওহে এবড় বেদনো, তেজিয়ে সেধনো, অধনে রেখেছ যতনে॥

অন্তরা।

শ্যাম্, আপনারো অঙ্গ, যেমন ত্রিভঙ্গ, কালিয় ভুজঙ্গ কুটিলে।
কুবুজারো অঙ্গ, রসেরো তরঙ্গ, তাহাতে শ্রীঅঙ্গ ডুবালে॥

চিতেন।

শ্যাম, এই ভূমণ্ডলে, আধো গঙ্গাজলে, রাধা কৃষ্ণ বলে নিদানে।
এখন্ কুঁজী কৃষ্ণ বোলে, ডাকিবে সকলে, ভুবনো তরাবে দুজনে।

অন্তরা।

শ্যাম, তেজিলে শ্রীমতী, তাহাতে কি ক্ষতি, যুবতী সকলি সহিলো।
ভুজঙ্গ মাণিকো, হোরে নিলো ডেকো, মরমে এ দুখো, রহিলো॥

চিতেন।

শ্যাম, প্রদীপেরো আলো, প্রকাশ পাইলো, চন্দ্রমা লুকালো গগনে।
ওহে গোখুরেরো জলো, জগতো ব্যাপিলো, সাগরো শুখালো তপনে॥

[অতি চমৎকার! কি সুন্দর রচনা। এতদ্রূপ প্রেম ভক্তি ও করুণা পরিপূরিত শ্লেষোক্তি কবিতা প্রায় শ্রবণ করা যায় নাই।]

---

[৬] মহড়া।

প্রাণোনাথো মোরো সেজেছেন শঙ্করো, দেখসিয়ে প্রিয়ে ললিতে।
অপরূপো দরশনো, আজু প্রভাতে॥
বুঝি কারো কাছে, রজনী জেগেছে, নয়নো লেগেছে ঢুলিতে।

চিতেন।

পার্ব্বতীনাথেরো, অর্দ্ধ শশধরো, সবিতা অর্দ্ধ কপালেতে।
আমার নাগরো, সেজেছেন সুন্দরো, চন্দনো সিন্দুরো ভালেতে॥

অন্তরা।

হায়, মথনেরো বিষো, ভখিয়ে মহেশো, নীলকণ্ঠ দেশো নিশানা।
নীলকণ্ঠ নাম, অতি অনুপাম, জগতে রয়েছে ঘোষণা॥

চিতেন।

আমার নাগরো, গিয়েছিলেন কারো, কলঙ্ক সাগরো মথিতে।
ফুরায়ে মন্থনো, এনেছেন্ নিশানো, আঁখির অঞ্জনো গলাতে॥

অন্তরা।

হায়, সে যেমন ভোলা, তাহাতে উজলা, গলে অস্থি মালা ছড়াতে।
মুখে কৃষ্ণ নাম, শিঙ্গায় বলে রাম, বিশ্রাম কুচনী পাড়াতে॥

চিতেন।

পোহায়ে রজনী, এই গুণমণি, এসেছেন্ মন্ তুষিতে।
গুঞ্জ ছড়া গলে, মুখে সুধা ঢালে, রাধা রাধা বলে বাঁশীতে॥

অন্তরা।

হায়, ত্রিলোচনো হয়ো, জগতে প্রচারো, একচক্ষু যারো কপালে।
কৃষ্ণ প্রেমে ভোরা, পাগলের পারা, ধুতুরা শ্রবণো যুগলে ॥

চিতেন।

ইহারো সেই মতো, সপত্র সহিতো, কদম্ব শ্রবণ যুগেতে।
ত্রিলোচন চিহ্ন, দেখ দীপ্তমানো, কপালে কঙ্কণো আঘাতে ॥

আহা! আহা! কবিওয়ালাদিগের কবিতার মধ্যে এবম্ভূত শ্লেষ ঘটিত সরস রূপক রচনা প্রায় কখনই শ্রবণ পথের পথিক হয় নাই। এই গীতটির মূল্য নাই, তুল্য নাই। এ বিষয়ে কি বাক্যে কবির সুখ্যাতি করিব, তদ্বর্ণনে বর্ণ বিবর্ণ হইল। ইহার দ্বিতীয় গান নিম্ন ভাগে প্রকটন করিলাম।

মহড়া।

শ্রীমতীর মনো, মানেতে মগনো, ওখানে এখনো যেওনা।
মানা করি, কলহ আর বাড়াওনা ॥
বিষাদের বাতি জ্বেলেছেন শ্রীমতী, তাহাতে আহুতি দিওনা।

চিতেন।

নিবেদন করি, ফিরে যাও হরি, দুয়ারে দাঁড়ায়ে থেকনা।
কত নারীর্ সঙ্গ, কোরেছ কি রঙ্গ, শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গ ছুঁওনা ॥

অন্তরা।

শ্যাম্, নিতি নিতি তবো, দেখি হে যে ভাবো, তথাচ সে সবো পাসরি।
এবারে তোমারো, রাধা পাওয়া ভারো, যে ভাবে বসেছেন্ কিশোরী ॥

চিতেন।

জিনি মেরুগিরি, মান ভরে ভারি, মরিবার ভয় করে না।
যদি গিরিধারী, হোতে চাহ হরি, মনে করি রাধা পাবেনা ॥

অন্তরা।

শ্যাম্, কার ভাবে ভুলে, কহ কোথা ছিলে, মোজেছিলে কার প্রেমেতে।
প্রভাতে কেমনে, আইলে এস্থানে, নিলাজো বদনো দেখাতে ॥

চিতেন।

সুখের নিশিতে, এখানে আসিতে, তোমারো মনেতে ছিলনা।
বিপক্ষ হাসাতে, এসেছো প্রভাতে, করিতে কপটো ছলনা।

অন্তরা।

শ্যাম্, সময়ে কি করে, বলিহে তোমারে, শ্রীমতী রাধার কথাটি।
এবারে মাধবে, যে আনি মিলাবে, সে খাবে রাধার মাথাটি॥

চিতেন।

দিয়ে পদ দুটি, মাড়াবে যে মাটী, শ্রীমতী তো সেটী ছোঁবে না।
তুলিয়ে সে মাটী, দিবে ছড়া ঝাঁটি, শ্রীরাধার এটি কট্‌কেনা॥

[অতি সুন্দর, অতি সুন্দর।]

মহড়া।

সখি, এ সকল প্রেম প্রেম নয়।
ইহাতে মজিয়ে নাহি সুখেরো উদয়॥
সুহৃৎ ভঞ্জনো, লোক গঞ্জনো, কলঙ্ক ভাজনো হোতে হয়।

চিতেন।

এমনো পীরিতি করি, যাতে তরি দুদিকো।
ঐহিকো আরো পার্থিকো॥
শ্রীনন্দ নন্দনো, দুখ ভঞ্জনো সদা রাখি মনো তাঁরি পায়।

অন্তরা।

অমিয় ত্যজে, গরলে মোজে, উপজে কি সুখো।
কলঙ্ক ঘোষণা জগতে, মরণো হোতে অধিকো॥

চিতেন।

হৃদয়ো মন্দিরো মাঝে, রসরাজে বসায়ে।
দেখিব আঁখি মুদিয়ে॥
বিকায়ে সে পদে, বাঁধিব হৃদে, কলঙ্ক বিচ্ছেদে নাহি ভয়।

অন্তরা।

মনেরে কোরে চাতক পাখি, রাখিব বিশেষে।
জলং দেহি দেহি ডাকিব প্রেমেরো প্রয়াসে॥

চিতেন।

ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশো, পদ, সে নীরদ হইতে।
জাহ্নবী হোলেন্ যাহাতে।
সেই কৃপাজলে, মনো ডুবালে, কালেরে করিব পরাজয়॥

অন্তরা।

কমলজ জনো, সেবিত ধনো, অরুণো চরণো।
মনেরো তিমিরো বিনাশে, পাইলে কিরণো॥

চিতেন।

হৃদে আছে শতদলো, সে কমলো ফুটিবে।
[৭] প্রেম পীযূষো ঘটিবে॥
মনো মধুব্রত, হোয়ে যেন রত, সেই নামামৃত সুধা খায়।

অন্তরা।

অমিয় আর গরলো, দুই রাখিয়ে সাক্ষাতে।
নয়ন দিয়েছেন্ বিধাতা দেখিয়ে ভকিতে॥
ত্যজিয়ে এ সুধারসো, কেন বিষো ভখিবো।
কলুষো কূপে ডুবিবো॥
থাকিতে নয়নো, অন্ধ যেইজনো, পেয়ে প্রেমধনো সে হারায়।

এই গীতের ব্যাখ্যা কি করিব? পাঠ করিতে করিতে প্রেমপুলকে পরিপূরিত হইতে হয়। পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি সকলেরি, নিকট প্রফুল্লবদনে সংগীত করা যায়। পাঠক ও শ্রোতৃ উভয়েই তুল্য রূপে আমোদিত হইতে থাকেন।

মহড়া।

যেন প্রাণ্, অরসিক সহ, মিলন নাহিক হয়।
তুমি আরো অন্য তাপ, দিও শত শত, যত তব মনে লয়॥

[আহা! কি কি পরিতাপ! এই গীতের অপর কিছুই প্রাপ্ত হইলাম না। এই মহড়াটি ভাব ও রসে পরিপূর্ণ, ইহাতে কবির বিশেষ কবিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে।]

মহড়া।

শ্যাম্, তুমি যত রসিক, রসে পারক, শ্রীমতী তা জানে।
ভারি ভুরি কোরনা, বঁধু এখানে।
গিয়েছে সে কালো, জানিছে সকলো, কুবুজা মিলেছে কপাল গুণে॥

চিতেন।

নন্দঘোষের বাড়ী, ধূলায় গড়াগড়ি, কড়া ছুই ননির কারণে।
এবে রাতারাতি, শিরে দণ্ড ছাতি, শৃগাল ভূপতি, হোয়েছো বনে ॥

[এই গীতের অপরাংশ প্রাপ্ত হইলাম না, একারণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলাম। যেহেতু ইহার পরিশেষের রচনা অতি উত্তম।]

মহড়া।

রসিক হইয়ে এমনো কে করে।
কাণ্ডারী হইয়ে, তরঙ্গ ডুবায়ে, রঙ্গ দেখ গিয়ে, দাঁড়ায়ে দূরে ॥

চিতেন।

প্রাণ্ তুমি হে লম্পটো, নিতান্ত কপটো, প্রকাশিলে শঠো খল আচারে।
নহে কেবা কোথা, এত নিষ্ঠুরতা, কোরেছে সর্ব্বথা, নিজ জনারে ॥

অন্তরা।

প্রাণ, আরো এক শুনো, বচনে তোমার, দাঁড়ালেম কুলের বাহিরে।
প্রাণ্, তুমি জেনে শুনে, বিরহ তুফানে, ভাসালে এজনে, ছলনা করে ॥

চিতেন।

তোমার চরিত্র, পথিকো যেমতো, হোয়ে শ্রান্তি যুক্ত বিশ্রাম করে।
শ্রান্তি দূর হোলে, যায় সেই চোলে, পুন নাহি চাহে ফিরে ॥

[অতি উৎকৃষ্ট।]

মহড়া।

কহ সখি কিছু প্রেমেরি কথা।*
ঘুচাও আমারো মনেরো ব্যথা ॥
করিলে শ্রবণো, হয় দিব্য জ্ঞানো, হেন প্রেম ধনো, উপজে কোথা।
আমি এসেছি বিরাগে, মনের বিরাগে, প্রীতি প্রয়াগে, মুড়াব মাথা ॥

চিতেন।

আমি রসিকের স্থানো, পেয়েছি সন্ধানো, তুমি নাকি জানো প্রেমবারতা।
কাপট্য তেজিয়ে, কহ বিবরিয়ে, ইহারো লাগিয়ে এসেছি হেথা ॥

---

*প্রাচীন কবিসংগ্রহে (পৃ ৭৮) এই গান হরুর নামে দেওয়া আছে।—স.

অন্তরা।

হায়, কোন্ প্রেম লাগি, প্রহ্লাদ বৈরাগী, মহাদেব যোগী কেমন প্রেমে।
কি প্রেম কারণে ভগীরথ জনে, ভাগীরথী আনে ভারত ভূমে॥

চিতেন।

কোন প্রেমে হরি, বোধে ব্রজনারী, গেল মধুপুরী, কোরে অনাথা।
কোন্ প্রেম ফলে, কালিন্দীর কূলে, কৃষ্ণ পদ পেলে মাধবীলতা।

[উৎক্রুষ্ট, উৎকৃষ্ট।]

হরু ঠাকুর*

[৪] ৺হরেকৃষ্ণ ঠাকুর, যিনি হরুঠাকুর নামে সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিলেন। ইনি মহানগর কলিকাতার সিমুলা নিবাসী ৺কল্যাণচন্দ্র দীর্ঘাড়ির পুত্র। যৎকালে ইহাঁর যজ্ঞোপবিত হয়, তৎকালেই ইনি দৈবশক্তি দেবীর কল্যাণে কবিতা রচনা করণে প্রবৃত্ত হয়েন। ক্রমে যত অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে বয়সের আধিক্য হইতে লাগিল, ততই উত্তর উত্তর শক্তির উন্নতি হইল। হরুঠাকুরের পিতা কল্যাণচন্দ্র দীর্ঘাড়ি প্রতিবাসিদিগের মধ্যে বিশেষ এক জন গণ্য ও মান্য ছিলেন না। কিন্তু সৎকর্ম্ম করিয়া সদাচার দ্বারা সামান্যরূপে সংসার নির্ব্বাহ করিতেন। হরুঠাকুর স্বীয় ক্ষমতা ও গুণের প্রভাবে স্বয়ং খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করত সর্ব্বপ্রিয় ও মান্য হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার সম্ভ্রম ও গৌরবের কথা অধিক কি উল্লেখ করিব, তিনি অতি অল্প দিবসের মধ্যেই আপনার সংগীতে গুরু, রঘু প্রভৃতি প্রাচীন কবিকদম্বের উচ্চ নাম প্রচ্ছন্ন করত আপামর সাধারণ সর্ব্ব সমাজে পূজ্য হইয়া ঠাকুর শব্দে বাচ্য হইলেন।

এই ঠাকুরটী ৭৫ বৎসরের অধিক কাল ইহ সংসারে বিচরণ করিতে পারেন নাই। এবং যে সময় তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন অদ্য দিবস হইতে সেই সময়ের গণনা করিলে বোধ করি ৪০ বৎসরের ঊর্দ্ধ না হইবে, বরং কয়েক বৎসর ন্যূন হইতে পারে।

ইনি সংস্কৃত অথবা ইংরাজী কিছুই অভ্যাস করেন নাই, অথচ বুদ্ধির কৌশলে এরূপ ভাব ভঙ্গি প্রকাশ করিতেন, যে, সেই বাহ্য ব্যাপার দৃষ্টে তাবতেই তাঁহাকে উক্ত উভয় বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী বলিয়া জ্ঞান করিতেন। প্রধান প্রধান অধ্যাপক মহাশয়েরা তাঁহাকে অধ্যাপক শ্রেণীর মধ্যে গ্রাহ্য করিতেন। এবং তিনি অনেকানেক স্থানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সহিত তুল্যরূপে গাড়ু ঘড়া প্রভৃতি বিদায় লইয়াছেন।

হরু অতিশয় সুগায়ক ছিলেন। কবিতা সকল যেমন উত্তম রূপে রচনা করিতেন, সেই রূপ আবার তৎ সমুদয় অতি সুমধুর স্বরে ও যথা যোগ্য রাগ রাগিনীতে সংযুক্ত করত সংগীত দ্বারা লোকের চিত্ত হরণ করিতেন। তাঁহার কণ্ঠ বিগলিত সুধা স্বরে তাবতেই মোহিত হইয়াছেন।

---

* সংবাদপ্রভাকর, শুক্রবার ১ পৌষ ১২৬১ সাল। ইং ১৫ ডিসেম্বর ১৮৫৪।—স.

ইঁহার বয়ঃক্রম যখন ৮।১০ আট দশ বৎসর তখন সখের দলে জিল দিতেন। এবং কবিতার দুই একটি পদ পূরণ করিতেন। পরে যৎকালে ১৫।১৬ পঞ্চদশ বা ষোড়শ বর্ষ বয়স হইল তৎকালে সখের দলের উপর স্বয়ং প্রাধান্য প্রকাশ পূর্ব্বক স্বরচিত সুর ও গান দ্বারা শ্রোতৃবর্গের মন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। এবং যে সময়ে যে কবিতা রচনা করিতেন তাহা রঘুনাথ দাসের দ্বারা সংশোধন করিয়া লইতেন। আর মধ্যে মধ্যে বিনা বেতনে রঘুর দলে গাহনা করিতেন। কিন্তু কবিতা কল্পে তাঁহাকে বড় অধিক কাল রঘুর সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় নাই, কারণ পরমেশ্বরের পরিপূর্ণ অনুকম্পায় তিনি সংক্ষেপ সময়ের মধ্যেই গুরুর নিকট এমত গুরু হইলেন যে, গুরু হইয়াও রঘু তাঁহার নিকট লঘু হইল। কিন্তু হরু অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ও সজ্জন ছিলেন, এ জন্য গুরুর গুরুত্ব রক্ষা করিয়া নিজ লঘুত্ব প্রচারে ত্রুটি করেন নাই। অর্থাৎ প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত যে যে গীত প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে আপন নাম গোপন রাখিয়া সর্ব্ব শেষে "রঘুর" নামে ভণিতা দিয়াছেন। আমরা অন্তবাসরীয় প্রভাকরে [৫] এই মহাশয়ের প্রণীত যে কয়েকটি গানের সংপূর্ণাংশ প্রকাশ করিলাম যিনি তৎপ্রতি নয়নান্তপাত করিবেন, তিনিই তাহাতে রঘুর নামের ভণিতা দেখিতে পাইবেন।

হরুঠাকুর কখনই কোন রূপ বিষয় কর্ম্ম করেন নাই, বাল্যকালে কেবল আমোদ প্রমোদ, পরে সংগীত ব্যবসায় দ্বারা উপজীবিকা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক সমস্ত সময় সম্বরণ করিয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে "সৌখীন" ছিলেন, কাহারো স্থানে কপর্দ্দক মাত্র গ্রহণ করেন নাই। শেষে নানা গতিকে অভাব বশতঃ ধনের নেসায় পেসায় প্রবৃত্ত হইলেন। মহামান্য মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর কর্তৃক ইঁহার "সৌখীনত্ব" রূপ সতীত্ব সংহার হয়। অর্থাৎ মহারাজের অধিক অনুরোধ ও আশ্বাস বাক্য এবং দানের বশ হইয়া ইনি ধনাগম তৃষা কৃশা করিতে পারিলেন না।

কোন পর্ব্বাহ রজনীতে হরুঠাকুর পেসাদারি দলে সখ্ করিয়া সংযুক্ত হইয়া উক্ত নৃপতির নিকেতনে গাহনা করত সর্ব্বতোভাবেই রাজার মন প্রফুল্ল করিয়াছিলেন, রাজা তচ্ছ্রবণে অতিশয় আনন্দ-পরবশ হইয়া ঠাকুরকে পারিতোষিক অর্থাৎ বক্‌সিস স্বরূপ এক যোড়া সাল প্রদান করেন। হরু তাহাতে অপমান ও লজ্জা বোধ করত অভিমানে ম্লান ও ক্ষুব্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই সাল ঢুলির মস্তকে অর্পণ করিলেন। মহারাজ তদ্দৃষ্টে চমৎকৃত অথচ কিঞ্চিৎ

রাগত হইয়া "ঐ গায়ককে এখানে নিয়ে আয়, নিয়ে আয়" পুনঃ পুনঃ এতদ্রূপ উল্লেখ করাতে ঠাকুর অতিশয় ভীত হইয়া পলায়ন করণের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু পলাইতে পারেন নাই, অত্যন্ত ত্রাসিত ও কম্পিত কলেবর হইয়া রাজ সমীপে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ দেখিয়া ক্রোধ ভাব পরিহার পূর্ব্বক সবিশেষ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হরু আত্ম বিবরণ জ্ঞাত করিলে মহামতি শোভাবাজারপতি অতি সন্তোষচিত্তে তাঁহার প্রতি প্রীতি পূর্ব্বক নিজ নামে দল করিতে উপরোধ করিলেন, হরু সেই অনুমতির অধীন ও লোভাধীন হইয়া কাযে কাযে সমাজের মাঝে লাজের মাথায় বাজের আঘাত করত রাজের অনুরোধ রক্ষা করিলেন। গোষ্ঠীপতি নৃপতি দলপতির আদেশে দল করিয়া দল পতি হইলে সেই ধ্বনি যে ধনির কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল তিনিই তাঁহাকে যত্নযোগে আহ্বান করত আপন বাটীতে গাহনার নিমিত্ত অর্থ দিয়া বাধিত করিতে লাগিলেন। এবম্প্রকারে ক্রমে ধনাঢ্যদিগের আগার মাত্রেই তাঁহার দলের বায়না হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি বিশেষ বিশেষ পর্ব্বাহে রাজবাটী ভিন্ন অন্যত্র বায়না লইতে পরিতেন না।

মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর হরু ঠাকুরকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তিনি ইহাঁর গান ভিন্ন অন্যের গান প্রায় শুনিতেন না। প্রকৃত এক জন গোঁড়া ছিলেন বলিলেই হয়। আপনার মনোগত ভাব সকল ব্যক্ত করিয়া সেই সেই ভাবে গান সকল রচনা করিতে অনুরোধ করিতেন, ঐ সমুদয় পুরুষোক্তি গান শ্লেষ ও ব্যঙ্গে পরিপূর্ণ হইত, তাহাতে মহিষীগণের উপর ইঙ্গিত থাকিত।

হরু ঠাকুরের এই এক থানা প্রধান ক্ষমতা ও শক্তি ছিল, যে কোন ব্যক্তি যে কোন সময়ে যে কোন কথা প্রশ্ন স্বরূপ প্রদান করিতেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই পদ বা সেই কথাটি উপলক্ষ করিয়া তাহাতে পাঁচ সাত অন্তরা গান প্রস্তুত করিতেন।

যথা। প্রশ্ন।

"পীরিতি নাহি গোপনে থাকে।"

পূরণ।

"পীরিতি নাহি গোপনে থাকে।
শুনলো সজনি বলি তোমাকে।
শুনেছ কখনো, জলন্ত আগুনো, বসনে বন্ধনো করিয়ে রাখে।" ইত্যাদি

তথা।

"তোমার আশাতে এ চারিজন।"

পূরণ।

"তোমার আশাতে এ চারিজন।
মোরো মনো প্রাণো শ্রবণো নয়ন।
আছে অভিভূতো হোয়ে সর্ব্বক্ষণ॥
দরশো, পরশো, শুনিতে স্বভাবো করিতেছে আরাধন।" ইত্যাদি।

প্রায় এই প্রকারেই অধিকাংশ গীত পূরণ করিতেন। সিমুলিয়ার ঠঠনে নিবাসী ৺রামশঙ্কর ঘোষ মহাশয় সর্ব্বদাই আপনার অভিপ্রায়ানুযায়ি প্রশ্ন প্রদান করিতেন। সেই সকল প্রশ্ন পূরিত গানের অধিকাংশই আমরা অগ্র প্রকটন করিলাম। হরু উক্ত ঘোষ মহোদয়ের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। রাজ-ভবনে এবং উক্ত ঘোষের গৃহে যত অধিক বার সংগীত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, এত অধিক কাল আর কোন খানেই করেন নাই।

কি "ভবানী বিষয়" কি "সখী সংবাদ" কি "বিরহ" কি "খেউড়" কি "লহর" হরু সকল প্রকার গান রচনা করণেই নিপুণ ছিলেন। কিন্তু "ভবানী বিষয়" তাদৃশ উত্তম হইত না, হরুর সখীসংবাদ ও বিরহের পরিচয় পশ্চাদ্ভাগেই প্রকাশ হইল, সুতরাং বাহুল্য করিয়া লিখিবার প্রয়োজন করে না। ইনি খেউড় এবং লহর গানের বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষাই বিখ্যাত ছিলেন, যখন যাহা রচনা করিতেন তখন তাহাই অতি আশ্চর্য্য হইত, তাহাতে কত বিদ্যা, কত গুণপনা এবং কত শব্দ ও ভাবের কৌশল প্রকাশ করিতেন তাহা লিখিয়া কি ব্যক্ত করিব? কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যে, অতি জঘন্য, অতি ঘৃণিত, অশ্রাব্য, অবাচ্য শব্দে পূরিত হইত, একারণ তাহা কোন প্রকারেই প্রকাশ করা বিধেয় নহে। যখন তাহার নাম করিতে হইলেই রাম [৬] বলিয়া ঘাম নির্গত করিতে হয়, ভূত প্রেত প্রভৃতি কর্ণে হস্ত দিয়া কোথায় প্রস্থান করে, তখন আমরা কি প্রকারে তাহা পত্রস্থ করিতে পারি। পূর্ব্বকার অতি প্রধান প্রধান মহিমান্বিত অর্থাৎ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর, নবকৃষ্ণ বাহাদুর প্রভৃতি উচ্চ লোকেরা এবম্ভূত অদ্ভুত সকার বকারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন, আমোদের পরিসীমা থাকিত না। জ্ঞাতি, কুটুম্ব, স্বজন, সজ্জন, পরিজনে পরিবেষ্টিত হইয়া গদগদ চিত্তে শ্রবণ করিতেন। ইহার বাহুল্য ব্যাখ্যা আর কি করিব?

রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের হরুঠাকুরের লহর এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের শান্তিপুর নিবাসি লোচন খড়্‌কির "কত এতকাল কি কোরে মলেম্, আইবড়ো কপালে বিয়ে হোলোনা রে" ইত্যাদি কবিতা দ্বারা অনেকেই অবগত আছেন।

রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর যৎকালে "নগর কীর্ত্তন" করেন তৎকালে হরু ঠাকুর এই নাম প্রস্তত করিয়াছিলেন, যথা।

"হরিবোল্ বলিয়ে প্রাণো যা্বে।
আমার্ এমন্ দিন্ কি হবে ॥
অন্তিম সময়ে বন্ধুগণে, আমার শ্রবণে হরিনাম্ শুনাবে।
পুরাণে শুনেছি করুণাময়ো, হরি আমায়্ কি করুণা করিবে ॥" ইত্যাদি।

তথা।

"হরি নাম লইতে অলসো কোরোনা, রসনা, যা হবার তাই হবে।
ভবেরো তরঙ্গ বেড়েছে বোলে কি, ঢেউ দেখে না ডুবাবে ॥" ইত্যাদি।

এই দুইটী নাম কি মনোহর! কি মোহহর! কি মোহকর! শ্রবণ অথবা কীর্ত্তন করণ মাত্রেই অশ্রু পতন ও লোমাঞ্চ হইতে থাকে। অতি মূঢ় পাষণ্ড ব্যক্তিরো হৃদয় আর্দ্র হয়। আবাল বৃদ্ধ বনিতা মাত্রেই মুগ্ধ হইতে থাকেন। সকলেরি অন্তঃকরণে প্রেমের উদয় হয়; সকলেই চমকিত হইয়া মরণ স্মরণ করত মনের সমুদয় মোহ বিকার হরণ পূর্ব্বক ভাব ভক্তি ও জ্ঞানের প্রভাবে মরণ হরণ চরণ স্মরণ করিতে থাকেন। যেখানে যে বাঙ্গালি মহাশয় বিরাজ করিতেছেন, তিনি, সেইখানেই বিশেষ বিবেকের অবস্থায় এই নাম সংকীর্ত্তন কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই নাম কত ভিক্ষুকের উপজীব্য হইয়াছে তাহার সংখ্যা হয় না। কি ইতর কি ভদ্র, তাবতেই এতৎ গানে প্রেমিক হইয়া থাকেন, ইহার মধ্যে কি এক নিগূঢ় মধুরত্ব আছে তাহা আমি বচনে ব্যক্ত করনে অশক্ত হইলাম।

ভবানে বেনে ও নীলু ঠাকুর, ভোলা ময়রা প্রভৃতি প্রথমে হরু ঠাকুরের দলে জিল দিত। পরে দোহার অর্থাৎ গায়কের পদে নিযুক্ত হয়। এইরূপে কিছুদিন গত করিয়া সকলে ভিন্ন ভিন্ন রূপে স্ব স্ব নামে দল স্থাপন করিলেন। তৎকালে হরু সকলকেই গীত ও সুর প্রদান করিতেন। অতি অল্প দিবস পরেই ভবানে বেনে রামজির অনুগত হইয়া তাহারি নিকট গীত লইতে আরম্ভ করিল. সর্ব্বশেষে রাম বসুর আশ্রিত হইয়া মহৎ সুখ্যাতি সংগ্রহ করিল।

হরু ভোলা ময়রাকে মনের সহিত ভাল বাসিতেন, এজন্য নীলুর পক্ষপাত করিয়া তাহাকেই ভাল ভাল গান ও ভাল ভাল সুর গুলীন প্রদান করিতেন। এবং ভোলা জয়ী হইলেই অত্যন্ত তুষ্ট হইতেন, একারণ নীলু তাঁহার আশ্রয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য, রাম বসু, গৌর কবিরাজ ও রামসুন্দর রায়ের শরণ লইলেন, এবং তাঁহারদিগের প্রদত্ত অস্ত্রের বলে হরু গুরুর সহিত যুদ্ধ দিতে আরম্ভ করিলেন, সেই সমস্ত গীত যুদ্ধে অনেক রহস্য হইয়াছিল। আমরা সময় ক্রমে তদ্বিস্তারিত উল্লেখ করিতে কখনই ত্রুটি করিব না।

এক রাত্রি রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে নীলু ও ভবানে প্রভৃতির দল হরু ঠাকুরের উপর কয়েকটি শ্লেষোক্তি ছেড়ের খেস্‌সা গান গাহিয়া আসর অত্যন্ত সরগরম করিয়া তুলিল, তৎ শ্রবণে সকলের মুখ হইতে খল খল শব্দে হাস্য নির্গত হইতে লাগিল, এবং সকলেই ভাবিলেন হরু ঠাকুর ইহার উত্তর করিতে পারিবেন না। পরে হরু উঠিয়া যখন তাহার সদুত্তর প্রদান করিলেন তখন সেই সমস্ত ব্যক্তি তদপেক্ষা শতগুণে সন্তুষ্ট হইয়া সাধুবাদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। ৯০ বৎসর বয়স্ক কোন প্রাচীন ব্যক্তির প্রমুখাৎ সেই উত্তর গীতের কেবলমাত্র মহড়াটি শ্রবণ করিয়া নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।

যথা।

"মহারাজ, এখন্ যে যা ইচ্ছে করুন্।
সব এই মুগুরের গড়া।
এখন্ যে যা ইচ্ছে করুন্।
কেউ মারুন্ বা দশকোষি পাল্লা, দরিয়া টোপ্‌কে পড়ুন।"

ঐ গানের সমুদয় শুনিতে পাইলে পাঠকগণ বিশিষ্টরূপেই তুষ্ট হইতেন।

রাজা নবকৃষ্ণ যত দিবস জীবিত ছিলেন, তত দিবস হরু ঠাকুর আপন দল রক্ষা করিয়া আপনিই গান গাহিতেন। পরে যে দিবস উক্ত মহাত্মা ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন, সেই দিবসেই ইনি এককালীন শপথ পূর্ব্বক দল ও গাহনা পরিত্যাগ করিলেন। দল স্থাপিত রাখিয়া তাঁহাকে গাহাইবার নিমিত্ত কত ভাগ্যধর ব্যক্তি কত প্রকার লোভ দেখাইয়াছিলেন তিনি কিছুতেই সেই লোভের বশীভূত হয়েন নাই। মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুর বিস্তর অনুরোধ করেন, তাহাতে সম্মত না হইয়া এই উত্তর করিলেন যে "মহাশয়ের পিতার নিকট আমি লজ্জাশূন্য হইয়া যে প্রকার ব্যবহার করি [৭] য়াছি

আপনার নিকট কদাচ সে প্রকার করিতে পারিব না"। এই বাক্যে তাঁহাকে নিরুত্তর করিয়া ক্ষান্ত হইলেন।

হরু ঠাকুর এক বিবাহ করেন, সেই বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র ও দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। বহু দিবস হইল সেই পুত্রটি লোকান্তরিত হইয়াছেন; তাঁহার এক বিধবা স্ত্রী এপর্য্যন্ত জীবিতা আছেন, হরুর দুই কন্যা কয়েকটী সন্তান সন্ততি প্রসব করেন। অধুনা তাঁহারদিগের মধ্যে কেহ কেহ জীবিত আছেন। কিন্তু কিরূপ অবস্থায় দিনপাত করিতেছেন আমরা তদ্বিশেষ বলিতে পারিলাম না। দৌহিত্র সন্তানেরা তাঁহার বাটী ও বিষয়াদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ফলে সে বাটীতে তাঁহারদিগের কাহাকেই আর দেখিতে পাই না। ইহাতে বোধ হয় বিক্রয় করিয়া স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন।

হরু ঠাকুরের গানের নিমিত্ত আমরা কত যত্ন, কত চেষ্টা ও কত পরিশ্রম করিয়াছি, এবং কত স্থানে ভ্রমণ করিয়া কত লোকের উপাসনা করিয়াছি ও এ পর্য্যন্ত করিতেছি তাহা লিখিয়া কি ব্যক্ত করিব? দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিলে যে উপকারের কার্য্য না হয়, আমারদিগের কেবল কায়িক ক্লেশ ও মানসিক অনুরাগের দ্বারা সে কার্য্য সুসিদ্ধ হইয়াছে ও হইতেছে। যে যে মহাশয় অপার অনুগ্রহ বিস্তার পূর্ব্বক এ বিষয়ে যথোচিত আনুকূল্য করিতেছেন —তাঁহারা অস্মদাদিকে জন্মের মত ক্রয় করিয়া রাখিতেছেন, আমরা এ উপকারের প্রত্যুপকার করিয়া তাঁহারদিগের তুষ্টি জন্মাইতে পারি এমত কোন সম্ভাবনাই দেখিতে পাই না।

এ সমস্ত গানে মিলের ও শব্দের যে কিঞ্চিৎ গোলযোগ আছে তাহা কেহ ধর্ত্তব্য করিবেন না, কেবল ভাব অর্থ ও মর্ম্ম গ্রহণ করিবেন। ১০০ এক শত বৎসরের অধিক কাল পূর্ব্বে এরূপ যাহা হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ শুদ্ধ দৈবশক্তির বলে অশিক্ষিত জনের দ্বারা এমত উত্তম রচনা হওয়াতে কে না শ্লাঘার ব্যাপার বলিয়া গ্রাহ্য করিবেন। অদ্য এই অবধি শেষ করিয়া নিম্নভাগে গানগুলীন প্রকাশ করিলাম।

মহড়া।

আর রাধার অভিমান কে সবে, বিনে কেশবে।
হরি পরিহরি একি অন্যে সম্ভবে॥
আমি যে সেই গৌরবিণী, তারি গৌরবে।

চিতেন।

যে বংশীর রব শুনি সদা সর্ব্বক্ষণ।
যেন মৃত দেহে সখি আমার, আসিত জীবন॥
এখনো এ পাপ প্রাণ, রবে কি রবে।

অন্তরা।

শ্যামের গুণের কথা, শুন প্রাণ সই।
ছলক্রমে এক দিনো অভিমানী হই॥

চিতেন।

সে মান ভঞ্জনে হরি পেয়ে কত ক্লেশ।
আসি মানো ভিক্ষা করি নিলো, ধরি যোগির বেশ॥
সে সবো স্বপনো হোলো তারো অভাবে।

[এই গীতের বয়স ৭০ বৎসরের ন্যূন নহে, বরং অধিক হইবে। সেই সময়ের এই রচনাকে অতি উৎকৃষ্টই কহিতে হইবে। আহা! "এখনো এ পাপ প্রাণ রবে কি রবে" এই পদের পরিপাট্য শব্দ কৌশল ও মধুরতার বিষয় কি ব্যাখ্যা করিব? পরিতাপ এই, ইহার অপরাংশ ও দ্বিতীয় প্রাপ্ত হইলাম না।]

মহড়া।

ও সখিরে,
কই বিপিনবিহারী বিনোদ আমার এলো না।
মনেতে করিতে এ বিধু বয়ানো,
সখি এ যে পাপো প্রাণে, ধৈরয না মানে, প্রবোধি কেমনে তা বলনা॥

চিতেন।

সই হেরি ধারাপথো, থাকয়ে যেমতো, তৃষিতো চাতকো জনা।
আমি সেইমত হোয়ে, আছি পথো চেয়ে, মানসে করি সে রূপো ভাবনা॥

অন্তরা।

হায়, কি হবে সজনি, যায় যে রজনী, কেন চক্রপানি এখনো।
না এলো এ কুঞ্জে, কোথা সুখ ভুঞ্জে, রহিল না জানি কারণো॥

চিতেন।

বিগলিত পত্রে, চমকিত চিত্তে, হোতেছে স্থির মানে না।
যেন এলো এলো হরি, হেন জ্ঞান করি, না এলো মুরারি পাই যাতনা॥

অন্তরা।

সই রবি কিরণেরো প্রায় হিমকরো, এ তনু আমারো দহিছে।
শিখি পিক রবো, অঙ্গে মোরো সবো, বজ্রাঘাত সম বাজিছে॥

চিতেন।

সই করিয়ে সঙ্কেতো, হরি কেন এতো, করিলেকো প্রবঞ্চনা।
আমি বরঞ্চ গরলো, ভকি সেও ভালো, কি ফলো বিফলে কাল্ যাপনা॥

অন্তরা।

সই দেখ নিজ করে, প্রাণোপণো কোরে, গাঁথিলাম এ কুসুমহার।
একি নিরানন্দ, বিনে সে গোবিন্দ, হেন মালা গলে দিব কার॥

চিতেন।

সই, খেদে ফাঁটে হিয়ে, কারো মুখো চেয়ে, রহিব অবলা জনা।
আমি শ্যাম্ অন্বেষণে, পাঠালাম্ মনে, তারো সঙ্গে কেন প্রাণো গেলনা॥
[অতি সুন্দর, এই গীত স্থর করিয়া গাহিলে সকলেরি মন মোহিত হয়।]

মহড়া।

কেহ নাহি আর।
হরি তোমা বিনে দুখিনী রাধার॥
ইথে যে উচিত তোমার।
[৮] করহে মুরারি, অধীনী তোমারি, সকলি তোমারে লাগে ভার॥

চিতেন।

আগেতে বাড়ায়ে গৌরবো, সে সবো, পুন করিলে সংহার।
জগতেরো পতি, তোমারো কি ক্ষতি, যে দুখো হোলো সে অবলার॥

অন্তরা।

ওহে শ্যাম্, ভাব দেখি একোবার্, গোকুলেরো সে নীরে।
কিরূপো ব্যাভারো, হোতো নিরন্তরো, সকলি বিস্মরিলে॥

চিতেন।

হোতেম্ যখন্ মানিনী, আপনি করিতে যে ব্যবহার্।
সে সবো এখনো, হইল স্বপনো, স্মরণার্থে রয়েছে আমার॥

অন্তরা।

ব্রজনাথ্। এক্ষণে, ব্রজ ভূমেরো, হোয়েছে হে যে দশা।
উদ্ধবো সকলি, দেখেছে বিশেষো, কি কহিব সহসা॥

চিতেন।

আগমন কালে মাধবো, আসিবো, কোয়ে ছিলে এই সার।
কেবল্ মাত্র আশা, ব্রজেরো ভরসা, নতুবা হে সকলি আঁধার্॥

অন্তরা।

কেবল্ এই হেতু প্রাণো আছে গোপিকার শরীরে।
ত্রিভঙ্গ মুরারি, বাধা মনমালি, জাগিতেছে অন্তরে॥

চিতেন।

দিবানিশি এই ধ্যানো, বাহ্যজ্ঞানো, হারা হোয়ে অনিবার।
কখনো চেতনো, পেয়ে ডাকি প্রাণোকৃষ্ণ কোথায়, দুঃখে কর পার॥

অন্তরা।

আর কি, হবেহে এমন দিন্, পুন যাবে ব্রজেতে।
আর কি হে হরি, হইবে কাণ্ডারি, যমুনা পার হোতে॥

চিতেন।

আর কি কদম্বতলে, কৌশলে, লবে দান পশরা।
কহে রঘুনাথো, হবে মনোনীতো, সকল ব্রজবাসি জনার॥

[চমৎকার, চমৎকার।]

মহড়া।

কি হবে। কোথা গেলে হরি, অনাথো করি, তেজিয়ে পথো মাঝে।
তব বিরহে, হৃদয়ো, বিদরে যে।
আমি একাকী এ বনে, রহিব কেমনে, হরি মরি প্রাণে যে॥

চিতেন।

হায়, এই স্কন্ধে করি, আমারে মুরারি, লইতে চাহিলে হে যে।
আবার কিবে ভাবান্তরে, অদেখা আমারে, হোলে কি মনে বুঝে॥

অন্তরা।

হায়। ওহে তরুগণো, মোরো শ্যামধনো, দেখেছ কেহ তোমরা।
বিড়ম্বিলো বিধি, সে প্রাণনিধি, এই খানে হোয়েছি হারা॥
[কি আক্ষেপ! এই গীতের অপরাংশ প্রাপ্ত হইলাম না।]

মহড়া।

কদম্বতলে কেগো, বংশী বাজায়।*
এত দিনো আসি যমুনা জলে, আমি এমনো মোহনো, মূরতি কখনো, দেখিনি এসে হেথায়॥

চিতেন।

অঙ্গে অগৌর চন্দনো চর্চ্চিতো, বনমালা গলায়।
গুঞ্জ বকুলের মালে, বাঁধিয়াছে চূড়া, ভ্রমরা গুঞ্জরে তায়॥

অন্তরা।

সই, সজল নবজলদ বরণো, ধরি নটবরো বেশ্।
চরণো উপরে থুয়েছে চরণো, এই কি রসিকো শেষ্॥

চিতেন।

চন্দ্র চমকে চলিতে চরণ্, নখরেরো ছটায়।
আমার হেন লয় মনো, জীবনো যৌবনো, সঁপিব ও রাঙ্গা পায়॥

অন্তরা।

হায়। অনুপম রূপো মাধুরী সখি, হেরিলাম্ কি ক্ষণে।
প্রাণো নিলে হোরে, ঈষতো হেসে, বঙ্কিমো নয়নে॥

চিতেন।

মন্দ মধুরো মুচকি হাসি, চপলা চমকায়।
কুলবতীর কুলো, শীলো, গেলো গেলো, মন্ মজিলো হেরে উহায়॥

অন্তরা।

সই, অলকা আবৃত বদনো, তাহে মৃগ মদো তিলকো।
মনোহরো সাজো, নাসাগ্রে গজো. মুকুতার ঝলকো॥

---

*বাঙ্গালীর গানে (পৃ ১১২) এবং বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ে (পৃ ১৫৫৮) এই গানটি দেওয়া হয়েছে রঘুর নামে। প্রাচীন কবি সংগ্রহে (পৃ ১৩) গানটি আছে খণ্ডিত আকারে। গ্রীতিগীতি (৫৬৩ নং) এবং বাঙ্গালীর গানে সবশেষে একটি চিতেন আছে।—সঃ

চিতেন।

বিম্বঅধরে অর্পে বেণু, সে রবে ধেনু চরায়।
কিবে সুন্দরো সুঠামো, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমো, রূপে ভুবন ভুলায়॥

অন্তরা।

সই, বেষ্টিত ব্রজ বালকো সবে, কি শোভা আমরি হায়।
গগনেতে তারাগণো মাঝে, চাঁদ যেন শোভা পায়॥
সই, কেনবা আপনা খেয়ে, আইলাম যমুনায়।
হেরে পালটিতে আঁখি, নাহি পারি সখি, রঘু কহে একি দায়॥
[আহা, আহা! কি সুমধুর! হরু ঠাকুরের প্রথম অবস্থার এই গান।]

মহড়া।

আগে যদি প্রাণসখি জানিতেম।
শ্যামেরো পীরিতো, গরলো মিশ্রিতো, কারো মুখে যদি শুনিতেম্॥
কুলবতী বালা, হইয়া সরলা, তবে কি ও বিষো ভকিতেম্।

চিতেন।

যখন মদনমোহন আসি, রাধা রাধা বোলে বাজাতো বাঁশী, যদি মন্ তায় না দিতেম্।
সই, আমিও চাতুরী, করিয়ে সে হরি, আপন বশেতে রাখিতেম্॥

অন্তরা।

হইয়ে মানিনী, যতেকো গোপিনী, বিরহ জ্বালাতে জ্বলিতেম্।
[১] সই, বড়জাল সম, সে বঙ্ক নয়ন, জানিলে কি তায়, এ কোমল প্রাণ সমর্পণো করিতেম্।

চিতেন।

আগে গুরুজনো, বুঝালে যখনো, তা যদি গ্রহণো করিতেম্।
রিপুগণো বশে, রহিতো অনাসে, মনেরো হরিষে থাকিতেম্॥
[অতি আশ্চর্য্য! সর্ব্বাংশেই সুন্দর।]

মহড়া।

হরি ব্রজনারী চেননা এখন।*
রাধার প্রণোধন॥
প্রভাসো তীর্থে দরশন।
পাইয়ে কৃষ্ণেরে, অভিমানো ভরে, কহে করে ধোরে গোপীগণ॥

চিতেন।

নাহি পীতধটি মুরলী, গোচারণের সে ভূষণ।
এবে যদুপতি, হয়েছো ভূপতি, দ্বারকা পতি, স্বোণারো ভবন॥

অন্তরা।

যদুনাথ। আরো কেন দুখিনীগণে স্মরণো হবে।
গিয়েছে সে সবো, ব্রজেরো ভাবো, মজেছ গৃহ ভাবে॥

চিতেন।

রুক্মিনী আদি রাজসুতা, বশতা, সবে সেবে ও চরণ।
রাধা কুরূপিনী, গোপের রমণী, বনবাসিনী কি লাগে মন॥

অন্তরা।

ওহে শুনেছি, দ্বারকাতে তব, সে সুখো বিলাস।
মহিষীগণেরো, বিবিধ প্রকারো, পূরাতেছ অভিলাষ॥

চিতেন।

সত্যভামার মানো রাখিলে, রোপিলে, পারিজাতেরো কানন।
তাহে আছ বাঁধা, সাধো প্রিয় সাধা, ভুলেছ রাধার প্রেমধন॥

অন্তরা।

তোমারে, অকিঞ্চন জন নাথো, কৃষ্ণ জগজনে কয়।
এই হেতু নাথো, অকিঞ্চন যতো, ও পদে আশ্রয় লয়॥

চিতেন।

সে নামে কলঙ্ক রাখিলে, ত্যজিলে, যখন্ শ্রীবৃন্দাবন।
আর ও চরণো, না লবে শরণো, দুখে গেলে প্রাণো দুখিজন॥

---

* গুপ্তরত্নোদ্ধারে (পৃ ৩২), বাঙ্গালীর গানে (পৃ ১২০) এবং প্রীতিগীতিতে (২৪০৫ নং) সবশেষে চিতেন আছে। প্রাচীন কবি সংগ্রহে দ্বিতীয় অন্তরা থেকে অবশিষ্ট অংশ নেই।—স.

অন্তরা।

শুনহে, বহুকালান্তরে, প্রাণবঁধু পেয়েছি দেখা।
জীবনে মরণে হরি তোমা বিনে, আর নাহিকো সখা॥
সুখো দুখো কৃষ্ণ তব হাত, রঘুনাথ, করয়ে নিবেদন।
চলহে নিলাজো, গোপিকা সমাজো, ব্রজরাজো নন্দেরো নন্দন॥
[এই গানে কি আশ্চর্য্য প্রেম পূরিত করুণা প্রকাশ পাইয়াছে।]

মহড়া।

ইহাই কি তোমারি, মনে ছিল হরি, ব্রজকুলনারী বধিলে।
বলনা কিবাদ সাধিলে।
নবীনো পীরিতো, না হইতে নাথো, অঙ্কুরে আঘাতো করিলে॥

চিতেন।

একি অকস্মাতো, ব্রজে বজ্রাঘাতো, কে আনিলো রথো গোকুলে।
অক্রুরো সহিতে, তুমি কেন রথে বুঝি মথুরাতে চলিলে॥

অন্তরা।

শ্যাম্, ভেবে দেখ মনে, তোমারি কারণে, ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী।
নাহি অন্য ভাবো, শুনহে মাধবো, তোমারি প্রেমেরো প্রয়াসী॥

চিতেন।

শ্যাম্, নিশিভাগ নিশি, যথা বাজে বাঁশী, তথা আসি গোপী সকলে।
কি সে হলেম্ দুষি, তা তোমায় জিজ্ঞাসি কি দোষে এ দাসী তেজিলে॥
[আহা! এই গানের সমুদয় পাইলাম না। অতি মনোহর।]

ঐ গীতের পাল্‌টা মহড়া।

যদি চলিলে মুরারি, তেজে ব্রজপুরী, ব্রজনারী কোথা রেখে যাও। *
জীবনো উপায় বোলে দেও।
হে মধুসূদনো, করি নিবেদনো, বদনো তুলিয়ে কথা কও॥

চিতেন।

শ্যাম যাও মধুপুরী, নিষেধো না করি, থাক হরি যথা সুখো পাও।
একবার্ সহাস্য বদনে, বঙ্কিম নয়নে, ব্রজগোপীর পানে ফিরে চাও॥
[কি দুঃখ! এই গীতটি সংপূর্ণ পাইলাম না।]

---

* প্রীতিগীতিতে (২৩৪১ নং) এই গান রাম বসুর নামে। বাঙ্গালীর গানে (পৃ ১১৪) এই গানটির রচয়িতা হরু ঠাকুর।—স.

মহড়া।

পুন হরি কি আসিবে বৃন্দাবনে গো।
সখি কও শুভ সমাচার।
জীবনো জুড়াও রাধার॥
মথুরা নগরে, মাধবেরো, দেখে এলে কি রূপ ব্যবহার॥

চিতেন।

না হেরে নবীনো, জলধরো রূপো, আকুলো চাতকী জ্ঞান।
দিবা নিশি আমার সেই শ্যাম ধ্যান॥
জীবনো যৌবনো, ধনো প্রাণো, হরি বিনে সকলি আঁধার॥

অন্তরা।

হায়, ভূপতি নাকি হয়েছে হরি, মধুপুরো সুখো বিলাসী।
স্বরূপে কহনা, সেখানে রাজার, কে রাজ মহিষী।
[এ গানের যে পর্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতেই মন অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছে।]

মহড়া।

ঐ আসিছে কিশোরি তোমার কৃষ্ণ কুঞ্জেতে।
সুখে বঞ্চিল নাজানি কোথা, কারো সহিতে॥
বঁধু ঘুমে ঢোলে পড়ে নারে চলিতে।
শুখায়েছে বিম্বাধরো শ্যাম চাঁদেরো, বঁধুর এলায়েছে পীতবাসো, নারে ভুলে পরিতে॥

[১০] চিতেন।

যাহারো লাগিয়ে নিশি করিলে প্রভাত্।
ওই সই সেই প্রাণোনাথ্॥
প্রভাতে অরুণো সহ উদয় আসি;
বঁধুর হোয়েছে অরুণো আঁখি নিশি জাগরণেতে॥
[এই মনোহর গীতটির সমুদয় না পাওয়াতে চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে।]

ঐ গানের দ্বিতীয় অথচ উত্তর।

মহড়া।

নিজ দাসের দোষো ক্ষমা কর, ওগো কিশোরি।
পীতবাসো গলে দিয়ে বলে বংশীধারী॥
যদি হোয়ে থাকে অপরাধো চরণে ধরি॥

চিতেন।

পোহাইলেম্ সঙ্কটে রজনী দুখেতে।
কহিব কার সাক্ষাতে॥
বরং তুমি শুভলে জিজ্ঞাসা কর, আমি ভ্রমিলামো বনে বনে, হারাইয়ে বাসরী॥

[কি বিচিত্র! বিচিত্র!]

ঐ গীতের তৃতীয় অথচ উত্তর।

মহড়া।

ওহে চাতুরী করিয়ে হরি ভুলাও আমায়।
ওহে চতুরেরো শিরোমণি, শ্যাম রস রায়॥
বনে অধরের অঞ্জনো তোমার লাগিল কোথায়॥
চিকুরেরো চিহ্ন হেরি হৃদয়ে তোমার,
তোমার কক্ষেতে কঙ্কণো চিহ্ন, ওই যে হে দেখা যায়॥

[যদিও ইহার সমুদয় পাই নাই, তথাচ এতৎ পাঠে তাবতেই কবির কবিত্বের প্রচুর পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।]

মহড়া।

সখিরে গৃহে ফিরে চলো।
শ্রমে শ্রীমতীর শ্রীমুখো ঘামিলো॥
নিকুঞ্জে আজু যাওয়া না হোলো॥
ঐ দেখনা কিশোরী, বৃক্ষ শাখা ধরি, কাতরা হোয়ে দাঁড়ালো॥

চিতেন।

কিশোরী কিশোরে, দোঁহে একত্তরে, হেরিব সাধো ছিলো।
তাহে নিদারুণো বিধি, হোয়ে প্রতিবাদী, সে আশা পুরাতে না দিলো॥

অন্তরা।

হায় শ্রী হরি স্মরিয়ে, সুযাত্রা করিয়ে, যেতে ছিলেম কুঞ্জকাননে।
তাহে হেন বিঘ্ন, জন্মিলো গো কেন, আমাদের কি কপাল বিগুণে॥

[এই উৎকৃষ্ট গীতের সংপূর্ণ সংগ্রহের জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই।]

ঐ গানের পাল্‌টা অথচ উত্তর।

মহড়া।

আমারে সখি ধরো ধরো।
ব্যথারো ব্যথিতো কে আছো আমারো॥
পথ শ্রান্তে নহিগো কাতরো।
হৃদে নবঘনো, দলিতাঞ্জনো বরণো, উদয়ে অবশো শরীরো॥

চিতেন।

অঙ্গ থরো থরো, কাঁপিছে আমারো, আরো না চলে চরণ।
সেই শ্যামো প্রেমোভরে, পুলক অন্তরে, সম্বরা যে ভারো অম্বরো॥

অন্তরা।

হায়, সে যে কটাক্ষেরো, অপাঙ্গ ভঙ্গিমো, বয়ানো কোরে তা কি কবো।
লেগেছে যাহারে প্রবেশি অন্তরে, সেই সে বুঝেছে সে ভাবো॥

চিতেন।

কুলো শীলো ভয়ো, লজ্জা তারো যায়ো, না রাখে জীবনো আশ্‌।
তারো জলে বা, স্থলে বা, অন্তরীক্ষে কিবা সন্দেহ নাহি মরিবারো॥

[হে ভাবুকগণ, আপনারা ভাবগ্রাহি ও মর্ম্মগ্রাহি হইয়া এই গীতের ভাব ও মর্ম্ম গ্রহণ করুন।]

মহড়া।

ও শ্রীরাধে, তোমার প্রেমেরো প্রেমি যে হওয়া ভার।
মহিমা অপার।
তব মায়াতে ত্রিজগতো বশো, প্যারি তুমি বশো বল দেখি কার॥

চিতেন।

গজ গামিনি রাই, জানিয়ে তত্ত্ব জাননা আপনার।

দেখ ত্রিদশেরো পতি যে জনো, তারে স্থাপিবারো তুমি মূলাধার॥

ঐ গীতের পাল্‌টা।

মহড়া।

রাধে তুমি কি সামান্যা নারী।

তব প্রেমে বাঁধা বংশীধারী॥

দেখগো মনে বিচারি।

শ্রীদামেরো শাপে, সেই মনস্তাপে, উদয় হইলে গোলোক পুরী॥

চিতেন।

বৃষভানু ঘরে জন্মেছ গোরাই, করিতে লীলা প্রচার।

রাধাতন্ত্রে শুনেছি মহিমা তোমার॥

পূর্ণ ব্রহ্মময়ী তুমি রাধে, গোলোকো ধামের ঈশ্বরী॥

[এই দুই গীতের সমুদয় পাইলাম না।]

মহড়া।

ওহে উদ্ধব, আমার এই রাজধানী।

মনে ধরে না॥

মনো সে প্রেম পাসরে না।

যখন ভাবি ব্রজপুরী, ধ্যাইয়ে কিশোরী, উপজয়ে কত ভাবনা।

চিতেন।

আমার মনে যে কি ভাবো, উদয় উদ্ধবো, তাতো তুমি বুঝনা।

আমার এ মনো মন্দিরো, সদা শূন্যাকারো, বিহনে সেই ব্রজাঙ্গনা॥

ঐ গীতের পাল্‌টা মহড়া।

ওহে উদ্ধব, আমি সেই রাধার প্রেমেরি প্রেমাধীনো।

সেই নিত্য বস্তু হে জেনো।

আরো সকলি অনিত্য, সেই সত্য সত্য, এ তত্ত্ব তুমিতো না জানো।

[এই দুই গীতের মধ্যে কত প্রেম ও রস আছে তাহা সকলে বিবেচনা করুন। ইহার সংপূর্ণ পাইলাম না।]

[১১] মহড়া।

সখিরে রসেরো অলসে।
গত দিবসেরো রজনী শেষে॥
অচেতন হোয়ে সুখো আবেশে।
শ্যামের অঙ্গে পদ থুয়ে শ্যামেরে হারায়ে, কেঁদেছিলাম কত হুতাশে॥

চিতেন।

যে বিচ্ছেদো ভরে, পরাণো শিহরে, তাই ঘটেছিলো, সই।
অমনি কম্পান্বিতো হৃদি, হেরে শ্যাম নিধি, হোরে নিলো বিধি কি দোষে॥

অন্তরা।

রাই অত্যন্ত কাতরা, নয়নেতে ধারা, বহিছে কহিছে ওহে শ্যাম্।
তব দরশনো, আকাঙ্ক্ষী যে জনো, তার প্রতি কেন হোলে বাম॥

চিতেন।

কোন সখী কহে, হেথা থাকা নহে, এ বনো অতি দুর্গম।
আনি সুশীতল বারি কোন সহচরী, বদনে দিতেছে হুতাশে॥

[এই গীতের ভাব কৌশল ও যথার্থ গোপনীয় মর্ম্ম যিনি গ্রহণ করিবেন, তাঁহারি মন আর্দ্র হইতে থাকিবে, কি চমৎকার! রচনা প্রণালীতে স্বপ্নাবস্থার স্বরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে।]

মহড়া।

মানিনী শ্যামচাঁদে, কি অপরাধে।*
তুমি হেয়েছো রাধে॥
ঠেকিলাম্ আজ্ একি প্রমাদে।
ম্লানো শশিমুখো কেনগো রাই, হেরিগো আজ্ এত আহ্লাদে॥

চিতেন।

এই দেখে এলেম্ কৃষ্ণ সহিতে হাস্য কৌতুকে।
ছিলেগো রাই, দোঁহে অতি পুলকে॥
ইতিমধ্যে বিচ্ছেদো অলন্, [অনল ?] উঠিলো কি বাদানুবাদে।

[আহা! ইহার সংপূর্ণ ও দ্বিতীয় পাইলাম না।]

---

*প্রাচীন কবি সংগ্রহে (পৃ ১৯) এবং গুপ্তরত্নোদ্ধারে (পৃ ৭২) হরুর নামে। প্রীতিগীতিতে (১৭৮০ পৃ) ভবানী বণিকের নামে।—স.

মহড়া।

যদি শ্যাম না এলো বিপিনে।
তবে কি হবে সজনি।
লম্পটো স্বভাবো তার জানি॥
ওগো বৃন্দে এই সন্দ হয়।
সে গোবিন্দ যে আমারো বাধ্য নয়॥
বুঝি কারো সহবাসে পোহায় রজনী।

চিতেন।

ছিলো যে সঙ্কেতো হরি আসিবে নিশ্চয়্।
বিলম্ব দেখে তায়, হতেছে সংশয়॥
বহু শ্রমে কুসুমেরি হার্।
গাঁথিলাম্ সখি গলে দিব কার্॥
যদ্যপি বিস্মৃত হোয়ে থাকে গুণমণি।

অন্তরা।

কৃষ্ণপ্রাণা আমি আমার্, অনন্ত গতি।
বোলে কি জানাবো তোমায়, তুমি কি জাননা দূতি॥

চিতেন।

ক্রমেতে হোতেছে যত নিশ অবশেষ।
শ্যাম বিনে ততই বাড়িছে ক্লেশ্॥
আসারো আশয়ে এতক্ষণ।
রয়েছি করিয়ে পথো নিরীক্ষণ॥
মাধবো না এসে যদি, এসে দিনমণি।

[আমি ভাব গ্রহণ করিতে করিতে অস্থির হইয়াছি, ইহার স্বরূপ গুণ ব্যাখ্যা করিয়া শেষ করিতে পারিলাম না।]

মহড়া।

শ্যামের ঐ গুণেতে ঝোরেগো নয়ন।
সে যে বিপক্ষো মধুসূদন॥
নাম ধরে, ত্রিসংসারে, ত্রিলোকো তারণ।

মহা ঘোর বিপত্তি কালে।
যে ডাকে শ্রীকৃষ্ণ বোলে॥
সে সঙ্কটে কৃষ্ণ তারো করেন্ দুখো নিবারণ॥

চিতেন।

সাধে কি আমারো মনো কৃষ্ণ প্রতি ধায়।
কি গুণে বেঁধেছে, পাশরিতে নারি তায়॥
যত লীলা করেছেন্ মাধব্।
অন্তরে জাগিছে সে সব্॥
বাঁচাইলেন্ ব্রজপুরী, ধরি গিরি গোবর্দ্ধন।

[ইহার আর কিছুই পাইলাম না।]

মহড়া।

সখি শ্যামচাঁদে করগো মানা।
কোন ছলে, যেন এসে না কদম্বতলে,
ললিত ত্রিভঙ্গ রূপো, হেরে প্রাণো যে বাঁচেনা॥

[এতদ্ভিন্ন আর কিছুই পাইলাম না।]

মহড়া।

অকূলো পাথারেতে।
ডোবে নৌকা রাখ ওহে রাধানাথ॥
তরি করে টলো টলো, কি হোলো, কি হোলো, জলেতে ডুবিলো অকস্মাৎ।

চিতেন।

প্রতিদিনো হরি, এই তরি, লোয়ে করি যাতায়াৎ।
এমনো সঙ্কটে, ঠেকিনি কখনো, তোমারো চরণো প্রসাদাৎ॥

[আহা! ইহার আর আর অংশ পাইলাম না।]

মহড়া।

বোঝা গেল না। হরি কেমন্ তোমার করুণা।*
মরিহে কি বিবেচনা॥
দিয়ে রাধার প্রেমে ডুরি, এলে মধুপুরী, পূরাতে কুবুজার মনো বাসনা।

চিতেন।

সকলি বিস্মৃতো, কি ব্রজনাথো, হোলে একোকালে।
ভেবে দেখহে গোকুলে, হোলো কি কি লীলে, তাকি তোমার মনে পড়েনা॥

অন্তরা।

শ্যাম্, নন্দ উপানন্দ, সুনন্দ আরো, রাণী যে যশোমতী।
হা কৃষ্ণ, জো কৃষ্ণ, কোথা প্রাণো কৃষ্ণ, বোলে লোটায় ক্ষিতি॥

চিতেন।

আরো শুন হরি, নিবেদন করি ব্রজেরো সমাচার।
ব্রজ গোপিকা সকলের, নয়নের জলে,
কেবলো প্রবলো হেরি যমুনা॥

[অতি সুন্দর।]

---

[১২] মহড়া।

এমন সুখদ সময়ে কোথা হে, ত্যজিয়ে এ সুখো বৃন্দাবন।
দুখিনী রাধায় মদন করে দগ্ধ হে মদনমোহন॥
এ সময়ে সখা, দেও হে দেখা, নিরখি তোমার চন্দ্রানন।

চিতেন।

একেতো সহজে এ ব্রজধাম, সদা সুখেরো আস্পদ।
তাহে কালগুণেতে, পূর্ণ সুখো সম্পদ॥
রসিক নাগরো, তোমা বিনে আরো, কে করে এ রসের উদ্দীপন!

অন্তরা।

প্রতি কুঞ্জে কুঞ্জে কিবে সুশোভন, সব মুঞ্জরিল তরুগণ।
পুনর্ব্বার যেন, এ ব্রজধাম, ধরিল নব যৌবন॥

---

*প্রীতিগীতিতে (২৩৬৯ নং) এই গান ভবানী-বণিকের নামে।—স.

চিতেন।

মুকুলে মুকুলে, কোকিলে জাল, করে কুহু কুহু রব।
কুসুমে কুসুমে, গুঞ্জরে অলি সব।
আমরি আমরি, এই শোভা হেরি, হইলে কি সবো বিস্মরণ।

— —

মহড়া।

আজ বাঁধ্‌বো তোমায় বনমালি।*
করিয়ে সখী মণ্ডলী॥
নাগরালি তোমার যত, কর্ব্ব হত, দিয়ে অঙ্গেতে ধূলি।
গোরসেরো, অবশেষো, দিব মস্তকে ঢালি॥

[এই গীতের অপরাংশ পাইলাম না।]

মহড়া।

কি কাযো আর ব্রজভুবনে।†
হায়, সে নীলরতনো, দরশনো বিহনে॥
রোয়ে রোয়ে চিতো, হয় চমকিতো, কেঁদে কেঁদে প্রাণ উঠে সঘনে।

চিতেন।

হায়, যদবধি হরি, গ্যাছে মধুপুরী, অনাথিনী করি, গোপীগণে।
সেই হোতে প্রায়, আছি মৃতবৎ, পরাণো গিয়েছে তাহারি সনে।

অন্তরা।

হায়, কোথা গেলে পাবো, সে প্রাণো মাধবো, কিরূপে মিলিব তারো চরণে।
গৃহ পরিবারো, সকলি অসারো, সেই মনোহরো, নাগরো বিনে।

চিতেন।

হায়, রজনী কি দিনো, হোয়ে জলাতনো, এই আরাধনো করিগো মনে।
হোয়ে বিহঙ্গমো, যাই সেই ধামো, দেখি গিয়ে শ্যামো বংশীবদনে।

---

*বাঙ্গালীর গানে (পৃ ১২২) এই গানটি সম্পূর্ণ দেওয়া আছে।—স.

†প্রীতিগীতিতে (১৩১৮ বং) এই গানের সবশেষের চিতেন নেই।—স.

অন্তরা।

হায়, যে শ্যামসোহাগে যারো অনুরাগে, আমি সোহাগিনী, সকলো স্থানে।
যে শ্যামের গুণো, দেব ত্রিলোচনো সদা করেন গানো, পঞ্চ বদনে॥

চিতেন।

হেন প্রাণেশ্বরো, ছেড়ে গ্যাছে মোরো, কি কাযো এ ছারো, দেহ ধারণে।
চল সবে মিলি, হোয়ে গলাগলি, ঝাঁপ্ দিব যমুনা জীবনে॥

অন্তরা।

হায়, এই যে সুখেরো, গোকুলো নগরো, হোয়েছে আঁধারো, শ্যাম কারণে।
কদম্বেরো তলো, বিহারেরো স্থলো, হেরে আঁখি জলো, বহে সঘনে।

চিতেন।

হায়, ঘটায়ে প্রমাদো, গিয়েছে বিনোদো, এ খেদো সম্বরি রহি কেমনে।
হে যদুনন্দনো, বিপদো ভঞ্জনো, দিয়ে দরশনো, বাঁচাও প্রাণে॥

[অতি উত্তম]

মহড়া।

আছে চন্দ্রাবলীর ঘরে।
দেখে এলেম্ তোমার্ শ্যাম চাঁদেরে॥
শুয়ে কুসুম শয্যাপরে।
নিশির শেষেরো অলসে অচেতন,
কারো সঙ্গে নাহি বসনো ভূষণ,
ভুজে ভুজে বাঁধা, যুক্ত অধরে অধরে॥

চিতেন।

তুমি রাধে অতি সাধে, করেছ প্রণয়।
সে লম্পটো কভু নয়, সরল হৃদয়॥
তোমারো সঙ্কেতো জানায়ে।
শ্যাম বিহরিছে অন্তেরে লোয়ে।
দেখিবেতো এসো রাধে, দেখাই তোমারে।

[ইহার সমুদয় পাইলাম না।]

মহড়া।

এ সময় সখা দেখা দেওহে।

তব অদর্শনে ব্রজনাথ, আমার আঁখি মনো সদাই দয়হে॥

হরি তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ যায়, হায় হায় হায় হে।

চিতেন।

গীরিস্ম, বরষা, হিমো শিশিরে, যত দুখো হে।

সব সম্বরণো কোরেছি, কৃষ্ণ বসন্ত যাতনা প্রাণে না সয় হে॥

অন্তরা।

প্রায় ব্যাধজাল হোয়ে, ঘেরেছে আমায় কোকিলেরো স্বর জাল্।

তাহে পোড়ে আমি, হরিণী সমানো ডাকিহে তোমারে নন্দলাল্।

চিতেন।

জীবনো যৌবনো, ধনো প্রাণো হরি, সঁপেছি সব তোমারে হে।

বিপত্তে মধুসূদনো, আমা প্রতি কেন, নিদয়ো জনার্দ্দনো হে॥

মহড়া।

দীননাথ, দীন ডাকে তোমায় হে, দীনবন্ধু বোলে।

পোড়ে অপার অকূলে॥

সেকি এমনি দুঃখে জলে।

চিতেন।

ওহে নিতান্ত যে সঁপে মন প্রাণ, তব শ্রীচরণ কমলে।

ডাকে সে মনের ব্যাকুলে॥

অন্তরা।

তব হৃষীকেশ কেশব দামোদর মুকুন্দ মধুসূদন নাম।

বিপদে পড়িয়ে যে ডাকে তোমায়, হেলে পায় সুখ মোক্ষধাম॥

[১৩] চিতেন।

ওহে তবে দীন প্রতি, এ, যে, বিপরীত, এ কি হে তব লীলে।

না পাই কোন কালে।

মহড়া।

শ্যাম তিলেকো দাঁড়াও, হেরি চিকণো কালো বরণ।*
শ্যাম্ তিলেকো দাঁড়াও॥
এ অধীনীর মনের মানস পূরাও।

সাধ মম বহু দিনের, আজ্ পেয়েছি অজনে, চন্দ্রাননে হাসি হাসি, বাঁশীটি বাজাও॥

চিতেন।

নির্জ্জনে এমন না পাব দরশন।
যায় নিশি যাক্, জানুক্, গুরুজন॥
তাহাতে নহি খেদিতো, শুন ওহে ব্রজনাথো॥
ও বংশীরো গুণ কত, বিশেষে শুনাও॥

অন্তরা।

শ্যাম, শুন শুন, যাও কেন, রাখহে বচন।
তোমার বাঁশীর গান্ আমি করিব শ্রবণ॥

চিতেন।

কোন্ রন্ধ্রে পূরে ধ্বনি কুলবতীর মন।
কুল সহিতে হে করিলে হরণ॥

কোন্ রন্ধ্রে পূরে ধ্বনি, রাধায় কর উদাসিনী, সাক্ষাতে বাজাও শুনি, আমার মাথা খাও॥

[অতি উত্তম।]

মহড়া।

আবার ঐ দেখ বাঁশী বাজেগো কুঞ্জবনে।
শুনগো সখি, এবার্ গেল কুলবতীর কুল মান, হবে কি,
মনে হোলে হৃদি বিদরিয়ে যায়, বারে বারে সবো কেমনে॥

চিতেন।

একবার্ বেজে শ্যামের মুরলী গো, সই ঐ কাল বিপিনে।
মনো সহ প্রাণো, করেছে হরণো, মরিতেছি গুরু গঞ্জনে॥

[সমুদয় পাইলাম না।]

---

*বাঙ্গালীর গানে (পৃ ১১৩) এই গানটি অতি দীর্ঘ।—স.

মহড়া।

অতি কাতরে কিশোরী কয়।
আয় দোসরী, বনে গিয়ে হেরি সেই বংশীধারী, বৃন্দে সখীর করে ধরি,
করে সবিনয়॥
যেমন্ আছিস্ তেম্নি আয়গো, আর্ বিলম্ব নাহি সয়।

চিতেন।

মুক্তকেশী, হোয়ে আসি গৃহ বাহিরে।
সজল নয়নে সাধে, সবারে॥
ব্যথার ব্যথী কে আছিস্ আমার, এসোগো এ সময়।

ঐ গানের পাল্‌টা অথচ উত্তর।

মহড়া।

ইথে কার অসাধ কমলিনি।
বল শুনি হাঁগো রাধে, হেরিতে নীলকান্ত মণি॥
আমরাতো সব তব আজ্ঞাবর্ত্তিনী।
যাবে কৃষ্ণ দরশনে, এতো শ্লাঘা কোরে মানি॥

চিতেন।

কায় মনো প্রাণো যারো, পদে সমর্পণ।
সে ধনে হেরিতে আমাদের, আলস্য কখন্॥
যদ্যপি কাল্ বল তুমি, আমরা প্রস্তুতো এখনি।
[এই সাট্‌টি অতি সুন্দর। ইহার সংপূর্ণ পাইলাম না।]

মহড়া।

এসেছো শ্যাম্, কোথা নিশি জাগিয়ে।
শুষ্কদেহ লইয়ে, এলে কারে প্রাণ সঁপিয়ে॥
এখন্ কি হইল মনে, শ্রীমতী বোলে,
কি ভাবিয়ে রাধানাথো, এখন হোলে উপনীতো, কোথা করিলে
প্রভাতো শ্রীরাধারে তেজিয়ে॥

চিতেন।

কোন্ প্রাণে সে তোমারে, দিলেহে বিদায়।
তুমি বা কেমনে তেজে, আইলে হেথায়॥
বিদরে আমারো বুকো, তব মুখো হেরিয়ে।

[এই গীতের অপরাংশ ও দ্বিতীয় পাইলাম না।]

অন্ত সখী সংবাদ এই পর্য্যন্ত শেষ করিয়া নিম্নভাগে কয়েকটি বিরহ প্রকাশ করিলাম।

মহড়া।

তোমার আশাতে এ চারিজন*
মোরো মনো প্রাণো শ্রবণো নয়ন্॥
আছে অভিভূতো হোয়ে সর্ব্বক্ষণ।
দরশো পরশো, শুনিতে স্বভাষো, করিতেছে আরাধন্॥

চিতেন।

অন্তরূপো আঁখি না হেরে আর।
শ্রবণো, প্রাণো তুমি জুড়াবার॥
শয়নে স্বপনে, মনো ভাবে মনে, কবে হইবে মিলন্।

অন্তরা।

প্রাণ, ইহারো কি বলো উপায়।
আমি যে ঠেকিলাম্ বিষমো দায়॥

চিতেন।

অস্থিরো হোলো এ চারি জনে।
প্রবধি প্রবোধো নাহি মানে॥
ইহার বিহিতো, যে হয় ত্বরিতো, কর প্রেয়সি এখন্।

অন্তরা।

প্রাণ, জীবনো যৌবনো ধনো।
এতো চিরো পদো নহে জানো॥

---

* [illegible] (পৃ ৭৯) বাঙ্গালীর গান (পৃ ১১৪) এবং প্রীতিগীতিতে (৩২৯ নং) এই গানটি পরিবর্ত্তিত আকারে উদ্ধৃত।—স

চিতেন।

এ তুমি শুনেছো জানতো প্রাণো।

অনুগতেরো রাখ সম্মানো॥

ও মৃগলোচনি, ও বিধুবদনি কর, সুধা বিতরণ॥

অন্তরা।

প্রাণ, এ রূপো আশ্বাসো কথায়।

বল কি ফল আছে তায়॥

চিতেন।

প্রতি দিনো আসি বিমুখে যাই।

নিবৃত্তি না হয়ো এ আশা বাই॥

ত্বরিতে সান্তনা, কর সুলোচনা, আরো না সহে যাতন।

[চমৎকার, চমৎকার।]

ঐ গীতের দ্বিতীয় অথচ উত্তর।

মহড়া।

প্রাণ স্থিরো নীরে বেঁধে প্রস্তরো।

[১৪] তুমি চঞ্চলো কেন এতো।

যাতে জনমে তব মনো প্রীতো॥

তাই কি না হবে, বুঝ নাহে ভাবে, আছিতো অনুগত

চিতেন।

আয়াসো পেয়ে হয় যে সুখো লাভ্।

সেই সে সুখেতে সুখো প্রভাব্॥

দেখো তার্ প্রমাণো, চাতক্ নব ঘনো, ব্যাভারে কি কি মতো।

[এই দুইটি গানে কবি অতি বিচিত্র কবিত্ব ও রসিকতা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহার সংপূর্ণ পাইলে পাঠক মহাশয়েরা পাঠ করত কি পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন তাহা লিখিয়া কি ব্যক্ত করিব! আমরা সংগ্রহের নিমিত্ত সাধ্যের ত্রুটি করি নাই, বোধ করি ইহার পর কোন না কোন মহাশয় কর্ত্তৃক আমারদিগের মনোরথ পূর্ণ হইবে।]

মহড়া।

ওহে বার বার আর কেন জানাও আমায়।
বুঝিয়াছি তোমারো যে মনের আশায়॥
তুমিতো আমারি আছো গিয়েছো কোথায়।

চিতেন।

সুখে থাকো মনে রাখো, এখন্ এই চাই।
তব গুণ গাই, কোথাও না যাই॥
তুমি যত ভালোবাসো ভাবে বুঝা যায়।

অন্তরা।

ওহে, তোমারো ও গুণো প্রাণো, থাকুকো তোমায়।
ও বাতাসো যেন হে, না লাগে কারো গায়॥

চিতেন।

তব সম, প্রিয়তম, কোথা পাবো আর।
হেন অসাধার্, গুণ আছে কার॥
বিবিধ রূপেতে আমি জেনেছি তোমায়।

অন্তরা।

যদি নারী হোয়ে করে কেউ, প্রেম অভিলাষ।
তোমার্ মতন্ রসিক্ পেলে, পূরে তারো আশ॥

চিতেন।

যে রূপো সুখে সে ভাসে, বিধি বিধানে।
কব কেমনে, সেই সে জানে॥
এক মুখে তব গুণো, কয়ে না ফুরায়।

অন্তরা।

ওহো যত দিনো, দেহে প্রাণো, থাকিবে আমার।
ঘুষিব ঘোষণা আমি নিয়ত তোমার॥

চিতেন।

তুমি যেমনো সুজনো রসিকেরো শেষ।
জানি সবিশেষ, নাহি দোষো লেশ॥
তোমারো রীতো চরিতো জাগিছে হিয়ায়।

অন্তরা।

তুমি ঘৃণাগ্রেতে জাননাকো শঠতা কেমন্।
আহা মরি মরি তব, কি সরলো মন্॥

চিতেন।

রঘুনাথো কহে কেন ও বিধুমুখি।
কি দোষো দেখি হোয়েছো দুখী॥
কেন হেন বাক্যবাণ, হানিছো উহায়।

[কি আশ্চর্য্য সুকৌশল সংযুক্ত সুব্যঙ্গ পরিপূরিত সুধাময় শব্দে এই গীতটি বিরচিত হইয়াছে।]

মহড়া।

যৌবনকালে যদি নারী, বুঝিতো পীরিৎ।*
তমোগুণে না হইত পূরিৎ॥
পুরুষেরো হইত বাধিৎ।
তাবতো হইত প্রেমে, সুখো সমুচিৎ॥

চিতেন।

সময়ে প্রেমেরো নাহি, করে আকিঞ্চন।
করমে কখন্, যায় যৌবনো যখন্॥
সে প্রণয়ে হয়ো কিনা, নানা বিঘটিৎ।

[আহা মরি "যৌবনকালে নারী যদি বুঝিতো পীরিৎ" আহা! আমি সেই কবির চরণে প্রণাম করি, যে কবির রসনা হইতে এই চমৎকার উক্তি উক্ত হইয়াছে।]

মহড়া।

বুঝেছি মনেতে।
রমণীর প্রেম কেবল্ ধন।
মিছে মিছি সে মিলন॥
তাদের ধন লোয়ে কথা, পীরিতি বা কোথা, কাকস্য পরিবেদন।

---

* বাঙ্গালীর গানে (পৃ ১২০) ঈষৎ পরিবর্তিত।—স.

চিতেন।

যদি হৃদয় চিরে প্রাণ্ নারীরে কর সমর্পণ।
তবু কেমন চরিত্তো, তাহে কদাচিত্তো,
নাহি পাওয়া যায় মন॥

অন্তরা।

রূপে কাম্ সদৃশো, পুরুষো, অর্থ হীন যদি হয়।
সেই রসিকো জনে, নারী নয়নে, না ফিরে চায়॥

চিতেন।

অতি নীচ যদি হয়, নিত্য ধন দেয়, যেচে তারে স'পে যৌবন।
তাহে কুৎসিত্তো কুজনা, নাহি বিবেচনা, স্বকার্য্য করে সাধন॥

অন্তরা।

কেবল্ অর্থেতেই লোভো, মৌখিকো সে সবো, কহে যে প্রেমো কথন।
পীরিতি রসেরো, রসিকো নারী, সহস্রে মেলে একজন।

চিতেন।

সকলেরি এ আশায়, কেবা প্রেম চায়, হোলে হয় স্বর্ণ ভূষণ।
তাদের্ সেই হয় প্রিয়তমো, সেই মনোরমো, ধন্‌দে তোষে যে জন॥

অন্তরা।

যার স্বামী আকুতী, তারে সে যুবতী নাহি করে মান্যমান।
বলে ধিক্ থাক্ পিতা মাতারে, এমন্ দরিদ্রে যে দিয়েছে দান॥

চিতেন।

যদি কপালোগুণে, পুনো সে জনে, অর্থ করে উপার্জ্জন।
তখন্ হেসে কয় যুবতী, পেয়েছি এ পতি, কোরে হর আরাধন॥

অন্তরা।

দেখে অর্থ আছে যারো, সদা নারী তারো, করয়ে মনোরঞ্জন।
বলে পাদপদ্মে স্থানো, দিও ওহে প্রাণো, আমি করিব সহগমন॥

চিতেন।

পুরাতে বাসনা, ললনা ছলনা, কথাতে করে কেমন্।
[১৫] করে আগেতে যেমনো, না থাকে তেমনো, হোলে পরে পুরাতন॥
[সমুদয় পূর্ব্বোক্ত বিরহের মধ্যে এই বিরহটিকে উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।]

মহড়া।

এত দুখো অপমান। সাধেরো পীরিতে প্রাণ।
নিতি নিতি প্রাণো, নূতনো আগুনো, উঠে না হয়ো নির্ব্বাণ॥

চিতেন।

অতি সমাদরে, জুড়াবারো তরে, জোরে ছিলেম পীরিতি।
আমার সে সকলো গেলো, শেষে এই হোলো, সদা ঝোরে দুনয়ান॥

[এই গানের সমুদয় না পাওয়াতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলাম।]

মহড়া।

পীরিতের ও কথা, কোয়েতো ফুরায় না।
প্রাণ, যত কও ততই, উপজে কতই, পরিসীমা হয় না॥

[হায় কি পরিতাপ! এই গীতের আর কিছুই পাইলাম না, যাহার চরণের এত শোভা, তাহার মুখের মাধুরী কতই হইবে বলিতে পারি না।]

মহড়া।

ধিক্ ধিক্ ধিক্ তার, জীবনো যৌবন।*
এমন্ প্রেমের সাধ,, করে যেই জন॥
সে চাহেনা আমি তার যোগাই মন।

চিতেন।

যেখানেতে না রহিল, মানি জনার মান।
সে কেমন্ অজ্ঞান্, তারে সঁপে প্রাণ॥
সেধে কেঁদে হয়ো গিয়ে কলঙ্ক ভাজন।

অন্তরা।

একি প্রণয়েরি রীতি সই, শুনেছ এমন।
কেহ সুখে থাকে, কেহ দুখে জলাতন॥

চিতেন।

শয়নে স্বপনে মনে, যে যারে ধ্যায়ায়।
সে জনো তাহায়, ফিরে নাহি চায়॥
তথাপি না পারে তারে হোতে বিস্মরণ

---

* গুপ্তরত্নোদ্ধার (পৃ ৮৩), প্রীতিগীতি (২৩১ নং) বাঙ্গালীর গানে (পৃ ১১৩) পরিবর্ত্তিত।—স,

অন্তরা।

সখি পীরিতি পরম ধনো, জগতেরি সার।
সুজনে সুজনে হোলে, হয়ো ছারেখার॥

চিতেন।

সামান্ত খেদেরো কথা একি প্রাণো সই।
কারেই বা কই, প্রাণে মোরে রই॥
ঘরে পরে আরো তারে করয়ে লাঞ্ছন।

অন্তরা।

যারে ভাবিব আপনো সই, তার এ বোধো নাই।
এমনো প্রেমেরো মুখে, তারো মুখে ছাই॥

চিতেন।

হেন অরণ্য রোদনে, ফলো আছে কি।
এ হোতে সুখী একা যে থাকি॥
ধোরে বেঁধে করা কিনা প্রেমো উপার্জ্জন।

অন্তরা।

যার স্বভাবো লম্পটো সই, তারে কি এ বোধ।
আছে, কি করিবে তব, প্রেম অনুরোধ॥

চিতেন।

অতি দৃঢ় উভয়েতে হওয়া এ কেমন।
এরূপো মিলন্, না দেখি কখন॥
রঘু বলে কোথা মেলে, দুজনে সুজন।
[উত্তম, উত্তম।]

——

মহড়া।

যার স্বভাবো যা থাকে প্রাণনাথ, তা কি ঘুচাতে কেহ পারে।
নিবেদন্ তোমারে॥
শুনেছি কথনো, অঙ্গারের মলিনো, ঘুচে কি দুধে ধুলে পরে।

চিতেন।

নিম্বতরু যদি রোপনো হয়ো, শত ভায়ো শর্করে।
সে যে মিষ্ট রসো, না হয়ো কখনো, নিজ গুণো প্রকাশো করে॥
[এই গীতের সমুদয় পাইলে কি সুখের ঘটনা হইত।]

মহড়া।

তুমি কার প্রাণ, করি দেহ শূন্য এলে বাহিরে।
হেরে যেরূপো, বাসনা করে॥
করি পরিত্যাগ আপনো প্রাণ, সেইখানে রাখি তোমারে।

চিতেন।

পদার্পণে যে কমলে পূর্ণিতো করিলে বসুমতী।
জ্ঞানো হয় প্রাণ তেমতি॥
নয়নো কটাক্ষে কুমুদো প্রকাশ, পাইতেছে তব অম্বরে।
[আহা, আহা! এই কবিত্ব গুণে যাবজ্জীবন বদ্ধ রহিলাম।]

মহড়া।

পীরিতি নাহি গোপনে থাকে।
শুনলো সজনি বলি তোমাকে॥
শুনেছ কখনো, জলন্ত আগুনো, বসনে বন্ধনো, করিয়ে রাখে।

চিতেন।

প্রতিপদের চাঁদো, হরিষে বিষাদো, নয়নে না দেখে, উদয়ো লেখে।
দ্বিতীয়ের চাঁদো, কিঞ্চিতো প্রকাশো, তৃতীয়ের চাঁদো জগতে দেখে॥

[এমত চমৎকার কবিতা, এমত আশ্চর্য্য ভাব, প্রায় কখনই শ্রবণ করি নাই, যিনি ইহার সংপূর্ণ প্রদান করিবেন, তিনি আমাকে বিনা মূল্যে ক্রয় করিবেন। "তৃতীয়ের চাঁদ জগতে দেখে" একথার তুল্য নাই, মূল্য নাই, অতি অমূল্য ধন।]

মহড়া।

এই ভয় সদা মনেতে ॥
বিচ্ছেদো বা ঘটে পীরিতে ॥
হোতেছে এখনো, নূতনো যতনো, কি হোলে কি হবে শেষেতে।

চিতেন।

প্রাণ নব অনুরাগে, পীরিতি সোহাগে, আছি আলাপনেতে।
বিনি আবাহনে ও বিধুমুখো, পাই সদা দেখিতে ॥
হেন ভাবো যদি, থাকে নিরবধি, তবে যাবে প্রাণ সুখেতে।
[উত্তম।]

---

[১৬] মহড়া।

রহিলনা প্রেম গোপনে।
হোলো প্রকাশিতে ভাল দায় ॥
কুলকলঙ্কী লোকে কয়।
আগে না বুঝিয়ে পীরিতে মজিয়ে, অবশেষে দেখো প্রাণো যায় ॥

চিতেন।

আমি ভাবিলাম আগে, যে ভয় অন্তরে, ঘটিল আমারে সেই ভয়।
গৃহেরো বাহিরো, না পারি হইতে, নগরেরো লোকো গঞ্জনায় ॥

অন্তরা।

হায়, কতজনে কত, বলেছে নাথো, মোরে থাকি মরমে।
বদনো তুলিয়ে কথা নাহি কই সরমে ॥

চিতেন।

হায়, কি পুরুষো নারী, করে ঠারাঠারি, যখন তারা দেখে আমায়।
ভাবি কোথা যাব, লাজে মরে যাই, বিদরে ধরণী যাই তায় ॥

অন্তরা।

হায়, হৃদয়ো মাঝারে লুকায়ে, সদা রাখি প্রেমো রতনে।
কি জানি কেমনে সখা তথাপি, লোকে জানে ॥

চিতেন।

হায়, পীরিতেরো কিবা সৌরভো আছে, সে সৌরভো মম অঙ্গে বয়।
কলঙ্ক পবনে লইয়ে সে বাসে, ব্যাপিলো জগতোময় ॥
["মধুরেণ সমাপয়েৎ" এই গান কি মধুর মধুর।]

৺নিত্যানন্দদাস বৈরাগী*

[৫] কবিওয়ালার মধ্যে নিত্যানন্দ বৈরাগী অত্যন্ত বিখ্যাত ও সর্ব্বপ্রিয় ছিলেন। ইহাঁকে সাধারণে "নিতে বৈষ্ণব" বলিত, এই নিতাইদাস ঈশ্বরানুকম্পায় এতদ্দেশীয় সংগীত বিদ্যায় অতিশয় নিপুণ হইয়াছিলেন; তাঁহার কণ্ঠবিগলিত সুস্বর শুনিয়া সকলেই মোহিত হইতেন। গীত এবং গাহনা দ্বারা ইনি বহু জনের মন হরণ করিয়াছিলেন।—গাহনা বিষয়ে ইহাঁর যদ্রূপ ক্ষমতা ছিল, কবিতা রচনা পক্ষে তদ্রূপ ছিল না, তথাচ সময়ে সময়ে প্রয়োজন মতে স্বয়ং গান প্রস্তুত করিতেন। কলিকাতার সিমুলা নিবাসী ৺গৌর কবিরাজ এবং নবাই ঠাকুর নামক একজন ব্রাহ্মণ কবিতা সকল প্ররচন পূর্ব্বক ইহাঁকে প্রদান করিতেন। তাঁহারদিগের প্রণীত গীতের দ্বারা নিতাইদাস সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইতেন। গৌর কবিরাজ বিরহ ও খেউড় গান যেমন উত্তমরূপে রচনা করিতে পারিতেন, অন্য গান তত উত্তম [৬] করিয়া রচিতে পারিতেন না; কিন্তু তাহাও অনেকাংশে উৎকৃষ্ট হইত। উক্ত কবিরাজ নিত্যানন্দ ভিন্ন অপরাপর অনেক দলে গানের সাহায্য করিতেন, "লোকে যুগী" নামে বিখ্যাত লক্ষ্মীকান্ত কবিওয়ালাকে ও নীলু ঠাকুরকে সর্ব্বদাই গান দিতেন, শ্রোতৃগণ অতিশয় যত্নযোগে সেই সকল গান শ্রবণ করত বিশেষ গৌরব প্রকাশ করিতেন। নিত্যানন্দ যে সমস্ত বিরহ ও খেউড় গাহিয়া যশস্বী হয়েন তাহার অধিকাংশই ইনি রচনা করিয়া দেন।

নবাই ঠাকুরের নিবাস কোথায় তাহা জ্ঞাত হইতে পারি নাই, ফলে রচনা পক্ষে সবাই নবাই ঠাকুরের অনুরাগ করিয়া থাকেন। ইনি সকল প্রকার গান নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তন্মধ্যে সখীসংবাদ সর্ব্বাপেক্ষাই উত্তম হইত, এবং আসরে উত্তর কাটিতে ভাল পারিতেন।

নিতাইদাস বাঙ্গালা ১১৫৮ সালে চুঁচুড়ার দক্ষিণ চন্দননগর গ্রামে কুঞ্জদাস বৈষ্ণবের ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সপ্ততি অর্থাৎ ৭০ বৎসরের অধিক কাল এই জগতীপুরে বিচরণ করিতে পারেন নাই। ইহাঁর একমাত্র স্ত্রী এবং "জগচ্চন্দ্র, রামচাঁদ ও প্রেমচাঁদ" নামে তিন পুত্র ছিল, পিতার মরণান্তে ঐ

* সংবাদপ্রভাকর, বুধবার ১ অগ্রহায়ণ ১২৬১ সাল। ইং ১৫ নবেম্বর ১৮৫৪।—স.

তিন সহোদর পৃথক্ পৃথক্ রূপে তিন দল করত গাহনা দ্বারা খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, এইক্ষণে তাহারা কেহই সজীব নাই, একে একে তাবতেই মানব-লীলা সম্বরণ করিয়াছে। সংপ্রতি ঐ বংশে বংশধর কেহই নাই।

নিতাইদাস যদিও কোন শাস্ত্রাভ্যাস করেন নাই, তথাচ সভ্যতা ও বক্তৃতা গুণে কেহই তাঁহাকে অশাস্ত্রিক জ্ঞান করিতে পারিত না, কারণ বাক্‌পটুতা ভাল ছিল, এবং নিজে যে যে কবিতা রচিতেন তাহা নিতান্ত মন্দ হইত না। বিশেষতঃ অপরের আনুকূল্যে যে সকল কবিতা গান করিতেন, প্রায় সকলেই তৎসমুদয় তাঁহার কৃত বলিয়াই জানিত। সেই গীতাবলীর শব্দ পারিপাট্য ও বিশুদ্ধ ভাব জন্য পণ্ডিতেরাও নিতাইকে পণ্ডিত বলিয়া উল্লেখ করিতেন।

ইঁহার দলে গোরাচাঁদ ঠাকুর ও নীলুঘোষ, এই দুইজন গায়ক প্রায় তাঁহার তুল্যই ছিল। ধনিলোক মাত্রেই কোন পর্ব্বাহ উপলক্ষে কবিতা শুনিবার ইচ্ছা হইলে অগ্রেই নিতাই দাসকে "বায়না" দিতেন। ইঁহার সহিত "ভবানে বেনের" সংগীত যুদ্ধই ভাল হইত।

যথা। কথা।

"নিতে ভবানের লড়াই"

এক দিবস ও দুই দিবসের পথ হইতেও লোক সকল নীতে ভবানের লড়াই শুনিতে আসিত, যাঁহার বাটীতে গাহনা হইত, তাঁহার গৃহে লোকারণ্য হইত, ভিঁড়ের মধ্য ভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে হইলে প্রাণান্ত হইত, তৎকালে যদিও অন্যান্য অনেক দল ছিল, কিন্তু হরুঠাকুর, নিতাই দাস, এবং ভবানী বণিক, এই তিন জনের দল সর্ব্বাপেক্ষাই প্রধানরূপে গণ্য ছিল।

এই নিত্যানন্দের গোঁড়া কত ছিল, তাহার সংখ্যা করা যায় না, কুমার হট্ট, ভাটপাড়া, কাঁচরাপাড়া, ত্রিবেণী, বালী, ফরাসডাঙ্গা চুঁচুড়া প্রভৃতি নিকটস্থ ও দূরস্থ সমস্ত গ্রামের প্রায় সমস্ত ভদ্র ও অভদ্র লোক নিতায়ের নামে ও ভাবে গদগদ হইতেন। নিতাই দাস জয়লাভ করিলে ইঁহারা যেন ইন্দ্রত্ব পাইতেন। পরাজয় হইলে পরিতাপের পরিসীমা থাকিত না। যেন হতসর্ব্বস্ব হইলেন, এমনি জ্ঞান করিতেন। অনেকের আহার নিদ্রা রহিত হইত, কতস্থানে কতবার গোঁড়ায় গোঁড়ায় লাঠালাঠি ও কাটাকাটি হইয়া গিয়াছে। অন্যে পরে কা কথা, ভাটপাড়ার ঠাকুর মহাশয়েরা নিত্যানন্দকে "নিত্যানন্দ প্রভু" বলিয়া সম্বোধন করিতেন, ইঁহার গাহনার প্রাক্কালে "প্রভু উঠেছেন" বলিয়াই গোঁড়ারা ঢলঢল

হইত। নিতায়ের এই এক প্রধান গুণ ছিল, যে, ভদ্রাভদ্র তাবল্লোককেই সমভাবে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন। বিশিষ্ট জনেরা ভদ্রগানে এবং ইতর জনেরা খেউড় গানে তুষ্ট হইত। এমত জনরব যে, বসন্তকালে কোন এক রজনীতে কোন স্থানে ইনি সখীসংবাদ ও বিরহ গাহিয়া আসর অত্যন্ত জমাট করিয়াছেন, তাবৎ ভদ্রেই মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছেন ও পুনঃ পুনঃ বিরহ গাহিতেই অনুরোধ করিতেছেন, তাহার ভাবার্থ গ্রহণে অক্ষম হইয়া ছোটোলোকেরা আসরে দাঁড়াইয়া চিৎকার পূর্ব্বক কহিল "হ্যাদ্ দেখ্ লেতাই, ফ্যার্ ঝদি কাল্কুকিলির গান ধল্লি, তো, দো, দেলাম, খাড়্ গা" নিতাই তচ্ছ বণে তৎক্ষণাৎ মোটা ভজনের খেউড় ধরিয়া তাহারদিগের অস্থির চিত্তকে সুস্থির করিলেন।

এই নিতাই দাস ১২২৮ সালে কাসিমবাজারের রাজভবনে দুর্গাপূজার সময়ে গাহনা করত প্রত্যাগত হইয়া সাংঘাতিক রোগে তনুত্যাগ করিলেন। ইনি কবিতা গাহিয়া বিস্তর ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু সর্ব্বদাই সৎকর্ম্ম করিয়া সদ্ব্যয় দ্বারা সেই ধনের সার্থকতা করিতেন, বাবাজী চুঁচুঁড়ায় এক "আখ্ড়া" ও বাটীতে এক দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতানুযায়ি "দোল" "রাস" ইত্যাদি ক্রিয়া কলাপ যথা নিয়মে করিতেন, অনেক লোককে নিত্য আহার দিতেন, অতিথি সেবায় অত্যন্ত অনুরাগ ছিল, তাঁহার বাটীতে অতিথি আসিয়া কখনই বিমুখ হয় নাই। অধুনা জীবিত থাকিলে এতদিনে তাঁহার বয়স ১০৩ বৎসর হইত, যেহেতু ১১৫৮ সালে জন্ম লইয়া নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ [৭] ভোগ করত ১২২৮ সালে নিত্যানন্দ-ধামে নিত্যানন্দে লয় প্রাপ্ত হয়েন। ৩৩ বৎসরের অধিক নহে তিনি ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন।

আমরা বহুদিন পর্য্যন্ত বহু পরিশ্রম ও বহু কষ্ট ভোগ করিয়া বহু স্থান হইতে বহুলোকের উপাসনা পূর্ব্বক নিতাইদাস বাবাজীর দলের কয়েকটী সংপূর্ণ ও অসংপূর্ণ গীত সংগ্রহ করত নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম, সকলে মনোযোগ সহযোগে এতৎপ্রতি নয়ন নিক্ষেপ করুন। এই সমস্ত অসংপূর্ণ গান যিনি সংপূর্ণ করিয়া দিবেন এবং ইহার অতীত অপরাপর কবিতা প্রদান করিবেন, আমরা তাঁহাকে পরম হিতকারী কারুণিক বন্ধু বলিয়া চিরকাল রসনাযন্ত্রে তাঁহার সুখ্যাতি ঘোষণা করিতে থাকিব। অপিচ এই স্থলে এইমাত্র আক্ষেপ রহিল যে প্রত্যেক কবিতার প্রয়চকদিগের নাম পৃথক্ পৃথক্ করিয়া প্রকাশ করিতে পারিলাম না, কারণ কোন্ গান কাহার কৃত তাহার নির্ণয় হইল না,

কিন্তু কোন কোন প্রাচীন লোকে কহেন, নিতাই যে সকল ভাল ভাল বিরহ গাহিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই গৌর কবিরাজের কৃত।

মহড়া।

সই কি কোরেছ হায়।
তোমরো সরলো পরাণো সঁপেছ কারে।
চেননা উহারে প্রাণো সখিরে॥
কত রমণীরো বোধেছে জীবনো, ঐ শঠ জনো পীরিতি কোরে।

চিতেন।

নয়নেরো বশো হোয়ে প্রাণসখি, পোড়েছ যে দেখি বিষম ফেরে।
হৃদয়ো মণ্ডলে, কারে দিলে স্থান, পুরুষো পাষাণো, চেননা ওরে॥
তুমিলো যেমনো, রমণী ভাজনো, তোমার এগুণো, কেবা বুঝিবে।
ও যে অতি শঠো, কুমতি কুরীতো, পরেরে মজায়ে সদাই ফেরে।

মহড়া।

রাধারো বঁধু তুমি হে,
আমি চিনেছি, তোমায় শ্যামরায়।
রাজার বেশ্ ধরেছ হে মথুরায়॥
রাখালেরো বেশো লুকায়েছ বঁধু, বাঁকা নয়ন্ লুকাবে কোথায়।

চিতেন।

এত অন্বেষণ করিয়ে মোহন, দরশন পেলেম্ ভাগ্যোদয়।
পাঠালেম্ কিশোরী, ওহে বংশিধারি, প্রতারণা কোরোনা আমায়॥

অন্তরা।

এত যে মুরারি, জামা যোড়া পরি, বাবু দিলে গজপরেতে।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমো, রূপো ঠামো শ্যামো, ঢাকা নাহি যায় তাহাতে॥
[ইহার আর কিছুই না পাওয়াতে চিত্ত অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে।]

মহড়া।

বঁধুর বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে।
শ্যামের বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে॥
নহে কেন অঙ্গ, অবশো হইলো, সুধা বরষিলো শ্রবণে।

চিতেন।

বৃক্ষডালে বসি, পক্ষি অগাণতো, জড়বতো, কোন কারণে।
যমুনারো জলে, বহিছে তরঙ্গ, তরু হেলে বিনে পবনে॥

অন্তরা।

একি একি সখি, একিগো নিরখি, দেখ দেখি সবো, গোধনে।
তুলিয়ে বদনো, নাহি খায়ো তৃণো, আছে যেন হীন চেতনে॥

চিতেন।

হায়, কিসেরো লাগিয়ে, বিদরয়ে হিয়ে, উঠি চমকিয়ে সঘনে।
অকস্মাতো একি প্রেমো উপজিলো, সলিলো বহিছে নয়নে॥
আরো একো দিনো, শ্যামেরো ঐ বাঁশী বেজেছিল কাননে।
কুল্যে লাজো ভয়ো, হরিলে তাহাতে, মরিতেছি গুরু গঞ্জনে॥

[যদি সহস্র বদন হইত, তবে এই গীতের যথার্থ গুণ বর্ণনা করিতে পারিতাম।]

মহড়া।

আমার মনো নাহি সরে তায়।
তুমি প্রেম করিবারে বলিছ আমায়॥
শুন সজনি, বলি তোমায়।
ইহা জেনে শুনে, ফণির বদনে, কর দেয় কে কোথায়॥

চিতেন।

বারে বারে পীরিতে সই, বিধিমতে পেয়েছি পুরস্কার।
ইহাতে যত সুখো সম্পদো, নাই অবিদিতো আমার॥
সুধারো কারণে, বল কোনোখানে, কে কোথা গরলো খায়।

[উৎকৃষ্ট।]

মহড়া।

পীরিতি নগরে বিষমো সাধ, মনোচোরেরো যে ভয়।
বসতি ইহাতে দায় ॥
নয়নে নয়নে সন্ধানো, মনো অমনি হরিয়ে লয়।

চিতেন।

সন্ধানো করিয়ে মনোচোর্ ভ্রমিছে নগরময়।
কুলেরো বাহিরো হওনা, থেকো সাব্‌ধানে লো সদয় ॥

মহড়া।

হেরি প্রাণ্‌রে তব মুখো কমলে, নয়নো খঞ্জন্।
ওলো হবে দুখো নিবারণ ॥
অতি সুমঙ্গল হেরি আজ যুবতি, বুঝি ভূপতি হব এখন।

চিতেন।

কমলোপরেতে খঞ্জন, যদি দেখে কোনো জন্।
অবশ্য তাহারো হয় রাজ্যলাভ, ওলো এইতো বেদের বচন্ ॥

অন্তরা।

হায়, ইহার কারণে, যাত্রাকালেতে শুন ওলো সুন্দরি।
বামে শব শিবে কুম্ভ, দক্ষিণে মৃগ দ্বিজ হেরি ॥

চিতেন।

তারি ফলো বুঝি আমারে আসি, ফলিলো এখন্।
[৮] ছত্রধারী হব তোমারো হৃদয়ে, পাব হৃদি সিংহাসন্।

[চমৎকার, চমৎকার !]

মহড়া।

যে কালে সলিলে বটপত্রে ভাসেন শ্রীপতি।
তখন কোথায় ছিলেন শ্রীমতী ॥
ইহার তত্ত্ব কথা কহ সম্প্রতি, ও দূতি।
রাধা ছাড়া হরি নয়, সবে কয়।
সই আমার ঐ সন্দ হয় ॥
জানি রাধা কৃষ্ণ একই আত্মা, ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি।

চিতেন।

তুমি চতুরা গোপী মধ্যে, বৃন্দে সজনি।
সবিশেষ, আমায় কও দেখি শুনি ॥
মহা প্রলয়-যে দিন, সে কালীন।
শ্যাম সঙ্গ রাই কেন বিহীন ॥
জানি শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম, প্রধানা রাই প্রকৃতি।
[ইহার অন্তরা ও দ্বিতীয় গান না পাওয়াতে অতিশয় কাতর হইলাম।]

মহড়া।

কহ দেখি সখি রাধারে কেন, মা, রাধা কেউ বলে না।
শ্রীমতী বটে সজনি, প্রকৃতিরূপে প্রধানা ॥
যদি ভাবি মনে, মা বলি বদনে জড়তা হয় রসনা।

চিতেন।

যে সীতে সে রাধা, ব্রহ্মরূপিণী, একই জানি দুজনা।
জগতো মণ্ডলে, সীতারে সকলে, মা বোলে করে সাধনা ॥
[ইহার সমুদয় পাইলাম না।]

মহড়া।

পরাণো থাকিতে প্রেয়সি, তোমারে কি তেজিতে পারি।
এমতি মনেতে কেন ভাবো সুন্দরি ॥
কি তব মনেতে, হইলো উদয়ো ইহারো কারণো, বুঝিতে নারি।

চিতেন।

ছলো ছলো করে নয়নো, দেখে প্রাণো ধরিতে নারি।
কি দুখো ভাবিয়ে, রয়েছ বসিয়ে, বিধুমুখো মলিনো করি ॥
[আহা কি পরিতাপ! ইহার অপরাংশ পাইলাম না।]

মহড়া।

পীরিতে সই, এমন্ বিবাগী হই, ভাবি তারো মুখো নিরখিব না।
এ মুখো তারে দেখাব না ॥

বিরহে প্রাণ গেলে তবু কথা কব না।
পুনো হোলে দরশনো, কর‍য়ে কি গুণো, তখনো সে মনো থাকে না॥
চিতেন।
সখি না জানি কি ক্ষণে, সে লম্পটো সনে. হইলো বিধিরো ঘটনা।
অন্তরো সদা উদাসী, দিবানিশি ঐ ভাবনা॥
সখি হেন নাহি কেহ, নিবারে এ দাহ, কালী হোলো দেহ দেখনা।
[সুন্দর, সুন্দর।]

মহড়া।
প্রেম ভাঙ্গে কি হোলে।
যার ভাঙ্গে তার নাহি বাঁচে প্রাণ্, যারে লোকে প্রেমিক বলে॥
জীবনেরো সাথী, হয়ো যে পীরিতি, জীবনে মরে পীরিতি গেলে।
চিতেন।
প্রেমরসে যেই জনো হয়ো রসিকো।
নিরবধি ধরে সে, যে, মিলনো সুখো॥
স্বপনে না জানে কারে, বিচ্ছেদো বলে।
অন্তরা।
প্রাণ্, সতীরো পীরিতি দেখ পতির সহিতে।
চিরোদিনো সমভাবে যায়ো সুখেতে॥
চিতেন।
আশ্চর্য্য মিলনো হয় সেই দুজনে।
বিচ্ছেদো কাহারো নাম, না শুনে কাণে॥
জীয়ন্তে মিলনো আবার মিলনো মোলে।
[অতি মনোহর।]

মহড়া।
ধিক্ ধিক্, ধিক্, আমারে ললিতে গো, ধন্ত কুবুজায়।
যোগী যারে ধ্যানে নাহি পায়॥
হেন গুণসিন্ধু হরি, কি গুণে ভুলালে তায়।

চিতেন।

এতদিন অবধি আমরা কোরে আরাধন।
হইলাম বঞ্চিতো, সে হরির চরণ॥
গৃহে বোসে, অনায়াসে, অতুলো চরণো পায়।

[আহা, এ গীতের সমুদয় না পাওয়াতে কি অসহ্য যাতনা ভোগ করিতে হইল।]

মহড়া।

ওরে প্রাণরে। কহ কুমুদিনী পদ্মিনী কোথা আমার।
এ সরোবরে, না হেরে তারে, আমি সবো হেরি শূন্যাকার॥
আমায় কে দেবে মধু দান।
কার মুখো নিরখিয়ে জুড়াইব প্রাণ॥
তাহারো বিচ্ছেদে, মনো প্রাণো কাঁদে চারিদিগে অন্ধকার।

চিতেন।

পদ্মিনীরো সখা ভ্রমরো, জানে এই জগতে।
এই সরোবরে আসিতাম, তারো মনো রাখিতে॥
বিধি তাহে নিদয়ো হোয়ে।
এমনো সুখেরো প্রেমো, দিলে ঘুচায়ে॥
কি হোলো, কি হোলো, কমল্ কোথা গেলো, তারে কি পাব না আর।

[এই গীতের প্রশংসা কত করিব বলিতে পারি না।]

মহড়া।

সে কেন রাধারে কলঙ্কিনী কোরে রাখিলে।*
বুঝিতে নারি সখি, শ্যামেরো লীলে॥
দ্বারিকা হইতে আসিয়ে শ্রীহরি, দ্রৌপদীরো লজ্জা নিবারিলে।

---

* পরে সম্পূর্ণ দেওয়া আছে।—স.

চিতেন।

ইন্দ্র যজ্ঞ ভঙ্গ কোরে সই, যে জনো গিরি ধরিলে।
শিশু বৎস ধেনু কারণে, আরো মায়াতে ব্রহ্মারো মনো ভুলালে॥
[আহা! আহা! এমত গানের সমুদয় প্রাপ্ত হইলাম না।]

মহড়া।

রাই এসো তোমারে, রাজা করি নিধুবনেতে।
[?] বহুদিনের এই সাধো আছে মনেতে॥
দোহাই রাধারো, বোলে শ্যাম নাগরো, ফিরিবে নগরেতে।
[ইহার অপর কিছুই পাইলাম না।]

মহড়া।

সখি ঐ মনোচোরো মোরো, মনো লোয়ে যায়।
কেমনে গো প্রাণ্ সখি ধরিব উহায়॥
আঁখিরো অন্তরো হোতে অন্তরে লুকায়।

চিতেন।

চোরেরো চরিত্র সখি, না জানি এমন্।
নয়নে নিদিলি, মোরো দিলেগো কেমন্॥
জেগে যেন ঘুমাইলাম্, কি হোলো আমায়।
[কি মনোহর, কি শ্রুতি-সুখকর আহা! এই গীতটী সংপূর্ণ পাইলাম না।]

মহড়া।

তুমি কার্ প্রাণ, মম মনো হরিলে এসে।
মৃগনয়নি, নয়নোবাণো হানো অনাসে॥
জর জর জর, কোরে কলেবর, বাঁধিলে ধনি প্রেমো ফাঁসে।

চিতেন।

তোমারে হেরিয়ে আমারো মনেরো তিমিরো বিনাশে।
স্বরূপে বলনা, ও শশি বদনা, ছিলে কার্ হৃদয় বাসে॥
[ইহার অপরাংশ পাইলাম না, ইহাতে মনের আক্ষেপ মনেই রহিল।]

মহড়া।

পুরুষো নিদয়ো সজনি কি জাননা।
সমাদরে রাখেনা ॥
আমি যারে ভাবি আপনো, সে আমারে ভাবেনা।

চিতেন।

যে দুখো যুবতী জনায়, সেকি তাহা জ্ঞাত নয়।
জানিতো যদ্যপি, আসিতো নিশ্চয় ॥
ধনলোভে আছে ভুলে, প্রিয়ে বোলে তোষে না।

অন্তরা।

আপনি শ্রীরামচন্দ্র দয়াময় নারায়ণ্।
উদ্ধারিয়ে সীতে অনলে করে দাহন্ ॥

চিতেন।

অযোধ্যা নগরে গিয়ে রাজা হোলেন শেষেতে।
বনবাসে দিলেন্ পুনো সে সীতে ॥
নারীর পঞ্চমাস গর্ভকালে কিছু দয়া হোলোনা।

অন্তরা।

নল নরপতি তায়, দময়ন্তী ভার্য্যা লোয়ে।
প্রবেশিল বনে, দুইজনে, একত্র হোয়ে ॥

চিতেন!

অর্দ্ধেকো বসনো পোরে, নিদ্রাগত যুবতী।
বসনো ছিঁড়িয়ে যায় নৃপতি ॥
কাননেতে, রেখে যেতে, তিলেকো ভাবিলে না।

[উত্তম।]

মহড়া।

কমলিনি কুঞ্জে কি কর,*
তোমার নবপ্রেম ভাঙ্গিলো।
ব্রজের বসতি বুঝি উঠিলো ॥
মথুরাতে যাবে কৃষ্ণ, ঐ নন্দের ভেরী বাজিলো।

---

* পরে সম্পূর্ণ দেওয়া আছে।—স.

চিতেন।

সহচরী কহে কিশোরি, ব্রজে প্রমাদ্ হইলো।
কংসেরো প্রেরিতে, অক্রুর খুড়া রথে, রাম কৃষ্ণ হোরে লইলো।
[ইহার আর আর অংশ পাইলাম না।]

মহড়া।

প্রাণ্ আমি তোমারি।
নিতান্ত জেনো সুন্দরি॥
তুমি যত কর অপমান্, অঙ্গেতে ভূষণো করি।

চিতেন।

*   *   *

অন্তরা।

প্রাণ, তুমি কাদম্বিনী, মনেতে মানি, আমিতো চাতকী।
অন্য মত য়োরো, নাহিকো মনেতে, বিচারিয়ে দেখ দেখি।

চিতেন।

পিপাসাতে পীড়িতো হোয়ে, যদি তেজি এ জীবন্।
তথাপি অন্য নীরো না করি ভক্ষণ॥
ঊর্দ্ধকণ্ঠ হোয়ে ডাকি, কাদম্বিনি দেহ বারি।
[কি মনোহর! এই সাটের সংপূর্ণ পাইলে কি সুখের ব্যাপার হইত্।]

মহড়া।

হরি ব্রহ্মাণ্ড দেখালে বদনে।
কৃষ্ণ কি-গো জানে॥
বালকো হোয়ে গোকুলে, মৃত্তিকা ভোজন ছলে, মায়া করে মায়েরো সনে।

চিতেন।

যশোদা কহিছে ওগো রোহিনি।
কেমনো বালকো কৃষ্ণ, কিছু না জানি॥
শকট ভঞ্জন সে দিনো করিলে চরণে।
[ইহার অপরাংশ পাইলাম না।]

মহড়া।

প্রেয়সি তোমার্ প্রেমধার্, আমি শুধিলে কি তাহা শুধিতে পারি।
এমতি মনেতে কেন ভাবো সুন্দরি॥
তুমি যে ধনো খাতকে, দিয়েছ করজো, পরিশোধে তাহা পরাণে মরি।

চিতেন।

মন বাঁধা.রেখে, তোমারো স্থানে, লইলাম্ প্রেমো করজো করি।
সে ধারো উদ্ধারো হইবে কেমনে, লাভে মূলে হোলো দ্বিগুণো ভারি॥
[আহা! আহা! এই গানের সংপূর্ণ পাইলে মন কি প্রফুল্ল হইত।]

মহড়া।

কমল কম্পিতো পবনে।
অলি কাতরো প্রাণে॥

*   *   *

চিতেন।

এই সরোবরে নিত্য করি যাতায়াত।
এমনো কখনো নাহি হয় বজ্রাঘাত।
স্থির নলিনী প্রাণে সহে কেমনে।

অন্তরা।

হায়, যে দিগে নলিনী হেলে, মধুকরো ধায়্।
পবনেতে বাদো সাধে, বসিতে না পায়॥

[১০] চিতেন।

হায়্, গুণ্ গুণ্ স্বরে কাঁদে অলি অধোবদনে।
ধারা বহিছে অলির্ দুটি নয়নে॥
অলিরো দুর্গতি দেখি, হাসে তপনে।
[উৎকৃষ্ট, উৎকৃষ্ট।]

মহড়া।

গমনো সময়েতে,
কেন কেঁদে গেল মুরারি ॥
তাই ভাবি দিবা শর্ব্বরী ॥
জনমেরো মত রাধারে কাঁদালে সই, বুঝি ব্রজে আসিবেনা হরি।

চিতেন।

হরি কি আসিবে ব্রজে আর্, মনে সন্দেহ করি।
যদি মধুপুরী হেসে যেতো হরি, পুনো আসিতো বংশিধারী ॥

অন্তরা।

হায়। দুটি করে ধরি, যখনো আমায়, যাই যাই বঁধু কয়।
তখনো শ্যামেরো কমলো বদনো, নয়ন্, জলে ভেসে যায় ॥

চিতেন।

এতই মমতা শ্যামেরো, যাইতে মধুপুরী।
সজলো নয়নে, উঠিলেনো রথে, বিধুমুখো মলিনো করি ॥

[উত্তম।]

মহড়া।

ব্রজে মাধবো এলোনা। কি হবে বলনা।
কিক্ষণে গমনো, করিলো মদনমোহনো, প্রাণ থাকিতে মিলনো হোলো না।

চিতেন।

হরি আসিবে আসিবে বলিয়ে, মিছে করি দিন্ গণনা।
এইরূপে গত, শিশিরো হেমন্ত বসন্ত উদয়ো দেখনা ॥

অন্তরা।

আঁখিজলে, তরুমূলে, সিঞ্চিলাম্ হাম্ ব্রজাঙ্গনা।
চিরো দিনো বঁধু, মথুরা রহিলো, আশাতরু তো ফলিলোনা ॥

[ইহার অপরাংশ পাইলাম না।]

মহড়া।

ব্রজে কি সুখে রোয়েছে।
কি দশা ঘটেছে॥
সে শ্যামসুন্দরো বিহনে দেখনা ওগো রাই, বনের পশু পক্ষি আদি ঝুরিছে

চিতেন।

হায়! সহজে শ্রীমতী তোমার কোমল অঙ্গ যে দহিছে।
শ্যামেরো বিচ্ছেদো, সামান্য কি খেদো, পাষাণো বিদারো হতেছে॥

অন্তরা।

হায়। ভ্রমরার্ দশা দেখ, এ সুখো বসন্ত সময়ে।
ধূলায়ে ধূসরো, হোয়ে কলেবরো, ভূমেতে রয়েছে পড়িয়ে॥

চিতেন।

হায়। সখি কোকিলেরা না করে গানো, অজ্ঞানো হোয়ে রয়েছে।
কৃষ্ণ বিরহেতে দেখনা প্যারী, খেদে কুহুরব ভুলেছে॥
[উত্তম, উত্তম।]

মহড়া।

যদি বৃন্দাবনে এসেছেন্ হরি।
তোমায়্ দয়া কোরে ওগো কিশোরি॥
সবে মেলি হেরি গিয়ে রূপো মাধুরী।
কেন গো বিলম্ব করো, ঐ দেখ বংশীধরো,
রাধা রাধা বোলে সদা, বাজাইছে বাঁশরী॥

চিতেন।

বিধাতা সাজালেন্ শ্যামে অতি চমৎকার্।
বারো একো সাধো ছিল শ্রীমতী রাধার্॥
শ্রীকৃষ্ণের চরণে দিতে, তুলসীরো মঞ্জরী।

অন্তরা।

হায়। কাননেতে তরুলতা, ছিল শুখায়ে।
সকলে প্রফুল্ল হইলো, বঁধুরে পাইয়ে॥

চিতেন।

কোকিলে পঞ্চম স্বরে করিতেছে গান্।
কমলে বসিয়ে অলি, করে মধুপান্॥
আনন্দে মগনা হোয়ে, নৃত্য করে ময়ূরী।
[অতি সুন্দর।]

মহড়া।

সখি এই বুঝি সেই রাধার্, মনোচোর, নটবর বংশীধারী।
তেজে সেই বৃন্দাবন্, শ্যাম্ এলেন্ এখন্, মধুপুরী।
আমা সবা পানে, কটাক্ষে চেয়ে, কোরে নিলে চিতো চুরি॥

চিতেন।

মথুরা নাগরী, কহিছে সবে, কৃষ্ণেরো লাবণ্য হেরি।
অক্রূরো সহিতে, কে এলো রথে, কালো রূপে আলো করি॥

অন্তরা।

শ্রবণে যেমন্ শুনেছিলাম্ সই, দেখিলাম আজু নয়নে।
আঁখি মনেরো বিবাদো আমার্, ঘুচে গেল এত দিনে।

চিতেন।

এত গুণোরূপো, না হোলে সখি, গুণোময়ো হয় কি হরি।
এমনো মাধুরী, কভু নাহি হেরি, আহা মরি মরি মরি॥
[অতি উত্তম।]

মহড়া।

আমার কুচ্ছ হোলে কি, লজ্জা সে পাবে না।
একি পতির্ ব্যাভার সই, ভেবেছে তাহার্,
আমি কেউ নই, মিছে ফুলে বন্ধি কোরে,
সে গেল আমারে, আমি তারে পেলেম না॥

*　　　*　　　*

চিতেন।

প্রবাসেতে গিয়ে পুরুষের রাজ্য লাভ যদি হয়।
সে সবো সম্পদো তেজিয়ে, এসে বসন্ত সময়॥
আমি তাই ভাবি প্রাণ্ সখি।
সে এমন্ ইন্দ্রত্ব পেয়েছে কি॥
বিরহ দাহনে, মদনেরো বাণে, মনো কি চঞ্চলো হোয়ো না।
[মন্দ নহে।]

মহড়া।

কাল্ নিশিতে দেখিছি স্বপনে।
বুঝি প্রাণনাথ্ এসেছেন, শ্রীবৃন্দাবনে॥
চিতেন।

*　　　*　　　*

নিশিতে নিদ্রিত, অচৈতন্যগত, চৈতন্য ছিলনা প্রায়।
রাধা রাধা বোলে, করেতে ধোরে, জাগালে বঁধু আমায়॥
মৃদু মৃদু হাসে, বসি বাম পাশে, তস্য শ্রীঅঙ্গ আলাপনে।
[এই গীতের মধ্যে অতি আশ্চর্য্য গূঢ়ত্ব আছে, "চৈতন্য ছিলনা প্রায়" ইহাতে স্বপ্নাবস্থার যথার্থ লক্ষণ বর্ণনা হইয়াছে।]

---

[১১] মহড়া।

নয়নো সন্ধানে নয়নে মজালে।
রূপে মন্ ভুলালে॥
তুমি প্রাণো যে আমায় কিনিলে বিনিমূলে।

চিতেন।

প্রাণ্ যে দশ ইন্দ্রিয়, মর্ম শরীরে, তোমারে হেরে বিভোর্।
রসিকে রমণী তুমি রসের সাগর্॥
রস আলাপনে মনো হরিয়ে নিলে।
[ইহার অন্তরা পাইলাম না।]

মহড়া।

কেন সজনি মোরো মরণো নাহিকো হয়।*
সুখোকালে সুখো ঋতু, দুখো দেও অতিশয়॥
তথাচ এ পাপ প্রাণো, কি সুখে এ দেহে রয়॥

চিতেন।

যারো অনুগত প্রাণো, সে গেল, তেজে আমায়।
তারো সতে, সেই পথে, প্রাণো কেন নাহি যায়॥

অন্তরা।

মরিলে এ দেহ সখি, জলে চিতা আগুনে।
দুখো বোধো নাহি হয়ো, শব অঙ্গ দাহনে॥

চিতেন।

সজীব শরীরো এ, যে, বিরহ অনলে দয়।
দগধিয়ে মরি সখি, ইহা কি পরাণে সয়॥
[রচনা উত্তম বটে।]

মহড়া।

মনো জলে মানো অনলে, আমি জলি তারো সনে॥
এ পীরিতি মিলনে।
তুয়া দেখে আমি দুখী কি অদুখী, বিধুমুখী ইহা বুঝ না কেনে।

---

* প্রীতিগীতিতে (১৪৫নং) ঈষৎ পরিবর্ত্তিত।—স.

চিতেন।

আতযানো ধূয়ে, না তেজিলে প্রাণো, কি কর, কি কর্ব, বলি এক্ষণে।
প্রলয়ো লক্ষণো, হোতেছে এখনো, দুই জনো পাছে মরি পরাণে॥

অন্তরা।

হায়, কাননে অনলো লাগিলে যেমন, কীটো পতঙ্গাদি হয়ো জলাতন্।
তোমারো পীরিতে দিবসো শর্ব্বরী, ততোধিকো আমি হোতেছি দাহন্॥

চিতেন।

ওলো এ দায়ে যে জনো, করে পলায়নো, পরাণো লইয়ে সেই সে বাঁচে॥
আমিলো সুন্দরি, পলাতে না পারি, কেবলি তোমার ঐ মমতা গুণে।

[অতি চমৎকার, চমৎকার !]

—

মহড়া।

আমার্ মনো চাহে যারে, তাহারো রূপো নিরখিতে ভালবাসি॥*
যেবা যার, প্রাণো প্রেয়সী।
নয়নো চকরো, পিয়ে সুধা যারো, সেই জনো তারো, শরদ-শশী॥

চিতেন।

তব বিধু মুখো, হেরিয়ে আমার, ঘুচিলো মনেরো তিমিরো রাশি।
যে হয়ো অন্তরে, কহিব কাহারে, সুখোসিন্ধু নীরে অমনি ভাসি॥

অন্তরা।

হায়, কালো কলেবরো, দেখিতে ভ্রমরো, তাহে ষটপদো, কুৎসিতো অতি।
এ তিনো ভুবনে, সকলেতে জানে, নলিনীরো মনো তাহারো প্রতি॥

চিতেন।

কমলিনী মনে ভাবে নিরন্তরো, নাহিকো সুন্দরো অলি সাদৃশি।
দিবসেতে হেরে, সাধো নাহি পূরে, মানসেতে হেরে, হইলে নিশি॥

[আহা, এই গীতে কি বিচিত্র ভাব ও কবিত্ব প্রকাশ হইয়াছে।]

---

* সঙ্গীতকোষ (পৃ ৩০৯) গুপ্তরত্নোদ্ধার, (পৃ ২০০) প্রীতিগীতিতে (২২১ নং) অন্তরা এবং দ্বিতীয় চিতেন নেই। কবিওয়ালাদিগের গীতসংগ্রহে (পৃ ১২৩) কিছুটা পরিবর্ত্তিত।—স.

৺নিত্যানন্দ দাস.বৈরাগী*

[দুই]

[১৬] গত ১ অগ্রহায়ণের প্রভাকরে আমরা নিত্যানন্দ দাসের জীবন বৃত্তান্ত ও কতকগুলীন গান প্রকাশ করিয়াছি,.তৎপাঠে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। অদ্যকার পত্রে পূর্ব্ব প্রকাশিত কতিপয় অসংপূর্ণ গীতের সংপূর্ণাংশ ও অপর কয়েকটি গীত নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম, অবলোকন করুন।

মহড়া।

একা নহে প্যারী, তোমার শ্রীহরি, অনেকেরি, তুমি জেনো।
জগতো সংসারে তারো, সকলি যে আপনো॥
জগন্নাথো নাম, কোরেছেন্ ধারণো, হরি জগতেরো প্রাণো।

চিতেন।

যে ভকতি করে, সে পায় কৃষ্ণেরে, কৃষ্ণ ভক্তেরো অধীনো।
নিতান্ত তোমারো, প্রেম বশো হরি, ভেবনা তুমি কখনো॥

অন্তরা।

নন্দালয়ে দেখ, নন্দ যশোদারো, অতিশয় প্রেমে বশো।
যমুনারো তীরে, গোধন চারণো, আশ্চর্য্য লীলা প্রকাশো॥

চিতেন।

ভ্রাতৃভাবে দেখ, বলরাম সনে, হয়েছে প্রেমো ঘটনো।
শ্রীদামো সুদাম, বসুদাম সনে, রাখাল ভাবে মিলনো॥

[ভাল।]

মহড়া।

কমলিনী নিকুঞ্জে কি কর।†
তোমার নবপ্রেম ভাঙ্গিলো॥
ব্রজের বসতি বুঝি উঠিলো।
মথুরাতে যাবে কৃষ্ণ ঐ, নন্দের ভেরী বাজিলো॥

---

* সংবাদ প্রভাকর, শুক্রবার ১ পৌষ ১২৬১ সাল। ইং ১৫ ডিসেম্বর ১৮৫৪।—স.

† পূর্বে আংশিক উদ্ধৃত।—স.

চিতেন।

সহচরী কহে কিশোরি, ব্রজে প্রমাদ হইলো।
মথুরা হইতে, প্রাণনাথে হোরে নিতে অক্রূর আইলো॥

অন্তরা।

যে শ্যামচাঁদ সোহাগে তোমায় আদরিণী বলে ব্রজেতে।
সে শ্যামসুন্দর, মথুরা নগরে যাবে, নিশি প্রভাতে॥

চিতেন।

সেই বংশীধারী, যাবেগো প্যারী, ত্যজে গোকুলো।
নিধুবনে রাধা রাধা বোলে, কে বাঁশী বাজাবে বলো॥

[পূর্ব্বে এই গানের কেবল চিতেন মহড়া প্রকাশ হইয়াছিল, এবারে অন্তরা প্রকটিত হইল।]

মহড়া।

আগে মনো কোরে দান ফিরে যদি লই।*
লোকে দত্তহারী কবে সই।

চিতেন।

ভাল বোলে ভালবাসি যায়, প্রাণো সঁপি তায়।
সে কি মন্দ হোলে তারে, মন্দ বলা যায়॥
এত তারো শঠতা ব্যাভার।
তবু সে অত্যাজ্য আমার॥
সখ্যতা কোরেছি আগে, কেমনে বিপক্ষ হই।
[আহা কি দুঃখ এই গীতের সমুদয় পাইলাম না।]

---

* বাঙ্গালীর গানে (১৮৭ পৃ) সম্পূর্ণ উদ্ধৃত। স.

মহড়া।

সে কেন রাধারে কলঙ্কিনী কোরে রাখিলে।*
বুঝিতে নারি সখি, শ্যামের এ লীলে॥
দ্বারিকা হইতে আসি শ্রীহরি, দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারিলে।

চিতেন।

ইন্দ্র যজ্ঞ ভঙ্গ কোরে সই, যে জন্যে গিরি ধরিলে।
শিশু বৎস ধেনু কারণে, আরো মায়াতে ব্রহ্মার মন্ ভুলালে॥

অন্তরা।

হায় দেখ প্রাণসখি, যোগিজন যারে, সদা করে ধ্যান্।
যাহারো বাঁশীর গানেতে, যমুনা বহে উজান॥
যার বেণু রবে ধেনু সব, ধায় পুচ্ছ তুলে।
যারে দরশন করিতে হর পার্ব্বতী আসিতেন এই গোকুলে॥

অন্তরা।

হায়। ত্রেতাযুগে শুনেছি সখি, কর দেখি তাহা প্রণিধান।
যাহার গুণে পশু পক্ষির, ঝুরিত দুটি নয়ান॥

[১৭] চিতেন।

সীতা উদ্ধারিতে যে জন, জলেতে ভাসালে শিলে।
যার পদরেণু পরশে দেখো, অহল্যা মানবী দেহ পেলে॥

অন্তরা।

হায়। সবে বলে দয়াময়, পঞ্চপাণ্ডবের সখা শ্রীহরি।
প্রেমের বন্ধনে হোলেন্, বলিরাজার দ্বারেতে দ্বারী॥

চিতেন।

হিরণ্য বধিতে যে জন নৃসিংহ রূপ ধরিলে।
প্রহ্লাদ ভক্তের কারণে হরি, স্ফটিকেরি স্তম্ভে দেখা দিলে॥

অন্তরা।

হায়। ত্রিপুরারি যার নাম, জপে অবিশ্রাম, দিবারজনী।
বীণাযন্ত্রে যার গুণো গায়, সেই নারদ মুনি।

---

* পূর্বে আংশিক উদ্ধৃত।—স.

চিতেন।

শমন দমন হয় যার নামে, রামজী দাসে বলে।
মৈত্রভাবে যে জন কোরেছিল কোলে, গুহক চণ্ডালে।
[এবারে এই গীতটি সংপূর্ণ প্রকাশ হইল।]

মহড়া।

যেতে হোলো মুরারি বৃন্দাবন।
শ্যাম তোমার ব্রজ বালকগণ॥
তোমারে না দেখে, অস্থির ক্ষণেকে, ক্ষণে হয় অচেতন।

চিতেন।

কহিছে দৈবকী, প্রিয় বচনে, শুনরে প্রাণ গোপাল।
শুনেছি বৃন্দাবনে, তব সব রাখাল॥
হা কৃষ্ণ বলিয়ে, ভূতলে পড়িয়ে সকলে করে রোদন॥

অন্তরা।

সে ব্রজনগরে, নন্দেরো ঘরে, কাতরা নন্দরাণী।
নবনী করে, ডাকে উচ্চস্বরে কোথারে নীলমণি॥

চিতেন।

ঘরে ঘরে ফেরে, তোমার তরে, কখনো গোষ্ঠেতে ধায়।
ভ্রমেতে পথে পথে, ডাকিছে কৃষ্ণ আয়॥
শিরে করাঘাত করে, যমুনা নীরে, তেজিতে যায় জীবন।
[আহা কি মধুর!]

মহড়া।

তোমা বিনা গোপীনাথ, কে আছে গোপীকার।
শ্রীনন্দের নন্দন কৃষ্ণ, কোথাহে আমার॥
ওহে ব্রজ হরি মরে রাধা প্যারী, দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ একবার।

চিতেন।

দীনবন্ধু দুখোভঞ্জনো, অকিঞ্চনো জনেরো ধনো।
কেন হোলেহে, হেন নিদারুণো॥
ফুলাইতে পারো, ব্রহ্মাণ্ডেরো ভারো, রাধার ভার কি হোলো এত ভার।
[আহা! এই গীতের আর কিছুই পাইলাম না]

মহড়া।

কোথারে যুবতীর যৌবন, তোমা বিনে নারীর মান গেলো।*
নবীন কালে দেহে ছিলে, প্রবীণ কালে কোথা গেলে, তোমায় হোয়ে হারা, হোয়েছি কাতরা, আপন বঁধু এখন পরের হোলো॥

চিতেন।

নবীন বয়সে, রঙ্গরসে, দিনে দেখা হোতো শতবার।
নীরস নলিনী বোলে এখন্ ভ্রমর চায়না ফিরে একবার॥
আগে প্রাণ হোলো, তার পরে হোলো যৌবন ঘটনা।
বিধাতার একি বিবেচনা, যৌবন গেল, প্রাণ তো গেল না॥
আমি কি ছিলেম, কি হোলেম, আরো বা কি হই, অনুতাপে তনু শুখালো।
[অতি আশ্চর্য্য। অতি আশ্চর্য্য। কি পরিতাপ! ইহার আর কিছুই পাইলাম না।]

মহড়া।

ও যে, কৃষ্ণচন্দ্ররায়। হেরনা ও বয়ান॥
রেখো সখি, দুটি আঁখি, কোরে সাবধান।
ও পুরুষো, করে নাশো, নারীর কুলো মান॥

---

* প্রীতিগীতিতে (১১২ নং) এই গান রামবসুর বলে উল্লিখিত।—স.

চিতেন।

নব ঘন শ্যাম রূপ, মরি কি বঙ্কিম নয়ান।
রাধার মনোমোহন মুরলী বয়ান॥
যোজনা রূপসি, শশি দেখে রূপবান।
[চমৎকার। চমৎকার।]

মহড়া।

আমি তোমার মন বুঝিতে, কোরেছি মান। *
দেখি আমায় কেমন তুমি ভালোবাসো প্রাণ॥
মনে তোমায় একবারো, নাহি বিভিন্নতা জ্ঞান।
অন্তরে হরিষো, মুখেতে বিরসো, কপটে ঝুরিছে এ দুটি নয়ান॥

চিতেন।

তুমি বল প্রেয়সি আমি, তোমার প্রেমাধীন।
অন্য নারী সহবাস, নাহি কোন দিন॥
প্রত্যক্ষে সে কথা, করি ঐক্যতা, সরলো কি তুমি পুরুষো পাষাণ।
[অতি উত্তম। ইহার সকল পাই নাই।]

মহড়া।

ঐ কালো রূপে এত রমণী ভোলে।
না জানি কি হোতো আরো বাঁকা না হোলে॥
হরি তোমার আশ্চর্য্য লীলে॥
যারো কাছে যাও নারায়ণ।
পতিরূপে সে তোমায়, করে আরাধন॥
নারী নাহি পারে ধৈর্য্য হোতে, এই ব্রজমণ্ডলে।

---

* প্রাচীন কবিসংগ্রহে (পৃ ৮১) এই গানের রচয়িতা নবাই ঠাকুর।—স.

চিতেন।

কত রূপে হোলে তুমি, কত অবতার।
না জানি তোমার লীলা অতি চমৎকার॥
দ্বাপরেতে হোয়ে অবতার।
করিলে হে মনো চুরি যত অবলার॥
[১৮] মোহন্ বাঁশীর গানে, বৃন্দাবনে, ব্রজাঙ্গনা মজালে।
(বিচিত্র। বিচিত্র।)

মহড়া।

মনের আনন্দে, গো বৃন্দে চল শ্রীবৃন্দাবনে, হরি দরশনে।
একাকী মাধব সেখানে॥
উভয়েতে হেরি গিয়ে, জুড়াব উভয়।
ইহাতে হইবে কত সুখোদয়॥
মনেরো তিমিরো যাবে মনো মিলনে।

চিতেন।

সাজগো সাজগো সাজ, সাজ তুরিতে।
সুচিত্রে চম্পকোলতা, আরো ললিতে॥
রঙ্গদেবী সুদেবীগো, যত সখীগণ।
আমার সঙ্গেতে সবে করহ গমন॥
রাধা বোলে বাজে বাঁশী শুনি শ্রবণে।
(আর কিছুই পাইলাম না।)

মহড়া।

তুমি কৃষ্ণ বোলে ডাকো একবার।
শুনরে কোকিলে শুন শুন, বলি শুন মিনতি আমার॥
হরি হারা হোয়ে আছো মৌনে বসিয়ে; মধুর রবো শুনি যে আর!

চিতেন।

এই দেখো বৃন্দাবনে, বসন্ত এলো।
নীরবে রোয়েছ কেন, ওরে কোকিলো॥
হরি গুণো গানো পিক কররে এখন্, শুনে প্রাণো জুড়াক শ্রীরাধার।
(আর কিছুই পাইলাম না।)

মহড়া।

তুমি হে ব্রহ্ম সনাতন। অপার মহিমা জনার্দ্দন॥
শুনহে শ্রীমধুসূদন॥
ইন্দ্র যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়ে মুরারি, ধোরে ছিলে গিরি গোবর্দ্ধন॥

চিতেন।

কতরূপে কত লীলে করেছ, ওহে দৈবকী নন্দন।
গোলোকো তেজিয়ে, গোকুলে আসিয়ে, প্রকাশো করিলে বৃন্দাবন॥

অন্তরা।

হায়, শিশুকালে শকটো ভঞ্জন কোরেছিলে শ্যামরায়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড উদরো মাঝে, দেখাইলে যশোদায়॥

চিতেন।

আরো এক দিনো, কুঞ্জ কাননে, লোয়ে ব্রজ গোপীগণ।
মহারাসো কোরে, অন্তর্ধান হোয়ে, হোলে চতুর্ভুজ নারায়ণ॥

অন্তরা।

হায়, কাঞ্চন হোলো কাষ্ঠের তরি, শুনিছি পুরাণেতে।
অহল্যা পাষাণী মানবী হোলো পদরেণু হইতে॥

চিতেন।

দ্রৌপদীরে যখন্ বিবস্ত্রা করে, দুষ্টমতি দুঃশাসন।
বস্ত্রধারী হোয়ে, বস্ত্র দান দিয়ে, কোরেছিলে লজ্জা নিবারণ॥

অন্তরা।

হায়, শুনেছি তুমি পাণ্ডব সখা, বনমালী কালিয়ে।
রহিলে বলির দ্বারেতে দ্বারী, প্রেমে বশো হইয়ে॥

চিতেন।

হিরণ্যকশিপু করিলে বধ নৃসিংহ রূপো মোহন।

প্রহ্লাদ ভক্তেরো কারণে দিলে স্ফটিকেরি স্তম্ভে দরশন॥

(অতি সুন্দর। এই গীতের পাল্টা অথচ দ্বিতীয় নিম্নভাগে প্রকটিত হইল।)

মহড়া।

তোমারি প্রেম কারণে। আমি অবতার ব্রজ ভবনে॥

রাই বুঝিয়ে দেখ মনে।

রাধা রাধা বলি, বাজায়ে মুরলী, গোচারণ করি বিপিনে॥

চিতেন।

বংশীধারী কহে কিশোরি, এত বিনয় কর কেনে।

রাধে বিনোদিনি, জানতো আপনি, যত লীলা করি যেখানে॥

অন্তরা।

হায়, অযোধ্যায় দশরথ গৃহেতে, রাম রূপে অবতার।

জনক দুহিতা, তুমি হে সীতা গৃহিণী ছিলে আমার॥

চিতেন।

জটাধারী হোয়ে, তোমারে লোয়ে, ভ্রমিলাম কাননে।

বন্ধন করিয়ে সাগরবারি, বোধেছি লঙ্কার রাবণে॥

অন্তরা।

হায়, দেখনা ব্রহ্মাণ্ডের নারীগণ, আসিয়ে বৃন্দাবনে।

প্রেমে কত জনা, করে আরাধনা, চাহিনে কারোপানে॥

চিতেন।

নিকুঞ্জ কাননে করি মহারাস, প্যারি তোমারি সনে।

পরশুরামরূপে নিক্ষেত্রি করি, জানে তিন্ ভুবনে।

মহড়া।

ওহে নারায়ণো, আমারে কখনো, বোলোনা জানকী হোতে।

সে জনমের বহু দুখো আছে মনেতে॥

দুর্জ্জয় রাবণো, করিয়ে হরণো, রাখিলো অশোকো বনেতে।

চিতেন। —

কহিছে রুক্মিণী, ওহে চক্রপাণি, আসিছে পবনো স্থতে।

রামরূপে শ্যাম দেহ দরশনো, আমিতো হবনা সীতে॥

(এই গীতটি অতি সুমধুর করুণা রসে পরিপূরিত। ইহার সমুদয়াংশ যিনি প্রদান করিবেন তাঁহার নিকট অত্যন্ত উপকৃত হইব।)

৺রাম বসু*

[১] বঙ্গদেশীয় যে সকল মহাশয় বঙ্গভাষায় উত্তম রূপ কবিতা রচনা করত সাধারণের প্রিয় ও সর্ব্বত্র বিখ্যাত ও যশস্বী হইয়াছেন, আমরা তাঁহারদিগের জীবন বৃত্তান্ত সম্বলিত বিরচিত কবিতা সমুদয় সংগ্রহ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করণার্থ অতিশয় যত্নশীল হইয়াছি। এবং এ বিষয় সুসিদ্ধ জন্ম মানসিক পরিশ্রম সহযোগে কায়িক ক্লেশে শরীর পতন ও যথা সর্ব্বস্ব ব্যয় করণেও প্রস্তুত হইয়াছি, কিন্তু এই অভিপ্রেত পরিপূর্ণ হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। ইহা "শব সাধনের" কার্য্য অপেক্ষাও গুরুতর। কারণ সমুদয়াংশ শুদ্ধরূপে একত্র সংগ্রহ করা সাধ্যাতীত হইয়াছে, প্রাচীন ব্যক্তিরা তাবতেই ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন। সুতরাং প্রাচীনদিগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন কবি কদম্বের কীর্তিও পৃথ্বী পরিত্যাগ করিয়াছে। যাঁহারা এই ক্ষণকার প্রাচীন, তাঁহারা পরম্পরা যাহা অবগত আছেন তাহাও অনেক গোলযোগে মিশ্রিত, যেহেতু সকলে সকল গানের সকল ভাগ জ্ঞাত নহেন, যিনি যাহা অভ্যাস করিয়াছিলেন, তিনিও তাহার এক এক অংশ বিস্মৃত হইয়াছেন। আমরা সংপ্রতি এতদ্রূপ দুইশত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কয়েক দিবস এ বিষয়ের প্রস্তাব করাতে পরস্পর সকলে কবিওয়ালাদিগের কবিতা গাহিতে ও মুখে বলিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রায় কাহারো মুখ হইতে সংপূর্ণ একটী গান নির্গত হইল না। তবে দুই একজনের নিকট দুই একটী গীতের আদি অন্ত প্রাপ্ত হওয়া গেল। পূর্ব্বতন লোকেরা পূর্ব্বে কবিতা সকল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন না, এবং তৎকালে পুস্তকাকারে মুদ্রিত করণের প্রথাও ছিল না। কাযেই ক্রমে তাহার লোপ হইয়া আসিতেছে। যাহা হউক, আমরা যখন এ বিষয়ে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছি, তখন যতদূর সাধ্য ততদূর পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া দেখিব: ইহাতে সর্ব্বতোভাবে সংপূর্ণ না হয়, অসংপূর্ণ হইয়া যে পর্য্যন্ত হয় তাহাই ভাল।

৺ "রাম বসু" যিনি কবিওয়ালাদিগের মধ্যে একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুবিখ্যাত কবি ছিলেন। তিনি অতি ভদ্র কুলোদ্ভব, কুলীন কায়স্থ, তাঁহার নাম "রাম মোহন বসু" কলিকাতার পশ্চিম পারস্থ শালিখা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন,

* সংবাদপ্রভাকর, শনিবার ১ আশ্বিন ১২৬১ সাল। ইং ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৫৪।—স.

ভাবতেই তাঁহাকে "রাম্ বোস্" বলিয়া জানিতেন, যথা "রাম বোষের দল", "রাম বোসের গান" ইত্যাদি। এই রাম বসু বাল্যকালে কলিকাতায় যোড়াসাঁকো নিবাসী মান্তবর ৺ বারাণসী ঘোষের বাটীতে তাঁহার [২] পিসার নিকট থাকিয়া লেখাপড়া করিতেন, ইনি "জন্ম কবি" ছিলেন, পাঁচ বৎসর বয়সের সময়ে কবিতা রচনা করিয়াছেন, যখন পাঠশালে লিখিতেন তখন কবিতা রচিয়া কলাপাতে লিপিবদ্ধ করিতেন, কবিওয়ালা ভবানে বেনে কোন উপায়ে তাহা জানিতে পারিয়া বিস্তর উপাসনা করত তাঁহার নিকট হইতে গান সকল গ্রহণ করিত। ঐ সময়ে বসুর বয়স ১২ দ্বাদশ বৎসরের অধিক হয় নাই, সেই সমস্ত গান গাহিয়া ঐ ভবানে বেনে অত্যন্ত প্রতিপত্তি করিয়াছিল।

এই মহাশয় ইংরাজী ভাষা কিঞ্চিৎ অভ্যাস করিয়া প্রথমে কেরাণীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন, কিন্তু কবিতা কল্পে অতিশয় আমোদ জন্মিবায় বিষয়কর্ম্মে তাঁহার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি ছিল না, একারণ আশু সেই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল গান রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাহাতে যতই তাহার অনুরাগের আধিক্য হইল, ততই দৈবশক্তির কৃপা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এবম্প্রকারে রাম বসুর কবিত্ব কুসুমের সৌরভ সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইলে বড় বড় "কবিওয়ালা" মাত্রেই তাঁহার অনুগত হইতে লাগিল। প্রথমে তিনি অনুরোধ-পরবশ হইয়া বিনা বেতনে গান বিতরণ করিতেন। পরে সংসারের প্রয়োজন কিম্বা অনটন বা প্রবৃত্তি অথবা লোভ দেবের আবির্ভাব বশতঃ মূল্য লইয়া গান সমস্ত বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন।

সর্ব্বাগ্রে তিনি ভবানে বেনেকে, পরে নীলু ঠাকুর, তৎপরে মোহন সরকার, সর্বশেষে ঠাকুরদাস সিংহের দলে গান দিতেন। ঠাকুরদাস সিংহের জীবিতাবস্থাতেই তিনি স্বয়ং দল করিয়া বসেন। সেই দল "রাম বসুর দল" নামে ঘোষিত হওয়াতেই বসুজ বঙ্গদেশের সর্ব্ব স্থানে আহূত ও সমাদৃত হইয়াছিলেন।

বাঙ্গালা ১২৩৫ কিম্বা ৩৬ সালে রামবসু লোকান্তরিত হয়েন, ইনি ৪২ বেয়াল্লিশ বৎসরের অধিক কাল এই জগতীপুরে জীবিত ছিলেন না। এই সময়ের মধ্যে উক্ত কবি প্রচুর প্রকার সুখ সম্ভোগ পূর্ব্বক সমূহ সম্মান সহযোগে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন। মুরশিদাবাদস্থ ৺রাজা হরিনাথ রায় বাহাদুরের ভবনে ৺দুর্গা পূজার সময় গান করিয়া তথা হইতে পীড়িত হইয়া আসেন, সেই সাংঘাতিক রোগেই অনিত্য শরীর পরিত্যাগ করিলেন।

কলিকাতার নিজ্ দক্ষিণ ভবানীপুরস্থ ভদ্র সন্তানেরা যে এক "নল দময়ন্তী" যাত্রার দল করিয়াছিলেন, অদ্যাপি যে দলের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা হইয়া থাকে, রাম বসু সেই দলের সমুদয় গান ও ছড়া প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। সেই গীতে গায়কেরা সকলকেই পুলকিত করিয়াছিলেন। তাহার দুইটী গানের কিয়দংশ নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।

যথা।

"কেনে গো, সজনী আমার উড়ু উড়ু
করে মন।
পিঞ্জরের পাখি যেমন, পলাবারি
আকিঞ্চন ॥"

তথা।

"নল্ নল্ নল, বলিস্ কি, তা বল।
দাবানল, মনানল, প্রেমানল, কি অনল,
কি সেই, কুলমজানে কামানল্ ॥"

রাম বসু "ভবানী বিষয়, সখী সংবাদ" বিরহ" খেউড়" লহর" সপ্তমী" শ্যামা বিষয়ের রণ বর্ণন" ও টপ্পা প্রভৃতি সমুদয় গান উত্তম রচিতেন। তন্মধ্যে সপ্তমী ও বিরহ তুলনারহিত, এই দুই গানেই তিনি অধিক প্রশংসিত হয়েন। কিন্তু তিনি সমস্ত গানই ভালরূপে রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার এক একটা "লহর" ও শ্লেষোক্ত "খেউড়" অতি সুন্দর, সর্বমনোরঞ্জক, রহস্য পরিপূরিত।

যথা।

"তেম্নি এই নীলুর দলে রামপ্রসাদ একটিন্
নয় কাজের কাজী, ঠাটের বাজী ভাইরে, যেমন্ ঢাকের পিঠে বামা থাকে, বাজে নাকো একটি দিন ॥" ইত্যাদি।

এই গানের সমুদয় প্রকাশের প্রয়োজন করে না। ইহার সমুদয় শুনিলে হাসিতে হাসিতে নাড়ী ছিঁড়িয়া যায়।

আমি গুরুতর রোগে এক মাস শয্যাতে ছিলাম, উত্থান শক্তি ছিল না, অদ্যপি অত্যন্ত পীড়িত আছি, কলিকাতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জলপথে ভ্রমণ

করিতেছি, এজন্য ইঁহার জীবন বৃত্তান্ত এবারে বাহুল্যরূপে লিখিতে পারিলাম না। যদি জগদীশ্বর অনুকুল হইয়া আশু আরোগ্য করেন, তবে অবিলম্বে মনোরথ পরিপূর্ণ করিতে ত্রুটি কখনই করিব না।

যেমন সংস্কৃত কবিতায় "কালিদাস", বাঙ্গালা কবিতায় "রামপ্রসাদ" ও "ভারতচন্দ্র" সেইরূপ কবিওয়ালাদিগের কবিতায় "রামবসু", যেমন ভৃঙ্গের পক্ষে পদ্মমধু, শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন, অপুত্রের পক্ষে পুত্রসন্তান, সাধুর পক্ষে ঈশ্বর প্রসঙ্গ, দরিদ্রের পক্ষে ধন লাভ, সেইরূপ ভাবুকের পক্ষে "রাম বসুর গীত" আমরা পশ্চাদ্ভাগে উক্ত বসুর প্রণীত যে সকল গান প্রকাশ করিলাম যদিও তাহার কোন কোন গানের কোন কোন অংশের অভাব হইয়াছে, তথাচ তৎপাঠেই পাঠকগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। অধুনা আমরা যদি এরূপ প্রকটন না করি তবে ভবিষ্যতে এককালেই লোপ হইবার সম্ভাবনা, এজন্য যখন যাহা প্রাপ্ত হইব, তখনি তাহা প্রকাশ করিব। ইহার অপ্রকাশিত বিষয়ের যে যে ভাগ যে যে মহাশয় অবগত আছেন, তাঁহারা অনুকম্পা পুরঃসর তত্তাবৎ লিখিয়া পাঠাইলে ক্রমে সম্পন্ন হইতে পারিবেক।

যদিও প্রাচীনদিগের মধ্যে অনেকেই এই সকল গীত পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছেন, কিন্তু এইক্ষণকার যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে কাহারো কর্ণে অদ্যাপি ধ্বনিত হয় নাই। এতৎ প্রকাশে তাঁহারদিগের কত উপকার হইবে তাহা অনির্ব্বচনীয়।

যথা গীত।

সপ্তমী।

মহড়া।

তবে নাকি উমার্ তত্ত্ব কোরেছিলে।
গিরিরাজ্। ওহে, শুন শুন তোমার মেয়ে কি বলে॥
নারী প্রবোধিয়ে যেতে হে, কৈলাসে যাই বোলে।
এসে বল্‌তে মেনকা, তোমার দুখের কথা, উমা সব্ শুনেছে।
তোমায় দেখ্‌তে পাষাণী, আপনি ঈশানী, আস্‌তে চেয়েছে॥
তুমি গিয়েছিলে কই, উমা বলে ঐ হে, আমি আপনি এসেছি জননী বোলে।

চিতেন।

তারা হারা হোয়ে নয়নের্, তারা হীরা হোয়ে রই।
সদা কই, উমা কই, আমার প্রাণ উমা কই॥

আমার সেই হারা তারা, ত্রিজগতের সারা, বিধি এনে মিলালে।
উমা চন্দ্রবদনে, ডাক্‌ছে সঘনে, মা মা, মা বোলে॥
উমা যত হেসে কয়, ওতো হাসি নয় হে, যেন অভাগীর কপালে অনল জ্বলে॥

অন্তরা।

ভাল হোক্ হোক্ ওহে গিরি। জাই আমি নারী তাই ভুলি বচনে।
তোমারো কি মনে, হোতোনা হে সাধ্, হেরিতে উমার চন্দ্রাননে॥

চিতেন।

আশা বাক্যে আমার পাপপ্রাণ্, রহে বল কত দিন্।
দিনের দিন, তনু ক্ষীণ, বারি হীন, যেন মীন॥
যারে প্রাণ্ পাব দেখে, সম্বৎসরে তাকে, আস্তেতো যেতে হয়।
যেন মাহীনা কন্যা, তিন্ দিনের জন্যে এলোহে হিমালয়॥
মুখে করি হা হা রব, ছিলেম্ যেন শব হে, গৌরী মৃত দেহে এসে জীবন দিলে।

[এই সপ্তমী নিজ দলে গাহেন। পাঠকগণ মধুকর হইয়া এই গীত পদ্মের মধু পান করুন।]

সপ্তমী।

মহড়া।

মঙ্গলার মুখে কি মঙ্গল শুন্তে পাই।
উমা অন্নপূর্ণা হোয়েছেন কাশীতে, রাজরাজেশ্বর, হোয়েছেন্ জামাই॥
শিবে এসে বলে মা, শিবের সে দিন আর এখন্ নাই॥
যারে পাগল্ পাগল্ বোলে, বিবাহের কালে, সকলে দিলে ধিক্‌কার।
এখন্ সেই পাগলের সব, অতুল বিভব, কুবের ভাণ্ডারী তার॥
এখন্ শ্মশানে মশানে, বেড়ায়্না মেনে, আনন্দ কাননে জুড়াবার ঠাঁই।

চিতেন।

ফিরে এলে গিরি কৈলাসে গিয়ে, তত্ত্ব না পাইয়ে যার।*
তোমার সেই উমা, এই এলো, সঙ্গে শিবো পরিবার॥
এখন্ যন্ত্রণা এড়ালে, ওহে গিরিরাজ, গঞ্জনা দূরে গেলো।
আমার মা কৈ, মা কৈ, বোলে উমা ঐ, ব্যগ্র হয়ে দাঁড়ালো।
বলে তোমার আশীর্বাদে, আছি মা ভাল, দুখিনীরো দুখোল্লাব্ তে হবে নাই।

অন্তরা।

হোক্ হোক্ হোক্, উমা সুখে রোক্, সদাই হোতো মনে।
ভিখারির ভাগ্যে, পোড়েছেন দুর্গে, তার ভাগ্যে এমন্ হবে কে জানে॥
দুহিতার সুখো শুনিলে গিরি, যে সুখো হয় আমার।
আছে যার কন্যা, সেই জানে, অন্যে কি জানিবে আর॥
যদি পথিকে কেউ বলে, ওগো উমার মা, উমা ভাল আছে তোর্।
যেন করে স্বর্গ পাই, অম্‌নি ধেয়ে যাই, আনন্দে হোয়ে বিভোর্॥
শুনে আনন্দময়ীর, আনন্দ সংবাদ, আনন্দে আপনি আপ্‌না ভুলে যাই॥

অন্তরা।

এই খেদ হয়, সকল্ লোকে কয়, শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয়।
যে দুর্গা নামেতে দুর্গতি খণ্ডে, সে দুর্গের দুর্গতি একি প্রাণে সয়॥

চিতেন।

তুমি যে কয়েছ আমায় গিরিরাজ্, কত দিন কত কথা।
সে কথা, আছে শেল্ সম মম হৃদয়ে গাঁথা॥
আমার লম্বোদর নাকি উদরের জ্বালায়, কেঁদে কেঁদে বেড়াতো।
হোয়ে অতি ক্ষুধার্ত্তিক্, সোণারো কার্ত্তিক্, ধূলায় পোড়ে লুটাতো॥
গেল গেল যন্ত্রণা, উমা বলে মা, আমি এখন অন্ন অনেককে বিলাই।
[এই সপ্তমী চন্দ্রবৎ, পাঠকগণ চকোরবৎ হউন।]

সপ্তমী।

মহড়া।

কও দেখি উমা, কেমন্ ছিলে মা, ভিখারি হরের ঘরে।
জানি নিজে সে পাগল্, কি আছে সম্বল্, ঘরে ঘরে বেড়ায় ভিক্ষা কোরে॥
শুনিয়া জামাতার দুখ, খেদে বুক বিদরে॥
তুমি ইন্দুবদনি, কুরঙ্গ নয়নি, কনক বরণি তারা।
জানি জামাতার গুণ্, কপালে আগুন্, শিরে জটা বাকোল পরা॥
আমি লোকমুখে শুনি, ফেলে দিয়ে মণি, ফণি ধোরে অঙ্গে ভূষণ করে।

চিতেন।

গৌরী কোলে কোরে নগেন্দ্র রাণী করুণা বচনে কয়।
উমা মা আমার, স্বর্ণলতা, শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয়॥
মরি জামাতার খেদে, তোমারো বিচ্ছেদে, প্রাণ কাঁদে দিবে নিশি।
আমি অচল নারী, চলিতে নারি, পারিনে যে, দেখে আসি॥
[৪] আমি জীবন্মৃত হোয়ে, আশাপথ চেয়ে, তোমায় না হেরিয়ে নয়ন ঝোরে।

অন্তরা।

মরি ছি ছি ছি, একি কবার কথা, শুনে লাজে মরে যাই।
তোমা হেন গৌরী, দিয়েছেন্ গিরি, ভুজঙ্গেতে যার ভয় নাই॥
মাখে অঙ্গেতে ছাই।

চিতেন।

* * * *

তুমি সর্ব্বমঙ্গলা, অকূলের ভেলা কূলে এনে দিতে পারো।
দেখে খেদে ফাটে বুক্, তোমার এত দুখ্, সে দুখো ঘুচাতে নারো॥
[এই গীতের অন্তরার চিতেন ও মিল না পাওয়াতে অন্তঃকরণ অশেষ আক্ষেপ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে।]

সপ্তমী।

মহড়া।

গিরি, গা তুলহে, মা এলেন্ হিমালয়।
উঠ দুর্গা দুর্গা বোলে, দুর্গা কর কোলে, মুখে বল জয়্ জয়্ দুর্গা জয়্॥
কন্যাপুত্র প্রতি বাচ্ছল্য, তায় তাচ্ছল্য, করা নয়।
আঁচল ধোরে তারা।
বলে ছি মা, কি মা, মাগো। ওমা, মা বাপের কি এম্নি ধারা।
গিরি তুমি যে অগতি, বুঝেনা পার্ব্বতী, প্রসূতির অখ্যাতি জগময়।

চিতেন।

গত নিশিযোগে, আমি হে দেখেছি যে সুস্বপন।
এলো হে, সেই আমার, হারা তারা ধন॥

দাঁড়ায়ে দুয়ারে।

বলে মা কই, মা কই, মা কই, আমার, দেও দেখা দুখিনীরে॥

অমনি দুবাহু পশারি, উমা কোলে করি, আনন্দেতে আমি আমি নয়।

[এই গীত নিজ দলে গাহেন। ইহার সমুদয়াংশ না পাওয়াতে অত্যন্ত খেদিত হইয়াছি।]

যদিও অনেকে অতি উত্তম উত্তম সখীসংবাদ গান রচনা করিয়াছেন, এবং এ বিষয়ে নীলু ঠাকুরের দল সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় যশস্বী ছিল, কিন্তু রাম বসু সময়ে সময়ে যে দুই একটি সখীসংবাদ করিয়াছেন, তাহার তুল্য নাই ও মূল্যও নাই। অপিচ উক্ত বসুর বিরচিত সখীসংবাদ গাহিয়াই প্রথমে নীলু ঠাকুরের এত উচ্চ গৌরব হইয়াছিল।

"জলে কি জলে, কি দোলে, দেখগো সখী, কি হেলেগো হিল্লোলেতে" ইত্যাদি।

নীলু ঠাকুর এই গানে বিশেষ বিখ্যাত হয়েন, কিন্তু এ গান রাম বসুর রচিত। এতদ্ভিন্ন প্রথমে তিনি উক্ত ঠাকুরকে অনেক ভাল ভাল সখীসংবাদ, বিরহ ও খেউড় গান প্রদান করিয়াছিলেন।

পত্র বাহুল্য ভয়ে এই স্থলে আমরা অধিক উদ্ধৃত না করিয়া নিম্নস্থ কয়েকটী সখীসংবাদ প্রকটন করিলাম; এতদ্দৃষ্টে তাবতেই তাঁহার এ বিষয়ে কবিত্বশক্তির প্রচুর পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।

সখীসংবাদ।

মহড়া।

মান্ কোরে মান রাখ্‌তে পারিনে।*

আমি যে দিগে ফিরে চাই, সেই দিগেই দেখ্‌তে পাই,

সজল আঁখি জলধর বরণে॥

অতএব অভিমান্, মনে করিনে॥

---

* প্রাচীন কবি সংগ্রহে (পৃ ২৮) এই গানের রচয়িতা অনিশ্চিত। প্রীতিগীতিতে (১৭৫১নং) নীলমণি পাটনীর বলে উল্লিখিত। বাঙ্গালীর গানে (পৃ ১৫৭) বলা হয়েছে, নীলমণি পাটনীর দলে গাওয়া হোত বলে কেউ কেউ তাকেই এর রচয়িতা মনে করেন। আবার কেউ কেউ বলে থাকেন গদাধর মুখোপাধ্যায় এর রচয়িতা। —স.

আমি কৃষ্ণ প্রাণা রাধা।
কৃষ্ণ প্রেম্ ডোরে প্রাণ্ বাধা
হেরি ঐ কালো রূপ্ সদা॥
হৃদয় মাঝে, শ্যাম বিরাজে, বহে প্রেম্ ধারা দুনয়নে॥

চিতেন।

যদি ওগো বৃন্দে শ্রীগোবিন্দে, করি মান্।
রাখি মনকে বেঁধে, শ্যামের খেদে, কেঁদে উঠে প্রাণ।
শ্যাম্‌কে হের্‌বনা আর সখী।
বোলে চক্ষু মুদে থাকি॥
সে রূপ অন্তরেতে দেখি॥
কৃতাঞ্জলি, বনমালি, বলে স্থান্ দিও রাই চরণে॥

[এই গীতের পদ না পাওয়াতে আমরা পদশূন্য হইয়াছি। কি বিপদ! এমত সুপদসূচক পদ আমারদিগের নিকট বিপদ হইল।]

উক্ত সুকবি মহাশয় যে বৎসর মানবলীলা সম্বরণ করেন, তাহার এক কিম্বা দুই মাস পূর্ব্বে নিম্ন প্রকাশিত সখী সংবাদ প্ররচন করেন।

যথা।

মহড়া।

শ্যাম কাল্ মান্ কোরে গ্যাছে, কেমন আছে, দূতী দেখে আয়।*
কোরে আমারে বঞ্চিতে, গেল কার কুঞ্জে বঞ্চিতে, হোয়ে খণ্ডিতে মরি হরি প্রেমের দায়॥
ছলে আমার মন ছলেছে॥
আগে বুঝ্‌বে মন দূরে থেকে। চোখে দেখেগো। কয়্ কি, না কয় কথা ডেকে॥
যদি কাতরে কথা কয়, তবে নয়, অপ্রণয়, অম্‌নি সেধোগো ধোরে দুটি রাঙ্গা পায়।

চিতেন।

সাধ কোরে কোরেছিলাম দুর্জ্জয়মান, শ্যামের তায় হোলো অপমান।
শ্যামকে সাধ্‌লেম্ না, ফিরে চাইলেম না, কথা কইলাম্ না রেখে মান্॥

---

* কবিওয়ালাদিগের গীত সংগ্রহে (পৃ ৯) সম্পূর্ণ গানটি দেওয়া আছে।—স.

কৃষ্ণ সেই রাগের অনুরাগে। রাগে রাগে গো। পড়ে পাছে চন্দ্রাবলীর নব রাগে।

ছিল পূর্ব্বের যে পূর্ব্ব ভাব্, আবার এ, কি অপূর্ব্ব ভাব্, পাছে রাগে শ্যাম্ রাধা আদর ভুলে যায়॥

অন্তরা।

যার মানের মানে আমায় মানে। সে না মানে। তবে কি কর্ব্বে এ মানে॥

মাধবের কত মান না হয় তার পরিমাণ, মানিনী হয়েছি যার মানে॥

চিতেন।

* * * *

কৃষ্ণ বিরহে তনু জ্বলে। জ্বলে জ্বলে গো।

জুড়াবে কি অন্য জলধরের জলে॥

* * * *

[ইহার সমুদয় ও দ্বিতীয় গীত না পাইবায় অত্যন্ত অসুখী হইলাম।]

মৃত্যুর পূর্ব্বকার রচিত বিরহ।

মহড়া।

ভাব দেখে করি অনুভাব্, ভাব্ বুঝি ফুরালো।*

[৫] দিনের দিন্, রসহীন্, হোলে প্রাণ, আছ সেই তুমি, তোমার প্রেম লুকালো॥

* * * *

তোমায় লোকে কয়, রসময়।

মিথ্যা নয়, সে রস্ পরের কাছে হয়।

ঘরে এলে মুখ যেন সে মুখ নয়॥

তোমার আমার কাছে ভ্রান্তি, হয় শিরে সংক্রান্তি, যেন শান্তি শতকেতে পাঠ্ এগুলো॥

চিতেন।

সেই তুমি, সেই আমি, সেই প্রণয়, নূতন নয় পরিচয়।

তবে প্রাণ, হোলে রসের অনুষ্ঠান, বিরস্ বদন কেন হয়॥

পেলেম ব্যাভারে পরীক্ষে।

---

* এই গানের অন্তরা পরে দেওয়া হয়েছে।—স.

ওরে প্রাণ, তোমার অযাচক ভিক্ষে।

চক্ষে রেখে চাওনা পোড়া চক্ষে ॥

এখন্ সদাই বদন বাঁকা, হোলে পর দেখা, সে সব্ শশিমুখের হাসি কমনে গেলো ॥

অন্তরা।

* * *

চিতেন।

নাই তোমার এখন, সে সুহাস্য, সুদৃশ্য, সুবচন।

কথা হয়, যেন কে কারে কি কয়, প্রাণ সদাই অন্য মন্ ॥

তুমি রসিক নও, তা নও প্রাণ্।

ও প্রাণ, রাখ স্থান বিশেষে মান্ ॥

কোন রাজ্যে ধান, কোন রাজ্যে বাণ ॥

আমি হাজা প্রজা বোলে, জলে জ্বলালে,

আমার সুখের সময় তোমার রস শুখালো ॥

ঐ গীতের দ্বিতীয় গানের

মহড়া।

প্রাণ বাঁধাতে কি করে প্রাণ মন্ বাঁধায় মজালে।

আমার প্রাণ, এক সমান, আছে প্রাণ।

তুমি রাগ্ কোরে পীরিতে ভাগ্ বসালে ॥

[তাঁহার শেষ সময়ে এই দুই ভাবের গীতে ভাবের শেষ হইয়াছে। ইহাতে ভাব, রস, প্রেম, কৌশল, কবিত্ব, পাণ্ডিত্য কোন বিষয়েরি অভাব নাই। ইহার সমুদয় না পাওয়াতে দুঃখ হৃদয় রাজ্য একেকালে অধিকার করিল।]

মহড়া।

থাকো প্রাণ অভিমান লইয়ে।

আমি দেশে যাই মনো দেও ফিরায়ে ॥

চিতেন।

মধুর প্রয়াসে আমি, আইলাম তব স্থানে।

নলিনী কেন ম্লান হোলে মানে ॥

আশা না পুরায়ে দিলে মধু। কেতকী কলঙ্ক কর শুধু॥
মিছে বন্ধ কোরে, জ্বলাও হে আমারে, নিশি গেল তোমায় সাধিয়ে।

[রাম বসু অতি অল্প বয়সে এই গান রচনা করেন, নীলু ঠাকুর এই গীত গাহিয়াছিলেন। ইহার সমুদয় ও পাল্‌টা পাওয়া যায় নাই।]

মহড়া।

তোরে ভালবেসেছিলাম বোলে কিরে প্রেম আমার দুকুল মজালি।
দুমাস না যেতে, দারুণ বিচ্ছেদের হাতে, সঁপে দিয়ে আমায় ফেলে পলালি॥
সই কিসে, বিচ্ছেদ বিষে, জ্বলি তাই বলি।
আমি সাধে কি বিষাদে রোয়েছি।

কোরে না বুঝে লোভ, শেষ্ পেয়ে ক্ষোভ, বলি কাকে, চোখে দেখে, ঠকেছি॥

যেমন মৎস্য মাংসভোগী, হয়েছিল জম্বুকী, তুই কি আমার ভাগ্যে এখন্ সেইটে ঘটালি।

চিতেন।

পীরিতে মজিয়ে চিরদিন রব, প্রাণ জুড়াব, ছিল বাসনা।
ত্রিরাত্র না যেতে, তাতে, কি বিড়ম্বনা॥
আমি তুরি জন্যে হলেম্ পরের বশ।

আগে মান খোয়ালেম্, কুল মজালেম্, দেশ্ বিদেশে অপমান আর অপযশ॥

আগে দেখ্য়ে বাড়াবাড়ি, কল্লি ছাড়াছাড় তুই, আমার মাথায় তুলে দিলি কলঙ্কের ডালি।

[এই গীত নিজ দলে গাহনা করেন। ইহার অন্তরা ও পাল্‌টা পাওয়া যায় নাই।]

মহড়া।

পতি বিনে সই, সতীর মান্ কই, আর থাকে।

হায় আমি যেন হলেম সতী, বিপক্ষ তায় রতি পতি, নারী হোয়ে কি কর্ম্ম তার, শিব্ ডরাতেন যাকে॥

আমার হোলো যার মানে মান্, সে কই মান্ রাখে।
ছি ছি কি লজ্জা আইগো আই।
অন্ত দিনের কথা দূরে থাক্, সর্ব্বনেশের পর্ব্ব কটা মনে নাই॥
হোলেম্ পতির পরিত্যেজ্যে, থাক্‌তে দেয়না রাজ্যে সই, আবার রাজার মসিল কালো কোকিল ডাকে॥

চিতেন।

পতি পরহস্তা, ব্যবস্থা সতীর প্রতি নয়।
একাঙ্গ হোলে দুজনার, তবেই ধর্ম্ম রয়॥
হোলো তায় আমায় সম্বন্ধ।
নামে ভার্য্যা, কাযে ত্যাজ্যা সই, লোকের যেমন নদী চড়ার সনন্দ॥
আমায় তাচ্ছীল্য দেখে তার, দয়া হবে বল কার, আমার পতি দত্ত জ্বালা, জুড়াবে কে॥

অন্তরা।

হায় আমার এ কথা, অকথ্য, সত্যবাদী পতি আমার।
আসি আশা দিয়ে, গেল মন ছোলে, যুগান্তরে পাওয়া ভার॥

চিতেন।

ফুলে বদ্ধি হোয়ে ওগো সই, মূলে হারা হই॥
কত হবগো রমণী হোয়ে, অনঙ্গ বিজয়ী॥
আমার ধিক্ ধিক্ যৌবনে।
কাননের কুসুম্ যেমন সই, ফুটে আবার শুখায়ে রয় কাননে॥
আমায় পেয়ে কুলনারী, বধে সারি সারি সই, যেমন কুরু সৈন্য বেড়া চারিদিকে।

[এই গীত নিজ দলে গাহেন। ইহার পাল্‌টার অন্বেষণে অনেক যত্ন করিলাম। এই গান সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট।]

মহড়া।

তুমি কার প্রাণ। হানো কার পানে নয়ন বাণ।
তোমার নূতন যে প্রিয়তম, হয়নি তার কোন ব্যতিক্রম, কেন পরের দেহে থেকে বধ পরের প্রাণ।

[৬] [কোন মহাশয় এই গীতের সমুদয় প্রেরণ করিলে অত্যন্ত উপকৃত হইব।]

মহড়া।

তোমার বিচ্ছেদেরে বুকে কোরে প্রাণ জুড়াব প্রাণ।*

শুনে রুষ্ট বচন, হলেম্ তুষ্ট এখন, উষ্ণ জলে করে যেমন অনল নির্ব্বাণ॥

হেরি চক্ষু কর্ণেতে যেন ছমাসের পথ্।

কথা শুনে প্রাণ জুড়াবে দেখায় দণ্ডবৎ॥

[এই গীতটী অতি চমৎকার। ইহার সমুদয় প্রাপ্ত না হওয়াতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছি।]

মহড়া।

আমার পর ভেবে সই পর সকলি হোয়েছে।

আমি যে পর ভজিলাম্ সখি, পরসুখে হব সুখী, অপরে কি আছে বাকী, সে পরে পর ভেবেছে॥

অতঃপরে না জানি কি কপালে আছে।

যার লাগি ঘরে হলেম পর। সে ভাবিল পর। পরে আবার সাধে বাদ, শুনি পরস্পর॥

পরমভাজন, ছিল যেজন, পরোক্ষে সে হাসিছে॥

চিতেন।

না বুঝে সই পরের প্রেমে মজ্‌লাম একবার।

সখি সেই পরে, তারোপরে, পরে, মন ছিল আমার॥

সে পর বিধির সংঘটন। পরম ভাজন।

তৎপরে তৎপরে ভেবে, পরে দিলাম্ মন॥

আবার তারে, অন্য পরে, পর কোরে রেখেছে।

[ইহার অন্তরা পাওয়া যায় নাই। নিজ দলে গাহনা করেন।]

মহড়া।

ওরে পীরিৎ তোর জ্বালা, তবে ঘুচাতে পারি।

তেজে সুখসাধ, লোক পরিবাদ, যদি পরের মরণে আপ্‌নি না মরি।

---

* প্রীতিগীতিতে (১৩৪ নং) এর চিতেন দেওয়া আছে।—স.

ত্যেজে খল, এ সব ছল চাতুরী।
তোরে ভেবে পরের মত পর।
সোয়ে দুখ, বেঁধে বুক, একবার দেখ্‌ব হোয়ে স্বতন্তর॥
হোয়ে আত্মসুখে সুখী, আত্ম কুশল দেখি, পর উপকারো জন্মে না করি॥

চিতেন।

তব অদর্শনে প্রাণ যদি, তব ধ্যানে না থাকে।
পথে দেখা হোলে যদি আর, সখা বোলে না ডাকে॥
যদি ভুলি পরদত্ত সুখ্‌।
নয়নে, হেরিনে, কোন লম্পট শঠের মুখ্‌॥
যদি পরের করে মনো, না দিয়ে কখনো, আপ্‌নার যৌবনো, আপনি সম্বরি॥

অন্তরা।

না হই পরাধীন, যদি চিরদিন, আপনারে ভেবে আপনা।
মনে প্রাণে এক ঐক্যতা কোরে, দূরে তেজি পরের ভাবনা॥

চিতেন।

পরকাতরা কেমন কুস্বভাব, পরের দায়ে বাঁধা যাই।
জানি মিছে কথায় যে ভুলায়, তারি পিছু পিছু ধাই॥
জানি প্রাণের অরি তুই রে প্রাণ।
দুখে দই, তবু সই, কথা কই, রেখে সম্মান॥
তুই তো পলাস্‌ আমায় ফেলে, আমি তোরে ভুলে, উল্‌টে গিয়ে যদি পায়ে না ধরি॥

[এই গীত নিজ দলে গাহনা করেন।]

ঐ গীতের পাল্‌টা মহড়া।

ও পীরিৎ তুই আমার মনে থেকে ছেড়ে যা।
হবে নিবৃত্তি, এ সব প্রবৃত্তি, আপনার্‌ মন হবে আপনি সোজা॥

[ইহার আর কিছুই পাওয়া যায় নাই।]

মহড়া।

প্রাণ বোলোনা প্রাণ।
ছি ছি হাস্‌বে লোকে, আমার পাকে হবে শেষে অপমান॥

যারে প্রাণ স'পেছ, সেই প্রাণ ॥
আমায় কোরে অন্তরের অন্তর, যারে অন্তরে দিয়েছ স্থান ॥

চিতেন।

নূতন যারা, তোমার তারা, নয়নের তারা।
যে জন্ স্থূলে ভুল, দুটি আঁখির শূল, কেন তায় আদর করা ॥
ত্যেজ্য ধনের বাড়ায়ে সম্মান, কর পূজ্য ধনের অপমান।

অন্তরা।

যথায় তব নব ভাব, যারে প্রাণ বল তার সুখ।
আমায় কেন, বোলে প্রাণ, বাড়াও দ্বিগুণ দুখ ॥

চিতেন।

ভেবেছিলাম প্রাণের প্রাণ, গিয়েছে সে দিন।
এখন হোলেম প্রাণ, তোমার কথার প্রাণ, কিন্তু কর্ম্মে ফল হীন ॥
চোখের দেখা মুখের আলাপন, হোলো সেই লক্ষ লাভ জ্ঞান।

[এই গীত মোহন সরকার গাহিয়াছিল। ইহার রচনা ও ভাব অতি সুন্দর।]

মহড়া।

আমি প্রেম কোরে কি এত জ্বালা সই।
কেউ বলে না ভাল, কলঙ্কিনী বই ॥
আমি তো কখনো কারো মন্দকারী নই—
তবে কেন বলেগো লোকে, কুলকলঙ্কিনী এলো ঐ ॥

চিতেন।

যে দেখে আমারে, সেই করে লাঞ্ছন।
প্রাণ জুড়াব কোথা, স্থান নাহি এমন ॥
ঘরে পরে করে গঞ্জনা, আমি মরমেতে মরে রই।

[এই গীত মোহন সরকার গাহেন। ইহার সমুদয় ও দ্বিতীয় গীত পাওয়া যায় নাই।]

বিরহ।

মহড়া।

পোড়া প্রেম্ কোরে কি, পোড়ায় আমার জন্মটা গেলো।*

[৭] যত দিন হোয়েছে মিলন্, এক দিন নাই তার্ কান্না বারণ, পোড়া শিবের দশা যেমন তাই আমারে হোলো॥

চিতেন।

পোড়া প্রেমে মোজে হলো, কি দশা আমার।

কর্ম্ম ভোগের যেমন্ কপাল্ আমার, এমন্ খুঁজে মেলা ভার॥

অস্থি ভাজা ভাজা হলো প্রেমের দায়।

ভেবে তোর গুণাগুণ, মনের আগুন, জ্বল্‌ছে যেন রাবণেরি চিতা প্রায়॥

হোলে আমার সঙ্গে দেখা, সদাই মুখ বাঁকা, তুইতো আর আর লোকের কাছে থাকিস্ ভালো।

[এই গীতের সমুদয় পাওয়া যায় নাই।]

——

মহড়া।

কও বসন্ত রাজা। তোমার কোথায় সে প্রবাসী প্রজা।

একা গেলে একা এলে, দুখিনীর কি কোরে এলে, তোমায় কি সে পাঠ্‌য়ে দিলে, আমায়্ করতে ভাজা ভাজা।

আন্‌লে তারে, যে যার ধারেহে, সব্ যেতো বোঝা সোজা॥

তুমি নারীর বেদন জান না। ঋতুরাজ হে, কেন তারে সঙ্গে কোরে আন্‌লে না॥

কর অবলার উপরে বল্, ভাল খল্ দিলে পুরুষের বদলে নারীর সাজা।

চিতেন।

গ্রীষ্মে, বরিষে, আশার আশ্বাসে, প্রাণ রহেছে।

তার্ পর্ শরদ্ শিশির্, বিরহিণীর প্রাণে সয়েছে॥

আমার প্রাণোকান্ত না আসায়।

ঋতুরাজ হে। তুমি হোলে শীতান্ত কৃতান্ত প্রায়॥

যে জন ধারে তোমার রাজকর, দেশান্তর, তারে আন্তে তো পারে না কোরে সোজা।

---

* এই গান পরে সম্পূর্ণ করে জোড়া হয়েছে।—স.

অন্তরা।

আছি বিরহ বাসরে, নাথেরে ভেবে অন্তরে, শর শয্যায় করিয়া শয়ন্।
সংগ্রামে পাণ্ডবের হাতে ভীষ্মদেবের দশা যেমন ॥

চিতেন।

দেখ্‌লে না সে চক্ষে, যত বিপক্ষে প্রাণ জ্বলালে।
দেখ বনের পক্ষ, সে বিপক্ষ, বসন্ত কালে ॥

তুমি উল্‌টা বিচার করো না। ঋতুরাজ হে, রাজাতে কি হাজা শুকো ধরে না ॥

কোরে তোমার এ রাজ্যেতে বাস, সর্ব্বনাশ হোলো দুখিনীর ভাগ্যেতে দুকুল হাজা।

[এই গীত নিজ দলে গাহেন। এতচ্ছ্রবণে সকলেই ক্ষুব্ধ হয়েন। ইহার পাল্‌টা গানের মহড়া পশ্চাতে লিখিত হইল।]

ঐ গীতের পাল্‌টা মহড়া।

ঘর্ আমার নাই ঘরে।
মদন্ কর দিব কি তোমার করে ॥

ভূমিশূন্য রাজা তুমি, পতি শূন্য সতী আমি,আমার স্বামী গৃহ শূন্য, কাল কাটালেন্ পরে পরে।

সর সর, পঞ্চশর হে, ডর্ করিনে ও ডরে ॥
আমার জীবন শূন্য এ জীবন।
ঋতুরাজহে, শূন্য গৃহে, সৈন্য লোয়ে কি কারণ ॥

ঐ গীতের তৃতীয় মহড়া।

সব জ্বালা জুড়ালো।
আমার প্রবাসী নিবাসে এলো।

তুমি পেলে তোমার প্রজা, আমি পেলেম্ আমার রাজা, এখন তুমি মদন রাজা, কার কাছে কর লবে বলো।

[শেষোক্ত দুই গানের সমুদয় যিনি প্রদান করিবেন, তিনি পরম বন্ধুতার কর্ম্ম করিবেন।]

বিরহ।

মহড়া।

সেই গেলে প্রাণ আসি বোলে, এই কি সেই আসি।
সুখের আশে, দুখে ভাসে, বঁধু তোমারো প্রাণ প্রেয়সী।
বল কেমন পেয়েছিলে, নব রূপসী।
সে আশাতে যদি বশ হোলে রসময়।
আশা দিয়ে আমারে, যাওয়া উচিত নয়॥
আসাপথ চেয়ে আমি, নয়নো নীরে ভাসী।

চিতেন।

এসো এসো এসো দেখি, প্রাণ একি, দেখি চমৎকার।
অপরূপ আগমন, হইল তোমার॥
শশি সঙ্গে তুমি প্রাণ করিলে গমন।
ভানু সঙ্গে পুন এসে দিলে দরশন॥
আমারে বঞ্চনা কোরে, কোথা পোহালে নিশি।

[মোহন সরকারের মৃত্যুর পর ঠাকুরদাস সিংহ সেই দলের অধ্যক্ষ হইয়া এই গীত এবং ইহার নিম্নভাগের প্রকাশিত গীত এই দুই গীত গাহিয়া অত্যন্ত বিখ্যাত হয়েন। ইহাতেই তাঁহার নাম প্রকাশ হয়। রাম বসুর কৃত সকল বিরহের মধ্যে এই দুই বিরহ অনেকেরি মনোরঞ্জক হইয়াছিল।]

ঐ গীতের পাল্‌টা মহড়া।

প্রাণ তুমি আপনার নহ, আমার হবে কি।
মনে মনে, মনাগুনে, আমি জল্‌ব বই আর বল্‌ব কি॥
অনেক দিনের আলাপ বোলে আদরে ডাকি।
কেমন্ আছ তুমি প্রাণ, শুনি শ্রবণে।
প্রাণ গেলে প্রাণ নিজ দুখ, তোমায় বলিনে॥
ফলহীন বৃক্ষের কাছে, সাধ্‌লে কাঁদ্‌লে, ফলবে কি

চিতেন।

আমার বোলে, আমালে [আমারে] ছোলে প্রাণ দিলে পরেরি করে।
তুমি বন্ধি হোয়ে আছ তার, প্রেমেরি ডোরে।

বিরল পেয়ে তুমি তার মধু খেয়েছ।
আপ্‌নি এখন্ রসহীন্ হোয়ে এসেছ।
বিরস্ মুখের হাসি দেখে. বল কে হবে সুখী।

অন্তরা।

তুমি ছিলে যখন্ আত্মবশে রসে জুড়াতে।
পরে হোয়ে আর কি এখন্ পর ভুলাতে॥

চিতেন।

আমার যা হবার হলো, প্রাণ ভাল দায়ে পড়েছ।
রাহুগ্রস্ত শশী যেমন, তেম্‌নি হয়েছ।
সন্ধিযোগে যে শশির স্থিতি দণ্ড নয়।
সন্ধ্যা হোলে তোমার প্রাণ, নিত্য গ্রহণ হয়॥

[৮] সারা নিশি, সর্ব্বগ্রাসী, দিনে ও চাঁদমুখ দেখি।

[পাঠক মহাশয়েরা বিশেষ অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে এই গীতে সমূহ সন্তোষ লাভ করিবেন, কারণ ইহাতে বিশেষ কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ আছে।]

মহড়া।

এমন্ ভাব রাখা ভাব্ কোথা শিখিলে।
সে ভাব কোথা হে, যে ভাবে ভুলালে॥
ভাব দেখি নবভাবে, কি ভাবে ছিলে।
ভাবে ভাব কোরে ভাবান্তর, এখন তার অভাবে ভাবালে॥

চিতেন।

স্বভাবে অভাব আজ দেখিহে তোমার।
একি ভাবের দেখা, কও সখা, আবার॥
অনুরোধে প্রবোধিতে মন, ভাল ভাবের উদয় দেখালে।

অন্তরা।

মরি মরি, তোমার ভাবে বুঝি, জান কত ছল।
মুখে বঁধু, যেন মধু, হৃদে হলাহল॥

চিতেন।

অঙ্গ সঙ্গ রঙ্গরস, নাই এখন্ সে পাপ।
মন্ ভেঙ্গেছে, আছে, লোক্ দেখা আলাপ॥
দেখে আঁখি হইত সুখী, তাকি ক্রমে ক্রমে ঘুচালে।

[এই গীত মোহন সরকার গাহেন]

মহড়া।

রমণী হোয়ে রমণীরে, রতি মজালে।
তারো মৃতপতি, কেন বাঁচালে॥
বিরহিণীর দুখ ঘটালে।
রতিপতি দেয় যন্ত্রণা। আমার পতি তা বুঝে না।
আমি একা, সে অদেখা, শত্রু বুঝাব কি বোলে॥

চিতেন।

অনঙ্গ যে অঙ্গ দহে, একি প্রাণে সয়।
একবার মনে করি, ভয়ে ভজ্ব মৃত্যুঞ্জয়।
আবার ভাবি তায় কি হবে।
রতিত্তো পতি বাঁচাবে॥
একবার মদন, হোয়ে নিধন, নারীর গুণে জীবন পেলে।

অন্তরা।

মরি কি তার গুণের পতি। কি গুণে রাচালে [বাঁচালে] রতি।
অসতীরে সুখী কোরে, সতীর করে দুর্গতি॥

[মোহন সরকারের দলে এই গান গায়। ইহার পদের চিতেন পাওয়া যায় নাই]

পাল্টা গীত নিম্নভাগে প্রকাশ হইল।

মহড়া।

রতি কি, তারো নিজ পতি, করেনা দমন।
পেয়ে পদ্ম-ধারী, মজালে মদন্॥

নির্ব্বিবেকী নারী সে কেমন্।
আমরা নিজপতি জনে। চাঁইতে না দিই কারো পানে॥
সে কেমনে, পতিধনে, পরে সোঁপে ধরে জীবন।

চিতেন।

বসন্ত সামন্ত আদি বাড়িল রঙ্গ।
বিরহী যুবতীর অঙ্গ, দহে অনঙ্গ॥
যত কোকিলে কুহরে। তত হানে পঞ্চশরে॥
অবলারে, প্রাণে মারে, স্মর শরে করে দাহন।

অন্তরা।

রতি যদি পতিব্রতা। সে কোথা তার পতি কোথা।
তবে কেন, পঞ্চবাণ, ফেরেগো আমাদের হেথা॥
[ইহারো অন্তরার চিতেন পাওয়া যায় নাই]

মহড়া।

আগে প্রেম না হোতে কলঙ্ক হলো।
বিধি ঘটালে, উদ্যোগে দুর্যোগ,
প্রেমের আশা না পূরিলো॥
উপায়, এখন্ কি করি বলো।
তুমি এ পথে এলে। করে কুরব কুচক্রি সকলে।
দিনান্তরে দিতে দেখা বুঝি সখা, তাহা ঘুচিলো।

চিতেন।

না হোতে তোমার সহ, সুখ সংঘটন।
জানাজানি কাণাকানি, করে রিপুগণ॥
নয়নেরি মিলনে। এত প্রমাদ হবে, তা, কে জানে॥
না পেলেম্ প্রাণ জুড়াইতে, লাভে হোতে, দুকুলো গেলো।

অন্তরা।

সরমে, মরি মরমে, লোক্ যদি হাসে।
তোমার লজ্জায়, আমার লজ্জায় বাঁচিব কিসে॥

চিত্তেন।

দুজনে গোপনে, যদি অন্য কথা কয়।
অমনি চমুকে উঠে, অভাগীর হৃদয়॥
ফুটিতে না পারি হায়।
যেন বোবার স্বপ্ন সম প্রায়॥
মনাগুনো মনে জ্বলে, নয়ন্ জলে, হোয়ে প্রবলো॥

[এই গীত অগ্রে প্রকাশ করত ইহার পাল্টা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। এতৎপাঠে তাবতেই সুখি হইবেন।]

[ঠাকুরদাস সিংহ এই দুই গীত গাহেন।]

উক্ত গীতের পাল্টা।

মহড়া।

এই কোরো প্রেম্ গোপনে রেখো।
কেহ না জানে, তুমি আমি বই, কথা প্রকাশ কোরোনাকো॥
দেখো প্রাণ্, অতি সাবধানে থেকো।
তোমায় আমায় ঐক্যতা। কেউ শুনে না যেন এ কথা॥
পথে দেখা, হলে সখা, নয়ন্ ঠেরে সঙ্কেতে ডেকো।

চিতেন।

পীরিতের আশা, আমার নিরাশা বা হয়।
কুলনারী, সদাই করি, কলঙ্কেরি ভয়॥
যৌবন কোরেছি দান। তার দক্ষিণা দিলাম্ কুলমান॥
না হই যেন অপমানী, গুণমণি, দেখোহে দেখো।

অন্তরা।

অবলা, আমি সরলা, তায়্ কুলবতী।
প্রেমের আশে, পাছে শেষে, বলে অসতী॥

চিতেন।

মনের মিলনে, মনে থাক্‌ব দুজনা।
তুমি কেবা, আমি কেবা, চেনা যাবে না॥
যন চাতকিনী প্রায়। প্রেম্ সমানে থাক্‌বে দুজনায়॥

[৯] মেঘে যেমন শশী ঢাকা, তেম্‌নি সখা, লুকায়ে থেকো।
[অতি সুন্দর অতি সুন্দর।]

মহড়া।

এত দিনে সই, প্রাণ্‌নাথের আমার, মানভঙ্গ হয়েছে।

কদিন কথা ছিল না, ডাক্‌লে দেখা দিত না, সে আজ হাসিমুখে আসি বোলে গিয়েছে॥

ছিল যে সন্দ, সে সব্‌ দ্বন্দ্ব, ঘুচেছে॥

যেন পরীক্ষা দিয়ে উঠেছি।

কোন্‌ ছল পেয়ে প্রাণ্‌, কর্ব্বে যে মান্‌, বাঁকাবাঁকির দফা রফা কোরেছি।

গেলে কৃষ্ণ দরশনে, সন্দ হোতো মনে তার, এখন সে দোষে নির্দ্দোষী বিধি কোরেছে।

চিতেন।

ভালবাসি বোলে, ছলে কৌশলে প্রাণ্‌ নাথের হোতো মান্‌।

নারী হোয়ে, সদা প্রেমের দায়ে, সাধ্‌তে যেতো প্রাণ॥

যারে তিলেক, না দেখ্‌লে মরি।

তারে এক্‌লা রেখে, এক্‌লা থেকে, ত্রিরাত্রি কি প্রাণে ধরিতে পারি॥

যেজন হাসালে, কাঁদালে, চরণে ধরালে সই, সে আজ্‌ আপন্‌ সাধে এসে সেধে গিয়েছে।

অন্তরা।

আমার প্রাণনাথের স্বভাব ভাল নয়, কুটিল হৃদয়, যেন বিষধর।

নিজ রসাভাসে, দংশে এসে যদি সই, জ্বোলে মোর্ব্ব নিরন্তর।

[এই গীতের অন্তরার চিতেন ও পাল্‌টা গানের জন্য বিস্তর লোকের উপাসনা করা গিয়াছে, কোনখানেই প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ইহার দ্বিতীয় বিরহ অতি উত্তম হইয়াছিল, রামবসু এই যোড়া গান নিজ দলে গাহিয়া ভাবকের মন মুগ্ধ করিয়াছিলেন।]

মহড়া।

যাক্‌রে প্রাণ,
বিচ্ছেদে প্রাণ আমারি গেল গেল।
যত সুহৃৎ ভাঙ্গা লোকের কুরীৎ মন্ত্রণায়,
সাধের পীরিৎ ভেঙ্গে তুমি আছতো ভাল॥
দেখা শুনো পুন হবে হে, তার আশা ঘুচিল।
কোরে হাস্তেরে হাস্ত কৌতুক।
পথে দেখা হোলে, যাব চোলে অঞ্চলেতে ঢেকে মুখ॥
ধোরে ভালবাসা ভাব্, হোলো ভাল লাভ্, সুখের আশা কোরে, প্রেমের বাসা ভাঙ্গিল।

চিতেন।

পীরিতেরো সাধ ঘুচালে, দুখে জ্বলালে জীবন।
না জানি কারণো, কও কেন, ভাংলো তোমার মন।
যা হোক্ ভাল ভালবাসিলে
খেয়ে আমার্ মাথা, পরের কথায় পীরিৎ ভেঙ্গে পালালে॥
কোরে আমার উপর রাগ্, রাখ্‌লে যার সোহাগ্, এখন্ তার আদরে তোমার আদর বাড়িল।

অন্তরা।

তোমার পীরিতি কি রীতি, হোলহে যেমন্, হংসী মূষিকেরি প্রায়।
হংসী প্রেমের দায়, পাখা দিয়ে ঢাকে তায়, সে পক্ষ কেটে পলায়॥

চিতেন।

বিধিমতে আমায় মজালে, সুখে জ্বলালে হৃদয়।
বুঝে দেখ মনে, দর্পণে মুখ দেখা বই নয়॥
তোমার অন্তরে নাই একটু টান্।
বল ভালবাসি, সেটা কেবল দেঁতোর হাসি, হাস প্রাণ।
প্রেমে ধোরে তোমার ধ্যান, পেলেম্ ভাল জ্ঞান, এখন ঘরে পরে সকল শত্রু হাসিল।

[এই গান নিজ দলে গাহেন।]

মহড়া।

যৌবন জনমের মত যায়।*
সেতো আশাপথ নাহি চায়॥
কি দিয়েগো প্রাণ সখি, রাখিব উহায়।
জীবন যৌবন গেলে আর।
ফিরে নাহি আসে পুনর্ব্বার॥
বাঁচিতো বসন্ত পাব, কান্ত পাব পুনরায়।

চিতেন।

গেল গেল এ বসন্তকাল, আসিবে তৎকাল।
কালে হোলে কাল, এ যৌবন কাল॥
কালপূর্ণ হোলে রবে না।
প্রবোধে প্রবোধ মানে না।
আমি যেন রহিলাম, তার আসার আশায়।

[এই গীত মোহন সরকার গাহেন। যিনি শুনিয়াছেন তাঁহারি কর্ণে সুধা প্রবেশ করিয়াছে, ভাবে তাঁহার মন মোহিত হইয়াছে। তিনিই রসে গলিয়াছেন, ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট বিরহ কেহ কখনই শুনেন নাই, যিনি ইহার অন্তরা ও পাল্‌টা গান দিতে পারিবেন, যাবজ্জীবন বিনা বেতনে তাঁহার নিকট বিক্রীত রহিব।]

মহড়া।

আমার পতিকে বোলো, দেশের ভূপতি বসন্ত।
যদি সে রৈল দেশান্তর, কে দিবে রাজার কর, হবে কি কোকিল রবে প্রাণান্ত॥
সেতো জানেনা, ঋতুবসন্ত কেমন দুরন্ত।
অঙ্গে দে কর, বলে দে কর।
বলি সর, ওরে পঞ্চশর, আমারদের ঘরেতে নাই ঘর॥
মদন যে করে করের তরে, এমন্ আর কে করে, ওরে সাধে কি কোরেছে শিব সাঁপান্ত।

---

* পরে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত।—স.

চিতেন।

ভার্য্যে রেখে মদনরাজ্যে সই, কান্ত গেল দেশান্তর।
সজনি, দিবা রজনী, বিরহে দহে কলেবর॥
যেমন আমার কপাল পোড়া।
তেমনি সই, হর কোপে ঐ, অনঙ্গের সর্ব্বাঙ্গ পোড়া॥
মদন সেই পোড়ার ভয়েতে পুরুষকে ধরেনা সই, এসে কামিনীর কাছে হোলো কৃতান্ত।

[এই গীত নিজ দলে গাহেন। ইহার দুই গান যিনি শুনিয়াছেন তিনিই মোহিত হইয়াছেন। আক্ষেপ এই যে সমুদয় প্রাপ্ত হইলাম না।]

[১০] ঐ গীতের পাল্‌টা মহড়া।

যৌবন যক্ষের ধন, বিপক্ষে লোতে চায়।
আমায় সঁপিয়ে মদনে, সে রইল সেখানে, এখানে সতী মরে পতির দায়॥

মহড়া।

মনে রৈল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে, যখন্ যায়গো সে, তারে বলি বলি, আর বলা হোল না॥
সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।
যদি নারী হোয়ে সাধিতাম্ তাকে।
নির্লজ্জা রমণী বোলে হাসিতো লোকে।
সখি ধিক্ থাক্ আমারে, ধিক্ সে বিধাতারে, নারী জনম যেন করেনা।

চিতেন।

একে আমার এ যৌবনকাল, তাহে কালবসন্ত এলো।
এ সময়ে প্রাণনাথ, প্রবাসে গেলো॥
যখন হাসি হাসি, সে, আসি বলে।
সে হাসি, দেখিয়ে ভাসি নয়ন জলে॥
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন্ চায় ধরিতে, লজ্জা বলে ছি ছি ধোরোনা।

অন্তরা।

তার মুখ দেখে, মুখ ঢেকে, কাঁদিলাম সজনি।
অনাসে প্রবাসে গেল, সে গুণমণি ॥
একি সখি হোলো বিপরীৎ, রেখে লজ্জার সমান।
মদনে দহিছে এখন্ এ অবলার প্রাণ ॥

[এই গীত ঠাকুরদাস সিংহ গাহেন। গান অতি চমৎকার, দুই অন্তরায় পরিপূর্ণ; আমরা সমুদয় প্রাপ্ত হই নাই। ইহার পাল্‌টা প্রস্তুত হয় নাই।]

মহড়া।

ওলো সুধাংশুমুখি প্রাণ, কি নূতন মান দেখালে।
তোমার হাসি শশিমুখে, কান্নাও আছে চোকে, বচনে মান রেখে প্রাণ জুড়ালে ॥
কোরে মান্, প্রেমের দুই পক্ষ সমান্ জানালে।
আমার এ পক্ষে, না কোরে বিপক্ষতা।
এক চক্ষে নিদ্রা যাও, আর চক্ষে জেগে রও, সাপক্ষে দুই পক্ষে শীলতা ॥
তোমার মানেতে নাই কৌশল, না দেখি কোন ছল, শতদল ভেসে যায় নয়ন জলে।

চিতেন।

মান্ তরঙ্গে অঙ্গ ডুবালে, প্রাণ তা ভেঙ্গে বলে না।
আকাঙ্ক্ষ ইঙ্গিতে, ভাবের ভঙ্গিতে, বুঝ্‌লাম্ যেমন্ মন্ত্রণা ॥
আমায় নিগ্রহ করবে নাকি নির্দ্ধার্য্য।
কোরে ঔদাস্য মান, অধৈর্য্য কল্লে প্রাণ, আপনায় আপনি নও ধৈর্য্য ॥
ওলো পূর্ণচন্দ্রাননে, আধো আধো পানে, আধো চাঁদ ঢেকেছে প্রাণ অঞ্চলে।

অন্তরা।

তোমার কতবার দেখেছি প্রাণ কত মান্, আজ কি সৃষ্টি ছাড়া সৃষ্টি।
ভেবে দেখ্‌লে সে মান্, মলেও রাগ যায় না প্রাণ, অথচ আমার পানে সুদৃষ্টি ॥
আজ্ কি সৃষ্টি ছাড়া সৃষ্টি।

[এই গীত নিজ দলে গাহেন। ইহার অপরাংশ ও পাল্‌টার সমুদয় ভাগ অতি উৎকৃষ্ট।]

ঐ গীতের পাল্‌টা গানের মহড়া।

তোমার মানের উপরে মান, কোরে আজ্ মান বাড়াব।*

আমায় আজ্ যেমন্ কাঁদালে, পায়্ ধোরে সাধালে, আমি আজ্ তেম্‌নি কোরে কাঁদাব॥

[ইহার আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। যিনি অনুগ্রহ করিয়া পরিপূর্ণ দুইটী গীত প্রদান করিবেন তিনি আমারদিগের মহোপকারী বন্ধু হইবেন।]

মহড়া।

হায়রে পীরিত তোর, গুণের বালাই নে মরি।†

যখন্ যারে পাও, তার্ কি সুখো দুখো সব্ ঘুচাও॥

তুলো সিংহাসনে, কর পথের ভিখারী।

তোমার তরে, সদা ঝুরেছে, কি পুরুষ কি নারী॥

একবার যার্ সঙ্গে যার পীরিৎ হয়।

সে তার্ নয়ন্ তারা, আর কিছুই কিছু নয়॥

ভাবি জন্মে যার মুখ না দেখিব আর, আবার দেখা হোলে তার সেই, চরণে ধরি।

চিতেন।

কি ক্ষণে এপ্রেমে লাগ্‌লো প্রেম, আমি জন্মে ভুল্‌তে পারিনে।

দুখ ভোগ, অনুযোগ, তবু না দেখ্‌লেতো বাঁচিনে।

কেমন্ কোরে রেখেছিস্ আমায়।

তারে না দেখ্‌লে প্রাণ, আর কোথাও ন [না] জুড়ায়॥

মন্ স্বর্গপথে যেতে, বর্গ মানে না।

কেবল চতুর্ব্বর্গ ফল সেই চাঁদবদন হেরি॥

অন্তরা।

হায়, প্রেমের প্রেম, মনে উদয় হোলে, সাধ্য কি বাধ্য রাখি।

তিলেক না হেরে বিরহ বিকার, পলকে পলকে, প্রলয় দেখি॥

[এই গীত নিজে গাহেন। ইহার পাল্‌টা ও সমুদয়াংশ পাওয়া যায় নাই, যিনি জ্ঞাত আছেন তিনি প্রদান করিলে মহোপকার স্বীকার করিব।]

---

* প্রীতিগীতিতে (১৭৪১ নং) সম্পূর্ণ উদ্ধৃত।—স.

† পরে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত। গুপ্তরত্নোদ্ধার (পৃ ১৭০) এবং প্রীতিগীতিতে (৫৭৩) সম্পূর্ণ উদ্ধৃত।—স.

মহড়া।

তোরা বল্ দেখি সই পুরুষের মান্ যায় কেমন কোরে।
আর মান সমাধান, কল্লে পায় ধোরে যে সই।
আমি নারী হোয়ে কোন্ মুখে তায় সাধব পায়ে ধোরে ॥

চিতেন।

ভেবে ছিলাম্ মনে, মোজে মানে, আপনার মান বাড়াই।
তাহে একদিগে মান্ রাখ্তেগে সই, দুদিগ্ বা হারাই ॥
যখন্ মান্ কোরে, মানিনী হোয়ে, রইগো মনের দুখে।
কতবার, তখন্ প্রাণনাথ আমার মানের দায়ে, ব্যাকুল হোয়ে, প্রাণ্ দিয়ে মান্ রাখে ॥
এখন্ আমার মান্, ভেঙ্গে দিয়ে, উল্টে মান্ কল্লে সই, এবার্ তার মানের মান্ থাকে কিসে তাই ভাবি অন্তরে ॥
[নিজ দলে এই গীত গাহেন। [১১] ইহার সমুদয়াংশ ও পাল্টা পাওয়া যায় নাই।]

মহড়া।

যার ধন তারে দিলে প্রাণ্ বাঁচে প্রাণ্ সখি।
হোয়ে পরধন গচ্ছিতে, প্রাণ যায় পরীক্ষা দিতে, যেমন অনলে পোড়ালে রাম্ জানকী ॥
যে কণ্টক্ আমার পাড়ার লোক্, এমন আর কোথাও না দেখি।
আমার অকেকাল্ সঙ্গে কাল, তায় কাল্ এ বসন্ত কাল, হোলো তিন্কালে নারী সারা চারা কি ॥

চিতেন।

পেয়েছি পতিব্রত নিধি, তায় বিবাদি, বিপক্ষ দুজন।
মন্মথ, না হয় মন্মত, সদাই সে আকুল করে মন ॥
হোলো এইতো দুখ সতীত্ব রাখায়।
ভূপতি ধর্ম্ম হীন, খগতি পরাধীন, যুবতী কার কাছে প্রাণ জুড়ায় ॥

এই উভয় শঙ্কটে সই, দুই দিকে সারা হই, পতি ভাব্‌লেনা সতীর দশা হবে কি ॥

[এই গীত নিজ দলে গাহেন। ইহার সকলাংশ ও পাল্‌টা যদি কেহ পাঠাইয়া দেন, তবে তাঁহার নিকট অত্যন্ত উপকৃত হইব।]

মহড়া।

সখি বল্‌ব কি এ দুখিনীর, এ জ্বালা বারমাস।*
গেল চিরদিন কাঁদিতে, বসন্ত কি শীতে, হয়েছে যেন সীতের বনবাস।

[এই গীত ও ইহার দ্বিতীয় গান অতি চমৎকার হইয়াছিল। আমরা একটি মহড়া ভিন্ন আর কিছুই প্রাপ্ত হই নাই। নিজ দলে গাহেন।]

মহড়া।

তোমার প্রেম হোতে প্রাণ, বিচ্ছেদ আমায় ভাল বেসেছে।†
পীরিৎ হোলো আর ফুরালো, চোকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে গেল, জন্মের মত বিচ্ছেদ আমার হৃদয়ে বসেছে ॥

[নিজ দলে গাহেন। এই মহড়া ভিন্ন আর কিছুই প্রাপ্ত হই নাই।]

মহড়া।

ছিলে প্রাণ যে দেশে, সে দেশে কি, বসন্ত আছে।
যত এদেশের কোকিলে, আমায় স্থির হোতে না দিলে, সেখানে কি তেম্‌নি কোরে ডাক্‌তো তোমার কাছে ॥

[ইহার আর কিছুই পাওয়া যায় নাই।]

---

* পরে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত।—স.

† প্রাচীন কবি সংগ্রহ (পৃ ১০৪) এবং বাঙ্গালীর গানে (পৃ ১৬০) সম্পূর্ণ উদ্ধৃত।—স.

মহড়া।

কার দোষ দিব কপালেরি দোষ আমার।*
যেমন্ প্রাণনাথ্, প্রাণে দেয় আঘাৎ,
তেমনি অন্যায় অবিচার বসন্ত রাজার।
কে আছে সপক্ষরে, বিরহী জনার॥
করে অনঙ্গ, যে রঙ্গ, প্রকাশিতে লজ্জা পাই।
অঙ্গে কর্ দিয়ে, কর্ সাধে গো সদাই॥
ভয়ে পুরুষে না ধরে, নারীবধ করে সই,
এমন্ মেয়েমুখো রাজার রাজ্যে নমস্কার॥

চিতেন।

সময়েরি গুণে সখিরে, করে হীন জনে অপমান।
কোথাগে, জুড়াব প্রাণ, নাহি দেখি, হেন স্থান।
একে দুঃসহ বিরহ, নির্ব্বাহ নাহিক হয়।
তাহে কাল্‌গুণে কাল্ বসন্ত উদয়॥
এসে সপ্তরথি মিলে, যুবতী মজালে সই, যেন অভিমন্যু বধের উদ্যোগ এবার॥

অন্তরা।

সই আমি যার, সে আমার ভেবে, দেশে যদি না এলো।
জগতের জীবন, মলয় পবন, সে আমার কাল হোলো॥
তবে মরণ্ ভালো।

চিতেন।

প্রিয়জনে তেজে প্রিয়জন, গেল প্রয়োজনে আপনার।
আমারে বলে আমার, এমন্ কে আছে আমার॥
হোয়ে রতিপতি, করে যুবতীর সঙ্গেতে বল্।
আছি পথ্ চেয়ে রথ্ হোয়েছে অচল॥
ভয়ে সারথি পলালো, শেষে এই হোলো সই, কালা কোকিলেরি রবে প্রাণে বাঁচা ভার॥

[স্বয়ং দল করিয়া প্রথমেই এই গান এবং পশ্চাদ্ভাগস্থ ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় গান রচনা করেন। এমত উত্তম গান প্রায় শুনা যায় না।]

* কোন কোন বইতে এর রচয়িতা ঠাকুরদাস চক্রবর্তী—বাঙ্গালীর গান (পৃ ১৭১)।—সং.

উক্ত গীতের পাল্‌টা।

যাক্ প্রাণ্, প্রাণনাথ যেন সুখে রয়।
থেকে দেশান্তর, দহে নিরন্তর, তারে নিন্দে করি পাছে পতিনিন্দে হয়।
আমি মরি, সহচরি, করিনে সে ভয়॥
দেখ আমি মোলে কত শত নারী মিল্‌বে তার।
সখি সে বিনে, কে, আছে গো আমার।
আমায় তেজিলে তেজিতে পারে, কে দুষিবে তারে সই, আমার পূজ্যধন বইতো তেজ্য ধন নয়॥

চিতেন।

গেল গেল, কুলো কুলো, যাক্ কুল্, তাহে নই আকুল।
লোয়েছি যাহার কুল, সে আমার প্রতিকূল,
যদি কুল কুণ্ডলিনী, অনুকূলা হন্ আমায়।
অকূলের তরি, কুল্ পাব পুনরায়॥
এখন্ ব্যাকুলো হোয়ে কি, দুকুলো হারাব সই, তাহে বিপক্ষ হাসিবে যত রিপুচয়॥

[কি মনোহর, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, এরূপ সতী স্ত্রী উক্তি গীত কখনই শুনা যায় নাই, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরি নিকট নির্ভয়ে গান করা যায়।]

তেসরা পাল্‌টা।

মহড়া।

এই খেদ্ তারে দেখে মরুতে পেলেম্ না।
আমায় চাক্ না চাক্, সখা সুখে থাক্,
কেন দেখা দিয়ে, একবার্ ফিরে গেল্ না॥

চিতেন।

জীবনো থাকিতে প্রাণনাথ, যদি নাহি এলো নিবাসে।
লুব্ধ আশা দিয়ে সে, কেন রইল প্রবাসে॥
আমি যেই আশাবৃক্ষে সদা দিয়ে অশ্রুজল।
সৃজিলাম সই, বই হোলো সুখফল॥

তরু সমূলে শুখালো, শেষে এই হোলো সই, কালো কোকিলেরি রবে প্রাণো বাঁচে না।

[১২] [এই শেষোক্ত দুই গানের সমুদয় না পাওয়াতে যাবজ্জীবনের জন্য অন্তঃকরণে ক্ষোভ রহিল।]

মহড়া।

কাল বসন্তের হাতে, যায় বা সতীত্ব সৌরভ।

যে ধন্ দিয়ে গেলেন প্রাণনাথ, তায় বা করে গো আঘাৎ। কত সই গো সই মুহুর্মুহু কুহু রব॥

চিতেন।

শিশির নিশির যন্ত্রণা, সই এ হোতে ছিলোতো ভালো।

বসন্ত, হয়ে কৃতান্ত, বিরহী বধিতে এলো॥

মনের কথা কই এমন্ কে আছে।

দেশের রাজা যিনি, নারী বধেন্ তিনি, তবে আর দাঁড়াব কার্ কাছে॥

আসি সপ্তরথি মেলে, আমারে মজালে, যেমন অভিমন্যু ঘেরেছে কৌরব।

[এই গীত নিজ দলে গাহেন। সমুদয় পাওয়া যায় নাই।]

মহড়া।

ধিক্ সে প্রাণকান্তে, এলোনা বসন্তে।
রমণী রাখিয়ে ভুলে আছে কি ভ্রান্তে॥
সে যে গিয়েছে দূর দেশ।
আছি কি মরেছি, করেনা উদ্দেশ॥
পতি হোয়ে সঁপে গেল, মদন দুরন্তে।

চিতেন।

একা রেখে যুবতীকে, গেল দেশান্তর।
তার বিরহেতে, প্রাণ আমার দহে নিরন্তর॥
সে বিনে এ যৌবন রতন।
বল রক্ষক কে, করিবে রক্ষণ॥
জানেনা কি কমল্ কলি, ফুটিবে মাসান্তে।

অন্তরা।

প্রিয়জনে ত্যজে প্রিয়জন, আছে কেমনে।
হোলো নাকি তার দয়া, রমণী রতনে ॥

চিতেন।

কন্যাকালের কথা মনে হোলে বাড়ে শোক।
আমার জনক্ তারে দিলেন্ দান, দেখিয়া সুলোক ॥
করে করে কোরে সমর্পণ।
তারে বোল্লেন্ সুখে, কোরোহে পালন ॥
কথা না হোলো পালন, সঁপিলেন কৃতান্তে।
[এই গীত মোহন সরকার গাহেন।]

মহড়া।

কও দেখি প্রেম্ কোরে প্রেমির মান থাকে কিসে।
তুমিতো প্রেমে পণ্ডিত, কত প্রেম কোরেছ এই বয়সে ॥

চিতেন।

বাসনা করেছি মনেহে, করিব পীরিৎ।
অপমানের ভয়ে প্রাণ, সদা সশঙ্কিৎ ॥
সাধে পাছে রটে, পরিবাদ্।
ডুবিবে অবলার কুল, এ বড় প্রমাদ্।
হোয়ে প্রেমাধিনী, অপমানী না হই যেন শেষে।
[ঠাকুরদাস সিংহ এই গীত গাহেন।]

৺রাম বসু*

[দুই]

গত ১ আশ্বিনের প্রকাশিত পত্রের শেষ।

[১] আমরা গত মাসের প্রথম দিবসীয় পত্রে ৺রামমোহন বসুর জীবন বৃত্তান্ত প্রকটন করত কতিপয় কবিতা প্রকাশ করিয়াছিলাম, তৎপাঠে অনেকেই প্রীত হইয়াছেন, এবারে আবার তদতিরিক্ত অনেক গুলীন গান সঙ্কলন পূর্ব্বক অতি যত্নে পত্রস্থ করিলাম, বোধ করি, অনুরাগ সহযোগে ইহাতে নয়নাস্তপাত করিলে পূর্ব্বাপেক্ষা সকলে অধিক সুখানুভব করিবেন, এতন্মধ্যে এক একটি গান এ প্রকার চমৎকার আছে, যাহার গুণের ব্যাখ্যা করিয়া শেষ করা যাইতে পারে না। যে পর্যন্ত রাম বসুর মৃত্যু হইয়াছে, সে পর্যন্ত কবিওয়ালাদিগের কবিতা শুনিয়া আর কেহই সুখি হয়েন না, তাহার অভাবে এককালেই এ বিষয়ের অভাব হইয়াছে বলিতে হইবেক। কোকিলের কুহুরব নিবারণ হইয়া এইক্ষণে কেবল ভেকের ধ্বনি হইতেছে, অতএব এখন এই কুরবে অধীর না হইয়া বধির হওয়াই কর্ত্তব্য হয়। নেত্র-সুখকর মনোহর ফুল্লারবিন্দ-মকরন্দ পান করিয়া আনন্দ লাভ করিলে আর কি রসহীন কণ্টকময়-কেতকী কুসুমে আসক্তি জন্মে?—নীরদ নির্গত নীরানন্দ পরিহার-পূর্ব্বক নিরানন্দকর লবণ-নীরধির নীরে কি আনন্দ জন্মিতে পারে?—সুবর্ণ-সুবর্ণ-দর্শক অপক্ক আম্ররূপ-বৎ তাম্রদৃষ্টে কি নয়নের তৃপ্তি জন্মাইতে পারে? যাহা হউক, কীর্ত্তি-কুশল মহাত্মাগণের কীর্ত্তিকলাপ পৃথ্বীময় ব্যক্ত হইলেই অত্যন্ত সুখের বিষয় হয়। প্রার্থনা করি, জগদীশ্বর আমারদিগের এই সঙ্কল্পিত কল্পে কল্পের ঘটনা না করিয়া অল্পে অল্পে প্রসন্নতা প্রকাশ করিতে থাকুন।

[২] অনেক গীতের অনেকাংশ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, ইহার নিমিত্ত আমরা বিস্তর পর্য্যটন করিয়াছি, প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছি, এবং অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়াছি, তথাচ কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। সুধা পানে ক্ষুধা নিবারণ না হইলে যেমন অন্তঃকরণে অপর্য্যাপ্ত আক্ষেপ জন্মে, তদ্রূপ এতদ্বিষয়ের অপ্রাপ্তি জন্য আমারদিগের মনের সকল অভিপ্রায় বিপুল বিলাপেই বিলুপ্ত

---

* সংবাদপ্রভাকর, সোমবার ১ কার্ত্তিক ১২৬১ সাল। ইং ১৬ অক্টোবর ১৮৫৪।—স,

হইতেছে। কি করি, সাধ্যের অতীত কিছুই হইতে পারে না। যতদূর সাধ্য তাহা করিলাম, অথচ সর্ব্বতোভাবে অভিপ্রেত সুসিদ্ধ করিতে পারিলাম না। যে যে মহাশয় যাহা যাহা জ্ঞাত আছেন, তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক লিখিয়া পাঠাইলে সংপূর্ণরূপ না হউক অনেকাংশেই মানস পরিপূর্ণ হওনের সম্ভাবনা বটে। কি পরিতাপ! দেশীয় লোকেরা ইহাতে কিছুমাত্র মনোযোগ করেন না, এই স্বাদে স্বাদিত নহেন, যিনি কিছু কিছু জানেন, তিনি মনে করেন, তাহা লিখিয়া পাঠাইলে বুঝি তাঁহার সর্ব্বনাশ হইয়া আমারদিগের রাজ্য লাভ হইবে। আমরা কিছু লাভের প্রত্যাশায় লোভের অধীন হইয়া এ বিষয় প্রকাশার্থ ব্যাকুল হই নাই, কেবল পূর্ব্বতন সুকবি কদম্বের কীর্ত্তিকলাপ প্রকটন করিয়া দেশের হিত সাধন জন্য এতদ্রূপ যত্ন ও চেষ্টা করিতেছি, কারণ এতদ্বারা আধুনিক নব্য ভব্য সভ্য জনেরা কাব্য ঘটিত প্রাচীন ব্যাপার যতই জ্ঞাত হইবেন, ততই সুখি হইতে পারিবেন, এবং গীতের রচনা দৃষ্টে ভাব, রস, ও অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া অনেক উপকার প্রাপ্ত হইবেন, শিক্ষার্থিগণ রসজ্ঞ ও গুণজ্ঞ হইয়া রচনা প্রণালী পক্ষে পরম পারদর্শি হইবেন।

আমরা রামবসুর গীত সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গেই রাসু নৃসিংহ, হরুঠাকুর, নীলঠাকুর, নিতাইদাস বৈরাগী প্রভৃতি প্রাচীন বিখ্যাত কবিওয়ালা দিগের জীবন-চরিত সম্বলিত উত্তম উত্তম কবিতা সকল, ও কীর্ত্তন্‌ওয়ালাদিগের কীর্ত্তন, যাত্রা ও ঢপওয়ালাদিগের "ধূয়া" "পদ" ও তুক্কা সমুদয় নানা উপায়ে সংগ্রহ করিতেছি। ক্রমে ক্রমে তাহা পত্রস্থ করিয়া সাধারণের সুবিদিত করিব।

আমরা যে সকল কবিতা প্রকাশ করিতেছি, সুর সম্বলিত তাহার গাহনা শুনিলে অন্তঃকরণে আশু যেরূপ আহ্লাদ জন্মে, মুখে পাঠ করিলে তত সুখোদয় হইতে পারে না। ফলে ইহাতে কবির কবিত্ব ও বিদ্যার অন্যথা কি হইতে পারে? ঐ সমস্ত কবিতার সুর অদ্যাপি অনেকেই জ্ঞাত আছেন, তাহা বড় কঠিন নহে, সহজেই শিক্ষা হইতে পারে, যৎকিঞ্চিৎ যত্ন করিলে অনায়াসেই সুরজ্ঞ-জনের নিকট হইতে অভ্যাস করিতে পারিবেন।

"হাফ্ আখড়াই" "দাঁড়া সখের কবি" ও "পেসাদারি" কবিতার গাহনার প্রণালী এক প্রকার। কিছু মাত্রই প্রভেদ নাই। প্রথমে "চিতেন" পরে "মহড়া" সর্ব্বশেষে "অন্তরা" গাহিতে হয়, কিন্তু লিখন কালে অগ্রে মহড়া, পরে চিতেন, শেষে অন্তরা লিখিতে হইবে। পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা অবিদিত আছেন, তাঁহারদিগের বিদিতার্থ লিখিতেছি যে, পাঠ কালীন, প্রথমে "চিতেন"

পরে "মহড়া" তৎপরে "অন্তরা" পাঠ করিবেন, এবং সুর করিয়া গাহিতে হইলেও উক্ত নিয়ম অবলম্বন করিবেন।

আমরা প্রথম-বারে যে সকল গান মুদ্রিত করিয়াছিলাম, তাহার যে যে অংশ অসংপূর্ণ ছিল, এবারে সেই সকল গানের অনেকাংশই পরিপূর্ণ হইয়াছে। বোধ করি এবারে যাহা অসংপূর্ণ রহিল, ভবিষ্যতে তাহা সংপূর্ণ হইবে, কিন্তু সংপূর্ণভাবে সংপূর্ণ হইবে এমত প্রত্যাশা করিতে পারি না, তবে প্রকৃষ্ট ব্যাপারের যতদূর হয় ততদূরকেই মহোপকারের ঘটনা বলিয়া রটনা করিতে হইবেক।

কবির দলের কবিতা সকল "পয়ার ত্রিপদী, চৌপদী" ইত্যাদি কোন গ্রন্থের ছন্দে বর্দ্ধিত নহে। শুদ্ধ সুরের উপরেই নির্ভর করে। সুরানুযায়ি শব্দ বসিয়া থাকে, ইহাতে কথার ন্যূনাধিক হইলে কোন মতেই দোষ হইতে পারে না। কারণ সুরের অনুরোধে শব্দ সংযোগ করিতে হয়, এজন্য আমরা সুরানুগত উচ্চারণ ভেদে পদ সকল লিপিবদ্ধ করিলাম।

যথা।

কথনো, তখনো, বরণো, নীলো, কমলো, গমন্, ধর্, মান্, কর্, বল্, হাস্, বাস্, ধরো, করো ইত্যাদি।

অতএব পাঠক মহাশয়েরা এরূপ লেখাকে অশুদ্ধ জ্ঞান করিবেন না।

বঙ্গ দেশীয় লোকের মধ্যে যাঁহারা বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই, এবং জন্মাবধি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে, উড়িষ্যা রাজ্যে অথবা অপর কোন স্থানে বাস করিতেছেন, তাঁহারা এ রসের বিশেষ রসজ্ঞ হইতে পারেন না, কারণ তাঁহার দিগের কর্ণ-কুহরে এবিষয়ের ধ্বনি কখনই ধ্বনিত হয় নাই; সুতরাং অপরিচিত বিষয়ে পরিচিত হওনে উপদেশের অপেক্ষা করে। যে কোন ব্যাপার হউক, তাহার প্রথা ও প্রণালী পরিজ্ঞাত না হইলে তৎপ্রতি কখনই প্রীতি জন্মিতে পারে না। প্রগাঢ়রূপ প্রযত্ন পুরঃসর চিত্তকে তন্মধ্যে নিবিষ্ট করত স্থির ভাবে যত তাহার মর্ম্মানুধাবন করিবেন, ততই ভাবার্থ গ্রহণ করিয়া রসাস্বাদন করিতে পারিবেন।

অধুনা দূরস্থ মহাশয়দিগের কথা দূরে থাকুক, বঙ্গদেশস্থ সমস্ত নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই এ ব্যাপার প্রকৃষ্টরূপে পরিজ্ঞাত নহেন, ২৫ বা ৩০ বৎসর পূর্ব্বে যাহা হইয়াছিল, অধুনা যখন তাহাই লোপ হইয়া [৩] আসিতেছে, তখন বহুকালের প্রাচীন বিষয়ের প্রসঙ্গ করাই বিফল হইতেছে। আহা!

পূর্ব্বতন কবিগণ কি সকল আশ্চর্য্য কবিতাই রচনা করিয়াছিলেন। তৎসমুদয় অপ্রকাশ থাকাতে কি বিলাপের ব্যাপার হইয়াছে। এইক্ষণে সংগ্রহ করিয়া ব্যক্ত করা মহাবীর হনুমানের মহানাটক উদ্ধার করণের অপেক্ষাও কঠিন ব্যাপার দেখিতেছি, ইহা কোন রূপেই এক ব্যক্তির সাধ্যাধীন নহে, নরলোকে বাস করিয়া পরলোকে গমন করিতে না হইলে এক দিন সাহস করিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেও হওয়া যাইতে পারে। ব্রহ্মার-ন্যায় পরমায়ু কুবেরের ন্যায় ধন, ভীমের ন্যায় বল, বৃহস্পতির ন্যায় বিদ্যা, এবং কর্ণের ন্যায় দানশক্তি, এই কয়েকটীর একত্র সংযোগ হইলে কি হয় বলিতে পারি না, ফলে তাহা হইলেও সুসিদ্ধি কল্পে সন্দেহ হইতেছে, কেননা যাঁহারদিগের দ্বারা সংগ্রহ করিব এমত ব্যক্তির প্রায় অভাব হইয়াছে, যাহা হউক, যখন প্রবৃত্ত হইয়াছি তখন জীবন ও উত্থানশক্তি সত্বে কখনই প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিব না, যত দূর সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে পারি তাহাই করিব।

গত মাসিক পত্রের ১০ পৃষ্ঠায় ১ ও ২ স্তম্ভে এক গান প্রকাশ হয়।

যথা।

"ওলো সুধাংশু মুখি প্রাণ্, কি নূতন্ মান্ দেখালে ॥

তোমার হাসি শশিমুখে, কান্নাও আছে চোকে, বচনে মান্ রেখে প্রাণ্ জুড়ালে ॥"

[ইহার পাল্টা গীতের কিয়দংশ যাহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা প্রকটন করিতেছি, সকলে দৃষ্টি করুন।]

মহড়া।

তোমার মানের উপরে মান্, কোরে আজ্ মান্ বাড়াবো।

আমায় কাল্ যেমন কাঁদালে, পায়্ ধোরে সাধালে, আমি আজ্ তেম্নি কোরে কাঁদাবো।

চিতেন।

প্রাণ যে কোরেছ নিদারুণ্ মান্, সাধ্‌তে গেল আমার প্রাণ।

কোন ছুবি নই, তবু সকল সই, প্রেম্ সম্বন্ধে মান্নমান্ ॥

কেমন কোরেছ পীরিতে পদানত।

সঁপিলাম ধন প্রাণ্, তবু মন্ পাইনে প্রাণ্, অপমান্ প্রাণে সব কত ॥

কর কথায় কথায় দ্বন্দ, কেমন্ কপাল মন্দ, গোবিন্দ জুড়ান তো প্রাণ্ জুড়াবো।

[এই গানের সকলাংশ না পাওয়াতে যেরূপ দুঃখিত হইয়াছি তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করিবার নহে।]

গত ১লা আশ্বিনের পত্রে ১১ পৃষ্ঠায় প্রথম স্তম্ভে লিখিত হয়।

যথা।

"সখি, বল্‌ব কি, এ দুখিনীর এ জ্বালা বারমাস।
গেল চিরকাল কাঁদিতে, বসন্ত কি শীতে হয়েছে যেন সীতের বনবাস॥"

অনেক চেষ্টা করিয়া ইহার প্রায় সমুদয় ও দ্বিতীয় গানের কিয়দংশ সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিলাম।

যথা।

মহড়া।

সখি বল্‌ব কি এ দুখিনীর এ জ্বালা বারোমাস।
গেল চিরকাল কাঁদিতে, বসন্ত কি শীতে, হোয়েছে যেন সীতের বনবাস॥
যদি কই, তবেই সই, সর্ব্বনাশ।

* * * * *

চিতেন।

ভাল্ শুভক্ষণে, তাতে আমাতে, এক্ রজনী দেখা সই।
তারপর্ আমিই বা কে, সেই বা কে, কর্ম্মে পাওয়া গেল কই॥
কেমন্ হোয়েছে দৃষ্টি পোড়া সার।
চক্ষে দেখতে পাই, দুঃখে মোরে যাই, করে না সাপক্ষ ব্যাভার॥
আমি লজ্জা খেয়ে যদি, করি সাধ্যসাধি, উল্‌টে সে করে আমায় উপহাস॥

অন্তরা।

সই। আগে ছিলাম্ সুখে নব বালিকে, এখন সে কলিকে ফুট্‌লো।
মধুব্রতী হেরে বঁধু বিগুণ, দ্বিগুণ আগুন জ্বোলে উঠ্‌লো॥

চিতেন।

পূর্ণ ষোলকলা, ষোড়শী বালা, যৌবন ধরা নাহি যায়।
কৃষ্ণপক্ষে যেন দিনের দিন্, হোচ্ছে কলানিধি ক্ষয়॥

আমার এ ধনের সম্ভোগী যেজন্।

কল্লে না রক্ষে, সঁপে বিপক্ষে, আগুনে যেড়ায় পরের ধন্॥

রেখে একলা অবলারে, বিরহ বাসরে, করে সে পরের সঙ্গে সহবাস॥

গত ১ আশ্বিনে এই গীতের কেবল মহড়া মাত্র সংগ্রহ হইয়াছিল, অন্ত চিতেনের সমুদয় মহড়ার কিয়দংশ ও অন্তরা এবং অন্তরার চিতেনের সমস্ত কথা, ও দ্বিতীয় গীতের চিতেন মহড়া সংগ্রহ করত প্রকটন করিলাম, এতৎপাঠে তাবতেই পুলোকিত হইবেন, এই দুই গীতের যে যে অংশ গুপ্ত রহিল, বোধ করি বন্ধুগণের গুপ্ত সাহায্যে ভবিষ্যতে তাহা গুপ্ত রহিবে না।

ঐ গীতের পাল্টা।

মহড়া।

প্রাণনাথেরে প্রাণসখি তোম্‌রা কেউ বুঝাও॥

আমি বোল্লে তো শুন্‌বেনা, স্বভাব দোষ ছাড়বেনা, বোলবোনা কোথা যেও না যেও।

যৌবন যায়, একবার তায় শুনাও॥

কেমন্ পোড়েছি বিষ-নয়নে তার্।

ফুটল এ মুকুল, হয় না অনুকূল, ভ্রান্তে কি মাসান্তে একবার॥

থাক্তে বর্ত্তমানে পতি, সতীর এ দুর্গতি, পারতো সকল জ্বালা ঘুচাও।

চিতেন।

বুঝলাম মনে মনে, কোকিলের গানে, ডুব্‌লাম কলঙ্কে এবার।

তেজ্‌লাম সকল সুখো ভোজে যায়, মোজলাম্ বিচ্ছেদে তাহার॥

আমি সাধে কি সাধিনে গো তায়।

দেখ্‌লে সই আমায়, শত্রু ফিরে চায়, সে যেন চোখের মাথা খায়॥

হোলো কি গুণে পরের বশ, ছেড়ে সে ঘরের রস, গোপনে দুটো কথা সুধাও।

[অতি সুন্দর, অতি সুন্দর।]

মহড়া।

মান্ যদি না রাখ প্রেমে মিথ্যা মজাবে।
কুলবালা, এ অবলা, শেষে ভেবে কি প্রাণ্ যাবে॥

*　　　*

[৪] চিতেন।

পীরিতে মজাতে সখা, দেওহে দেখা, দিনে শত বার।
কোরে প্রাণোপণ্, দিয়ে মন্, মন যোগাচ্ছ আমার॥
জানি পুরুষ পাষাণ অতি নির্দয়।
প্রাণ রমণী আমি করি কত ভয়॥
আমার এ প্রাণ্, তোমায় দিলে প্রাণ, শেষে আমারো কি হবে॥

[ইহার আর কিছুই পাই নাই।]

মহড়া।

যে কোরেছে যাহারো সহ পীরিতি ব্যাভার।
সেই সে বুঝেছে সখি মরম তাহার॥
পরেতে পরের মনো, কে পেয়েছে কার।
প্রণয় কারণে, উভয়ের দোষগুণ, না করে বিচার॥

চিতেন।

কামিনী পুরুষ মাঝে সই, আছে যত জন।
যে যাহার মন, কোরেছে হরণ॥
মান অপমান দেখ না, দোঁহে সদা করে অঙ্গীকার।

অন্তরা।

ওরে প্রাণরে। গরিমা নাহি প্রেমের দেহে।
প্রেমের অধীন হোলে সকলি সহে॥

চিতেন।

গুরুজন গঞ্জনা দেয়, না হয় দুখি।
সদা বাসনা প্রিয়তমেরে দেখি॥
দিনান্তরে দেখা না হোলে, মন প্রাণ দহে দোঁহাকার॥

[এই গীত মোহন সরকার গান।]

মহড়া

আমার প্রেম্ ভেঙ্গে প্রাণ, কার প্রেমে মঁপেছ।

এমন্ রসিকা নারী কোথা পেয়েছ ॥

বদন তুলে কথা কও হেসে। প্রাণ বুঝি আভাসে। তুমি ভালবাস কি, সে ভালবাসে ॥

তুমি যেমন্ সে কি তেমন, দুই সুজনে মিলেছ ॥

[ইহার অপরাংশ পাইলাম না।]

গত আশ্বিনের প্রথম দিবসীয় পত্রের ৪ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের প্রকাশিত।

"গিরি গাতুল হে, মা এলেন্ হিমালয়।"

এই সপ্তমীর পদ পূর্ব্বে পাওয়া যায় নাই, অধুনা সংগ্রহ পূর্ব্বক চিতেন ও মহড়া সম্বলিত অবিকল নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।

মহড়া।

ওহে, গিরি গাতুলহে, মা এলেন্ হিমালয়।

উঠ দুর্গা দুর্গা বোলে, দুর্গা কর কোলে, মুখে বল জয় জয় দুর্গা জয় ॥

কন্যা পুত্র প্রতি বাচ্ছল্য, তায় তাচ্ছল্য, করা নয়।

আঁচল ধোরে তোরা। বলে ছি মা, কি মা, মাগো, ও মা, মা বাপের কি এম্‌নি ধারা ॥

গিরি তুমি যে অগতি, বুঝেনা পার্ব্বতী প্রসূতির অখ্যাতি জগময় ॥

চিতেন।

গত নিশিযোগে আমি হে, দেখেছি যে সুস্বপন্।

এলোহে, সেই আমার, হারা তারা ধন্ ॥

দাঁড়ায়ে দুয়ারে। বলে মা কই, মা কই, মা কই আমার, দেও দেখা দুখিনীরে ॥

অম্‌নি দুবাহু পশারি, উমা কোলে করি, আনন্দেতে আমি আমি নয় ॥

অন্তরা।

মা হওয়া যত জ্বালা।

যাদের মা বল্‌বার আছে, তারাই জানে।

তিলেক্ না হেরিয়ে মর্ম্মে ব্যথা পাই, কর্ম্মসূত্রে সদা স্নেহে টানে ॥

চিতেন।

তোমারে কেউ কিছু বল্‌বে না, দেখে দারুণ্ পাষাণ্।

আমার লোক গঞ্জনায় যায় প্রাণ্॥

তোমারতো নাই স্নেহ।

এক্‌বার ধর ধর, কোলে কর, পবিত্র হোক্ পাষাণ্ দেহ॥

আহা এত সাধের মেয়ে, আমার মাথা খেয়ে, তিন্ দিন্ বই রাখে না মৃত্যুঞ্জয়॥

গত ১ আশ্বিনের পত্রে প্রকাশ হয়। যথা,

"যার ধন তারে দিলে প্রাণ্ বাঁচে প্রাণ সখি।"

এবারে এই গীতের চিতেন মহড়া সংপূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ করিলাম; অন্তরা না পাওয়াতে দুঃখ রাখিবার স্থান পাইলাম না।

মহড়া।

যার ধন্ তারে দিলে প্রাণ্ বাঁচে প্রাণ্ সখি।

হোয়ে পরধন গচ্ছিতে, প্রাণ যায় পরীক্ষে দিতে, যেমন অনলে পোড়ালে রাম্ জানকী॥

যে কণ্টক্, আমার পাড়ার লোক্, কবে কে, কবে কলঙ্কী।

আসার আশায় প্রাণ্ রেখে এত কাল।

মানেনা কালাকাল্, যৌবনের যৌবন্ কাল, আজ আমার অকালেতে সকাল্॥

আমার অঙ্গে কাল্ সঙ্গে কাল্, তায় কাল্ এ বসন্ত কাল্, হোলো তিন্ কালে নারী সারা চারা কি॥

চিতেন।

পেয়েছি পতিদত্ত নিধি, তায় বিবাদি বিপক্ষ ছজন।

মন্মথ না হয় মন্মত, সদাই সে আকুল করে মন॥

হোলো এইতো সুখ্ সতীত্ব রাখায়।

ভূপতি ধর্ম্মহীন, স্বপতি পরাধীন, যুবতী কার কাছে প্রাণ্ জুড়ায়॥

এই উভয় শঙ্কটে সই, দুই দিগে সারা হই, পতি ভাব্‌লেনা সতীর দশা হবে কি॥

[ইহার চিতেন ও মহড়ায় মন যে রূপ মুগ্ধ হইয়াছে, অন্তরা পাইলে না জানি আরো কতই হইত। আমরা অদ্য বাসরীয় প্রভাকরে ৺রাম বসুর প্রণীত যে সকল কবিতার অসংপূর্ণ অংশ প্রকাশ করিলাম, যে কোন মহাশয় কৃপা করিয়া সেই সকল কবিতা পূর্ণ করিয়া দিবেন, এবং আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা প্রাপ্ত হই নাই তাহা প্রেরণ করিবেন, আমরা কস্মিন্ কালে তাঁহার দিগের উপকার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না, সুতরাং চিরকালের নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা জালে জড়িত রহিব।]

মহড়া।

এ বসন্তে সখি, পঞ্চ আমার কাল্ হোলো জগতে॥
করে পঞ্চ দুখে দাহ, পঞ্চভূত দেহ, পঞ্চত্ব বুঝি পাই পঞ্চবাণেতে॥
[৫] পঞ্চ যাতনা প্রায়, নিশি পঞ্চ প্রহরেতে।
যদি পঞ্চামৃত করি পান। নাহি জুড়ায় প্রাণ। হৃদে বেঁধে পঞ্চবাণ॥
দেখ পঞ্চানন তনু ভস্ম কোরেছিলেন্ যার, এখন্ সেই দহে দেহ পঞ্চশরেতে।

চিতেন।

পঞ্চাক্ষর নাম, মকরধ্বজ, বিরহি রাজ্যে রাজন।
সহ সহচর, পঞ্চশর, রিপু্ হোলো পঞ্চজন॥
ভ্রমর্ কোকিলাদি পঞ্চশর।
রাজা পঞ্চশর।
অঙ্গে হানে পঞ্চশর॥
তাহে উনপঞ্চাশত, মলয় মারুত সই,
আবার ভানু দহে তনু পঞ্চযোগেতে।

অন্তরা।

সই গ্রহ প্রকাশিলে, পঞ্চম মঙ্গল, ফুল ঘ্রাণ যেন পঞ্চবাণ।
পঞ্চদশ দিনে হ্রাস বৃদ্ধি যার, তার কিরণেও দহে প্রাণ॥

চিতেন।

পঞ্চম দ্বিগুণ বদন যার, রাক্ষসের যে প্রধান।
তার চিতা সম জলিছে সখি, পঞ্চম দুখেতে প্রাণ॥
যদি বিপক্ষ দিগেতে চাই। পঞ্চ রিপু পাই। পঞ্চ সহকারি নাই।

কেবল পঞ্চম অসাধ্যে, পঞ্চ রিপুর মধ্যে সই, আমি থাকি যেন সখি পঞ্চতপাতে।

অন্তরা।

সই পঞ্চ পাণ্ডবেরা খাণ্ডব কানন, জ্বালায়ে ছিল যেমন্।
তেমতি এ দেহ জ্বলাচ্ছে সখি বসন্তের চর পঞ্চ জন ॥
পঞ্চম দ্বিগুণ, দ্বিগুণ কোরে, করিতে চাহি ভক্ষণ।
তাহে প্রতিবাদি, হয়গো আসি, প্রতিবাসি পঞ্চ জন্ ॥
বলে পঞ্চ রিপু গিয়েছে। প্রাণে সয়েছে। এ পঞ্চ কদিন্ আছে ॥
কিন্তু এ পঞ্চ যাতনা, প্রাণে আর সহেনা, সই, এবার পঞ্চ মিশায় বুঝি পঞ্চ ভাগেতে।

[এই গানের পাল্টা অপ্রাপ্য হইয়াছে। ইহার দোষ গুণ আমরা কিছু ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা করি না, পাঠক মহাশয়েরা পাঠ পূর্ব্বক ভাবার্থ ও মর্ম্ম গ্রহণ করিবেন।]

গত ১ আশ্বিনের পত্রের ৮ পৃষ্ঠায় তৃতীয় স্তম্ভে লিখিত হয়।

"আগে, প্রেম্ না হোতে কলঙ্ক হোলো ॥"

[পূর্ব্বে এই গান সংপূর্ণরূপে পাওয়া যায় নাই, এবারে অনেক যত্নে সংগ্রহ করিয়াছি, একারণ পাঠক ও গায়কগণের সুযোগার্থ শুদ্ধরূপে তদবিকল নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।]

যথা।

মহড়া।

আগে প্রেম্ না হোতে কলঙ্ক হোলো।
বিধি ঘটালে উদ্যোগে দুর্যোগ,
প্রেমের আশা না পূরিলো ॥
উপায় এখন্ কি করি বলো ॥
তুমি এ পথে এলে।
করে কুরব, কুচক্রি সকলে ॥
দিনান্তরে দিতে দেখা, বুঝি সখা, তাহা ঘুচিলো।

চিতেন।

না হোতে তোমার সহ, সুখ সংঘটন।
জানাজানি কাণাকাণি, করে রিপুগণ॥
নয়নেরি মিলনে।
এত প্রমাদ হবে তা কে জানে॥
না পেলেম্ প্রাণ্ জুড়াইতে, লাভে-হোতে, দুকূলো গেলো।

অন্তরা।

কোরে সাধ্, এত পরিবাদ, সয়্ কি অবলার্।
ঘরে পরে মন্দ বলে, কত সব আর্॥
না করিতে চুরি, লোকে চোর্ বলে আমায়।
মনের কথা, মর্ম্মের ব্যথা, প্রকাশ করা দায়॥
মনে মনাগুণ দয়।
যেন বোবের স্বপন সম হয়॥
গুমুরে গুমুরে বঁধু, হৃদের মধু, হৃদে শুখালো।

[অতি চমৎকার! এমত আশ্চর্য্য রচনা প্রায় দেখা যায় না। কবিওয়ালার মধ্যে এবম্ভূত সুন্দর গীত কেহই প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। ইহার তৃতীয় গানের কিয়দংশ সংগ্রহ করিয়া সর্ব্বশেষে প্রকাশ করিলাম।]

মহড়া।

আজ্ শুন্‌লাম সই, প্রাণনাথের প্রাণনাথ্ আছে একজন্।

সময়ের দোষে, হোলো কর্ত্রীহোয়ে কর্ত্তা সে, এখন্ সেই ফাঁদে পড়েছেন্ আমার সাধের ধন্॥

সদা ভারি, আজ্ঞাকারি, প্রাণনাথ এখন্।
সে যে সিংহবেশে সর্ব্বনাশী।
করে গ্রাস, প্রাণনাথ্‌কে যেমন, রাহুতে গ্রাসে শশী।

নূতন্ কুমদ পেয়ে সুখে আমোদ করেন্ তিনি, আমার প্রাণচকোরের হোলো হুতাসে মরণ॥

চিতেন।

আমি জামি আমার প্রাণনাথ্ আমারি বশীভূতো।
এখন কেমন্ কেমন্ দেখি সই, আগে জানিনে এতো॥
যখন্ নূতন পীরিৎ আমার সনে।
এ পথে, বঁধু আস্তো যেতো, চেতনা কারোপানে॥
এখন্ সে পথ্ পেয়ে সখা, এপথ গ্যাছেন্ ভুলে, আমি মাসান্তে ঘরে পাইনে দরশন॥

[ইহার অন্তরা ও দ্বিতীয় গান প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, এজন্য অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছি।]

মহড়া।

শুনি, নাম বসন্ত, তার আকার কেমন্।
তারে দেখ্লে পরে সই, মনের বেদনা কই, মনে মনে এসে কেন, করে মন্ হরণ॥
যার জ্বালাতে জ্বলি তার, পাইনে দরশন।
অদর্শনে অবলার দহিছে পরাণ্।
নাজানি কি প্রমাদ ঘটে, দেখ্লে সে বয়ান॥
কি দুরন্ত, সে বসন্ত সই, অশান্ত কোরেছে, আমায় বিনে আলাপন॥

চিতেন।

বসৎ করি রাজ্যে যার, জন্মে তার দেখা পেলেম্ না।
ভূপতি সতির। দুঃখ ভাব্লে না॥
কার করেতে যোগাই কর্ ভাবি নিরন্তর।
সদা স্মর হেঁনে শর করে জরজর॥
সেনাপতি সঙ্গে ফেরে তার, দুরন্ত কৃতান্ত সম অনঙ্গ মদন॥

অন্তরা।

সখি যার প্রতাপে, অঙ্গ কাঁপে, মনে কত ভয়।
এলো এলো, দেখা হোলো, এমনি জ্ঞান হয়॥

[৬] চিতেন।

ছিল যে রাবণসুতো, ইন্দ্রজিতো, ছিল রামো নাম।
লুকায়ে সখি, করিত সংগ্রাম॥
সেই মত কি ঋতুরাজ শিখেছে সন্ধান্।
মায়ামেঘে কায়া ঢেকে, হৃদে হানে বাণ্॥
লুকি যুদ্ধ কোরে কেন সে, বিরহিণী নারীর প্রাণো করে বিমোচন।

[এই গীতটি যেমন উৎকৃষ্ট ও শ্রুতি সুখকর, ইহার পাল্টাও সেই প্রকার উত্তম, কিন্তু অনেক যত্ন করিয়া তাহা সংগ্রহ করণে অক্ষম হইলাম। এজন্য আমরা নৌকাপথে বহুদূর পর্য্যন্ত গমন করিয়া বহুজনের উপাসনা করিয়াছি, যে মহাশয় জ্ঞাত আছেন কোন ক্রমেই তাঁহার সহিত সাক্ষাতের সংযোগ হইল না, তিনিই যদি কিঞ্চিৎ দয়া পূর্ব্বক শ্রম করিয়া লিখিয়া পাঠান, তবেই মানস সুসিদ্ধ হইতে পারে নচেৎ যাবজ্জীবনের জন্য মনের দুঃখ মনেই রহিবে।]

গত ১ আশ্বিনের প্রভাকরে ৯ পৃষ্ঠায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্তম্ভে প্রকাশ হয়।

যথা।

"থাক্‌রে প্রাণ্। বিচ্ছেদে প্রাণ আমারি গেল গেল।

যত সুহৃৎ ভাঙ্গা লোকের কুরীৎ মন্ত্রণায়, সাধের পীরিৎ ভেঙ্গে তুমি আছোতো ভাল।"

অনেক কষ্টে এই গীতের পাল্টা গান সংগ্রহ পূর্ব্বক নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম, সকলে অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন।

মহড়া।

বাঁচ্‌লাম প্রাণ্। বিচ্ছেদ কোরে ঘুচালে বিচ্ছেদের ভয়॥

আগে ভেবেছিলাম পীরিৎ ভাংলে যাবে প্রাণ, এখন্ বাঞ্ছা করি যেন নিত্যি এমনি হয়।

একবার পোড়েছে রে পতঙ্গ হে, তার আতঙ্ক কি কম॥
যখন অখণ্ড ছিল পীরিৎ।
ও আতঙ্ক হোতো, ভঙ্গ হোলে হব এ সুখে বঞ্চিত্॥

এখন ভাঙ্গা শঙ্কা যায়, ভেঙ্গে গ্যাছে তায়, আমি এক্ বাঁচকে গোলাম প্রেমের পরিচয়।

চিতেন।

যে অনলে আমায় পোড়ালে তুমি কি তায় পুড়্বে না।
যার দোষে প্রেমো যাক্ ভেঙ্গে, তাতো গড়ে না ॥
প্রেমের ধাঁধা থাকে যত দিন।
বাঁধা থাক্তে হবে সমভাবে হোয়ে অধীনের অধীন।
সখা নাই কোন সন্দ, কি আছে দ্বন্দ্ব, আমার কোমল প্রাণে এখন্ সকল জ্বালা সয় ॥

অন্তরা।

আমি দেখেছি, শিখেছি, সতর্কে আছি, আর্ তো ভোগায় ভুল্‌ব না।
না এলে তুমি, এখন আর আমি, পায়ে ধোরে সাধ্‌ব না ॥

চিতেন।

আভাঙ্গা পীরিতের যত ভয়, ভাংলে তত থাকে না।
অলি দেখে কলির ত্রাস্ ধরে, ফুট্‌লে ছাড়ে না ॥
এখন্ নই আমি সে কলিকে।
সকল দেখে শিখে, হোয়েছি হে প্রেমে বড় ব্যাপিকে ॥
পারি সাঁতারে সাগর্, পার্ হোতে নাগর্, কাণ্ডারী যদি হে মনের মত হয়।

এই গীতটি সর্ব্বাংশেই সুন্দর।

মহড়া।

ঘরের ধন্ ফেলে প্রাণ্, পরের ধন্‌কে আগুলে বেড়াও।*
নাহি জান ঘর্‌বাসা, কি বসন্ত, কি বরষা, সতীরে কোরে নিরাশা, অসতীর আশা পুরাও ॥
রাজ্য পেয়ে ভার্য্যের প্রতি, কর্ম্মেতে লুকাও।
যেমন্ প্রাণ হে সত্যবাদী।
আমি তেমনি কর্ম্মনাশা নদী।
ছুঁলে পরে কর্ম্ম নষ্ট হয় যদি ॥
আমি সতী হোয়ে কমি পতির মান্যমান্, তুমি অস্ত কূলে গিয়ে জীবন জুড়াও ॥

*এই গানটি রাম বসুর কিনা সন্দেহ। 'আনুষঙ্গিক তথ্য' অংশ দ্রষ্টব্য।—স.

চিতেন।

দৈব যোগে যদি এপথে, প্রাণ্ করেছ আজ্ অধিষ্ঠান্।

গেল দুখ্, হোলো সুখ, দুটো দুখের কথা বলি প্রাণ্॥

তোমার মন্ হোলো বার্ বাগে।

গেল চিরকাল ঐ পোড়ারোগে।

আমার সঙ্গে দেখা দৈব যোগাযোগে॥

কথা কর্চ্ছ হে আমার সনে, মন্ আছে সেখানে, মনে কর সখা, পাখা পেলে উড়ে যাও।

ঐ দিবসের পত্রে প্রকাশ পায়।

যথা।

"হায়রে পীরিতি তোর্ গুণের বালাই নে মরি।"

পূর্ব্বে এই গান অসংপূর্ণরূপে প্রকাশ হইয়াছিল, অধুনা সমুদয়াংশ প্রকাশ করিলাম।

মহড়া।

হায়রে পীরিতি তোর্ গুণের বালাই নে মরি।

যখন্ যারে পাও, তার সুখো দুখো সব্ ঘুচাও, ভুল সিংহাসনে কর পথের ভিকারী॥

তোমার তরে সদা ঝোরে হে, কি পুরুষ, কি নারী।

এক্‌বার যার সঙ্গে যার পীরিৎ হয়।

সে তার নয়ন্ তারা, আর কিছুই কিছু নয়।

ভাবি জন্মে যারো মুখো না দেখিব আর, আবার দেখা হোলে তার সেই চরণে ধরি॥

চিতেন।

কি ক্ষণে এ প্রেমে লাগ্‌লো প্রেম, আমি জন্মে ভুল্‌তে প্যারিনে।

দুখো ভোগ্ অনুযোগ্, তবু না দেখলে তো বাঁচিনে॥

কেমন্ কোরে রেখেছিল্ আমায়।

তারে না দেখ্‌লে প্রাণ, আর কোথাও না জুড়ায়॥

মন স্বর্গপথে যেতে স্বর্গ মানে না, আমি চতুর্ব্বর্গ কম্ সেই চাঁদবদন হেরি॥

অন্তরা।

হায়, প্রেমের প্রেম্ জনে উদয় হোলে, সাধ্য কি বাহ্য রাখি।
তিলেকো না হেরে, বিরহ বিকার, পলকে প্রলয় দেখি।

চিতেন।

প্রেম-সুধা পানো, যে করে, তারো নাহি থাকে কোন খেদ।
[৭] সপক্ষ, বিপক্ষ, প্রেমে শত্রু মিত্র নাহি ভেদ্॥
নাই উঠ্‌তে বস্‌তে শক্তি যার।
শুনে প্রেমের্ কথা, যায় সাত্ সমুদ্র পার॥
প্রেমে বোবার কথা শুনে কানায় চক্ষু পায়, আবার পঙ্গু এসে হেসে লঙ্ঘায় গিরি॥

[অনেক অন্বেষণ করিয়া ইহার দ্বিতীয় গান প্রাপ্ত হইলাম না।]

রাম বসু প্রথমে নীলু ঠাকুরকে যে সকল সখীসংবাদ প্রদান করেন, তাহা সর্ব্বতোভাবেই উত্তম, তচ্ছ্রবণে মোহিত না হইয়াছেন এমত ব্যক্তি কেহই নাই, আমরা কোন কোন ব্যক্তি নিকট হইতে তাহার কয়েকটী গীত বহু যত্নে সংগ্রহ করত প্রকটন করিতেছি, পাঠকগণ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে অশেষানন্দ লাভ করিবেন।

যথা। মহড়া।

ওহে, এ কালো, উজ্জ্বলো, বরণো তুমি কোথা পেলে।*
বিরলে বিধি কি নির্ম্মিলে॥
যে বলে, সে বলে, বলুকো কালো।
আমার নয়নে লেগেছে ভালো॥
বামা হলে শ্যামা বলিতাম্ তোমায়, পূজিতাম্ জবা বিল্বদলে॥

চিতেন।

আরোতো আছে হে, অনেকো কালো, এ কালো নহে তেমন্।
জগতের মনোরঞ্জন্॥
না মেনে গোকুলে কুলেরো বাধা।
সাধে কি শরণো, লয়েছে রাধা॥
জনমের মত ঐ কালোচরণে, বিকায়েছি, হে বিপিনমূলে॥

---

* [illegible]

অন্তরা।

ওহে শ্যাম্, কালো শব্দে কহে কুৎসিতো, আমার এইতো, জ্ঞান ছিলো।
সে কালোর কালত্ব গেল হে কৃষ্ণ, তোমারে হেরে মনো॥

চিতেন।

এখনো বুঝিলাম্ কালোরো বাড়া, সুন্দরো নাহিকো আর।
কালো রূপ্ জগতের সার॥
ত্রিলোকে এমন্ আর, নাহিকো হেরি।
ও রূপের তুলনা কি দিব হরি॥
কালোরূপে আলো করেছে সদা, মোহিতো হয়েছে সকলে॥

অন্তরা।

একো কালো জানি কোকিলো, আরো ভ্রমরায় কালো বরণ।
আরো কালো আছে, জলো কালিন্দীর, কালো তো তমালো বন্॥

চিতেন।

আরো কালো দেখো, নবীনো নীরদ, ছিলহে দৃষ্টান্ত স্থল্।
কালোতো নীলকমল্॥
সে কালোর কালত্ব দেখেছ সবে।
প্রেমোদয়, অশ্রু হয়, কায়ে না ভেবে॥
তোমারো মতনো, চিকণো কালো, না দেখি ভুবন মণ্ডলে॥

[হে ভাবকগণ! এই কবিতা-চাঁদের সুধা পান করিয়া সমুদয় ক্ষোভ ক্ষুধা নিবারণ কর।]

মহড়া।

জলে কি জলে, কি দোলে, দেখগো সখি, কি হেলে হিল্লোলেতে।*
পারিনে স্থির্ নির্ণয় যে করিতে॥
শ্যামলো কমলো ফুটেছে বুঝি, নির্মলো যমুনা জলেতে।

---

*প্রাচীন কবিসংগ্রহে (পৃ ১৮) এই গানটি [illegible], গাওনা হয়েছিল' ভবানী বণিকের বলে। শ্রীভিটীতিতে (১২০৭ সং) ভবানীর বলেই লিখিত।—স.

চিতেন।

নিতি নিতি লই এই, যমুনার জল সখি।
জল মধ্যে কি, আজ্ একি দেখ দেখি॥
জলে কি এমনো, দেখেছ কখনো, বল দেখি ওগো ললিতে॥

অন্তরা।

সই দেখ দেখি শোভা, কিসের আভা, হেরি জলো মাঝেতে।
প্রস্ফুটিত্ তমালো, বৃক্ষ যারো কালো, ঐ ছায়া কি ইথে॥

চিতেন।

আরো সখি কালোচাঁদ্ কি আছে।
গগন মণ্ডলে, কি পাতালে রয়েছে।
বল দেখি সখি, কালোচাঁদ কি, উদয় হয় বসেতে

ঐ গীতের পাল্টা গানের কিয়দংশ।

মহড়া।

ওগো, চিনেছি, চিনেছি, চরণো দেখে, ঐ বটে সেই কালিয়ে।*
চরণে চাঁদ্ ছাঁদ্, আছে দীপ্ত হোয়ে॥
যে চরণ ভোজে ব্রজেতে আমায়, ডাকে কলঙ্কিনী বলিয়ে।

চিতেন।

ভুবনো মোহনো, না দেখি এমনো, ঐ বই।
রূপ্ কি অপরূপ্, রসকূপ, আমরি সই॥
কুলে শীলে কালী দিয়েছি আমি, কালো রূপ্ নয়নে হেরিয়ে।

[রাম বসুর কৃপায় নীলু ঠাকুর এই দুই গীতেই নাম বিখ্যাত করেন। যদি চাঁদের সুধায় মিষ্টতা না থাকে তথাচ ইহার মিষ্টতার হানি কিছুতেই হইতে পারে না।]

মহড়া।

ওগো কৃষ্ণ কথা কবে যদি, ধীরে ধীরে কও, কেউ যেন না শোনে।
ও নামে বিপক্ষ বহু আছে এখানে॥
কহিতে বাসনা থাকে, বোলো আমার কাণে কাণে।

---

*প্রীতিগীতিতে (১২৩৫ সাং) হরুর নামে উল্লিখিত।—স.

চিতেন।

আলস্থক্রমেতে, ভ্রমেতে, করি কৃষ্ণ রব।
ও নামেতে খড়্গহস্ত, আমার প্রতি সব॥
হিরণ্য কশিপু রাজ্য, হয়েছে এই বৃন্দাবনে।

[নীলু ঠাকুর এই সকল সখী সংবাদে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, রাম বসু আপনার নবাঙ্কুরাগের সময়ে উক্ত ঠাকুরকে সকল নবাঙ্কুরাগের কৃষ্ণ বিষয় প্রদান করিয়াছিলেন। এ গানের অপরাংশ ও পাল্টা সংগ্রহ করণে অক্ষম হওয়াতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলাম।]

মহড়া।

দেখো কৃষ্ণ তুমি ভুলনা।
আমি কালো ভালবাসি বোলে আমায় ভাল কেউ বাসেনা।
আমারে শ্রীচরণে ঠেলনা।
নাই কোনো সম্পদো আমার, কেবল দিবে নিশি ঐ ভাবনা॥

চিতেন।

আমি তব লাগি, সর্ব্বত্যাগী, হোলেম্ কালাচাদ;
[৮] রটালে গোকুলে, কালা পরিবাদ্॥
আমারে যে আমার বলে শ্যাম্, এমন দুখের দোষের্ কেউ মেলে না।

[হায়! জগদীশ্বর এমত লোকের প্রাণ হরণ করিলেন। এই গীত মোহন সরকার গাহিয়াছিলেন।]

মহড়া।

মথুরার বিকিতে যেতেগো বড়াই।
ভালো আর্ কি পথো নাই॥
জানতো এ পথের দানী, লম্পটো কানাই।
যারে ডরাই তাই ঘটে।
আনিলে তারি নিকটে॥
আপন্ জোরে যৌবন লোটে, না মানে দোহাই

চিতেন।

কি করিলে, কি করিলে, আনিলে কোথায়।
দাঁড়ায়ে কে গো, কদম তলায়॥
দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গ ছাঁদে।
না জানি কি বাদ্ সাধে।
মরি যায়ো পরিবাদে, ঘটে পাছে তাই॥

[রাম বসুর কৃত এই সখীসংবাদ মোহন সরকার গাহিয়াছিলেন, ইহার অন্তরা ও পাল্টা গান সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। এই গীতের বয়স ৫০ বৎসরের অধিক হইবে।]

মহড়া।

কেন আজ্ কেঁদে গেল বংশিধারী।*
বুঝি অভিপ্রায়, বঁধু ফিরে যায়, সাধের্ কালাচাঁদকে কি বোলেছ ব্রজকিশোরী॥

*　　*　　*

চিতেন।

রাধাকুঞ্জে দ্বারী হোয়েছিল গোপিকায়।
শ্যামের দশা দেখে এলেম্ রাই, সুধাই গো তোমায়॥
মণিহারা ফণি প্রায়, মাধব তোমার।
প্রিয় বাঁশী বোলে বদন্ তুলে, চাইলেনা একবার॥
শ্রীমুখে শ্রীরাধা নাম, গলে পীতবাস, দেখে মুখো, ফাটে বুকো, আমরি মরি॥

[অনেকেই কহেন এই গীত রাম বসু প্রস্তুত করিয়াছিলেন কিন্তু এই গান তিনি নিজ দলে গান করেন, কি দল করিবার পূর্ব্বে অন্য কোন দলে দিয়াছিলেন তাহার নির্ণয় করিতে পারিলাম না, কিন্তু অনুমান হইতেছে তাঁহার দল করণের পূর্ব্বে এই গীতটী হরু, নীলু ঠাকুর, নর ঠাকুর দাস সিংহ গাহিয়াছিলেন।]

---

*"এই গানটি পুস্তক বিশেষে কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্যের বলিয়া লিখিত হইয়াছে।"—বাঙ্গালীর গান, (পৃ ১৫৩)। প্রীতি-গীতি (১৭৩৩ সং) ঈশ্বরগোস্বামী (পৃ ১৬৮) এবং কবিওয়ালাদিগের গীত সংগ্রহে (পৃ ১৭) রচয়িতা রাম বসু—।

[illegible] [illegible] পত্রে প্রকাশ হয়।

"শ্যাম কাল্ মান্ কোরে গ্যাছে, কেমন আছে, দূতি দেখে আয়।"

এই গীতের সমুদয়াংশ ও পাল্টার কিয়দংশ প্রাপ্ত হইয়া তদ্রূপে নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

মহড়া।

শ্যাম কাল্ মান কোরে গ্যাছে, কেমন আছে দূতি দেখে আয়।

কোরে আমারে বঞ্চিতে, গেল কার কুঞ্জে বঞ্চিতে, হোয়ে খণ্ডিতে মরি হরি প্রেমের দায়॥

ছলে আমার মন ছলেছে।

আগে বুঝ্‌বে মন্ দূরে থেকে। চোখে দেখেগো। কয় কি, না কয়্ কথা ডেকে॥

যদি কাতরে কথা কয়, তবে নয়, অপ্রণয়, অম্‌নি দেখোগো ধোরে দুটি রাঙ্গা পায়॥

চিতেন।

সাধ্ কোরে কোরেছিলাম্ দুর্জ্জয় মান, শ্যামের তায় হোলো অপমান।

শ্যাম্‌কে সাধ্‌লেম্ না, ফিরে চাইলেম্ না, কথা কইলেম্ না রেখে মান্॥

কৃষ্ণ সেই রাগের অনুরাগে। রাগে রাগে গো। পড়ে পাছে চন্দ্রাবলীর নব রাগে॥

ছিল পূর্ব্বের যে পূর্ব্ব রাগ, আবার এ কি অপূর্ব্ব রাগ, পাছে রাগে শ্যাম্ রাধার আদর ভুলে যায়॥

অন্তরা।

যার মানের মানে আমায় মানে। সে না মানে। তবে কি কার্য্যে এ মানে॥

মাধবের কত মান্, না হয় তার পরিমাণ্, মানিনী হয়েছি যার মানে॥

চিতেন।

যে পক্ষে যখন্ রাড়ে অভিমান্ সেই পক্ষে রাখ্‌তে হয় সমান।

রাখ্‌তে শ্যামের মান, গেল গেল মান, আমার কিসের মান্, অপমান॥

এখন্ মানাতে প্রাণো জলে। [illegible] [illegible] গো। [illegible] কি [illegible] [illegible] জলে॥

[illegible]

ইহার পাল্‌টা গানের কিয়দংশ প্রকাশ করিলাম।

মহড়া।

কর্ণ্ডে রাধার মানো রক্ষে, উভয় পক্ষে, যেন মানো রয়।
কোরে এ পক্ষে পক্ষপাত্‌, যে পক্ষে যাক্‌ রাধানাথ, জানি প্রেম্‌ পক্ষে শ্যাম্‌ আমার বিপক্ষ নয়॥

* * * *

শ্যামের আদর মাখা অঙ্গ। সে ত্রিভঙ্গ গো।
আদর বাড়ায় মান্‌ তরঙ্গে ঢেলে অঙ্গ॥
আমরা যখন্‌ যে মান্‌ করি, আছে তায় পায় ধরাধরি, সখি আজ্‌ কিছু রাধার আদর নূতন নয়॥

চিতেন।

সাধে কি সাধ্‌তে বলি মাধবে, সরল স্বভাবে কাঁদে প্রাণ।
এমন্‌ হয়গো হয়, আমা বোলে নয়, প্রেমে সবাই সয়, অপমান্‌॥
সখি আমার মান্‌ গেল গেলো। জানা গেলোগো,
বংশিধারির মান্‌ থাকে তা হোলেই ভালো॥

* * * *

[রাম বসু এই দুই গীত প্রস্তুত করিয়া এক মাস পরেই প্রাণত্যাগ করেন। এ গীত সর্ব্বতোভাবেই উৎকৃষ্ট, ইহার সমুদয় প্রাপ্ত হইলে সুখের পরিসীমা থাকিবেক না।]

মহড়া।

এত ভৃঙ্গ নয়, ত্রিভঙ্গ বুঝি, এসেছে শ্রীমতীর কুঞ্জে।
গুণো গুণো স্বরে কেনো, অলি শ্রীরাধার শ্রীপদে পুঞ্জে।
কৃষ্ণ বই, কে আর্‌ বল্‌তে পারে সই, শ্রীরাধার রাস কুঞ্জে।
জানি শ্রীমুখে বোলেছেন্‌ শ্রীকান্ত।
গীতা যোগ মধ্যে, তিনি ঋতুর মধ্যে বসন্ত।
[১] আরো পতঙ্গেরি মধ্যে, কৃষ্ণ ভৃঙ্গরাজ, নেলে ও কেন ও রস ভুঞ্জে।

[illegible]।

[illegible] গোপিকায়, কেন প্রাণ [illegible]।

[illegible] মাধব [illegible]।

দেখ তমালে কোকিলে বোসে ঐ।

মনেরো আনন্দে, শ্রীগোবিন্দে, ডাকিতেছে সই॥

আরো কমলিনীর কমল্, চরণে ধোরে, সুখে গানো করে অলিপুঞ্জে।

[নিজ দলে এই গান গান, ইহার অন্তরা ও পাল্টা প্রাপ্ত হইলাম না।]

মহড়া।

আছে খৎ নে পথে বোসে, কে রমণী সে, শ্যাম্ কি ধারো কিছু তার।

হোয়ে আমাদের ভূপতি, ওহে যদুপতি, কোটালি কোরেছিলে কোন্ রাজার॥

প্রেমধার্ ধার তুমি কার।

খতে লেখা রয়েছে ও শ্রীহরি।

খাতক্ত্রিভঙ্গ শ্যাম, মহাজন শ্রীরাধাপ্যারী।

মনে আতঙ্ক করি ঐ, ত্রিভঙ্গ শুন কই, তোমা বই, ঢেরাসই আর্ হবে কার॥

চিতেন।

*　　*　　*　　*　　*

ওহে গোবিন্দ মনে সন্দ হোতেছে।

দিয়েছ দাসখৎ তুমি কোন্ রমণীর কাছে।

*　　*　　*　　*　　*

মহড়া।

দেখ্‌বে কেমন্ সুন্দরী কুবুজা।

তোদের রাজা যে, নিজে বাঁকা, সে,

নূতন রাণী যে হোয়েছে বাঁকা কি সোজা॥

মহড়া।

রাধার মান্ তরঙ্গে কি রঙ্গ।

কমল্ ভাসে, কুমুদ হাসে, প্রমোদ রসে ডুবেছে শ্যাম্ ত্রিভঙ্গ।

মহড়া।

ভঙ্গি বাঁকা যার, সেই কি রাধাখ্যানে পায়।

আমরা সোজা মন্ পেয়ে সই, কুব্জার মন পেয়েছে কই, মিলো সেই বাঁকায় বাঁকা কুবুজায়॥

[পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে কেহ উক্ত কয়েকটি সখী-সংবাদের সমুদয় ভাগ প্রেরণ করিলে আমরা পরম বাধ্যতা স্বীকার করিব।]

মহড়া।

প্রাণ রে প্রাণ। এমন পীরিৎ থাকায় না থাকা॥

তোমার পরের কাছে পরম সুখ, পথে যেতে হাস্য মুখ, আমার সঙ্গে দেখা হোলে বদনো বাঁকা।

দায়ে পোড়ে প্রাণ্ নাথ হে, দিওছ দেখা॥

দেখা হোলে, সখা বোলে, আদরে ডাকি।

তুমি বল ভাল তো জ্বালা, এ পাপ আবার কি॥

পথে দেখে, নয়ন্ ঢেকে, পলাও ছুটে, যেন পিঠে, বেঁধেছ পাখা॥

[এই গানের চিতেন ও অন্তরা পাইলাম না, ইহাতে যে দুঃখ তাহা লিখিয়া কি জানাইব। ইহার পাল্‌টা গানের কেবল মহড়াটী প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ করিলাম।]

মহড়া।

এ ভাবের ভাব্ রবে কতদিন্।*

তুমি প্রাণ্ পণে মন্ যোগাওনা, পরিত্যাগো করনা, আমি যেন হোয়ে আছি জালে গাঁথা মীন্॥

[এই গানের আশ্চর্য্য রচনার গুণ ব্যাখ্যা করিতে পারি না। বাল্যকালে শ্রবণ করিয়াছিলাম, তখন এত গৌরব জানিতে পারি নাই, একারণ স্মরণ না রাখাতে এইক্ষণে আক্ষেপের অধীন হইতে হইল।]

পূর্ব্বে নিম্নস্থ গীতের সমুদয় পাই নাই, এবারে সংপূর্ণ পাইয়া পুনর্ব্বার গ্রন্থস্থ করিলাম।

---

* প্রীতিগীতিতে (১১৫৩ নং) চিতেন দেওয়া আছে।—স.

মহড়া।

ভাব্ দেখে করি অনুভাব্, ভাব বুঝি ফুরালো।

দিনের দিন্, রসহীন্, হোলে প্রাণ, আছ সেই তুমি, তোমার প্রেম লুকালো॥

একি ভাব্, গ্যাছে পূর্ব্বের সে সব ভাব্, অভাবে ভাব মিশালো।

তোমায় লোকে কয়, রসময়।

মিথ্যা নয়, সে রস্ পরের কাছে হয়॥

ঘরে এলে মুখ যেন সে মুখ নয়।

তোমার আমার কাছে ভ্রান্তি, হয় শিরে সংক্রান্তি, যেন শান্তি শতকেতে পাঠ এগুলো॥

চিতেন।

সেই তুমি, সেই আমি, সেই প্রণয়, নূতন নয় পরিচয়।

তবে প্রাণ, হোলে রসের অনুষ্ঠান, বিরস বদন্ কেন হয়॥

পেলেম্ ব্যাভারে পরীক্ষে।

ওরে প্রাণ, তোমার অযাচক ভিক্ষে॥

চক্ষে রেখে চাওনা পোড়া চক্ষে।

এখন্ সদাই বদন্ বাঁকা, হোলে পর দেখা, সে সব্ শশিমুখের হাসি কমনে গেলো।

অন্তরা।

প্রাণ যে মনে ভুলালো এ মনো আমায়, কই আর সে মন, কেমন্ কেমন্ দেখ্‌তে পাই।

কোন পথে হারালে মন্, ওরে প্রাণ, আমিও সেই পথে যাই॥

নাই তোমার এখন্ সে সুহাস্য, সুদৃষ্ট, সুবচন।

কথা হয়, যেন কে কারে কি কয়, প্রাণ সদাই অন্য মন॥

তুমি রসিক নও, তা নও প্রাণ্।

ওরে প্রাণ, রাখ স্থান বিশেষে মান্॥

কোন রাজ্যে ধান, কোন রাজ্যে বাণ॥

আমি হাজা প্রজা বোলে জলে জলালে, আমার সুখের সময় তোমার রস শুখালো।

মহড়া।

তারে বোলোগো সখি, সে যেন, এ পথে এসেনা।
পোড়া লোকে মন্ বুঝে দেয় গঞ্জনা ॥

* * * * *

চিতেন।

আকিঞ্চনহতে, গলেতে গেঁথে, পোরেছিলাম প্রেমো হার।
ত্রিরাত্রি না যেতে, হোলোগো তাতে, বিড়ম্বনা বিধাতার ॥
সখি সে কোথা, আমি কোথা।
না জেনে, না শুনে, লোকে কয় নানা কথা ॥
আমি পীরিতি করিতাম্ প্রাণে প্রাণ সঁপিতাম, তা বুঝি কপালে হোলো না ॥

[১০] [এই গীতটী কোন্ দলে গাহনা হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারিলাম না। ইহার অপরাপর অংশ ও পাল্‌টা অতি বিচিত্র! বসুজ যত কবিতা রচনা করেন তাহার মধ্যে এই সাটের গান মধ্যমরূপে গণ্য হইতে পারে।]

মহড়া।

প্রাণ্‌রে প্রাণ্। নইলে কেন হৃদে হানো বিচ্ছেদ্ বাণ ॥
বুঝি মানের অভিপ্রায়, মান্‌চণ্ডীর তলায়, তুমি নাগর কেটে দিবে নর বলিদান।
নারী হোয়ে কোথা শিখেছ, প্রাণ্‌ঘাতকী সন্ধান ॥
তুমি স্বচক্ষে কি দেখেছ।
রাগে রক্ষা নাই আর, আমার পক্ষে খড়্গহস্ত হোয়েছ ॥
ধোরে মিছে ছলে ছল, কোরে অকৌশল্, কর ছুতো নতায় কথায় কথায় অপমান।

চিতেন।

তুচ্ছ কথায় কোরে অভিমান্, যখন্ কোরেছ বাড়াবাড়ি।
তখনি জেনেছি, আজ হোতে প্রেম্ ছাড়া ছাড়ি ॥

তোমার ভালবাসা এতো নয়।

আমার প্রাণ্ জলাবে, দেশ ছাড়াবে, তাড়াবে তারি আশয়॥

আমি সর্ব্বত্যাগী হই, তোমার বাহ্য ঐ, তাইতে কোরেছো আজ্ এমন সর্ব্বনেশে মান।

[এই গানের অন্তরা পাইলাম না। পাল্‌টা গীতের কিয়দংশ প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ করিলাম।]

ঐ গানের পাল্‌টা মহড়া।

এই খেদ্ হয়॥

তবু বল পুরুষ্ ভাল-মানুষ নয়॥

যখন্ দক্ষ যজ্ঞে সতী, ত্যজেছিলেন্ প্রাণ, তখন মৃতদেহ গলায়, গেঁথে রাখ্‌লেন মৃত্যুঞ্জয়।

* * * * *

চিতেন।

কথায়্ কথায়্ কোরে অভিমান্, তিলে কোরে বোসো তাল্।

ও ধনি, না জানি, কেমন পুরুষের কপাল॥

যদি পুরুষ পাতকী হবে।

তবে পাণ্ডবেরা, নারীর্ সঙ্গে বনে কেন বেড়াবে॥

দেখ তারা একা নয়, হরি দয়াময়, মানে ধোরেছিলেন্ ব্রজে রাধার্ পদদ্বয়।

[ইহার অপরাংশ কেহ প্রদান করিলে অত্যন্ত উপকৃত হইব।]

সখী-সম্বাদ।

মহড়া।

কে হে সে জন্। নারী যারে করিছে রোদন্॥*

কোথা হোতে এসেছে, তার কিবে প্রয়োজন্।

আমরি মরি। কিরূপের মাধুরী॥

সুধাইলে শুধুই বলে, বসতি শ্রীবৃন্দাবন্॥

---

*"কোন কোন পুস্তকে নিত্যানন্দ বৈরাগীর রচিত বলিয়া দৃষ্ট হয়।" —বাঙ্গালীর গান (পৃঃ১৪৪)।—স.

চিতেন।

দ্বারী কহে শ্রীকৃষ্ণের সভায়, শুন ওহে যদুরায়।
ব্রজের সংবাদ কিছু, নিবেদিই তোমায়॥
দুখিনীর আকার। রমণী কোথাকার॥
কাতর হইয়ে কহে, দেহ কৃষ্ণ দরশন্।

নীলু ঠাকুর এই সখী-সম্বাদ গাহিয়াছিলেন।

মহড়া।

আর নারীরে করিনে প্রত্যয়।
নারীর নাইকো কিছু ধর্ম্ম ভয়॥

*　　　　*　　　　*

চিতেন।

*　　　　*　　　　*

অন্তরা।

নারী মিলতে যেমন, ভুলতে তেমন্ দুই দিগে তৎপর্।
মজ যে পরে, চায়না ফিরে, আপনি হয় অন্তর॥

চিতেন।

উত্তমেরে ত্যজ্য কোরে অধমে যতন্।
নারী, বারি, দুই জনারি, নীচ্ পথে গমন্॥
তার প্রমাণ বলি প্রাণ, নলিনী তপনে তেজিয়ে, বনের পতঙ্গ, সে ভৃঙ্গ, তারে মধু বিতরয়।

ইহার অপরাংশ ও প্রথম গীত পাইলাম না।

মহড়া।

দেখি দেখি তোর্ খেদে, বাঁচে কিনা, বাঁচে প্রাণ্।
তুইতো যা এখন্, ফিরে দিয়ে মন্, তোরে সাধ্তে যাইতো তখন্ করিস্ অপমান॥

এটি পাল্টা গান। ইহার প্রথম ও এই গীতের অপর কিছুই প্রাপ্ত হইলাম না।

মহড়া।

এক্‌বার বিচ্ছেদ কোরে প্রাণ, তোমার মন বুঝব হে।
তোমার মন্ যদি খাঁটি হয়, বিচ্ছেদ জ্বালা সোয়ে রয়, তবে দুটি মন্ একটি কোরে থাক্‌বহে।

চিতেন।

* * *

অন্তরা।

ওহে প্রাণনাথ হে। বিচ্ছেদের পর মিলন হোলে পর, সে প্রেমে বাড়ে সুখোদয়।

গ্রহণান্তে যেন্ শশির কিরণ, স্বর্ণ দাহনে স্বর্ণ হয়॥

এই গীতের সাট যিনি প্রদান করিবেন, আমরা তাঁহার নিকট চিরবিক্রীত হইব।

মহড়া।

তবে। কি হবে সজনি নাথো মান্ কোরে গেলো।
প্রাণ সই, আমি ভাবি ঐ, আবার দ্বিগুণ্ জ্বালায় জলতে [জল্‌তে] হোলো।

* * *

চিতেন।

বিধিমতে প্রাণোনাথেরে, করিলাম্ বারণ।
কোরোনা কোরোনা, বঁধু প্রবাসে গমন॥
সে কথা না শুনে প্রাণনাথ্।
অকালে সকালে প্রেমে হান্‌লে বজ্রাঘাত।
নারী হোয়ে, করে ধোরে, সাধ্‌লাম তারে, তবু না রহিলো॥

বসুজ এই সাট মোহন সরকারকে প্রস্তুত করিয়া দেন,—ইহার আর কিছুই সংগ্রহ করিতে পারিলাম না।

[১১] . মহড়া।

এমন্ প্রেম্ কোরে এক্‌দিন, চিরদিন্ কে বিচ্ছেদের বোঝা ববে।

জানি যত সরল্ ভাব্, তোমার প্রেমে বিচ্ছেদ লাভ্, ওরে প্রাণ, কুটিল স্বভাব্ গুণে অভাব্ ঘটাবে॥

* * *

চিতেন।

দেখে ঠেকে তোমায় চিনেছি, ক্ষান্ত আছি পীরিতে।

বিচ্ছেদ করেছি প্রাণনাথ্, বিচ্ছেদের সঙ্গেতে॥

মনে ঐক্য আছে, ঝক্য গ্যাছে মিটে।

রসময়, প্রেমের কথা যে কয়, যাইনে তা'রো নিকটে॥

আমার জন্মের মত ফুরায়েছে রঙ্গরস, মিছে ধোরে বেঁধে পীরিৎ ঘটাবে॥

মহড়া।

ওগো ললিতে গো, তোরা দেখে যাগো, রাই কেন এমন হোলো।

কইতে কইতে কৃষ্ণ কথা, এলো থেলো স্বর্ণলতা কোথা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলে আছে কি মোলো॥

ইহার পাল্‌টা গীতের মহড়া।

ডুবে শ্যাম্‌সাগরে, যদি প্যারী মরে, রাই বধের ভাগী কে হবে।

ধরাধরি কোরে তোলো, মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলো হরি ধ্বনি শুনে ধনী, উঠে দাঁড়াবে॥

[এই কয়েকটি গীতের সংপূর্ণ পাইলে পূর্ণানন্দে পূরিত হইব।]

মহড়া।

বল কার অনুরোধে ছিলে প্রাণ।*

ছিলে আমার বশ, কি যৌবনের বশ, কিসেই প্রেমের বশে প্রেম্-রসে ডুব্‌তে প্রাণ॥

---

* পরে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত।—স,

ইহার পাল্টা মহড়া।

কেবল কই কথা লোক লজ্জাতে।

আমার যৌবন ধন, গিয়েছে যখন, সখা তুমিও গিয়েছ আমার সেই পথে॥

[এই দুইটি গীতের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছি।]

মহড়া।

কোকিলে কর এই উপকার্।
যাও নাথেরো নিকটে একোবার্॥
ব্যথায় ব্যথিত হও তুমি আমার।
নিষ্ঠুরো নাগরো আছে যথায়্।
পঞ্চস্বরে গানো শুনাওগে তায়।
শুনে তব ধ্বনি, বলিয়ে দুঃখিনী, অবশ্য মনে হইবে তার॥

চিতেন।

বিরহি জনারো, অন্তরে হানো, কুহু কুহু স্বর।
ইথে নাই তোমার পৌরুষ পিকবর্।
একলা অবলা আমি বালা।
আমারে যেরূপে দিলে জ্বালা॥
তাহারে তেমতি পারহে জ্বলাতে, প্রশংসা তবে করি তোমার॥

অন্তরা।

হায়, যে দেশে আমার প্রাণনাথো, কোকিলে বুঝি নাই সেদেশে।
তা যদি থাকিত, তবে সে আসিত, বসন্ত সময় নিবাসে।

চিতেন।

কিম্বা কোকিল্ আছে, নাই তারো, সুস্বর তব সমান্।
কুরবে বুঝি হানে পাবেনা বাণ্॥
অতএব বিনতি করি এখন।
কোকিলে তথায়ে কর গমন্॥
তোমার এরবে, প্রবাসে কে রবে, নিবাসে আসিবে প্রাণ্ আমার॥

অতুল্য, অমূল্য, এই কবি যে সময়ে জন্ম গ্রহণ করেন, তৎকালে জন্ম লইয়া তাঁহার সহিত একত্র হইতে পারিলে মনের সকল ক্ষোভ নিবারণ হইতে পারিত।

ঐ গীতের পাল্‌টা।

মহড়া।

সে যেন, এ কথা শুনে না।
দেয় বসন্তে আমারে যাতনা॥

* * *

চিতেন।

শশির কিরণে প্রাণো জ্বলে, জলেতে নাহি জুড়ায়্।
বিষ প্রায়, যদি চন্দন্ মাখি গায়॥
শেল্ সম হোলো, কোকিলের গান্।
মলয় মারুত অগ্নি সমান্॥
এ দেশের্ এ বিচার্, শুনিলে নাথের্ আর, পুন পদার্পণ হবে না।

রাম বসুর কৃত এই গান নীলু ঠাকুর কি মোহন সরকার, দুই জনের একজন গাহিয়া ছিলেন। এই সাটের গান কয়েকটি যিনি প্রদান করিবেন আমরা তাহার উপকার কখনই বিস্মৃত হইব না।

"যৌবন জনমের মত যায়"

ইহার অন্তরা ও প্রথম এবং দ্বিতীয় গান সংগ্রহ করিয়া যথারীতি ক্রমে নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

মহড়া।

১ সংখ্যা।

বসন্তেরে সুধাও, ও সখি।*
আমার্ নাথেরো মঙ্গল কি॥
নিবাসে নিদয় নাথো, আসিবেনা কি॥
তার অভাবে ভেবে তনু ক্ষীণ।
দিনে শতবার গণি দিন্॥
আসারো আশয়ে আছি, আশাপথো নিরখি॥

---

* প্রীতিগীতিতে (১৩০২ সং) কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্যের নামে।—স.

চিতেন।

প্রাণোনাথো যে দেশে আমার্, করিছে বিহার্।
এ ঋতুরাজার্ তথা অধিকার্॥
তার শুভ সংবাদ যত।
সকলি তা জানে বসন্ত॥
সুমঙ্গল কথা তারো, শুনালে হব সুখি॥

অন্তরা।

হায়। কাল্ আসিব বোলে নাথো করেছে গমন।
ভাগ্য গুণে যদি, হোলো সে মিথ্যাবাদী চায়া কি এখন॥

চিতেন।

সে যদি, ভুলেছে আমারে, মনে না কোরে।
আমি কেমনে, ভুলিব তারে।
পতি, গতি, মুক্তি অবলার্।
সুখ মোক্ষ সেই গো আমার্॥
তাহারো কুশল শুনে, কুশলে কুল রাখি।

ঐ গীতের পাল্টা।

২ সংখ্যা।

মহড়া।

অঙ্গ দহে অঙ্গহীন জন্।
ছি ছি নাথো বিনে কি লাঞ্ছন্॥
হর কোপে যার তনু হয়েছে দাহন্।
সে দহিছে বিনে, প্রাণনাথ্।
কর হীনে করে করাঘাত্॥
এ সব লাঞ্ছনা হোতে, বরঞ্চ ভালো মরণ্॥

[১২] চিতেন।

প্রাণনাথো বিদেশে গমন্, করিল যখন্।
পিছে পিছে তার্, গ্যাছে আমার মন্॥

সে সঙ্গে না গেল কেন প্রাণ্।
বসন্তে হোতেছে অপমান্।
জীবন রয়েছে বোলে, হোতেছিগো জ্বালাতন্।

উক্ত গীতের তৃতীয়।

৩ সংখ্যা।

মহড়া।

যৌবন জলধের মত যায়্।
সে তো আসা পথো নাহি চায়্॥
কি দিয়ে গো প্রাণ্ সখি, রাখিব উহায়॥
জীবন যৌবন গেলে আর।
ফিরে নাহি আসে পুনর্ব্বার॥
বাঁচিতো বসন্ত পাব, কান্ত পাব পুনরায়।

চিতেন।

গেল গেল এ বসন্ত কাল্ আসিবে তৎকাল্।
কালে হোলো কাল্, এ যৌবন কাল্॥
কাল পূর্ণ হোলে রবে না।
প্রবোধে প্রবোধ মানে না।
আমি যেন রহিলাম, তারো আসারো আশায়।

অন্তরা।

হায়। ষোলকলা পূর্ণ হোলো যৌবনে আমার।
দিনে দিনে ক্ষয় হোয়ে, বিফলেতে যায়॥

অন্তরা।

কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদে হয়্, শশিকলা ক্ষয়্।
শুক্লপক্ষে হয়, পুন পূর্ণোদয়্॥
যুবতীর যৌবন হোলে ক্ষয়।
কোটিকল্পে পুন নাহি হয়॥
যে যাবে সে যাবে হবে, অগস্ত্য গমন প্রায়।

এই তিনটি গান যিনি অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন তিনিই যথার্থরূপে রাম বসুর কবিত্ব, পাণ্ডিত্য, প্রেমিকতা, রসিকতা ও ভাবকতার বিশেষ পরিচয়

প্রাপ্ত হইবেন, ইহার তুলনা নাই, কি পরিতাপ। এমত মহাপুরুষের জীবিতাবস্থায় জগদীশ্বর আমারদিগ্যে বয়স্থ করেন নাই। তৎকালে আমরা অজ্ঞান বালক ছিলাম, বর্ত্তমান সময়ে যদি তিনি সজীব থাকিতেন, তবে আমরা যত্ন পূর্ব্বক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কত সুখি হইতাম, তাহা অনির্ব্বচনীয়।

মহড়া।

এই বড় ভয়, আমারো মনে।
পাছে কুলো যায়, না পাই প্রেমধন, শেষে হাসবে শত্রুগণে॥
পীরিতের রীতি আমি, কিছু জানিনে॥
প্রেম সুধা আস্বাদন্।
সদা করিতে চাহে পোড়া মন॥
নাহি জেনে মন্ত্র নাথো, দিব হাতো, ফণির বদনে।

অথবা

বিচ্ছেদ কণ্টক আছে, ফুটে পাছে, কমল্ চরণে॥

চিতেন।

সাধে কি কলঙ্ক ভয়ে ভঙ্গ দিতে চাই।
সুখ আশে, যোজে শেষে, কুল বা হারাই॥
একে তরুণো তরি।
তায় তুমিহে নব কাণ্ডারী॥
কলঙ্ক সাগরে প্রাণো, দেখো যেন ডুবে মরি নে॥
চমৎকার, চমৎকার। অন্তরা পাইলাম না।

৺রাম বসু*

[তিন]

[১১] গত ১ কার্ত্তিকের প্রকাশিত বিষয়ের শেষ।

আমরা রামবসুর জীবন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে প্রকাশ পূর্ব্বক গত ১ আশ্বিন ও ১ কার্ত্তিকের প্রভাকরে তাঁহার প্রণীত কতকগুলীন সংপূর্ণ ও কতকগুলীন অসংপূর্ণ গীত পত্রস্থ করত সর্ব্ব সাধারণের সুগোচর করিয়াছি। ইহাতে অনেকেই সন্তুষ্ট হইয়া আনন্দ প্রচার করিয়াছেন; এবং তন্মধ্যে কোন কোন মহাশয় অনুগ্রহ পুরঃসর কোন কোন অসংপূর্ণ গান সংপূর্ণ করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সংগ্রহ হইয়া আসিতেছে। আমরা প্রথমে প্রবৃত্ত হইয়া এ বিষয়ে এক প্রকার ভগ্নোদ্যম হইয়াছিলাম, কিন্তু এইক্ষণে সাধারণের সাহায্য পাইয়া ক্রমেই সাহসের উন্নতি হইতেছে; বোধ করি, ছয় মাসের মধ্যে ইহাঁর কৃত শেষাবস্থার প্রায় সমূদয় গান সংগ্রহ হইতে পারিবে। প্রথমাবস্থার সমুচয় গীত একত্র করা অতিশয় কঠিন হইয়াছে, কারণ একেতো বহুকাল গত, তাহাতে আবার তিনি এক সময়ে একজনকে কৃপা করেন নাই, কখনো "ভবানে বেনে" কখনো "নীলু ঠাকুর" কখনো "মোহন সরকার" এবং কখনো কখনো অপরাপর কবিওয়ালাদিগ্যে কবিতা দিয়াছিলেন। যাহা হউক, আমরা এই কল্পে ক্লেশকে ক্লেশ জ্ঞানি করি না; ইহার নিমিত্ত এক প্রকার সর্ব্বত্যাগি হইয়াছি। আমারদিগের শব-সাধনের ন্যায় সাধনা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দৃষ্টে কারুণিক ঈশ্বর আপনিই করুণা কণা বিতরণ করিতেছেন। প্রতিদিন দুই একটা করিয়া পুরাতন গীত কোথা হইতে প্রাপ্ত হইতেছি তাহা লিখিয়া কি ব্যক্ত করিব? কবিতা রসের রসিক মহাশয়েরা যদিস্যাৎ তাচ্ছীল্য না করিয়া এই ভাবে সমানরূপ যত্ন করিয়া যথাযোগ্য আনুকূল্য করেন, তবে অনায়াসেই শ্রম সাকল্য সাফল্য করত অমূল্য অতুল্য কৈবল্য সুখবৎ সুখ লাভ করিতে পারিব। এই স্থলে প্রস্তাব বাহুল্য করণের প্রয়োজন করে না, পূর্ব্বে বারম্বর যে সমস্ত গান উদিত হইয়াছে এবং অন্য যে কয়েকটী [১২] প্রকাশ

*সংবাদপ্রভাকর, বুধবার ১ অগ্রহায়ণ ১২৬১ সাল। ইং ১৫ নবেম্বর ১৮৫৪।—স.

হইল, সকলে স্থিররূপে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমারদিগের পরিশ্রমের বিশেষ সার্থকতা হইবেক। অপিচ এ পর্য্যন্ত যে সকল গান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই পুরাতন।

মহড়া।

কে তুমি তা বলো।
এলে প্রেম্ বাজারে, যৌবন্ ভরে,
হোয়ে ঢলো ঢলো।

*　　*　　*　　*

চিতেন।

শশিমুখি, তোমায় দেখি, মৃগনয়নি।
কোরে পদার্পণ্, পরের মন্, হরো ইঙ্গিতে ধনি॥
প্রিয়ে চেয়ে চিতো হরিলে আমার্, ঢেকে বদনে অঞ্চলো।

[রাম বসু এই গীতের কর্ত্তা, গাহনার কর্ত্তা মোহন সরকার। এই সরকার বসুর বসুতে অসু সার্থক করিয়াছিলেন।]

সখী সংবাদ।

মহড়া।

এমন্ ভাবিক্ নাবিক্ দেখি নাই।
নাহোতে পার, যমুনার, মাজখানে বা কূল্ হারাই॥
কি হবে মনে ভাবি তাই।
একি জ্বালা কালা কর্ণধার॥
হোলো প্রাণ্ বাচানো ভার॥
কাঁপে তরঙ্গে অঙ্গ, ও করে রঙ্গ, আমায় বলে ধর রাই॥

চিতেন।

তুলে তরণির্ উপর্, নটবর্, করে কত ছল্।
বলে দেখিছ কি, রাই, যমুনা প্রবল॥
তুমি পোরেছ রাই নীল্‌বসন্।
মেঘ্ ভেবে বাড়ে পবন্॥
বলে তরঙ্গের্ মাঝে, উলঙ্গ হোতে, একি লজ্জা আই গো আই।

অন্তরা।

* * * *

চিতেন।

তরি করে টলোমল, উঠে জল, হেরে হারাই জ্ঞান।
এ সময় বলে সই, কই পশরা দান॥
আমি ভেবে হোয়েছি আকুল।
অকূলে বুঝি যায় কুল॥
পেয়ে ঘোর শঙ্কটে যৌবন লোটে, না মানে কংসের দোহাই।

[৪০ বৎসর অতীত হইল রাম বসুর কৃত এই গান মোহন সরকার গাহিয়াছিলেন। এ গীতে অত্যাশ্চর্য্য রচনা কৌশল প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার কিয়দংশ ও দ্বিতীয় গান প্রাপ্ত হইলাম না।]

মহড়া।

রাইকে ধোরে তোলো।
ওগো শ্যামসাগরে, কালোনীরে, কিশোরী ডুবিলো॥

* * * *

চিতেন।

জুড়াইতে সখি, চন্দ্রমুখী, দিলে কালো জলে ঝাঁপ।
পরিতাপ ঘুচাতে, পেলেন মনস্তাপ॥
কিসে হবে পরিত্রাণ।
রাই জানে না সে সবো সন্ধান॥
কুলবতী হোয়ে রাধে, অকূলে পড়িলো।

[পূর্ব্বোক্ত গীতের অপেক্ষা এই গীতের বয়স অধিক হইবে। অতি চমৎকার রচনা। ইহার অপরাংশ কিছুই প্রাপ্ত হইলাম না।]

মহড়া।

লোয়ে দুগ্ধ দধি, পশরাতে, সাজায়ে সকল।
ভাবতেছি তাই সখি॥

যাব কি না যাব আজ্, মথুরায় বিকি।
বসেছে নূতনো দানী, নন্দেরো নন্দনো নাকি।

চিতেন।

বড়ায়েরো মুখে একি, গো সখি, শুনি পরমাদ্।
ঘুচিলো আমাদের্ সবো, বিকিকিনি সাদ্॥
যে শুনি দানিরো কথা, গিয়ে কুলো হারাবো কি॥

অন্তরা।

নিতি নিতি, বিকি কিনি, করি দধি সর্।
গোপজাতি ধর্ম্ম এই, ইহাতে দিই রাজকর্॥

চিতেন।

এ বড় বিষমো হোলো, বসিলো, দানী এ পথে।
কি দানো তাহারে সখি, হবে গো দিতে॥
শুনেছি রসিকো দানী, না জানি সে চায়ো বা কি॥

[৫০ বৎসর গত হইল রাম বসু এই গান প্রস্তুত করিয়া নীলুঠাকুরকে প্রদান করেন। ইহার পাল্টা পাইলাম না।]

মহড়া।

জলে জলে কে গো সখি।*
অপরূপো রূপো দেখি॥
ঢেউ দিওনা কেউ এজলে, বলে কিশোরী, দরশনে দাগা দিলে হইবে সই পাতকী॥

চিতেন।

* * * *

---

* প্রীতিগীতিতে (২২৩৬ নং) রচয়িতা হরু ঠাকুর। গুপ্তরত্নোদ্ধার (পৃ ১২১) এবং কবিওয়ালাদিগের গীতসংগ্রহে (পৃ ২৩) রাম বসুর নামেই আছে। সংকলনগ্রন্থগুলিতে গান সম্পূর্ণ ও পরিবর্ত্তিত আকারে আছে।—স.

অন্তরা।

বিশেষ বুঝিতে নারি, নারী বইতো নই।
ওগো প্রাণো সই॥
নিরখি নির্ম্মল জলে অনিমিষে রই।

চিতেন।

কতশত অনুভব হয় ভাবিয়ে।
শশি কি ডুবিলো জলে রাহুরো ভয়ে॥

আবারু ভাবি সে, যে, শশি কুমুদোবান্ধব্, হৃদয়ো কমলো কেন, তাদেখে হবে সুখী।

[এই গানের অপরাংশ ও দ্বিতীয় পাইলাম না, ইহাতে আক্ষেপ প্রকাশ কত করিব? এমত চমৎকার রচনা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। বসুজ প্রণীত এই গীতের সাট্ গান করিয়া নীলু ঠাকুর অনেক সদ্বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে মোহিত করিয়াছিলেন। কথিত কবি যৎকালে উক্ত কবিতা রচনা করেন, তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম উর্দ্ধ সংখ্যা বিংশতি বৎসর হইবে।

মহড়া।

হোয়েছি তোমার বাঁশীর দাসী, তাই আসি বনে।*
কুলবধূ, বধবঁধূ, সুমধুর তানে॥
[১৩] মুরারী স্বয়ং গায়কো।
মুরারী উত্তর্ সাধকো॥
না মানে কুলোকীলকো, গুরুভয় না গণে॥

চিতেন।

রাধা রাধা রাধা বোলে, বাঁশি করে রব।
বাঁশি আমার নাশিলেকো, সতীত্ব সৌরভ॥

---

* প্রীতিগীতিতে (২২৬৯ নং) সম্ভবতঃ ঈশ্বর গুপ্তকে অনুসরণ করেই অনুমান করা হয়েছে, গানের রচয়িতা রামসুন্দর রায়ও হতে পারেন।—স.

অমনি অরণ্যে আনে।
মুরলী কি মন্ত্র জানে।
অঞ্জনো কোরেছি মনে, গুঞ্জরো গঞ্জনো।

এই সাটের সমুদয় প্রাপ্ত হইলাম না। নীলু ঠাকুর এই গীত গাহিয়াছিলেন। এই গীতের কর্ত্তা কোন্ ব্যক্তি, সে বিষয়ে সংশয় জন্মিয়াছে, কেহ কেহ কহেন, "রাম বসু ইহার কর্ত্তা" এবং কেহ কেহ কহেন "রাম সুন্দর রায় ইহার জন্মদাতা" ফলে আমরা কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না, উভয়েই প্রায় তুল্য কবি ছিলেন, কবিতা কল্পে উভয়েরি অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ প্রাচীন ব্যক্তি রাম বসুর বলিয়া উল্লেখ করেন। উক্ত রামসুন্দর রায় কায়স্থ কুলোদ্ভব ছিলেন, কলিকাতার ডিঙ্গেভাঙ্গায় বাস করিতেন। ইনি নীলু ঠাকুরের দলে শ্লেষোক্তি খেউড় করিয়া হরু ঠাকুরকে নতমুখ করেন, তাহাতে অতি চমৎকার রসিকতা ও পাণ্ডিত্য ও কৌতুক প্রকাশ হইয়াছে। কেহ পাঠ করিলে শুনিতে শুনিতে হাসিতে হাসিতে নাড়ী ছিঁড়িয়া যায়। এতদ্ভিন্ন ইতি [ইনি] অতি উত্তম উত্তম সখী সংবাদ ও বিরহ এবং ভবানী বিষয় রচনা করিয়াছেন। আমরা ক্রমে ক্রমে তাহা সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতে সাধ্যের ত্রুটি করিব না। শুনিতে পাই, ইহার কৃত খেউড় গান সর্ব্বাংশেই সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত ও বিখ্যাত।

যথা।

"সেই হরি কি তোর্ হরু ঠাকুর্।
ভোলা ঠাটের দেব্‌তা পাটে রেখে করিস্ ভুর্॥" ইত্যাদি।

তথা রাম বসুর উপর এক খেস্বা রচনা করেন।

যথা।

"আক্‌ড়া সাজ্‌য়েছে ভালো, মাকড়া রাম্ বাউল্।
দিয়ে এড়ুয়া বেঁকি নূপুর পায়, ভেড়ুয়া যেন নেচে যায়, মেড়ুয়াবাদির মত ওটার মাথা ভরা কোঁক্‌ড়া চুল॥" ইত্যাদি।

বিরহ। মহড়া।

নব যৌবন্ জ্বালায়, মলেম্ গো সহচরি।*
নাথো নিবাসে এলো না কি করি॥

* * * * *

চিতেন।

বয়সো প্রথমে, সপ্তমে অষ্টমে, বালিকা ছিলাম্ যখন্।
তখনো বলিতাম্ সজনি, ভালো মদনো সেই কেমন্॥
এখন প্রাণোনাথো বিহনে।
জানিলাম সজনি, দহে বটে মদনে॥
হোলো কলিকা কদম্ব, এ কুচো ডাড়িম্ব, দিনে দিনে দ্বিগুণো ভারি।

অন্তরা।

যদি অনলো, হোতো প্রবলো, জলে করিতাম্ নির্ব্বাণ্।
নৈলে কাল্ ভুজঙ্গ, দংশিতো এ অঙ্গ, মন্ত্রেতে বাঁচিতো প্রাণ্॥

চিতেন।

* * * * *

[রাম বসুর এই গান মোহন সরকার গাহিয়াছিলেন, ইহার আর কিছুই পাইলাম না। আহা, কি পরিতাপ! এত দুঃখে রত্নময় পর্ব্বতের মধ্যস্থ হইয়াও চূড়া দেখিতে পাইলাম না।]

মহড়া।

বঁধু কার কখন্ মন্ রাখ্‌বে।
তোমার এক্ জ্বালা নয় দুদিক্ রাখা, বল প্রাণ্ কিসে প্রাণ্ বাঁচবে॥
সমভাবে কেমনে রবে।
সবে তোমার একো মন্।
তায় কোরেছ প্রেমাধিনী, দুটৈয়ে দুজন্॥
কপট্ প্রেমে বল দেখি প্রাণ্, হাসাবে কায় কাঁদাবে॥

---

* সঙ্গীত কোষে (পৃ ২০৭) রচয়িতা অজ্ঞাত বলে উল্লিখিত।—স.

চিতেন।

একোভাবে পূর্ব্বে ছিলে প্রাণ্ সে ভাব্ তোমার নাই।
পেয়েছ যে নূতন নারী, মনো তারি, ঠাঁই॥
রাখ্‌তে আমার অনুরোধ্।
প্রাণ্ তোমার প্রমাদ্ হবে, সে করিবে ক্রোধ্॥
দ্বেষাদ্বেষি দ্বন্দ কোরে কি, দেশান্তরী করিবে॥

[মোহন সরকারের মৃত্যুর পরে বসুজ ঠাকুরদাস সিংহকে এই গীত প্রদান করেন, ইহার সমুদয় সাট পাইলাম না।]

মহড়া।

নাথো আজ্ আমার পীরিতের ব্রত উজ্জাপন্।
আনো বিচ্ছেদেরে কোরে আবাহন॥
দক্ষিণান্ত, হোলে ক্ষান্ত, হয়ো পাপো মন্।
অঘটো ঘটনা ঘটে, কোরে যাই আজ্ বিসর্জ্জন্॥

চিতেন।

আমি প্রেমব্রত করেছিলাম্ যারো কামনায়।
কর্ম্ম দোষে সখাহে, না পেলেমো তায়॥
খণ্ডব্রতী হইহে যদি, হাসিবেহে শত্রুগণ॥

[ইহার অপরাংশ অপ্রাপ্য হইয়াছে রাম বসুর এই গান মোহন সরকার গাহিলে কবিওয়ালা বলাই দাস বৈরাগী অথবা অপর কেহ তৎক্ষণাৎ আসরে ইহার অত্যাশ্চর্য্য উত্তর করিয়াছিলেন।]

যথা।

মহড়া।

"হবে অপযশো সার।
কোরো না প্রেম্ উজ্জাপনো আর্॥
যে করে প্রেম্ উজ্জাপনো নানা বিঘ্ন তার্।

যজ্ঞকুণ্ডে জলিলে আগুন।
হবে প্রাণ্ যন্ত্রণা দ্বিগুণ্ ॥
রতিপতির হমের ধূমে, প্রাণে বাঁচা ভার ॥

চিতেন।

অনুরাগে, তনুত্যাগে, তাই দেখি তোমার
বল প্রাণ্, এ মন্ত্রণা কাহার্ ॥
প্রেম যোগে কল্লে অসংযোগ।
নাহি তার্, স্বর্গে সুখোভোগ ॥
আমারে মজাবে মিছে, হাসাবে সংসার ॥

---

[১৪] মহড়া।

আগে মন্ ভেঙ্গে শেষ্ যতন।
আর কি এ প্রেম, গড়ে ॥
*   *   *

চিতেন।

প্রাণ্ দেখো একো বৃক্ষ কেউ করিয়ে রোপণ।
ফলো পায়, কোরে তায় কত যতন্ ॥
তুমি খল স্বভাবী, প্রেমতরুরো, মূল ফেলেছ আগে ছিঁড়ে ॥

[অতি সুন্দর। বসুর কৃপায় এই গান মোহন সরকার গাহিয়াছিলেন ইহার সমুদয়াংশ পাইলাম না।]

মহড়া।

এই অবলার্ মান্ থাকে কিসে, প্রাণ্ তাতো বুঝ না।
তুমি জাননা সোহাগ্, কথায় কথায় কর রাগ্।
পীরিৎ ভাংতে শিখেছিলে গোড়্তে জাননা।
*   *   *   *   *

চিতেন।

কামিনী কলহ, নির্ব্বাহ, পুরুষ্ যদি রসিক্ হয়।
ধৈর্য্য গুণে, পূজ্য কোরে আনে, যে আনে, যে জানে প্রণয়্॥
তুমি আপ্নি প্রাণ্ হোলে অধৈর্য্য।
বোলে কর্ব্ব কি আর্, কপাল আমার; তুমি যে হোয়েছ আমার অত্যেজ্য॥
তোমায় হৃদয় মাঝে রাখি, তবু সখী নই, দিলে ঘরে আগুন্ শুনে পরের্ মন্ত্রণা॥

[রাম বসু এই গীত নিজ দলে গাহিয়াছিলেন। ইহার অপরাংশ সংগ্রহ করিতে পারি নাই, পাল্টা গানের চিতেন মহড়া প্রাপ্ত হইয়া নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।]

যথা দ্বিতীয় গানের মহড়া।

পরের মন্ত্রণায়, বাদ্ কোরে প্রেমের্ সাধ্ কেন ঘুচালে।
ছিলো নয়নের দেখা, তাতে ক্ষতি কি সখা, কেন সে প্রবৃত্তিপথে কণ্টকো দিলে॥
সেধে আপন্ কায্, কেবল্ আমারে মজালে।
পীরিৎ ভাংলে কি, বঁধু এম্নি হয়।
এখন্ ডাকলে সখা, না দেও দেখা, এ পথে হোয়েছে যেন বাঘের ভয়॥
তোমায় এ পথো ভুলায়ে, সে পথে নেগেল যে, এমন্ বশীকরণ্ বিদ্যা সে কোথা পেলে।

চিতেন।

এ সুখো প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, বল কিসে হোলো প্রাণ্।
মরি খেদে, মনের ঐ বিষাদে, কেঁদে উঠে প্রাণ্॥
যখন নবভাব্ ছিলো সে এক্ মন্।
এখন্ সে মমতা, সকল কথা, হোলো যেন শরদে মেঘের গর্জ্জন॥
কোন্ কুলটা রমণীর, কথায় ভুলে প্রাণ, তারো মায়ামেঘের আড়ে কায়া লুকালে।

[অতি উৎকৃষ্ট, অতি উৎকৃষ্ট।]

মহড়া।

ওগো প্রাণ্ সখি আমার্ মনের খেদ্ আর্ ঘুচ্‌লো না।
এলে বসন্ত, থাকে প্রবাসে কান্ত, আবার্ কান্ত এলে বসন্ত থাকে না॥

মহড়া।

অনেকেতো প্রেম্ করে, আমার্ কেন এমন্ হয়।
বিনি যন্ত্রণায়, যদি ছুদিন্ যায়।
যেন তিন্ দিনের্ দিন একটা ঘটেছে প্রলয়।
[উপরোক্ত দুই মহড়ার অপর কিছুই প্রাপ্ত হইলাম না।]

১ কার্ত্তিকের প্রভাকরে ৯ পৃষ্ঠায় প্রথম স্তম্ভে প্রকাশ হয়।

যথা।

"দেখ্‌ব কেমন সুন্দরী কুবুজা।
তোদের রাজা যে, নিজে বাঁকা সে, নূতন্ রাণী যে হয়েছে বাঁকা কি সোজা।"

ইহার অপরাংশ না পাইয়া বহু যত্নে দ্বিতীয় গান সংগ্রহ করত প্রকাশ করিলাম।

যথা।

মহড়া।

সময়্ গুণে এই দশা হোয়েছে।
ছিলো দাসী যে, হোলো রাণী সে, রাধা রাজনন্দিনীর্ এখন্ কপাল্ ভেঙ্গেছে॥
সরমে মরমে মরি, কর্ কার্ কাছে।
যে জন আঁখির আড়্ হোতো না।
তারে দেখ্‌তে এসে, এত লাঞ্ছনা॥
আমরা পথে বোসে কাঁদি আজ্, এমন কত কান্না তোদের্ রাজা কেঁদেছে।

চিতেন।

কপাল্ মন্দ হারিহে, কৃষ্ণের্ নিন্দে করা নয়্। .
দশা যখন বিগুণ্ হয়, বন্ধুলোকে মন্দ কয়্॥
রাধার্ চরণে যার্ লেখা নাম্।
এখন্ তোদের পায়ে, ধরালে সে শ্যাম্॥

ভাবতে বালগে [বল্‌গে] যা তোদের রাজাকে, এমন অভিমান্ কতবার্ ভিক্ষে লয়েছে।

অন্তরা।

কথা কইতে গেলে, নয়ন্ জলে, অঙ্গ ভেসে যায়্।
রাধা রাজার দাসী, এ রাজ্যে আসি, কাঁদিতেছে দরজায়॥
এমন্ নিষ্ঠুর্ ভূপতি, আমাদের্ শ্রীমতী যে নয়।
পেয়ে কাঙ্গালিনীর ভয়, অন্তঃপুরে গিয়ে রয়॥
আমরা দয়াল রাজ্যে বাস করি।
চাইলে উল্‌টে ভিক্ষে দে যেতে পারি॥

মনে কর্ত্তে বল্ তোদের রাজাকে, বুঝি আপ্‌নার সে দীনতা ভুলে গিয়েছে।

[অতি বিচিত্র।]

১ আশ্বিনের পত্রে প্রকাশ হয়।

"পোড়া প্রেম্ কোরে তোর্ পোড়ায় আমার জন্মটা গেলো।"

এই গানের অপর কিয়দংশ প্রাপ্ত হইয়া নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।

মহড়া।

পোড়া প্রেম্ কোরে তোর্ পোড়ায় আমার্ জন্মটা গেলো।

যত দিন হোয়েছে মিলন্, একদিন্ নাই তার কান্না বারণ, পোড়া শিবের দশা যেমন, তাই আমার হোলো।

ভেবে ভেবে হৃদের মধু হৃদে শুখালো।
আর্ তো দৃষ্টিপোড়ায় পুড়্‌তে পারিনে।
সোণার বর্ণ ছিলো, কালী হোলো, চোকের মাথা খেয়ে চেয়ে দেখিসনে॥

অনল নেবালে নিবেনা; সদাই উঠে জলিয়ে, বুঝি তোমা হোতে প্রেমের্ সাধ্ ফুরালো॥

চিতেন।

অনেকেতো অনেক পীরিৎ করে, এমন্ দশা বলো কার্।
কর্ম্মভোগের যেমন্ কপাল্ আমার্, এমন্ খুঁজে মেলা ভার॥
অস্থি ভাজা ভাজা হোলো প্রেমের দায়্।
ভেবে তোর্ গুণাগুণ, মনের আগুন্, জ্বল্‌ছে যেন রাবণেরি চিতা প্রায়॥
কেবল্ ঘরে দিলে দেখা, করিস্ মুখ বাঁকা, গিয়ে আর্ আর্ লোকের কাছে থাকিস্ ভালো।

[এই গান নিজ দলে গাহিয়াছিলেন। ইহার অপরাংশ ও পাল্টা প্রাপ্ত হইলাম না।]

[১৫] মহড়া।

নাথো, কোন গুণে মন্ চায় তবু তোমাকে।
ঝোরে প্রাণ্, আমার দুনয়ান্, এক্‌তিলো না দেখে॥

চিতেন।

তুমি শরীর্ বেদন্ জাননা লম্পট আপনি।
প্রীতি ডোরে, বন্ধি কোরে, বধ্ কর রমণী॥
হানো দারুণো বিচ্ছেদো শেলো, যুবতীরো বুকে।

অন্তরা।

ওরে প্রাণ, আমি অবলা, বুঝিতে না পারি।
কথায় কথায়, তুমি আমায় কর চাতুরী॥

চিতেন।

আমি সরল ভাবে তোমায় প্রাণ, রাখ্‌বো কেমন্ কোরে।
তুমি যে দেবে দুখ্ আমায়, জান্‌বো কি প্রকারে॥
পোড়া পীরিতি করিয়ে আমার্, জন্ম গেল দুখে।
[মোহন সরকার এই গান গাহিয়াছিলেন।]

মহড়া।

আমার যৌবন কিনে লয়, প্রেমধন দেয়, এমন্ পাইনে রসিক ব্যাপারী।
আমারো এদেশে, অনেকে আছে, তারা কয়রে প্রেমেতে চাতুরী॥
কেবল্ মিছে ভ্রমে, ভ্রমে মরি॥
অরসিক্ গ্রাহকে এ রস চায়্।
মূল্য শুনে কাণে, মাথা নোওয়ায়্॥
পশরা নামাতে এসে অনেকে, আগে দুই বাহু পশারি॥

চিতেন।

মদনো রাজারো, প্রেমেরো বাজারে, এলে প্রেম লাভো হয়্।
রসিকে রমণী, এলেম্ আমি, সেই আশয়্॥
আগে কে জানে সই এ বিবরণ্।
কপট মহাজন্ হেথা এমন্॥
নূতন ব্যবসায় রমণী পেলে, ফেরে ফারে করে চাতুরী।

অন্তরা।

এই অবলা সরলা, প্রেমের জ্বালা, ভার হয়্ আপনার্ সহিতে।
যৌবন রসেরো, ভারো অতি ভারো, নারী নারি আরো বহিতে॥

চিতেন।

গোপেতে গোরসো, লয়ে দেশো দেশো, ভ্রমণো করে যেমন্।
এত নয়্ তাদৃশ গছাবার ধন্॥
রসিকো, গ্রাহকো যদ্যপি পাই।
বিরলে বিক্রয়ো করি তার্ ঠাঁই॥
আমারে কিনিবে যৌবন কিনে, কেনা হব আমি তাহারি।
[হায় রাম বসু! জগদীশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করিলেন না!]
এই গীতের পাল্‌টা যখন পাইব তখন কি আহ্লাদ হইবে?

——

মহড়া।

বল কার্ অনুরোধে ছিলে প্রাণ্।
ছিলে আমার বশ্, কি যৌবনের বশ, কি সেই প্রেমের বশে প্রেমোরসে ডুব্‌তে প্রাণ॥

রাখিতেছে অধীনীর সম্মান্ ।
অভিমানী হোতেম্ হে তোমায় ।
প্রাণোনাথ্, কার্ সোহাগে অনুরাগে ধর্ত্তে আমার্ পায়্ ॥
তুমি আমি যে সেই আছি, তবে কিসে গেলো সে সম্মান ॥

চিতেন ।

আবাহনো কোরে প্রেম্, দিলে বিসর্জ্জন ।
সে যেমন্ হোক্, হোয়েছে, আমার কপালে ছিলহে যেমন্ ॥
রঙ্গরসে ছিলেম্ এত দিন্ ।
প্রাণোনাথ্, প্রেমের পথে, দুজনাতে কে কারো অধীন ॥
শেষে যদি করিবে এমন্, কেন আগে বাড়াইলে মান্ ॥

অন্তরা ।

ওরে প্রাণরে, কথা কবার্ নয়, কইতে ফাটে হিয়ে ।
পূজ্য ছিলেম্, তেজ্য, হোলেম্, যৌবনো গিয়ে ॥

চিতেন ।

দৈব দেখা প্রাণোনাথ্, হোতো হে পথে ।
আপ্না আপ্নি ভুলিতে, হাতে আকাশের চন্দ্র পাইতে ॥
এখন্তো সেই পথের দেখা হয় ।
প্রাণোনাথ্, লজ্জাতে মুখ্ ঢাকো যেন ঠেকেছো কি দায় ।
প্রেমো গ্যাছে, যৌবন গ্যাছে, শেষে তুমি করিলে প্রস্থান ॥

গত ১ কার্ত্তিকের পত্রে এই গানের কেবল মহড়া প্রকাশ করিয়াছিলাম। অন্ত সমুদয় প্রাপ্ত হইয়াছি। ঠাকুরদাস সিংহ গাহিয়াছিলেন। এই গানের দ্বারা রাম বসু চিরস্মরণীয় হইতেছেন।

রাম বসু*

[চার]

[১০] গত আশ্বিন, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিবসীয় প্রভাকরে আমরা রাম বসুর প্রণীত অনেক গুলীন সংপূর্ণ ও অসংপূর্ণ কবিতা প্রকাশ করিয়াছি, তৎপাঠে সন্তুষ্ট না হইয়াছেন এমত ব্যক্তি কেহই নাই; ফলে ইহাতে সন্তোষ ভিন্ন অসন্তোষ জন্মিবার কারণ কিছুই দেখিতে পাই না, কারণ অমৃত ভোজনে কাহার রসনা তৃপ্ত না হয়? কাহার অরুচি জন্মিয়া থাকে? রাম বসুর গীত সুধাধিক সুধাপূর্ণ, অমৃত হইতেও অমৃত। যেমন ঘৃত ভোজনে ক্রমশই রসনার বাসনার আধিক্য হইতে থাকে—যেমন সুগন্ধি কুসুমের আঘ্রাণ গ্রহণে নাসিকারন্ধ্র আমোদে পূর্ণ হইতেই থাকে—যেমন কলরবের কুহু কুহু কলরব কলনায় শ্রবণের শ্রবণ সুখের উন্নতি হইতেই থাকে—যেমন সুখদ সুরভি সাময়িক সুশীতল মৃদুল প্রাতঃসমীরণ স্পর্শে গাত্র পাত্র পুলকে পরিপূরিত হইতেই থাকে—যেমন মনোহর মূর্ত্তিধারি তিমিরারি তরুণ অরুণের চারু প্রভাতে প্রভাতে নেত্র নীরজের প্রফুল্লতাই প্রকাশ পাইতে থাকে, সেই রূপ এই মৃত কবির অমৃত পূরিত কবিতাকদম্ব কণ্ঠে উচ্চারণ করিতে, পাঠ করিতে, স্বরে গান করিতে, শ্রবণে শ্রবণ করিতে কোন কালেই প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয় না, ক্রমেই আসক্তি প্রশক্তির প্রাচুর্য্য হইতেই থাকে। এপ্রযুক্ত উক্ত বিষয় সংগ্রহ নিমিত্ত নিয়ত নিযুক্ত হইয়া কত ক্লেশের ভুক্তভোগি হইলাম তাহা উক্ত করিবার নহে। জগদীশ্বর আর কত দিনে এই আশা-পাশ হইতে মুক্ত করিবেন তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক, এই শ্রমকে শ্রম বলিয়াই জ্ঞান হয় না—লোকের উপাসনাকে উপাসনাই বোধ হয় না—কেহ অমর্য্যাদা করিলে তাহাতে ক্রোধ হয় না। যিনি এই প্রার্থিত বিষয়ে সাহায্য করেন, তাঁহার উপকার ঋণ কিছুতেই শোধ হয় না। যাঁহার নিকট যৎকিঞ্চিৎ যাহা প্রাপ্ত হই, তাঁহার স্থানে বিনা বেতনে যাবজ্জীবনের জন্য বিক্রীত হইয়া থাকি। যাহা হউক, অদ্য এই সূত্রে অধিক লেখনের প্রয়োজন করে না, তাহাতে কেবল বিষয়ের বাহুল্য করাই হয়। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সমস্ত অসংপূর্ণ গান প্রকাশ করিয়াছি তাহার কোন কোন গানের সংপূর্ণাংশ এবং তদতিরিক্ত অপর কয়েকটি গীত অতি যত্নে সংগ্রহ করিয়া নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম, পাঠক মহাশয়েরা অবলোকন করুন।

---

* সংবাদপ্রভাকর, শনিবার ১ মাঘ ১২৬১ সাল। ইং ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৫ সাল।—স.

মহড়া।

হর নইহে আমি যুবতী।
কেন জ্বালাতে এলে রতিপতি॥
কোরো না আমার দুর্গতি।
বিচ্ছেদ লাবণ্য, হোয়েছে বিবর্ণ, ধোরেছি শঙ্করের আকৃতি॥

চিতেন।

ক্ষীণ দেখে অঙ্গ, আজ্ অনঙ্গ একি রঙ্গ হে তোমার।
হর ভ্রমে শরাঘাত কেন করিতেছ বারেবার॥
ছিন্ন ভিন্ন বেশো, দেখে কও মহেশো, চেননা, পুরুষো প্রকৃতি॥

অন্তরা।

হায়, শুন শম্ভু অরি, ভেবে ত্রিপুরারি, বৈরি হওনা আমার।
বিচ্ছেদে এ দশা, বিগলিত কেশা, নহে নহে এতো জটাভার॥

চিতেন।

কণ্ঠে কালকূট নহে, দেখ পোরেছি নীল রতন।
অরুণো হোলো নয়ন্, কোরে পতি বিরহে রোদন॥
এ অঙ্গ আমারো, ধূলায়ে ধূষরো, মাখি নাই মাখি নাই বিভূতি॥

[এই গীত ভবানে বেণে গাহিয়াছিল, রাম বসু যখন প্রস্তুত করেন, তখন তাঁহার বয়স পঞ্চদশ বৎসরের ঊর্দ্ধ না হইতে পারে। দেখুন, এতদ্রূপ বাল্যাবস্থার গান কত দূর পর্য্যন্ত উত্তম হইয়াছে।]

মহড়া।

কোকিলে কি সময়ো পেলে॥*
তুমি এত দিন কোথা ছিলে।
কাল্ গুণে কাল্, তুমিও হোলে॥
একেতো বসন্ত ভূপতি।
অবিচারে মারে যুবতী॥
হোয়ে পক্ষ, তারি পক্ষ, নারী বধিতে এলে।

[এই গানের আর কিছুই প্রাপ্ত হই নাই, ইহার দ্বিতীয় গানের কিয়দংশ নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।]

---

*প্রীতিগীতিতে (১৬ ৪ নং) সম্পূর্ণ উদ্ধৃত। কিন্তু সেখানে ঠাকুরদাস চক্রবর্তী রচিত বলে উল্লিখিত।—স.

মহড়া।

রমণীরে সকলে নিদয়।
কেহ নারীর হিতকারী নয়॥

[১১] চিতেন।

পাণ্ডব খাণ্ডব বন, দহিল যখন।
নানা জাতি পক্ষি তাতে, হইল দাহন॥
কোকিলে মরিত যদি তায়।
তবে কি কুরবে প্রাণো যায়॥
বিরহিণী বধিবারে, বাঁচাইল ধনঞ্জয়॥

[কি পরিতাপ! এই উৎকৃষ্ট গীতের অপর কিছুই প্রাপ্ত হইলাম না।]

মহড়া।

তুমি হও মহাজন্ অবলার॥
বাঁধা রেখে মন, লব প্রেম ধন আমার যৌবন্ হবে জামিন্ দার।
পীরিতেরি খাতক্ আমি হবহে তোমার॥
পরিশোধ না হবে প্রণয়।
মন্ বাঁধা থাকিবে আমার, প্রাণ্ যত দিন্ রয়॥
স্থদে স্থখো ভুঞ্জ চিরদিন্, মোলে এধারে হবে উদ্ধার॥

চিতেন।

এসেছি পীরিতের দেশে প্রাণ্, প্রেমিক না পাই।
হেন স্থানো নাহি, প্রাণো, স'পে প্রাণ্ জুড়াই॥
পেয়েছি হে প্রেমিক তোমায়।
বাঁকতো কোরোনা বঁধু, ফিকিতো আমায়॥
আপনার্ কোরে, লও আমারে, প্রেম নিধি দিয়ে ধার।

[আশ্চর্য্য।]

মহড়া।

এক্‌বার্‌ আয়্‌ উমা, তোমারে মা, করিগো কোলে॥
বিধুমুখে ওগো জননি, ডাকো জননী বোলে।
তুমিতো ভাবনা মা বোলে॥
তোমা বিনে যে দুখো গেছে।
সে সব কথা, কব উমা, তোমারো কাছে।
বর্ষাবধি, পরে যদি, অজনে দেখা দিলে।

চিতেন।

মেনকা কহিছে উমা তোমা বিহনে।
অন্ধকারো ছিলো সবো, গিরি ভবনে॥
ঘুচিল তিমির নিশাচয়।
উমা মা আসি, পূর্ণশশী, হইলে উদয়॥
অঞ্চলে অঞ্চলের নিধি, বিধি আনি মিলালো।

[ইহার অন্তরা পাই নাই। অতি উত্তম।]

মহড়া।

পূর্ব্বাপর নারীর মত অবিশ্বাসী কে আছে।

নিজে বিপক্ষেরে দিয়ে পতির মৃত্যুবাণ, দেখো মন্দোদরী সতী পতি বোধেছে॥

নারীর্‌ হাতে সঁপে ধন প্রাণ, প্রাণ্‌ যেতে বোসেছে।

আমি সাধ্‌ কোরে কি করি খেদ্‌।

নারী মন্ত্রণাতে, দিতে পারে, ভাই ভেয়ে কোরে বিচ্ছেদ্‌॥

ধোরে তিলোত্তমা নারী মোহিনীরে বেশ্‌, দেখো সিন্ধু উপসিন্ধু প্রাণে মেরেছে॥

চিতেন।

ঘুণাগ্রেতে যদি করি দোষ্‌ তিলে কোরে বোসো তাল।
না জানি কারণো কও প্রিয়ে, কেমন্‌ পুরুষের্‌ কপাল্‌॥
তুমি আত্ম ছিদ্র লুকায়ে।

পেলে পরের ছিদ্র, পাড়ায় পাড়ায় বেড়াও ঢেঁড়্রা ফিরায়ে ॥

নারীর্ নাই কিছু মমতা, দারুণ বিধাতা, কেবল্ পুরুষে বধিতে যৌবন্ দিয়েছে ॥

অন্তরা।

যদি অবলা অবলা, বল তবে প্রাণ্, সবলা কে আছে আর।

বলে চতুর্গুণ, ছলে অষ্টগুণ, ভাবের্ অন্ত পাওয়া ভার ॥

চিতেন।

কামিনী কোমল কে কহেরে প্রাণ, হৃদয় অতি কঠিন্।

এক ঐক্যে, এক বাক্যে, এক পক্ষে, থাকে না এক দিন্ ॥

যেমন্ সসর্পে গৃহেতে বাস্।

হোলে দুষ্টা ভার্য্যা, বেড়ায় গর্জ্জ্যে, খেলে খেলে এম্নি ত্রাস্ ॥

ধনি তা নিলেরে প্রাণ্, বোধে পতির প্রাণ্, দেখো রাজ্কুমারী সতী কোটাল ভোজেছে।

[চমৎকার, চমৎকার।]

মহড়া।

গেল তিন্ দিনে প্রেম্, চিরদিনে, বিচ্ছেদ গেলোনা।

রসাভাবে, গেল ঘৃণ্য কোরে সে, পোড়া বিচ্ছেদের মনে কি ঘৃণা হোলোনা ॥

* * * *

হোলো তিন দিনে ছাড়াছাড়ি।

পোড়া বিচ্ছেদের্ কি, হয়োগো সখি, অবলারি সঙ্গেতে এত আড়ি ॥

* * * *

চিতেন।

আমার কপালে অল্প ভোগ্, প্রেমের কল্পযোগ্, করা ভার্।

ত্রিরাত্রি না যেতে অত্রযোগ, কেবল কর্ম্ম ভোগ্ হোলো সার্ ॥

কেমন্ হাবাতে কপাল্ আমার।

প্রেমের্ উদ্যোগী যে, সম্ভোগী সে, হোয়েছিল ছুটিবার্ কি একুটিবার ॥

আমার্ অকলঙ্ক চাঁদে, কলঙ্কেরি দাগ, বিচ্ছেদ্ একবারতো সেটা মনে ভাব্লেনা ॥

[কি আশ্চর্য্য রচনা! আহা! ইহার অপরাংশ প্রাপ্ত হইলাম না, এই গানের পাল্‌টার অসংপূর্ণ কিয়দংশ নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।]

মহড়া।

বোলো প্রাণনাথেরে, বিচ্ছেদকে তার, ডেকে নেযেতে।

থাকে আরো ধার্ আমি শুধে আস্‌বো তার্, এত তস্রিল করে কেন মসিল বরাতে॥

বাজে আসি আসি এমন্ বিনয় ভিক্ষা মাগাতে।

* * * *

দিয়ে উদোর্ ঘাড়ে তুলে, বুদোর্ ঘাড়ের মোট্, আমায় ফেলে গেল ফাঁকের শাঁকের করাতে।

* * * *

দিয়ে মনের বনে, আগুণ, প্রাণ জ্বলালে সে, তবু পাল্লে না বিচ্ছেদের্ বাসা পোড়াতে॥

* * * *

আপ্‌নি শাসন্ না কোরে এই, যৌবনের তালুক্, আমি তারে কি বোলেছি পত্তুনি দিতে।

[কি আক্ষেপ! এতদ্রূপ অত্যুৎকৃষ্ট গীতের আদি অন্ত প্রাপ্ত হইলাম না। যদি কেহ অনুগ্রহ পূর্ব্বক [১২] প্রদান করিতে পারেন তবে তাঁহার নিকট বিশেষ বাধ্যতা স্বীকার করিব।]

মহড়া।

হায় বিধাতা, এই ছিল কি আমার কপালে।

একি প্রেম্ ঘটনা, কি লাঞ্ছনা, ভেকের বাসা কমলে॥

* * * *

চিতেন।

আমি জন্মে জানিনে প্রেম যাতনা, মনে পড়ে না।

সই তুমি মজালে তোমার, ধর্ম্মে সবেনা॥

স্বর্ণ পিঞ্জর আছে সজনি, কেন বায়স এনে বসালে।

[এই গীতের সমুদয় পাইলে কি সুখের বিষয় হইত! বোধ করি কোন মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রেরণ করিবেন।]

ওহে বাঁকা বংশিধারি।

আজ মিলেছে হে তোমায় বাঁকা, কুবুজা নারী।

বাঁকায় বাঁকায় বড়ই ভাব, নাহি চাতুরী।

রাধা সে সরলা রমণী।

তুমি নিজে বাঁকা আপনি॥

মথুরা নাগরী পেয়ে, হরি ফিরিছ চক্র কার।

[ইহার আর কিছুই পাই পাই, ভবানে বেণে এই গীত গাহিয়াছিল। তৎকালে কবির বয়স ১৫।১৬ বর্ষের অধিক নহে।]

মহড়া।

নটবর দেখেগো সে সখি।

তার্ নাম্ জানিনে কালোবরণ, ভঙ্গি বাঁকা, বাঁকা আঁখি॥

যাই যদি যমুনার জলে, সে কালা কদম্ব তলে, হাসি হাসি, বাজায় বাঁশ, বাঁশির দাসী হোয়ে থাকি।

চিতেন।

ভুবন মোহন ভঙ্গি অতি চমৎকার।

সে যে মন্মথ মন্মথরূপ, ত্রিভঙ্গিম আকার॥

চাইলে সে চাঁদ্ বদন্ পানে, শরীর্ প্রাণ কি ধৈর্য্য মানে, একবার্ হেরে মরি প্রাণে, প্রেমে ঝোরে দুটি আঁখি॥

[এই গীতটি উক্ত গীতের সমবয়স্ক। ইহার অন্তরা পাইলাম না।]

মহড়া।

নৈলে কিছুই নয়।*

বটে সুখোনিধি, প্রেম যদি, সুজনে হয়॥

সুজনে কুজনে প্রেমে, নাহি সুখোদয়।

উভয়ে উত্তম্, পরিশ্রম্, যদি করে।

তবে যতনে এধনে রাখিতে পারে॥

সুখের সুখি, দুখের দুখি, দোঁহে দোঁহায় হোয়ে রয়॥

[ইহার অপরাংশ পাইলাম না। এই গান নীলুঠাকুর গাহিয়াছিলেন।]

---

* বাঙ্গালীর গানে (পৃ ১৫৯) সম্পূর্ণ উদ্ধৃত।—স.

মহড়া।

বঁধু কোন্ ভাবে এ ভাবে দরশন।
কোরে মধুর্ মধুর্ আলাপন॥
কত দিনো প্রাণো তুমি, হোয়েছ এমন।
প্রিয়বাক্যে প্রেয়সী বলিয়ে আমায়।
ডাকিছ প্রেমরসে রসরায়॥
ভুজঙ্গেরো মুখে যেন, সুধা বরিষণ॥
ঐ ঐ

মহড়া।

সখি প্রেম কোরে অনেকের এই দশা হয়।
শুধু তুমি আমি বোলে নয়॥

* * *

চিতেন।

যা বলিলে প্রাণ সই, সকলি স্বরূপ।
মজেছি পীরিতে, তেজিবে কি রূপ॥
দেখো দেখো সজনি, থেকো সাবধান।
রেখো আপনি, আপনারো মান॥
দুখে কর সুখো জ্ঞানো, ভেবনা সংশয়॥
ঐ ঐ

মহড়া।

আগে মন্ ভেঙ্গে শেষ যতন্।
আর্ কি এ প্রেম্ গড়ে?
সেখোরে এখনো প্রাণো, কেবল্ রাগ্ বাড়ে।
মিছে জ্বালাও কেন, তোমার গুণো বিঁধিয়াছে হাড়ে হাড়ে।

চিতেন।

প্রাণ যদি এক বৃক্ষ কেউ করিয়ে রোপণ।
ফল পায়, কোরে তায় কত যতন ॥
তুমি খল্ স্বভাবি প্রেম্ তরুরো, মূল ফেলেছ আগে ছিঁড়ে ॥

[এই গীত মোহন সরকার গাহিয়াছিলেন।]

মহড়া।

যা ভাবো তা নয়।
মনের সাধ্ গেলে কি, বল দেখি, অনুরোধে প্রেম্ কি রয় ॥
মিছে আর্ কোরোনা বিনয়।
বিনে ঐক্যে, বিনয়্ বাক্যে প্রাণ্, বল্ পর কি আপনার হয় ॥

চিতেন।

মিছে কেন আকিঞ্চন, কর ওরে প্রাণ।
মন ভুল্‌বেনা, আর খুল্‌বেনা সেই বিচ্ছেদের বাণ।
দাগা পেয়ে ভোগায় ভুলে আর্ বল নিত্তি কে যাতনা সয়।

অন্তরা।

জাগা ঘরে যায় চুরি, এমন্ তো ভেবনা প্রাণ।
ঠেকে ঠেকে, দেখে দেখে, হোয়েছি সাবধান ॥

চিতেন।

কুতর্কে লওয়াবে কি আর্ সতর্কে আছি।
হব খলের বশ, এখন্ নাই সে রস, নিজ মনকে বেঁধেছি।
জলে ফেলে অঞ্চলের নিধি, এখন্ তত্ত্ব কর নগর ময় ॥

[অতি সুন্দর, অতি সুন্দর।]

মহড়া।

দেশ চলালেম্ প্রেম্ কোরে সই, প্রাণ্ গেলে বাঁচি।

বিচ্ছেদ্ বিষে, লোকের রিষে, আমি দুই জ্বালাতে জল্‌তেছি॥

*　　　*　　　*　　　*

চিতেন।

না বুঝে মজেছি প্রেমে, কপাল ক্রমে, একে হোলো আর।

আমি প্রাণ্ জুড়াতে গেলেম্, শেষে প্রাণ বাঁচানো ভার॥

[১৩]　একে নব ভাব্ অনুরাগ, পড়ে মনে।

প্রাণ্ সঁপিলাম তারে আমি না জেনে শুনে॥

চোরেরো রমণী যেমন্ সই, তেম্‌নি মর্ম্মে মোরে আছি॥

[উৎকৃষ্ট, উৎকৃষ্ট।]

মহড়া।

যাও প্রাণনাথের কাছে বিচ্ছেদ্ একোবার।

যাতে বদ্ধ আছে বঁধুর প্রাণ, হানেগো তায় বিচ্ছেদ্ বাণ, যদি জ্বালায় জ্বোলে, আমার বোলে, মনে পড়ে তার॥

রাখো রাখো এই বিনতি অধীনী জনার॥

যাতে মত্ত আছে সে যে, মত্ত মাতঙ্গ।

কর গিয়ে সে প্রেমের সুহৃতো ভঙ্গ॥

তুমি গেলে তার প্রবৃত্তি, অমনি হবে নিবৃত্তি, বসন্তে বিদেশী হোয়ে রবেনা সে আর॥

চিতেন।

বিরহিণী আমি রমণী, পতি প্রবাসে আমার।

যৌবন্‌কালে হোয়েছি, আশ্রিতা তোমার॥

ওহে বিচ্ছেদ্ তোমার বিচ্ছেদ্ দায়, নাথো না জানে।

অন্য নারীর্ প্রেমোস্থখে, আছে সেখানে।

তারে জ্বলাতে পার্‌না, আমায় দেও যাতনা, ছিছি, অবলা বধিলে নাহি পৌরুষো তোমার॥

অন্তরা।

সকাতরে হাঁরে বিচ্ছেদ্ করি তোরে বিনতি।

কামিনীরো প্রাণো রেখে, রাখো সুখ্যাতি ॥

চিতেন।

হোয়ে আমার অন্তরের অন্তর্, নাথের্ অন্তরেতে যাও।

প্রণয়্ কোরে অপ্রণয়্, প্রণয়গে ঘটাও ॥

বিচ্ছেদ্ ব্যথার ব্যথা কিছু তায়, দিও বিশেষ।

নারীর প্রাণে কত ব্যথা, জানে যেন সে।

আমায় কোরেছে স্থূলে ভুল, ভেবে হোলো প্রাণাকুল, অকূলেতে কুল রক্ষা কর কুলজার ॥

[অত্যাশ্চর্য্য।]

মহড়া।

ওহে প্রাণোনাথো, পীরিৎ হোলো বিচ্ছেদের প্রজা।

শুনেছি প্রেমনগরে, বিচ্ছেদ রাজত্ব করে, রসিকেরে প্রাণে মারে সেই দুরন্ত রাজা ॥

প্রেমিক জনারে দেয়, বিরহ সাজা ॥

প্রেমের্ দেশে প্রাণ্নাথোহে, বিচ্ছেদ্ ভূপতি।

তার্ আতঙ্কে মরি, মনে ভয় করি, কেমন্ কোরে কর্ব্ব পীরিতি ॥

*   *   *   *

চিতেন।

তুমি নিত্য নিত্য বল আমায় প্রেমো করিতে।

মনে সাধ হয়, আবার্ করি ভয়, প্রাণ্রে, তোমায় প্রাণ্ দিতে।

নূতন প্রেম বাজার, বিচ্ছেদ রাজার, অধিকার।

নবীনা যুবতী, করিলে পীরিতি, বিচ্ছেদ তো কর্ লবে আমার ॥

শেষে আমাকে প্রাণবনা, হবেহে লাঞ্ছনা, কেবল্ কুলেতে উঠিবে কলঙ্ক ধ্বজা ॥

[উত্তম, উত্তম। আর কিছুই পাইলাম না।]

মহড়া।

প্রেমের্ কথা, যেথা সেথা, কারো কাছে বোলোনা।

আছি ভাল দুজনায়, অনেকে বিবাদি তায়, জাননা যে পরের ভাল, পরে দেখ্‌তে পারে না॥

[কি দুঃখ! এমত উৎকৃষ্ট কবিতার সমুদয় প্রাপ্ত হইলাম না]

মহড়া।

এবার্ আমি পণ কোরেছি, মন্‌কে পীরিৎ ছাড়াবো।

ঘুচ্‌লো আশাপথ, এমন ভণ্ড প্রেমে দণ্ডবৎ, বরণ্ বিচ্ছেদেরে নিয়ে প্রাণ্ জুড়াবো॥

ঐ ঐ

মহড়া।

আহা মরি কিবে ভালবাসো আমারে।

বল্‌তে তোমার গুণ্, লোহায় লাগে ঘুণ, জলে আগুণ জ্বলে আবার পাষাণ বিদরে॥

ঐ ঐ

মহড়া।

ছেড়েছি পীরিতের আশা, পীরিৎ তোমার বাসা ভেঙ্গে যাও।

যার্ সঙ্গেতে, এসেছিলে আমার অঙ্গেতে, সে গেল আর্ তুমি কেন, দুখিনীর মুখ্ দেখ্‌তে চাও।

*   *   *   *

চিতেন।

তাইতে বলি পীরিৎ আমি ছেড়ে যাও তুমি।

এক্ষণে, তোমারি সনে, থাক্‌বো কেমনে আমি॥

তুমি পীরিৎ আত্ম সুখে সুখী।

অনাথিনী, বিরহিণীর, কাছে তোমার্ কার্য্য কি॥

তুমি পর, আমি পর, সেও তো পর, পর্ মজানে পীরিৎ তুমি, মিছে আর অঙ্গ জ্বলাও॥

[সমুদয় পাইলাম না]

মহড়া।

দ্বারী একবার বল্ তোদের, কৃষ্ণ রাজার সাক্ষাতে।*

গোপিনী, কৃষ্ণ তাপে তাপিনী, তোমায় দেখ্‌বে বোলে আছে বোসে রাজ-পথে॥

এসেছি আমরা অনেক দুঃখেতে॥

তোদের রাজা নাকি দয়াময়।

দুখিনীর্ দুখ্ দেখ্‌লে, দেখ্‌বো কেমন্ দয়া হয়॥

ইথে হবে তোমার পুণ্য, কর আশা পূর্ণ, প্রসন্ন হোয়ে গোপীর পক্ষেতে॥

চিতেন।

বৃন্দে বিরহে কাতরা, হইয়ে সত্বরা, রাজ্ দ্বারে দাঁড়ায়ে কয়।

মধুর রাজ্যের অধিপতি কৃষ্ণ, শুনে তাইতে এলেম্ কংসালয়॥

মনে অন্য অভিলাষো নাই।

রাখাল্ রাজার বেশ, কেমন্ শোভা দেখে যাই॥

কোথা ভূপতি, জানাও শীঘ্রগতি, বিনতি করি ধরি করেতে॥

অন্তরা।

তাই এত তোয়্ বিনয় কোরে বলি।

বড় তাপিত্ হোয়ে এসেছি দ্বারী।

তাই এত তোয়, বিনয় কোরে বলি।

[১৪] দংশিয়ে পলায়েছে কালিয়ে কালোবরণ ফণী, আমরা সেই জ্বালায় জ্বলি॥

চিতেন।

বিষে না মানে জলসার, হোয়েছে যে রাধার, আর্‌তো না দেখি উপায়।

মণিমন্ত্র জানে তোদের রাজা দ্বারী, তাইরে এলেম্ মথুরায়॥

এই আমরা শুনেছি নিশ্চয়।

রাজার দৃষ্টি মাত্রেই, সে বিষো নির্ব্বিষো হয়॥

কৃষ্ণ প্রেমের বিষে, কৃষ্ণ বিচ্ছেদ বিষে, ব্রহ্মাণ্ডে ঔষধো নাই জুড়াতে॥

[সর্ব্বাংশেই সুন্দর।]

---

* প্রীতিগীতিতে (২৩৬৬) কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্যের রচনা বলে উল্লিখিত।—স.

মহড়া।

যদি বেঁচে থাকি, ওগো সখি শঠের সঙ্গে আর পীরিৎ কোর্ব্ব না।

না কোরে প্রেম ছিলাম্ ভালো, কোরে একি জ্বালা হোলো, লজ্জা সরম সকল গেলো, কেউ ভাল বলে না।

পীরিতের বাজারে সই, আর যাব না।

মিছে ছল্ কোরে বোলে কিবে ফল।

মনের মিলন্ ছিলো, বিচ্ছেদ হোলো, হংসমুখে পীরিৎ যেন দুগ্ধ জল॥

* * * *

চিতেন।

পীরিতে জীবন জুড়াতে, সখি পরের হাতে স'পেছিলাম্ প্রাণ।

আমার কুল্ গেলো, কলঙ্ক হোলো ঘরে পরে সবাই করে অপমান॥

পীরিৎ সুহৃৎ হোয়ে হোলো বিপক্ষ।

যেমন্ খলের মিলন জলের লিখন, সদ্য সদ্য ঘুচে গেলো সম্পর্ক॥

দেখে কুতর্ক কুব্যবহার, সতর্কে আছি এবার, পরের্ পরকীয় রসে ভুল্‌বনা॥

[সমুদয় পাইলাম না। সর্ব্বতোভাবেই উত্তম।]

মহড়া।

কও দেখিহে নূতন্ নাগর, একি নূতন্ ভাব রাখা।

হোয়ে কামিনী, জেগে পোহাই যামিনী, ছ মাসে ন মাসে তোমার পাইনেকো দেখা॥

এমন্ নূতন্ ভাব্, কে তোমায় শিখালে সখা॥

কেবল্ পর মজাতে জানো।

থাকো আপন্ সুখে, পরের দুখে, দুখী হওনা কখনো॥

তোমার তাদৃশী প্রীরিতি, দেখি ওরে প্রাণ, যেমন্ খলের পীরিৎ বলে জলের রেখা॥

চিতেন।

নূতন্ প্রেমে আমায় মজালে, কোরে নূতন্ আকিঞ্চন।
নূতন্ ভাব্ ধোরে নূতন্ স্বভাব, হোরে নিলে মন॥
নূতন্ প্রেম বাড়াবার্ লেগে।
এসে নিত্তি সখা, দিতে দেখা, নূতন্ নূতন্ সোহাগে॥

এখন্ কোথা রৈলো তোমার সে সব নূতন্ ভাব, পেলে ছুতো লতা কর বদনো বাঁকা।

অন্তরা।

প্রাণ্ এত যদি ছিল মনে, তবে কেনে, মজালে আমায়॥
আমি অবলা, কুলেরো বালা, এত জ্বালা কি সহা যায়॥

চিতেন।

শীলতা, শমতা, কোথা ওরে প্রাণ, কোথা নূতন্ আলাপন।
নূতন ছল, এমন্ নূতন্ কৌশল, কোথা তুমি শিখেছ প্রাণধন॥

* * *

[আর পাইলাম না।]

মহড়া।

তোমার, বিচ্ছেদেরে বুকে রেখে প্রাণ্ জড়াব [জুড়াব] প্রাণ।
শুনে রুষ্ট বচন, হোলেম্ তুষ্ট এখন, উষ্ণ জলে করে যেমন, অনল নির্ব্বাণ॥

* * *

বিষক্রমি, সম আমি, করি বিষ্ খেয়ে অমৃত জ্ঞান॥

চিতেন।

গেল গেল পীরিৎ গেল প্রাণ্, ভাল বাঁচিল জীবন।
দরশন, পরশন, ঘুচ্লো প্রাণ্ এখন।
হোলো চক্ষু কর্ণেতে যেন ছমাসের পথ।
কাণে শুনে প্রাণ জুড়াব, দেখায় দণ্ডবত্॥
পাষাণ্ হোয়ে, থাক্‌বো সোয়ে, পার যত কর অপমান॥

[আহা! এমত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর গীত আর না কি শুনা গিয়াছে। কি আক্ষেপ! ইহার আর কিছুই প্রাপ্ত হইলাম না।]

মহড়া।

এভাবের্ ভাব্ রবে কত দিন।

প্রাণ্ যতনে মন্ যোগাও না, পরিত্যাগো কর না, আমি যেন হোয়ে আছি জালে গাঁথা মীন॥

* * *

চিতেন।

যে ভাব ছিল পূর্ব্বেতে প্রাণ্, সে ভাব্ দেখিনে।
তোমার্ অভাব দেখে, স্বভাব দোষ, আমি ভুল্‌তে পারিনে॥
দেখা হোলে, সখাবোলে, আদরে ডাকি।
তুমি বল ভাল্‌তো জ্বালা, এপাপ্ আবার কি॥
আপন্ বোলে, সাধ্‌তে গেলে তুমি ভাবো ভিন্॥

[আর কিছুই পাইলাম না।]

মহড়া।

দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণ্‌নাথ, বদন্ ঢেকে যেওনা।

তোমায় ভালবাসি তাই, চোখের দেখা দেখ্‌তে চাই, কিছু থাকো থাকো বোলে ধরে রাখ্‌বো না।

আমি কোন দুঃখের কথা, তোমায় বলব না॥
তুমি যাতে ভালো থাকো সেই ভালো।
গেলো গেলো বিচ্ছেদে প্রাণ্ আমারি গেলো॥

সদা রাগে কর ভর, আমিতো ভাবিনে পর, তুমি চক্ষু মুদে আমায়্ দুঃখ দিওনা॥

চিতেন।

দৈবযোগে যদি প্রাণনাথ্ হোলো এপথে আগমন।
কও কথা, একবার কও কথা, তোলো এ বিধু বদন॥

পীরিৎ ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে তায়্ লজ্জা কি, এমন্ তো প্রেম্ ভাঙ্গাভাঙ্গি, অনেকের্ দেখি।

আমার্ কপালে নাই সুখ্, বিধাতা হোলো [১৫] বিমুখ্, আমি সাগর্ সেঁচে কিছু মাণিক পাবনা।

[ইহার আর কিছুই পাইলাম না। অতি উত্তম]

মহড়া।

শ্রীরাধায় বনে পরিহরি কোথাহে হরি।*
লুকালে কি প্রাণ হরি, ও প্রাণ হরি॥
এনে বনে ফুলো হরি, কে জানে বধিবে হরি, হরি ভয়্ কি মনে করি, মরি বোলে হরি হরি॥

চিতেন।

হরি নিয়ে বিহরি বনে, এইছিল প্রয়াস।
বনমালী, বনকেলি, করিলে নিরাশ॥
না জানি কি অপরাধে, তেজিলে দুঃখিনী রাধে, সাধে সাধে সুখো সাধে, গেলে হে বিষাদো করি।

[এই গান ভবানে বেণে গাহিয়াছিল, অন্তরা পাইলাম না।]

মহড়া।

জলে জলে কে, গো, সখি।†
অপরূপো রূপো দেখি॥
দেখো সই নিরখি।
কৃষ্ণের অবয়ব সব ভাব ভঙ্গি প্রায়।
মায়াকোরে ছায়া রূপে সে কালা এসেছে কি॥

চিতেন।

আচম্বিতে আলো কেন, যমুনারি জল।
দেখ সখি, কূলে থাকি, কে করে কি ছল॥
তীরের্ ছায়া নীরে লেগে হোলো বা এমন, স্বকিতে দেখিতে আমার, জুড়ালো দুটি আঁখি॥

অন্তরা।

নিতি নিতি আসি সবে জল আনিতে।
ওগো ললিতে।
না দেখি এমনো রূপো, বারি মাঝেতে॥

---

* শ্রীহিপীতিতে (১৯১৬ নং) রচয়িতা ভবানীচরণ বণিক।—স.

† বাঙ্গালীর গান (পৃ ১১১) এবং শ্রীহিপীতিতে (২২৩৬ নং) রচয়িতা হরু ঠাকুর।—স.

চিতেন।

আজু সখি একি রূপো নিরখিলাম্ হায়।
নীর মাঝে যেন স্থির সৌদামিনী প্রায় ॥
ঢেউ দিওনা কেউ এ জলে বলে কিশোরী, দরশনে দাগা দিলে হইবে সই পাতকি ॥

অন্তরা।

বিশেষ বুঝিতে, নারি নারী বই তো নই, ওগো প্রাণসই।
নিরখি নির্ম্মল জলে, অনিমিষে রই ॥

চিতেন।

কত শত অনুভব, হয় ভাবিয়ে।
শশি কি ডুবিল জলে রাহুরো ভয়ে ॥
আবার্ ভাবি সে যে শশী কুমুদ বান্ধব, হৃদয় কমলো কেন তা দেখে হবে সুখী ॥

মহড়া।

প্রেম্ তরুতে সই, চার্‌টি ফল্ ফলে।*
শুন ফলের্ নাম, ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম্, সময়ে এক্ বিন্দু দিলে, সুখসিন্ধু উথলে ॥

[আর কিছুই পাইলাম না। ইহার মূল দেখিয়াই যখন মোহিত হইয়াছি, তখন ফুল ও ফল পাইলে আরো কি সুখের হইত তাহা বিবেচনা করুন।]

মহড়া।

কর্ম্মে উত্তম্ পীরিৎ প্রাণরে সে প্রেম্ কি সামান্যেতে হয়।
তুমি নবীনা যুবতী, পীরিতে নূতনোব্রতী, পীরিৎ হবে কি মন্ তোমার তেমন্ নয় ॥
যাতে দ্বিধা হয়, সে কর্ম্ম করা উচিত নয়।
দেখো ভগীরথ্ মোক্ষ প্রেমের আশাতে।
কোরে মন্ত্র সাধন, কিম্বা শরীর পতন, আনিলেন্ গঙ্গা ভারতে ॥
দেখো প্রহ্লাদের্ যন্ত্রণা, হরি নাম তবু ছাড়্‌লে না, তার্ তাইতে হোলো শেষে সুখোদয় ॥

---

* প্রাচীন কবিসংগ্রহে (পৃ ১০২) বাঙ্গালীর গানে (পৃ ১৪৭) প্রীতিগীতিতে (২০০ নং) সম্পূর্ণ উদ্ধৃত।—স.

চিতেন।

শ্রীহরি প্রেমেতে, মোক্ষ আশাতে ধ্রুব প্রহ্লাদ বৈরাগি।

দুর্গার ভাবেতে, মুখ্য প্রেমেতে, সদাশিব্ হোয়েছেন্ যোগী॥

তোমার্ মনেতে তেমন্ নিষ্ঠা আছে কই।

এক্‌বার্ চাও পীরিৎকে আবার্ চাও বিচ্ছেদ্‌কে, দ্বিধা মন্ কর রসময়ী॥

যে জন্ পীরিতে রত হয়, প্রেম্ ধর্ম্মের ধর্ম্ম এতো নয়, দেখো প্রেমের্ দায়ে শ্মশান্‌বাসী মৃত্যুঞ্জয়।

[ইহার অন্তরা পাইলাম না।]

মহড়া।

তোমার প্রেম্ গেছে তবু প্রাণের প্রাণ্, মান্ রেখে কথা কই।

কত পুরুষ্ তুমি পাবে, সবাই তোমার মন্ যোগাবে, আমার প্রাণ্‌কে জুড়াবে, প্রাণ্ তুমি বই॥

গেছে বস্, তবু আছি তোমার বশ্ ভগ্নভাবে মগ্ন রই॥

* * * * *

চিতেন।

কল্পতরু যদি কৃপণ্ হয়, তবু রয় মহত্ব।

কত জন্ সুখো ফলো প্রয়াসে, পোড়ে থাকে নিয়ত॥

তোমার তেম্‌নি ভাব্ হোয়েছে।

ওরে প্রাণ্‌রে, আর কি সাধ্ আছে॥

কেবল লুব্ধ আশায়, প্রাণ পোড়ে আছে॥

প্রিয়ে সাধিলে মনের্ সাধ্, আর এখন চারা কি, হব এখন দত্তহারী যদি মনো ফিরে লই॥

[ইহার সমুদয় পাইলাম না।]

মহড়া।

ঘরে ঘর্ করা ভার হোলো সখি, আর্ তো বাঁচিনে।

একে মদন্ সর্ব্বনেশে, নারীর প্রাণ্ জ্বলায়গো এসে, পতি হোলো কন্তারেশে, চায়্ না সতীর পানে॥

ইচ্ছা হয়, তেজে লোকালয়, বাস্ করি বনে॥

মদন্ শর্ হানে সই যত, সে যে কর দিতে নয় রত।
কেবল্ ঘর্ আগুনে পোড়ে থাকে, পাণ্ডু রাজার মত॥

*　　*　　*　　*　　*

চিতেন।

বসন্তে থাকিতে পতি সতীর হয় প্রমাদ।
ভাল আমার্ বেনে, ভাগ্য গুণে, হয়েছে সই, হরিষে বিষাদ॥
কোথা সঙ্গদোষে পোড়ে, রতিরঙ্গ আলাপ ছেড়ে।
আমার্ প্রাণপতি এসেছে এবার্, শান্তিশতক পোড়ে॥
নাথের্ রঙ্গ দেখে আমার অঙ্গ জ্বলে সই, সদা দাহন করে আমায় অনঙ্গবাণে॥

[এই প্রকৃষ্ট গীতের অন্তরা পাই-[১৬] লাম না, ও মহড়ার··· মল পাইলাম না।]

মহড়া।

ঋতুরাজ্ নিলাজ ভূপতি।
যে ধারে কর, দেশান্তর, রৈল সে, তার দায়ে বধে সতী॥

*　　*　　*　　*　　*

চিতেন।

অন্তায়্ দেশে রেখে সই গেছে প্রাণনাথ।
সে পেলে কি ধন, এখানে মদন, দেয়্ তার্ স্ত্রীধনে আঘাত॥

*　　*　　*　　*　　*

অশান্ত বসন্ত রাজা, প্রাণনাথ পলাতক্ প্রজা, না ধরে সে নিষ্ঠুরেরে আমায় দেয় দুর্গতি।

[এই গীতটি অতি সুন্দর। ইহার সমুদয় ও দ্বিতীয় প্রাপ্ত হইলাম না। ভরসা করি, এ রসের উৎসাহি মহাশয়েরা আমারদিগের এই মনের আক্ষেপ নিবারণ করিবেন।]

মহড়া।

প্রাণ তুমি এ পথে আর এসোনা ॥*
শুধু দেখা, দিবে সখা, সেতো তা, মনেতে বুঝ্‌বে না।
তুমি যার, এখন তার, পুরাও বাসনা ॥
তোমা হোতে সুখো যা হবার।
প্রাণ্‌ তা হোয়ে বোয়ে গিয়াছে আমার ॥
দেখা হোলে, মরি জ্বোলে, এ দেখা দিও না।

চিতেন।

আগে তোমায় দেখ্‌লে সখা, হতো পরম আহ্লাদ।
এখন্‌ তোমায় দেখ্‌লে ঘটে হরিষে বিষাদ ॥
এসো বোসো বলা হোলো দায়।
কি জানি কে গিয়ে সখা, বোলে দিবে তায়।
সে তোমাকে, আমার্‌ পাকে করিবে লাঞ্ছনা।

অন্তরা।

তা বলা নয়, উচিত হয়, না এলে এখন।
নূতন রঙ্গিনী তোমার, করিবে ভৎসন ॥

চিতেন।

আমায় বরং সখা, দিও দেখা, যুগ যুগান্তে।
অনাদর, নাহি কোরো, সেই নূতন্‌ পীরিতে ॥
নবরসে সে, যে, রঙ্গিনী।
প্রাণ্‌ হোয়েছে তোমার প্রেমের অধীনী ॥
আমায় যেমন্‌ জ্বল্‌য়েছিল তারে জ্বালা দিওনা।

[অতি উত্তম।]

মহড়া।

এসো নূতন্‌ প্রেম্‌ করি, প্রাণ্‌ বাঁধা রেখে প্রাণ।

রাখ্‌বো হৃদয় মন্দিরে, বেঁধে প্রেমডোরে, প্রেমের্‌ প্রহরী থাকবে আমার দুনয়ান ॥

---

* প্রীতিগীতিতে (১১৪৮ নং) রচয়িতা গোরক্ষনাথ।—স.

প্রাণে থেকে প্রাণ, রেখে মান, হও প্রাণের প্রাণ ॥

হবে এ বড় পরিবর্ত্ত সম্বন্ধ।

গেলেও স্থানান্তরে, দেখ্‌বো অন্তরে, প্রাণ্ বোলে ডাক্‌লেও আনন্দ ॥

যাতে মন্ দিলে মন পাই, হাতে রেখে হাতে যাই, যেন কেউ কারে হান্‌তে নারে বিচ্ছেদ্ বাণ ॥

চিতেন।

না হোতে মনে মনে ঐক্যতা, সখ্যতা, না হয় সুখোদয়।

বিনে ঐক্যে, হাসে যত বিপক্ষে, দুই পক্ষে দুখে প্রাণ দয় ॥

* * *

যেন এবার আর তা না হয়, এক্ ভাবে ভাব রয়, শেষেতে দেশে না হই অপমান।

[অতি চমৎকার। কি পরিতাপ! এই সাটের সমুদয় পাইলাম না।]

মহড়া।

মান্ ভিক্ষে দেও আমারে প্রিয়ে এখন্।

ধনি আজ্‌কের মত মান্, করি সমাধান্, এক্‌বার্ বদন তুলে কর বিবাদ ভঞ্জন ॥

[ইহার সমুদয় ও প্রথম গানটি প্রাপ্ত হইলাম না।]

মহড়া।

যৌবনরথে কে তুমি রে প্রাণ্, পীরিৎ শূন্য যুবতী।

রূপে থমকে থমকে, চপলা চমকে, কেন পাগল্ কোরে বেড়াও পুরুষ জাতি ॥

প্রেমিকেরো প্রতি তুমি, কর ডাকাতি।

কুচগিরি উচ্চ পেয়ে মদন করে কেলি।

কোথা আছে করিকুম্ভ প্রাণ, ডাড়িম্ব কি কদম্ব কলি ॥

হেরে মুখো মনোহর, লজ্জা পায় শরদ্ শশধর, কেন কমল্ বনে নাহি ভ্রমরের গতি।

[অতি উৎকৃষ্ট। ইহার সমুদয় পাইলাম না।]

মহড়া।

সেই তুমি, আমিও সেই ॥
প্রেম্ গেল কোথায়।
ইহার কি অভিপ্রায় ॥
কোন রূপে ত্রুটি দেখিতে না পাই, দেখা হোলে তোষো কথায়।

চিতেন।

তখন্ হোতে এখন্ অধিক আদর, দেখি প্রিয়ে তুমি কর আমায়।
অত্যাপি আমারো, দোষো করি গুণো গাও, শুনি যথা তথায় ॥

(ইহার আর কিছুই পাইলাম না। বহু কালের গান। অন্য রামবসুর গীত এই পর্য্যন্ত শেষ হইল। ইহাতে অসংপূর্ণ কবিতা অনেক গুলীন রহিল। এ রসের রসজ্ঞ মহাশয়েরা যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করত সংপূর্ণ করিয়া দিবেন।]

৺লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস*

[৭] কলিকাতার ঠঠনে নিবাসী কায়স্থ কুলোদ্ভব ৺লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, যিনি সাধারণের নিকট "লোকেকাণা" নামে বিখ্যাত ছিলেন। এই বঙ্গদেশে তাঁহার পরিচয় ও তাঁহার নাম না জানেন এমত ব্যক্তি কেহই নাই। ইনি পেসাদারি পাঁচালীর দল করিয়া উপজীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ইহাঁরি দল সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ছিল। কারণ ইনি অতি সুকবি ছিলেন। তৎকালে এই বিশ্বাসের অপেক্ষা রহস্য-ঘটিত কবিতা রচনা বিষয়ে অপর কেহই পারদর্শী ছিলেন না। লক্ষ্মীকান্ত শুদ্ধ কবি ছিলেন এমত নহে। সংগীত বিদ্যায় বিশেষ নিপুণ ছিলেন, খেয়াল, ও ধুরপৎ প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া যে সমস্ত পাঁচালীর সুর প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা অত্যাশ্চর্য্য। এইক্ষণকার পাঁচালী সম্প্রদায়দিগের তৎসমুদয় ভাণ্ডার স্বরূপ হইয়াছে, তাহাই লইয়া তাঁবতে নাড়া চাড়া করিতেছেন!

বিশ্বাস অতিশয় বদ্বক্তা [সদ্বক্তা] ছিলেন, ইনি যথার্থই একজন উপস্থিত বক্তা। ভাঁড়ামি ব্যাপারে "গোপাল ভাঁড়" হইতে বড় ন্যূন ছিলেন না। উপস্থিত মতে ইনি যে সকল কথা কহিতেন, ও যে যে কথার উত্তর প্রত্যুত্তর করিতেন তচ্ছ্রবণে কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেন না। তাবতেই কুতুহলে পরিপূর্ণ হইতেন হাসিতে হাসিতে পেট ফুলিয়া উঠিত। অন্য যাঁহার পুত্র বিয়োগ হইয়াছে, শোকে অত্যন্ত কাতর, চক্ষের জলে পৃথিবী আর্দ্রা হইতেছে, তিনি লক্ষ্মীকান্তের মুখ নির্গত কৌতুকজনক একটি কথা শ্রবণ করিলে তৎক্ষণাৎ অমনি শোক [৮] সম্বরণ পূর্ব্বক হাস্য আস্য হইতেন। গোপাল ভাণ্ড কেবল ভাণ্ডই ছিল, তাহার অপর কোন কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। বিশ্বাস অতি সুগায়ক, সৎকবি এবং সুবক্তা ছিলেন।

ইনি সকলেরি প্রিয় ছিলেন, ধনি মাত্রেই ইহাঁকে স্নেহ করিতেন, ভাল-বাসিতেন ও আদর করিতেন, এবং অনেকেও ভয় করিতেন। ভয় করিয়া সর্ব্বদাই অর্থ দিতেন, ইহার কারণ, ভাঁড়ের মুখ, কি জানি, কখন কি বলিয়া বসে, এই ভাবিয়াই ধন দানে সন্তুষ্ট ও বাধ্য করিয়া রাখিলেন।

কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এক দিবস কৌতুক ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন "বিশ্বাস! তোমাকে লোকে লোকেকাণা কেন বলে?" লক্ষ্মীকান্ত তখনি এই উত্তর

---

* সংবাদপ্রভাকর, শনিবার ১ মাঘ, ১২৬১ সাল। ইং ১৩ জানুআরি ১৮৫৫।—স.

করিলেন, "মহাশয়! যে ব্যক্তি বলে লক্ষ্মীকান্ত, সেই বলে বিশ্বাস। আর যে গুওটা বলে লোকে, সেই বলে কার্ণা।"

এই নগরস্থ কোন প্রধান মান্য ধনাঢ্য সুবর্ণবণিক এক দিন হাস্য করিয়া কহিয়াছিলেন, "বিশ্বাস! তোমাদের বামুণ কায়েতের মধ্যে হাজার হাজার বেশ্যা দিবারাত্র রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করিতেছে, কেমন আমারদের স্বোণার-বেণের ভিতরে একটি বেশ্যা দেখাইতে পার?" বিশ্বাস তদ্দণ্ডেই অম্লানমুখে উত্তর দিলেন "মহাশয়! আপনারদের স্বোণারবেণের জেতের কথা কেন কহেন? স্বোণার জাতি, জাতি বৈষ্ণব, ভেকে কায্ কি"।

অপিচ কোন বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এক দিবস লক্ষ্মীকান্তকে আপনার বাগানে বনভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বিশ্বাস উদ্যানে গিয়া উক্ত বাবুর সহিত এরূপ করিয়া উদর ভরিয়া আহার করিলেন, যে, পাতে শতান্নও রাখিলেন না। বাবুর বাবুআনা আহার, পত্রে প্রায় সমুদয় দ্রব্যই পড়িয়া রহিল, আহারান্তে যখন উভয়ে আচমন করেন, তখন ভৃত্য পত্র ফেলিয়া দিল, বিশ্বাসের পাতে কিছুই নাই। অন্য জন্তু দূরে থাকুক, বিশ্বাসের ভোজনে পিপীড়াও বিশ্বাস করিতে পারে না, আশ্বাস করিয়া আইলে তাহাকে নিশ্বাস ছাড়িয়া তনু ত্যাগ করিতে হয়। বাবুর পাতে সমস্তই রহিয়াছে, একারণ কুক্কুর আসিয়া স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে আহার করিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে বাবুজী শ্লেষ করিয়া কহিলেন, "ছি, বিশ্বাস! দেখ তোমার পাতে কুক্কুরেও আহার করে না"—এই বাক্য শুনিয়া লক্ষ্মীকান্ত তৎক্ষণেই এই সদুত্তর করিলেন, "মহাশয়! এ কুক্কুর ভিন্ন গোত্রে আহার করে না"।

হে পাঠকগণ! এই স্থলে জিজ্ঞাসা করি আপনারা উক্ত ব্যক্তির বাক্ পটুতা ও অত্যাশ্চর্য্য সদ্বক্তৃতা বিষয়ে কি রূপ প্রশংসা করিবেন?—প্রস্তাব মাত্রেই বিনা চিন্তায় তখনি এমত সদুত্তর প্রদান করা কি রূপ কঠিন ব্যাপার তাহা আপনারাই বিবেচনা করুন। যাঁহারা এই ব্যক্তিকে লইয়া সর্ব্বদা একত্র থাকিয়া নানাবিধ বাক্ কৌশল পূর্ব্বক আমোদ প্রমোদ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই যথার্থ সুখ সম্ভোগ করিয়াছেন।

শোভাবাজার নিবাসী পাঁচালীওয়ালা ৺গঙ্গানারায়ণ নস্কর ইঁহার প্রতিযোগী ছিলেন, সেই নস্কর কর্ত্তা ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি কবি ছিলেন না। এক দিবস কোনো সভায় উভয়েই সভাস্থ হইয়াছেন, বিশ্বাস একবার এদিক, একবার ওদিক করিয়া পায়চারি করিতেছেন, এক স্থানে স্থির হইয়া উপবেশন করেন

নাই। নস্কর তাহা দেখিয়া ব্যঙ্গ পূর্ব্বক কহিলেন "কেমন হে বিশ্বাস! বড় যে জোয়ারের জলে ভাসিতেছ"—বিশ্বাস উত্তর করিলেন, "সাবধান, সাবধান, দেখো যেন তোমার তর্পনের কোশার মধ্যে না উঠি"।

এক দিবস কোন সভায় বিশ্বাস বসিয়া আছেন, এমতকালে নস্কর আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে "কাঁদে বাড়ি ধ" করিয়া বসিলেন, নস্কর কথোপকথনে অন্য মনে রহিয়াছেন, ইহার কিঞ্চিৎ পরে বিশ্বাস আস্তে আস্তে উঠিয়া পশ্চাদ্ভাগে আসিয়া নস্করের মস্তকে "তেপুঁটুলে শ" করিয়া বসিয়া পড়িলেন। ইহাতে সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তিই হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে বিশ্বাসকেই জয়ধ্বনি প্রদান করিলেন।

এই প্রকার দোষাশ্রিত ও দোষহীন রহস্য ও কৌতুকের কথা কত আছে তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না।

লক্ষ্মীকান্ত কেবল কৌতুকের কবিতায় প্রচুর পাণ্ডিত্য প্রচার করিয়াছেন। পরমার্থ ও ভক্তিরসের ব্যাপার যাহা রচিয়াছেন তাহা ব্যাখ্যার যোগ্য নহে। তন্মধ্যেও কেবল হাস্য পরিহাসের কথা প্রয়োগ করিয়াছেন।

যথা।

"গিরি কই আমার আনন্দময়ী, আস্‌বে কতক্ষণে।

যত বামুন্ করে ছুটাছুটি, ঘট্ নিয়ে পেতেছে ঘাঁটি, বুঝি কার্ চণ্ডী শুনে আমার চণ্ডী, আট্‌কেছে কোন্‌খানে ॥"

তথা।

"ভজ্‌বনা ভবানী বাণী, এবার্ খুব মনে দিয়েছি পাড়া।

যত গুপ্ত কথা ব্যক্ত কোল্লে, ব্যাস্ নামে সেই বামুন্ ছোঁড়া ॥" ইত্যাদি।

শ্লেষ ও খেউড় বর্ণনায় ইনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তাহাতে আশ্চর্য্য শক্তি ও চমৎকার ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, যে, তাহার অধিকাংশই অতিশয় অপবিত্র শব্দে বিন্যস্ত, একারণ কোন মতেই পত্রস্থ করা যাইতে পারে না। সেই সকল সুকৌশল সূচক উক্তি যদি কোন উত্তম বিষয়ে উক্ত হইত তবে কি সুখের বিষয় [?] হইত। বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ, সকলেই পাঠ করিয়া আনন্দিত হইতেন। ইনি শতরঞ্চ খেলার পাঁচালীতে যদ্রূপ অদ্ভুত কবিত্বকৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, সেরূপ আমরা প্রায় শ্রবণ করি নাই। পাশা, ও ঘুড়ি খেলার কবিতা গুলীনও অবিকল তদ্রূপ। কিন্তু তাহাতে অধিকাংশ অসাধু শব্দ প্রয়োগ থাকাতে প্রকাশ করা

বিধেয় হইল না। কেবল শতরঞ্চের পাঁচালীটি সংগ্রহ করিয়া পশ্চাদ্ভাগে উদ্দিত করিলাম, এতদ্দৃষ্টে সকলেই সবিশেষ জানিতে পারিবেন। যদিও ইহাতে অপবিত্র ভাষাই অধিক আছে, কিন্তু কবির অসাধারণ কবিতার ব্যাপার সর্ব্ব-সাধারণের সুবিদিত করণ কারণ প্রত্যাশা-পরবশ হইয়া পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না।

অধুনা লক্ষ্মীকান্তের বংশে বংশধর কেহই নাই। "বৈদ্যনাথ বিশ্বাস" নামে ইহার এক পুত্র ছিলেন, তিনি পিতৃদল রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার সন্তান সন্ততি না হইতেই প্রাণ বিয়োগ হয়। দর্পনারায়ণ নামে বিশ্বাসের একটি দৌহিত্র ছিল, সে ব্যক্তিও অনেক দিন পর্য্যন্ত দল রাখিয়াছিল, পরে জগদীশ্বর তাহাকেও পরলোকগত করিলেন। উক্ত কবি প্রায় ১০।১৫ বৎসর বয়সে প্রাণ ত্যাগ করেন, ৩৫।৩৬ বৎসর হইল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

যথা।

শতরঞ্চের পাঁচালী।

পুরুষ উক্তি গীত।

প্রেম কোরে মজালে আমায়, হায়, হায় হায়, পরাধীন মন।

হায় মন কি করিলে, মিছে মজায় ভুলে গেলে, তার উপাসনা কর, যে নহে আপন ॥

এস্ক* দূতের আশায় ভুলে, খেল্‌তে গেলে জিৎবে বোলে, কলে বলে জিতে নিলে, জান্‌লেনা কারণ।

ছড়া।

স্ত্রীলোকের বল।

জুল্ ১, কটাক্ষ ২, পেক্‌না ৩, হাসি ৪, কব্যাটা ফাঁস্‌ড়ে।
বাক্য ৫, কুহক্ ৬, হাট্ ৭, ঠমক্ ৮, এই আট্ বোড়ে ॥
মজাড়ে আর কাণ্ রূপ, এই দুটো ঘোড়া।
ছেনালী, চাতুরী নামে, নৌকা এক যোড়া ॥
যৌবন, লাবণ্য, দুটো হাতিকে বাখানি।
সোয়ার তাতে, মোহিনী রাজা, কাম রূপ মন্ত্রিণী ॥

---

* এস্ক।—আসক্তি অর্থাৎ আসক।

পুরুষের বল।

কর্ম্ম ১, ক্রিয়া ২, লজ্জা ৩, শীল ৪, ছিল আমায় বেড়ে।
সংসার ৫, ধর্ম্ম ৬, কুল ৭, মান ৮, এই আট বোড়ে॥
গাম্ভীর্য্য, গৌরব, নামে, ছিল দুটো ঘোড়া।
নিবৃত্তি আর ভয়, নামে নৌকা এক যোড়া॥
ধৈর্য্য আর জ্ঞান রূপ, এই দুটো হাতি।
প্রাণ রাজা সোয়ার মন, মন্ত্রিণী সারথি।

খেলা।

জুল্ বোড়ে, টিপে দিলে, কর্ম্ম বোড়ে, মেরে নিলে, ক্রিয়া বোড়ে আল্গা হোলো।

তার, কটাক্ষ বোড়ের ঘায়, ক্রিয়া বোড়ে, মারা যায়, ক্রমে বিবদ্ধ হইতে লাগিলো॥

পরে, তার হাসি বোড়ে, হেসে হেসে,
আমার লজ্জা বোড়ে, নাশে।
তার পেক্না বোড়ে, কল্লে আগুয়ান।
দারুণ পেক্নার ফন্দি, শীলতা করিল বন্দি,
শেষে শীলের বধিল পরাণ॥

পরে, তার বাক্য বোড়ে, এলো, তাতেই আমার ধর্ম্ম গেলো, কুহক্ বোড়ে, লজ্জা বোড়ে লয়।

তার, ঠাট বোড়ে, কুল মারে, ঠমকেতে, মান্ হরে, এই ষোলো বোড়ের পরিচয়॥

তখন্ কাটাকাটি, ঝুটোপুটি, দেখিয়ে ঝকড়া।
মজাড়ে আর কাণ্, বেরুলো, তুর্কী এক ঘোড়া॥
তখন্ বিঘটিত সময়ে, প্রাণ্ রাজা, ভয় পেয়ে।
মন্ মন্ত্রিকে সম্মুখে রেখে, পশ্চাতে লুকায় গিয়ে।
তখন্, তার ছেনালী নৌকাতে, মন্ মন্ত্রি চাপা দিলো।
আবার, কাণ ঘোড়া, কোড়া করি, আগুয়ান্ করিলো।
কাণ্ ঘোড়া লোয়ে ছুঁড়ী, কল্লে এম্নি নক্সা।
প্রতি হাত, সর্ব্বনাশী, প্রেমে দিলে রোক্কা॥

পরে, আর ষোলো বল, প্রবল হইলো।
কিস্তিতে কিস্তিতে, প্রাণ্ রাজা, নীচে গেলো॥
তখন্, নৌকা, ঘোড়া, হাতি, বোড়ে, মন্ত্রির ঘর ছেড়ে।
পাঁচ্টা ঘর আল্গা কোরে, প্রাণ্ রাজাকে রাখ্লে বেড়ে॥
তখন্ র্যাঁড় উপ্রো উপ্রি, পাঁচটা কিস্তি দিলে।
আমার প্রাণ্ রাজাকে, কয়েদ্ কোরে, পঙ্করং করিলে॥

যদিও এই কবিতায় ছন্দের ও মিলের বিস্তর দোষ আছে, এবং লিঙ্গ ঘটিত উক্তির দোষ দৃষ্ট হইতেছে এ দোষ যথার্থই দোষ বটে, তাহা স্বীকার করিব; কিন্তু যাঁহারা পাঁচালী রচনা করেন, তাঁহারা ছন্দ ও মিলের দোষ বড় ধর্ত্তব্য করেন না, সুতরাং এই দোষেই আর আর দোষ ঘটিয়া থাকে। ফলে প্রাচীনকালে এরূপ দোষ যদ্রূপ ছিল, বোধ করি এইক্ষণে আর তদ্রূপ নাই কারণ ক্রমে ক্রমে খণ্ডন হইয়া আসিতেছে। নব্য রচকেরা ভব্য হইয়া সংশোধন করিতেছেন, কিন্তু তাহাই বা কোথা? ইদানীং পেসাদারী দলে ও সৌখিন বাবুদিগের দলে যে সকল পাঁচালী রচিত হইয়া থাকে, তাহাতেও লিঙ্গ, মিল ও ছন্দের বিস্তর গোলযোগই দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল কবি পাঁচালীর ছড়া দেন, তাঁহারা ছড়া দেন, কি ছড়া দেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, আমরা ছন্দ ও মিল প্রভৃতির দোষ না ধরিয়া এই স্থলে লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাসকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে বাধ্য হইলাম, যেহেতু তিনি [১০] খেলার অবিকল প্রণালী ও মর্ম্ম রক্ষা করিয়া রূপক ছলে নায়ক নায়িকার প্রণয়ঘটিত উভয় দলের বল ও চাল্ এবং খেলার জয় পরাজয় যে প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করা কোন্ তুচ্ছ, সর্ব্বস্ব দান করিলেও হানি বোধ হয় না, বরং আহ্লাদ জন্মে।

অপিচ উক্ত বিশ্বাসের বিরচিত একটি গানের কিয়দংশ পত্রস্থ করিলাম, সকলে দৃষ্টি করুন।

যথা।

বাবুজীগো দম্ ফাটে মরি প্রাণ যায়॥
একি বিধির বুদ্ধি মোটা, পদ্মের মৃণালে কাঁটা, রেস্ত শূন্য নীলমণি হালদার, দুখো কব কায়।

একি বিধির বিবেচনা, সাগরের জল লোণা, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস্ কাণা, ঠাকুরকে পিরিলি দায়॥

যদি কোন মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিশ্বাসের প্রণীত শ্রবণযোগ্য শব্দ সংযোজিত বিশ্বাসের কবিতা প্রেরণ করেন, তবে আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ বাধ্যতা স্বীকার করিব।

পরিশিষ্ট